অকৃত্রিম ধন্যবাদ

প্রেমেন্দ্র মিত্র

প্রথম প্রকাশ :
ডিসেম্বর : ১৯৬১

প্রকাশক :
প্রসূন কুমার বসু
সমকাল প্রকাশনী
৮/২এ. গোয়ালটুলি লেন
কলকাতা-৭০০০১৩

প্রচ্ছদপট :
গৌতম রায়

মুদ্রাকর :
মানসী প্রেস
৭৩, মানিকতলা স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০০০৬

মশা

টাই আগে বলব, না, গল্প যাঁর মুখে শোনা, সেই ঘনশ্যাম-দার বর্ণনা দেব, বুঝে উঠতে ...ছি না।

গল্পটা কিন্তু ঘনশ্যাম-দা, সংক্ষেপে ঘনাদার সঙ্গে এমন ভাবে জড়ান, যে তাঁর পরিচয় না দিলে গল্পের অর্ধেক রসই যাবে শুকিয়ে। সুতরাং ঘনাদার কথা দিয়েই শুরু করা বোধ হয় ত।

ঘনাদার রোগা লম্বা শুকনো হাড়-বার-করা এমন একরকম চেহারা, যা দেখে বয়স আন্দাজ একেবারে অসম্ভব। পঁয়ত্রিশ থেকে পঞ্চান্ন যে কোন বয়সই তাঁর হতে পারে। ঘনাদাকে জিজ্ঞেস করলে অবশ্য একটু হাসেন, বলেন, "দুনিয়াময় টহলদারি করে বেড়াতে বেড়াতে সের হিসেব রাখবার কি আর সময় পেয়েছি! তবে—"বলে ঘনাদা যে গল্পটা শুরু করেন, সটা কখনো সিপাহী মিউটিনির, কখনো বা রুশ জাপানের প্রথম যুদ্ধের সময়কার। সুতরাং াদার বয়স আন্দাজ করা আমরা ছেড়ে দিয়েছি। শুধু ইটুকুই মেনে নিয়েছি যে গত দু'শ ছর ধরে পৃথিবীর হেন জায়গা নেই যেখানে তিনি যান নি, হেন ঘটনা ঘটেনি যার সঙ্গে ার কোন যোগ নেই।

কয়েক বছর হ'ল কেন যে কৃপা করে তিনি আমাদের এই গলিটির ছোট্ট মেসে এসে উঠেছেন তা ঠিক বলতে পারি না। আমাদের ছুটিছাটার আড্ডায় তিনি যে নিয়মিতভাবে এসে বসেন, এও তাঁর অসীম করুণা বলতে হবে। প্রায়ই অবশ্য তিনি ভয় দেখান যে পাত-তাড়ি গুটিয়ে আবার নিরুদ্দেশ হয়ে যাবেন কিন্তু সাধারণতঃ সেটা মাসের শেষে, মেসের খরচের াগাদা পড়বার সময়। বুঝে শুনে কিংবা হতাশ হয়েই তাঁর কাছে তাগাদা করা আমরা ছেড়ে দিয়েছি। ঘনাদা আমাদের আড্ডায় এসে নিয়মিতভাবে সবচেয়ে ভালো আরাম-কেদারাটায় বসেন যার ভাগ্য যেদিন ভাল থাকে, তার কাছে সিগারেট চেয়ে নিয়ে ধরান, তারপর চোখ

বুজে প্রায় ধ্যানস্থ হয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ হয়তো আমাদের কোন একটা কথায় বেশ এ উচ্চৈঃস্বরেই হেসে ওঠেন।

অপ্রস্তুত হয়ে আমরা তখন তাঁর দিকে তাকাই। ঘনাদা একটু নড়ে চড়ে উঠে সিগারেটে একটা লম্বা টান দিয়ে ঈষৎ বিদ্রূপের স্বরে বলেন, "কি কথা হচ্ছিল—বন্যার?"

আমরা লজ্জিত ভাবে স্বীকার করি যে সামান্য দামোদরের বানের কথা আমরা আলোচনা করছিলাম।

ঘনাদা আমাদের দিকে এমন করুণা-মিশ্রিত অবজ্ঞার সঙ্গে তাকান মনে হয় দামোদরের বানে আমাদের নিজেদের ভেসে যাওয়াই ভালো ছিল। তারপর জিজ্ঞাসা করেন, "টাইডাল ওয়েভ কাকে বলে জান? দেখেছ কখনো সেই লয়ের ঢেউ—যাকে বলে সুনামি-জলোচ্ছ্বাস।"

সঙ্কুচিতভাবে স্বীকার করি যে নামটা জানলেও ব্যাপারটা সম্বন্ধে নিজেদের কোন অভিজ্ঞতা নেই।

ঘনাদা হেসে বললেন,—"কেমন করে আর থাকবে! তাহলে শোন। তখন মুক্তোর ব্যবসা করব বলে তাহিতি দ্বীপে গিয়ে উঠেছি—"

ঘনাদার সেই সুদীর্ঘ চিত্তাকর্ষক গল্প থেকে জানা যায় যে কি করে এই রকম এক টাইডাল ওয়েভের মাথায় এক বেলায় তাহিতি থেকে একবারে ফিজি দ্বীপে গিয়ে তিনি উঠেছিলেন।

এ গল্প শোনার পর আমাদের অবস্থা কি হয়, তা বলাই বাহুল্য। দিন দুপুরে সূর্যের সামনে মিটমিটে আলোর মত আর কি!

ঘনাদার ভয়ে আমাদের অত্যন্ত সাবধানে কথাবার্তা বলতে হয়, কিন্তু আঁটঘাট বেঁধে যতই কিছু বলি না কেন, ঘনাদার হাত থেকে নিষ্কৃতি নেই। দেখা যায় ঠিক তিনি টেক্কা দিয়ে বসে আছেন!

হয়তো কথায় কথায় কে বলেছে যে, আজকাল অনেকেরই চোখে চশমা—চোখের জোর আর বড় বেশী নেই। ঘনাদা তাঁর মার্কা-মারা হাসিটি হেসে অমনি গিয়ে উঠলেন একেবারে আণ্ডিজ পাহাড়ের চূড়ায়, পৃথিবীর সবচেয়ে বড় পাখি কণ্ডর শকুনের বাসায় খোঁচা দিতে।

হাঁ, চোখের জোর দেখেছি বটে সেবার। আণ্ডিজ পাহাড়ের ওপর পথ হারিয়ে ফেলেছি, শীতে প্রায় জমে যাবার যোগাড়, সঙ্গে একজন মার্জেনটাইন শিকারী আর 'বোরোরো' জাতের এক সাড়ে ছ-ফুট লম্বা, রেড ইণ্ডিয়ান গাইড্। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, আর খানিকক্ষণের মধ্যে পথ না খুঁজে পেলে এই পাহাড়ের ওপরই বরফ চাপা পড়ে মরতে হবে। এমন সময় আমাদের চূড়োর নিচের খানিকটা মেঘ একটু ফাঁকা হয়ে গেল। কিন্তু বারো হাজার ফুট ওপর থেকে সেই ফাঁক দিয়ে কি আর দেখা যাবে। কিন্তু তখনো 'বোরোরো' জাতের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির কথা তো জানি না। হতভম্বের মত কারে সে একবার চোখের সামনে ধরলো, তারপর বললে, 'বাস্ ভয় নেই!'

অবাক্ হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'ভয় ত নেই, কিন্তু কি দেখতে পেলে তুমি?'

সে হেসে বললে, কেন ওইত নিচে শিকারীদের তাঁবু ফেলা রয়েছে বড় একটা কুকুর নিয়ে লাল কোট পরা এক শিকারী এইমাত্র তাঁবুতে ঢুকল'—শুনে আমি ত অবাক্।

ঘনাদার কথা শুনে আমরা ততোধিক অবাক্ হয়ে বললাম,—'বারো হাজার ফুট ওপর থেকে লাল রঙের কোট পর্যন্ত দেখতে পেলে!"

"তা না হলে আর চোখের জোর কিসের! শকুনের চোখ কি রকম জানো? দু' মাইল ওপর থেকে ভাগাড়ের গরু, লাশ ওরা দেখতে পায়। এই বোরোরো শিকারীদের চোখ তেমনি।

এরপর আমরা যে নির্বাক্ হয়ে গেলাম তা বলা বাহুল্য।

প্রায় নির্বাক্ হয়েই আজকাল থাকি। এর ভেতর সেদিন কি থেকে বুঝি মশার প্রসঙ্গ উঠে পড়েছিল। ঘনাদা তখনও এসে পৌঁছান নি। তাই বোধ হয় আমাদের অতটা সাহস।

তাছাড়া ভেবেছিলাম যে সামান্য মশা মারবার ব্যাপারে ঘনাদা তাঁর কামান দাগা প্রয়োজন বোধ করবেন না।

কিন্তু ভুল ভাঙতে আমাদের দেরি হোল না। বিপিন সবে তাদের গাঁয়ে কি ভাবে মশা মারবার ব্যবস্থা হচ্ছে সেই কথা তুলেছে, হঠাৎ দরজায় ঘনাদার আবির্ভাব।

"কি কথা হচ্ছিল হে?"

আমরা অত্যন্ত সঙ্কুচিত হয়ে বলি,—"নাঃ, এমন কিছু নয়, এই মশা মারবার কথা বলছিলাম।"

বিপিন তাড়াতাড়ি আরাম-কেদারাটা ছেড়ে সম্মানে ঘনাদার জন্যে জায়গা করে দেয়।

ঘনাদা তাতে সমাসীন হয়ে শিশিরের কাছে একটা সিগারেট চেয়ে নিয়ে ধরিয়ে বললেন "ওঃ, মশা!"

আমরা কতকটা আশ্বস্ত হই। যাক ঘনাদার দৃষ্টি তাহলে মশা পর্যন্ত পীঁছবে না। কিন্তু পরমুহূর্তেই বোমা ফাটল—যে সে বোমা নয়, একেবারে 'অ্যাটমিক'!

"হ্যাঁ, মেরেছিলাম একবার একটা মশা।"

আমরা স্তম্ভিত! ঘনাদা মশার প্রসঙ্গও বাদ দিতে চান না দেখে নয়, স্তম্ভিত, তাঁর এই অবিশ্বাস্য বিনয়ে। মশাই যদি মারতে হয়, তাহলে ঘনাদা মাত্র একটি মশা মারবেন, এ যে কল্পনাও করা যায় না!

শিশির সাহস করে বলেই ফেলল—"একটি মশা মেরেছিলেন!"

"হ্যাঁ, একটিমাত্র মশাই জীবনে মেরেছি।" আমাদের হতবুদ্ধি করেই ঘনাদা বলে চললেন—"মেরেছি ১৯৩৯ সালের ৫ই অগস্ট, সাখালীন দ্বীপে!"

আমরা ফ্যাল্-ফ্যাল্ করে তাঁর দিকে চেয়ে আছি দেখে একটু চুপ করে থেকে আবার বললেন, "সাখালীন দ্বীপের নাম শুনেছ, কিন্তু কিছুই জানো না—কেমন? দ্বীপটা জাপানের উত্তরে সরু একটা করাতের মত উত্তর-দক্ষিণে অস্বাভাবিক হয়ে পড়ে আছে। তার দক্ষিণ দিকটা ছিল জাপানীদের, আর উত্তরটা রাশিয়ার। সেই দ্বীপের পূর্বদিকের সমুদ্রকূলে তখন অ্যাম্বার সংগ্রহ করবার একটি কোম্পানির হয়ে কাজ করছি। এমন অখাদ্য পাণ্ডববর্জিত জায়গা দুনিয়ায় আর আছে কি না সন্দেহ। বছরের অর্ধেক সেখানে মুষলধারে বৃষ্টি পড়ে, আর বাকি অর্ধেক বরফে সব জমে যায়। তার ওপর আছে ভীষণ তুষার-ঝড় আর গাঢ় জমাট কুয়াশা। কোন রকমে দামী কিছু অ্যাম্বার সংগ্রহ করেই সেমুখো আর হব না এই ছিল মতলব, কিন্তু সে আশায় ছাই পড়ল। আমাদের কোম্পানির তান্‌লিন নামে এক চীনা মজুর একদিন সকালে হঠাৎ নিরুদ্দেশ; তার সঙ্গে এ পর্যন্ত যা অ্যাম্বার যোগাড় হয়েছিল, সেই মহামূল্য থলিটাও।

সাখালীন দ্বীপটি ত নেহাত ছোটখাট নয়, তার বেশীর ভাগ আবার জঙ্গল আর পাহাড়। সে সব পাহাড়-জঙ্গলের অনেক জায়গায় মানুষের পায়ের চিহ্নই পড়েনি। সুতরাং এই দ্বীপে কাউকে খুঁজে বার করা সোজা নয়। তবে একটা আশার কথা ছিল এই যে, অ্যাম্বারের মত দামী রত্ন চুরি করে সাখালীন দ্বীপে লুকিয়ে থেকে কারুর লাভ নেই। সে চোরাই মাল বেচতে তাকে কোন বড় সভ্য দেশে যেতেই হবে। আর সাখালীন দ্বীপ ছেড়ে এপ্রিল থেকে অক্টোবরের মধ্যে কাউকে যেতে হলে প্রধান শহর অ্যালেক্‌জ্যান্‌ড্রোভস্‌ক্ থেকে ব্লাডিভস্টকের স্টীমার না ধরে উপায় নেই। অক্টোবরের পরে অবশ্য সমুদ্র জমে বরফ হয়ে যায়। তখন লুকিয়ে কুকুর-টানা স্লেজে করে পালান সম্ভব। কিন্তু প্রধান স্টীমার-ঘাটায় কড়া নজর রাখবার ব্যবস্থা করলে তার আগে চোর কিছুতেই সাখালীন থেকে বেরিয়ে পড়তে পারবে না। অক্টোবর পর্যন্ত তাকে খুঁজে বার করবার সময় অন্ততঃ আমরা পাব।

বেতারে অ্যালেক্‌জ্যান্‌ড্রোভস্‌ক্-এর পুলিসের কাছে সমস্ত খবর পাঠিয়ে আমি ও আমাদের ক্যাম্পের ডাক্তার মিঃ মার্টিন দুজন কুলি নিয়ে তানলিনের খোঁজে বেরিয়ে পড়লাম।

কয়েকদিন জলা-জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে যখন প্রায় হতাশ হয়ে উঠেছি, তখন হঠাৎ ভাগ্যক্রমে একটা হদিস পেয়ে গেলাম।

টিয়ারা পাহাড়ের কাছে সেদিন সন্ধ্যায় আমরা তাঁবু ফেলেছি। ওখানকার আদিম গিলিয়াক জাতির এক শিকারীর কাছে সকাল বেলায় একটা উড়ো খবর পেয়েছিলাম যে, এই দিক্ দিয়ে একজন চীনাকে যেতে দেখা গেছে। কিন্তু তখনও পর্যন্ত সে খবরে বিশ্বাস করবার মত কোন প্রমাণ পাই নি।

রাত্রে তাঁবুর মধ্যে ঘুমোন একরকম অসম্ভব। সাখালীন দ্বীপে বড় হিংস্র জানোয়ার বলতে শুধু ভালুক ছাড়া আর কিছু নেই। সাধারণতঃ তারা মানুষকে আক্রমণ করে না, কিন্তু দিনে মাছি ও রাত্রে মশা যা আছে, তা হিংস্র জানোয়ারকে হার মানায়। আমি আর মিঃ মার্টিন তাই কোন রকমে ঘুমোতে না পেরে তখন বাইরে এসে দাঁড়িয়ে গল্প করছি। হঠাৎ চমকে উঠে বললাম, 'দেখেছেন মিঃ মার্টিন!'

মিঃ মার্টিনের দৃষ্টিও সেদিকে তখন গেছে। অবাক্ হয়ে তিনি বললেন, 'হ্যাঁ! বেশ জোরালো আলো বলে মনে হচ্ছে। এই জনমানবহীন জায়গায় ওরকম আলো আসছে কোথা থেকে? ভূতুড়ে ব্যাপার নাকি?'

খানিকক্ষণ লক্ষ্য করে বললাম, 'না, ভূতুড়ে নয়, বেশ স্বাভাবিক ব্যাপার। দূরের ওই পাহাড়ে ঢিবিটার পেছনে নিশ্চয় কোন একটা বাড়ি আছে—এ আলো সেখান থেকেই আসছে।'

মিঃ মার্টিন অবাক্ হয়ে বললেন, 'কিন্তু এখানে শখ করে অমন বাড়ি করবে কে? গিলিয়াক, ওরোক বা টুঙ্গুস জাতের অসভ্য শিকারী ছাড়া এ অঞ্চলে ত কেউ আসে না। এদিকে কোন খনি ইদানীং হয়েছে বলেও জানি না।'

ব্যাপারটা সম্বন্ধে কৌতূহল যত বেশীই হোক, সন্ধান নেবার জন্যে সকাল পর্যন্ত আমরা নিশ্চয় অপেক্ষা করতাম, কিন্তু সেই মুহূর্তে রাত্রির স্তব্ধতা হঠাৎ এক অমানুষিক চীৎকারে যেন বিদীর্ণ হয়ে গেল।

একবার আমি ও মিঃ মার্টিন দুজনে দুজনের মুখের দিকে চাইলাম তারপর ভেতর থেকে টর্চটা বের করে এনে কোন কথা না বলেই বেরিয়ে পড়লাম। একেবারে নিরস্ত্র যে আমরা ছিলাম না তা বোধ হয় বলবার দরকার নেই। দুজনের কোমর-বন্ধেই পিস্তল আঁটা ছিল।

যে পাথুরে ঢিবিটার পেছন থেকে আলো দেখা যাচ্ছিল, সেটা খুব বেশী দূর নয়, তায় শ তিনেক গজ হবে। ঢিবিটার পাশ দিয়ে ঘুরে যাবার পরই দেখা গেল আমাদের অনুমান ভুল হয় নি। একটা মাঝারি গোছের বাড়ির একটা জানালা থেকে উজ্জ্বল আলোটা দেখা যাচ্ছে।

আশ্চর্যের কথা এই যে, অমানুষিক যে চীৎকার আমরা শুনেছিলাম, তা একবার উঠেই একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেছে। চারিধার এমন শান্ত যে দুজনে এক সঙ্গে সে শব্দ না শুনলে মনের ভুল বলেই সেটা গণ্য করতাম।

বাড়িটার কাছে এসে তখন আমরা বেশ একটু ফাঁপরে পড়েছি। এখন করা যায় কি! অজানা জায়গায় সম্পূর্ণ অপরিচিত এক বাড়িতে হঠাৎ মাঝরাতে এসে ডাকাডাকি করাটা মোটেই সুবিধের হবে না, তা বুঝতে পারছিলাম; কিন্তু ফিরে যাওয়া ত তখন আর যায় না।

যে জানালাটা দিয়ে আলো আসছিল সেখানে গিয়ে সাবধানে একবার উঁকি দিলাম। মস্তবড় একটা ঘর, মিউজিয়াম যেমন থাকে অনেকটা সেইরকম। প্রকাণ্ড একটা কাঁচে ঘেরা টেবিল ঘরটার মাঝখানে বসান। সে কাঁচের ভিতর কি আছে দেখতে পেলাম না। লোকজনও কেউ সেখানে নেই। এত রাত্রে থাকবার কথাও নয়।

সেখান থেকে সরে এসে দরজায় ধাক্কা দেব কি না ভাবছি, এমন সময় পেছন থেকে সরু অথচ তীক্ষ্ণকণ্ঠে ইংরেজীতে এক আদেশ শুনলাম, 'প্রাণে বাঁচতে চাও ত হাত তোল—'

চমকে ফিরে দাঁড়িয়ে দেখি, বেঁটে গোছের জোয়ান একটি লোক আমাদের দিকে পিস্তল

উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে! তার পেছনে লম্বা-চওড়া যমদূতের মত চেহারার এক প্রহরী; তারও হাতে পিস্তল।

ব্যাপারটা বেশ নাটুকে হয়ে জমে উঠেছিল বটে কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরস্পরের পরিচয় পাওয়ার পর সব আবার থিতিয়ে সহজ হয়ে গেল।

পিস্তল হাতে যিনি আমাদের হাত তুলতে বলেছিলেন, জানতে পারলাম, তিনি মিঃ নিশিমারা নামে একজন জাপানী কীটতত্ত্ববিদ্। সাথালীনের কীটপতঙ্গ নিয়ে গবেষণা করবার জন্যে এই ঘাঁটিটি বসিয়েছেন। আমরা কি উদ্দেশ্যে তাঁর বাড়িতে হানা দিয়েছিলাম শোনবার পর লজ্জিত হয়ে তিনি আমাদের কয়েকদিন তাঁর ওখানে থেকে তাঁর কাজকর্ম দেখে যেতে অনুরোধ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে এ আশ্বাসও দিলেন যে পলাতক চীনা মজুরের সন্ধান তাঁর লোকজনের মারফত তিনিই করিয়ে দেবেন। এ অঞ্চল তাঁর একরকম হাতের মুঠোয়। তাঁর লোকজনের হাত এড়িয়ে কারুর পালাবার ক্ষমতা নেই।

কথাটা যে কতখানি সত্য, একদিন পার না হতেই বুঝতে পারলাম। পরের দিন সকালেই মিঃ নিশিমারা তাঁর গবেষণাগার আমাদের ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখিয়ে অনেক কিছু বুঝিয়ে দিলেন। সাধারণ কীটতত্ত্বের গবেষণা তিনি যে করেন না, তাঁর ল্যাবরেটরির নানা বিভাগ দেখেই তা অবশ্য বোঝা যায়। শুধু পর্যবেক্ষণ নয়, কীটপতঙ্গ লালন-পালন ও পরিবর্ধন করবার জন্য রাসায়নিক ও বৈদ্যুতিক নানা যন্ত্রপাতি ও উপাদান-উপকরণ তাঁর বিরাট ল্যাবরেটরিতে আছে।

মিঃ মার্টিন এক সময়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'পোকা-মাকড়ের ভেতর মশা-ই দেখছি আপনার গবেষণার প্রধান বিষয়।'

মিঃ নিশিমারা একটু হেসে বললেন, 'তাতে আশ্চর্য হবার কিছু আছে? মানুষের সভ্যতার মশাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় শত্রু। এই সাথালীন দ্বীপ থেকে শুরু করে সমস্ত পৃথিবীতে শুধু ম্যালেরিয়ার বাহন হিসাবে মশা কি পরিমাণ ক্ষতি প্রতিনিয়ত করছে, ডাক্তার হিসেবে আপনার নিশ্চয় অজানা নয়।'

মিঃ মার্টিন বললেন - 'কিন্তু আপনার গবেষণাগারে ত দেখছি মশার লালন-পালনই হল আসল কাজ। এর দ্বারা ম্যালেরিয়ার কি প্রতিকার হবে বুঝতে পারছি না।'

নিশিমারা আবার হেসে বললেন, 'না বোঝবারই কথা। শুধু মশা মেরে নয়, মশা যাতে আর ম্যালেরিয়ার বাহন না হতে পারে, সেই চেষ্টা করে আমি ম্যালেরিয়া সমস্যার নতুন ভাবে সমাধান করতে চাই।'

আমাদের একটু অবাক হতে দেখে তিনি বললেন,—'মশা কি করে রোগের জীবাণু ছড়ায় আপনাদের নিশ্চয় জানা আছে। তার মুখ একটা ডাক্তারী যন্ত্রের বাক্স বললেই হয়। গায়ের ওপর বসে প্রথম একটি যন্ত্রে সে চামড়া ফুটো করে, তারপর আর একটি যন্ত্রে মুখের লালা সেখানে লাগিয়ে দিয়ে আমাদের রক্ত যাতে চাপ না বেঁধে যায় তার ব্যবস্থা করে। এরপর তৃতীয় যন্ত্র-নল দিয়ে সে রক্ত শুষে নেয়।

আমাদের শরীরে যে রোগের জীবাণু ঢোকে, সে তার ওই দ্বিতীয় যন্ত্রের লালা থেকে। মশার জন্মের পর যদি কোন উপায়ে তার লালার এমন রাসায়নিক পরিবর্তন করে দেওয়া যায় যে, বিষাক্ত ম্যালেরিয়ার জীবাণু তার ভেতর বাঁচতেই পারবে না, তাহলে মশা হাজার কামড়ালেও আর আমাদের ভয় নেই। আমার গবেষণাগারে মশার লালা-পরিবর্তনের সেই চেষ্টাই আমি করছি।'

বিশ্বাস করি না করি, নিশিমারার কথায় প্রতিবাদ কিছু করিনি। সমস্ত গবেষণাগারটা আমাদের কাছে তখনই কেমন রহস্যময় মনে হয়েছে। আগের রাত্রের সেই অমানুষিক চীৎকারের শব্দের কথা তখনও ভুলতে পারিনি। নিশিমারাকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি সেটা কোন বন্য জন্তুর আওয়াজ বলে হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু মনে হয়েছে কিছু যেন তিনি গোপন করে যাচ্ছেন।

সেই গোপন রহস্য যে কি, সেইদিন রাত্রেই টের পেলাম। নিশিমারা আমাদের যত্ন-আতিথ্যের কোন ত্রুটি করেননি। রাত্রের খাওয়া-দাওয়া সেরে আমরা তখন আমাদের জন্যে নির্দিষ্ট ঘরটিতে শুতে এসেছি, হঠাৎ মিঃ মার্টিন বললেন, 'এরি মধ্যে শুয়ে কি হবে? আসুন একটু বাইরে ঘুরে আসি।' তাঁর কথায় রাজী হয়ে বাইরে বেরুতে গিয়ে অবাক্ হয়ে গেলাম। আমাদের ঘরের দরজা বাইরে থেকে বন্ধ!

'এর মানে?' মিঃ মার্টিন অত্যন্ত চিন্তিত ভাবে আমার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন।

মানে ঠিক না বুঝতে পারলেও এই দরজা বন্ধ করার পেছনে যে কোন শয়তানী মতলব আছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ তখন আর আমাদের নেই।

কিন্তু এত সহজে আমরা হার মানব কেন? ছাদের কাছে হাওয়া-চলাচলের একটা ছোট ভেন্টিলেটর ছিল। কোন রকমে তারই পাল্লা ভেঙে দুজনে সেখান দিয়ে গলে বাইরে গিয়ে নামলাম।

ঘুটঘুটে অন্ধকার রাত্রি। শুধু ল্যাবরেটরির একটা ঘরে তখনো আলো জ্বলছে। সন্তর্পণে সেই ঘরটার পেছনে একটা জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়াবার আগেই সেই কালকের রাতের মত রক্ত জল-করা আর্তনাদ শুনতে পেলাম। সে আর্তনাদ শোনার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা জানালা বেয়ে ঘরের ভেতর লাফিয়ে পড়েছি। কিন্তু একি ব্যাপার! যার খোঁজে আমরা বেরিয়েছি, সেই তানুলিনই মেঝের ওপর লুটিয়ে পড়ে অসীম যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। তার একপাশে কাল রাতে যাকে দেখেছিলাম সেই যমদূতের মত কাফ্রী প্রহরী দাঁড়িয়ে, অন্য পাশে ফাঁপা একটা কাঁচের মোটা নলের জিনিস হাতে মিঃ নিশিমারা।

'ব্যাপার কি মিঃ নিশিমারা?' বেশ একটু উত্তেজিত ভাবেই জিজ্ঞাসা করলাম। মিঃ নিশিমারা আমাদের দেখে রাগে বিস্ময়ে খানিক কথাই বলতে পারলেন না। তারপর অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে বললেন, 'আমার আতিথেয়তার ওপর একটু বেশী অত্যাচার করছেন না কি আপনারা? এ ঘরে আসতে কে আপনাদের অনুমতি দিয়েছে?'

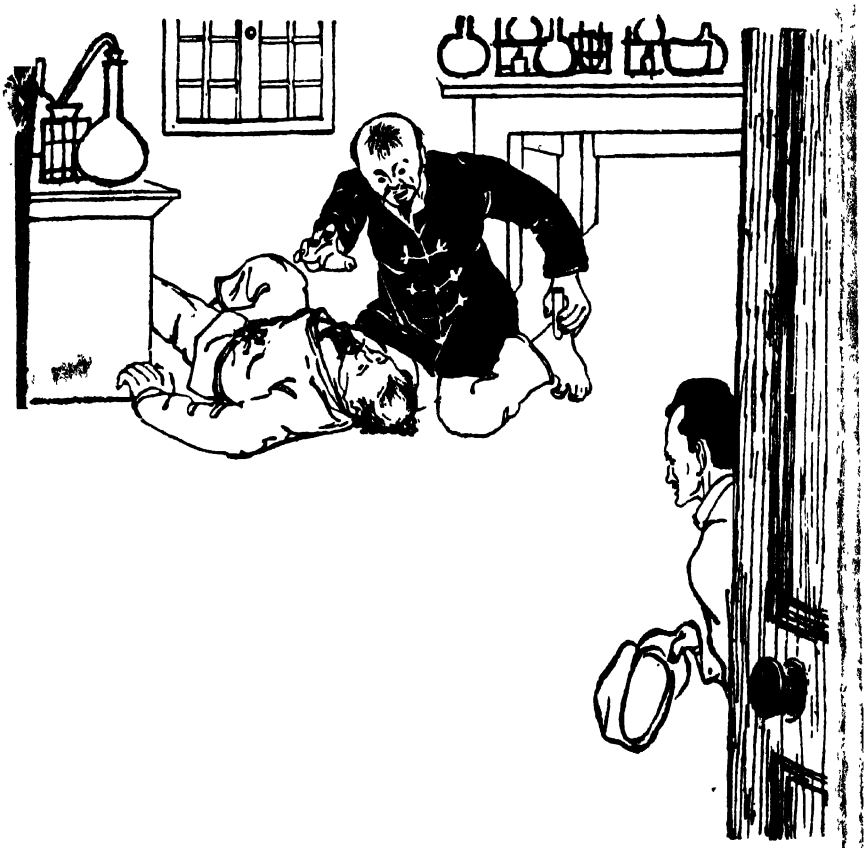

"কেউ দেয় নি, এখন বলুন এখানে হচ্ছে কি ?"

মিঃ নিশিমারা অদ্ভুত ভাবে হেসে বললেন, 'যা হচ্ছে তা তো দেখতেই পাচ্ছেন। এ লোকটাকে সাপে কামড়েছে, তারই চিকিৎসা করছিলাম।' মিঃ মার্টিন তখন মেঝেয় বসে পড়ে তান্‌লিনকেই পরীক্ষা করছিলেন। তিনি মুখ তুলে কঠিন স্বরে বল্লেন, 'এ তো মারা গেছে। আর সাপেও একে কামড়ায় নি। বলুন, কি করেছেন একে ?'

'কি করেছি জানতে চান ?' নিশিমারা কখন এরি মধ্যে কোথা থেকে একটা পিস্তল হাতে নিয়েছেন লক্ষ্যই করিনি। সেইটে আমাদের দিকে উঁচিয়ে ধরে তিনি বল্লেন,—বেশ, সেই কথাই বলব তাহলে, শুনুন। পৃথিবীর সবচেয়ে আশ্চর্য আবিষ্কারের কথা শুনে মরার সৌভাগ্য আপনাদেরই হোক। আপনাদের তান্‌লিন সাপের কামড়ে মারা যায় নি—মারা গেছে মশার কামড়ে—সামান্য একটা মশার কামড়ে !'

নিশিমারা তীক্ষ্ণ উচ্চ অট্টহাস্যে আমাদের স্তম্ভিত করে আবার বলতে লাগলেন—'বিশ্বাস করতে পারছেন না ব্যাপারটা, কেমন? কোন ভাবনা নেই, এক্ষুনি প্রত্যক্ষ প্রমাণ আপনাদের দিচ্ছি। কিন্তু তার আগে বলে যাই, শুনুন। মশার লালার রাসায়নিক পরিবর্তনের কথা যা বলেছিলাম মনে আছে তো সে পরিবর্তন আমি সত্যিই করেছি। ডিম থেকে শুরু করে মশা

যখন সামান্য জলের পোকা হয়ে থাকে, তখন পর্যন্ত তার ওপর নানা প্রক্রিয়া চালিয়ে মশার লালার এমন রাসায়নিক পরিবর্তন আমি ঘটিয়েছি যে, সাপের বিষের চেয়েও সে লালা মারাত্মক হয়ে উঠেছে। কাল রাত্রে যে চীৎকার শুনেছিলেন, সে এমনি একজনের ওপর মশার কামড়ের পরীক্ষার ফল। তানৃলিনের অবস্থা তো সামনেই দেখতে পাচ্ছেন—এইবার আপনাদের পালা।'

নিশিমারার ইঙ্গিতে সেই যমদূত তখন মিঃ মার্টিনকে অবলীলাক্রমে তুলে ধরেছে। তাঁর দিকে এগিয়ে গিয়ে নিশিমারা বললেন, 'এই কাঁচের নল দেখছেন, এর ভেতর একটি মাত্র বিষাক্ত মশা ভরা আছে। এই একটি মশা কিন্তু এখনো আপনার মত জনবিশেক জোয়ানকে অনায়াসে পরপারে পাঠিয়ে দিতে পারে। আপনি বিজ্ঞানের পীঠস্থান, সভ্য মার্কিন মুলুকের লোক। তাই আপনাদের দুই বন্ধুর মধ্যে বিজ্ঞানের পরীক্ষায় প্রাণ দেওয়ার গৌরব আমি আপনাকেই দিতে চাই। বেশী কিছু আপনাকে করতে হবে না। এই নলটি এমন কায়দায় তৈরী যে গায়ে চেপে ধরার সঙ্গে সঙ্গে সামনের ঢাকনাটা ভেতর দিকে খুলে যায়,—হিংস্র মশাটাও উড়ে এসে কামড়ে দিতে দেরি করে না...'

সমস্ত মাথার ভেতর কেমন ঝিমঝিম করছিল। মনে হচ্ছিল আর যেন দাঁড়াতে পারব না। কিন্তু তারই মধ্যে হঠাৎ মরিয়া হয়ে সজোরে একটা ঘুষি ছুঁড়লাম। নিশিমারা আচমকা ঘুষি খেয়ে ছিটকে পড়লেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর হাত থেকে কাঁচের নলটা মেঝেয় আছড়ে পড়ে চুরমার হয়ে গেল।

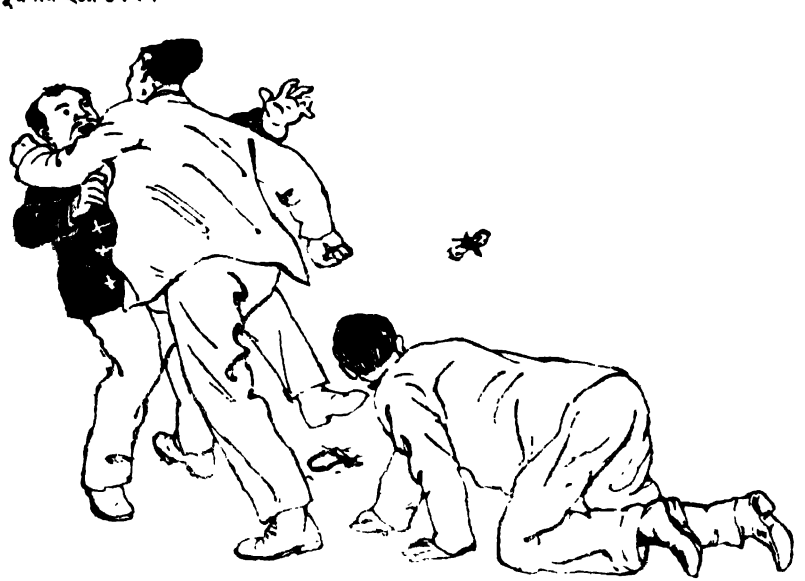

তারপর যে ব্যাপার ঘটল তা বর্ণনা করা যায় না। কল্পনা কর যে, ভাঙা নল থেকে বেরিয়ে সেই সাঙ্ঘাৎ শমন ঘরের ভেতর উড়ে বেড়াচ্ছে আর তিনটে মানুষ উন্মাদ হয়ে তাকে এড়িয়ে ঘর থেকে পালাবার চেষ্টা করছে -- ঘরের মাঝখানে আবার তানৃলিনের মৃতদেহ।

কোনঃকমে দরজার কাছে পৌঁছে খিলটা খুলে বেরুতে যাব এমন সময় সেই বিশাল কাফ্রী বাঘের মত আমার ঘাড়ের ওপর এসে পড়ল।

আর বুঝি আশা নেই। মশাটা ঠিক আমার নাকের কাছে একবার ঘুরে গেল। তার পরেই সেই কাফ্রী এক সঙ্গে পাঁচটা রেলের ইঞ্জিনের মত চীৎকার করে আমার ঘাড়ের ওপর নেতিয়ে পড়ে গেল। বুঝলাম, মশার দংশন-জ্বালার সঙ্গে সব জ্বালা তার জুড়িয়েছে।

কিছু ভাববার আর সময় নেই। উঠে পড়ে আবার পালাতে যাচ্ছি এমন সময়ে দেখি মিঃ নিশিমারা যুযুৎসুর প্যাঁচে মিঃ মার্টিনকে চিত করে ফেলে দিয়েছেন আর মশাটা ঠিক তার মাথার কাছে উড়ছে। ছুটে গিয়ে হেঁচকা টান দিয়ে মিঃ মার্টিনকে খানিকটা সরিয়ে দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে নিশিমারার আর্তনাদ শোনা গেল। মশাটা ঠিক তাঁর গালের ওপর গিয়ে বসেছে।

এবার আর একমুহূর্ত দেরি হোল না। আমার প্রচণ্ড এক চাপড় গিয়ে পড়ল নিশিমারার গালে। মশা আর নিশিমারার ভবলীলা এক সঙ্গেই সাঙ্গ হয়ে গেল।

মশা মারবার পরিশ্রমেই যেন হাঁপিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ঘনাদা বললেন,—"জীবনে তারপর মশা মারতে আর প্রবৃত্তি হয় নি।"

পোকা

ঘনাদা সেদিন প্রায় জব্দ হয়ে গিয়েছিলেন।

প্রায় জব্দ বলছি এই জন্যে যে সত্যিকারের জব্দ হবার পাত্র ঘনাদা নন। যত বেকায়দায় পড়ুন না কেন, নিজেকে সামলে নেবার অসামান্য প্রতিভা ঘনাদার আছে। তেলা-মাছের মত যে-কোন বেয়াড়া অবস্থা থেকে তিনি পিছলে বেরিয়ে যেতে পারেন।

সেদিন কিন্তু অবস্থাটা তাঁর বড় বেশী কাহিল হয়ে উঠেছিল। মেসের সকলের হাসি-ঠাট্টার চোটে তাঁর এতদিনের খ্যাতি-প্রতিপত্তি প্রায় ভেসে যায় আর কি!

মেসের তেতলার একটি ছোট চোর-কুঠরি গোছের ঘরে ঘনাদা একা থাকেন। এ ব্যবস্থাটা শুধু তাঁর নিজেরই মনঃপূত নয়, আমাদের অনুমোদিত। ঘনাদার মত অসামান্য পুরুষের সংস্পর্শে দিনরাত থাকা একটু বিপজ্জনক বলেই আমাদের ধারণা।

ঘনাদার তেতলার সেই ঘরে সেদিন রাত বারোটা নাগাদ হঠাৎ একটা খণ্ডযুদ্ধ বেধেছে বলে আমাদের মনে হল। শনিবারের রাত। পরের দিন ছুটি, সুতরাং ভোরে উঠবার তাড়া নেই বলে আমরা সবাই যে যার দলে একটু বেশীক্ষণ পর্যন্ত তাস পাশা খেলে সবেমাত্র শুতে গেছি, এমন সময় টেবিল-চেয়ার ওলটানোর সঙ্গে ওপরকার ঘরে ঘনাদার অমানুষিক চীৎকারে বিছানা থেকে উঠে বসলাম!

ব্যাপার কি!

তাস পাশা ইত্যাদি খেলা ঘনাদার দুচক্ষের বিষ। শনিবার রাত্রে তাই তিনি আমাদের ওপর বিরক্ত হয়ে অন্যদিনের চেয়ে একটু সকাল সকালই শুতে চলে যান। তারপর ওপরের ঘরে আলবোলায় তাঁর আরাম করে তামাক খাওয়ার শব্দ কখন করাতে কাঠ-চেরার মত মধুর নাক-ডাকার আওয়াজে মিশে যায়, সমস্তই আমরা নিচে থেকে টের পাই।

আজ হঠাৎ সেই সুখনিদ্রায় কি এমন আকস্মিক ব্যাঘাত ঘটল। ঘনাদার চীৎকার শুনলে ত' মনে হয়, ব্যাঘাতটা হিংস্র কোন সাতদিনের উপোসী বাঘ বা পাগলা গারদ ভেঙে বেরিয়ে আসা ছুরি হাতে খুনে গুণ্ডা ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। কিন্তু ঘনাদার

মত ত্রিভুবনজয়ী বীরের কাছে এসব তো তুড়ি দিয়ে উড়িয়ে দেওয়ার বস্তু! তাহলে ব্যাপারটা কি হতে পারে?

এই রহস্যময় ব্যাপারের নায়ক ঘনাদাই পর-মুহূর্তে হুড়মুড় করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছেন শুনতে পেলাম। তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলাম, "ব্যাপার কি, ঘনাদা!"

আমরা সবাই এখনো জেগে আছি ঘনাদা বোধহয় ভাবেন নি। আমাদের সকলের উৎকণ্ঠিত প্রশ্নের সামনে প্রথমটা এক মুহূর্তের জন্যে তিনি কেমন যেন একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন! কিন্তু সে বোধ হয় আমাদের মনের ভুল। পরের মুহূর্তেই আমাদের সকলকে একেবারে স্তম্ভিত করে দিয়ে তিনি চাপা গলায় বললেন, "ব্যাপার? ব্যাপার যা ভেবেছিলাম তাই!"

কথাগুলো যেমন দুর্বোধ, ঘনাদার গলার স্বর তার চেয়ে বেশী রহস্যময়। সে স্বরে এমন একটা বিভীষিকার আভাস যে মনে হল শিরদাঁড়ার ভেতর দিয়ে হিম একটা জলের ধারা যেন হঠাৎ বয়ে গেল!

শিবুই প্রথম এ ধাক্কা কতকটা সামলে উঠে কম্পিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে, "ভূত-টুত নাকি ঘনাদা?"

"ভূত!" ঘনাদার বিদ্রূপ-তীক্ষ্ণ স্বরে বোঝা গেল, সামান্য ভূত টুতের কথা তুলে শিবু তাঁকে কতখানি অপমান করেছে।

"সবাই মিলে একবার দেখে আসব!" প্রস্তাব করলে গৌর।

ঘনাদার তাতে কিন্তু ঘোর আপত্তি দেখা গেল। তাঁর কথায় মনে হল, আমাদের অতখানি বিপদের মুখে পাঠাতে তিনি রাজী নন। তিনি বরং রাতটা আমাদের কারুর ঘরে শুয়ে কাটিয়ে দিয়ে সকালে যা করবার করবেন।

কিন্তু আমরা অত সহজে নিরস্ত হতে পারলাম না। ঘনাদার মত লোককে যার জন্যে মাঝরাত্রে পরিত্রাহি ডাক ছাড়তে হয়, সে ব্যাপার যে কি, সন্ধান করবার চেষ্টা না করে আমরা থাকি কি করে।

সবাই মিলে সন্তর্পণে সিঁড়ি দিয়ে ঘনাদার ঘরে গিয়ে উঠলাম। ঘনাদা তাড়াতাড়িতে আলোটাও জ্বালতে পারেন নি। ঘর একেবারে অন্ধকার। আলো জ্বাললে কি দেখতে হবে কে জানে ভেবে সুইচটা টিপতেও যেন ভয় করছিল। শিশিরই প্রথম সুইচটা টিপে দিলে সাহস করে।

কিন্তু কোথায় কি!

ওল্টানো চেয়ারে টেবিল ছাড়া ঘরে তে কোন কিছু দেখবার মত নেই।

যথাসাধ্য চেষ্টা করেও আটকাতে না পেরে ঘনাদা আমাদের পেছন পেছনই ঘরে এসে ঢুকেছিলেন। আমরা অবাক্ হয়ে তাঁর দিকে তাকাতেই পরম গম্ভীর মুখে তিনি বল্লেন, "কি বলেছিলাম!" তাঁর ভাবখানা এই যে ঘরের কিছু না থাকাই যেন একটা ভয়ঙ্কর রহস্য।

আমরা কিছু বলবার আগেই হঠাৎ ঘরের মধ্যে একটা অদ্ভুত শব্দ শোনা গেল। গোঁ করে একটা শব্দ মেঝে থেকে ওপরে উঠে ঠক করে একটা আওয়াজে শেষ হল। আচমকা এই শব্দে আঁতকে উঠে প্রথমটা প্রায় নিজেদের অজান্তে হুড়মুড় করে সিঁড়ির দিকে হটে গিয়েছিলাম, কিন্তু পর মুহূর্তেই ব্যাপারটা বুঝতে পেরে হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে যাবার যোগাড়।

গৌরই ছিল সবার সমানে। গোড়ায় পিছু লাফ দিয়ে হটে এলেও সে তখন মেঝে থেকে সেই ভয়ঙ্কর রহস্যের মূলাধার বস্তুটিকে তুলে ধরেছে।

বড় গোছের একটা নারকুলো পোকা!

একবার ঘনাদার আর একবার সেই পোকার দিকে চেয়ে মেসের সকলের হাসি আর

থামতে চায় না। শিশির অনেক কষ্টে তারি মাঝে দম নিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "শেষকালে এই একটা পোকা আপনাকে এমন ভয় পাইয়ে দিলে ঘনাদা!"

সঙ্গে সঙ্গে আবার হাসির ধুম পড়ে গেল। কিন্তু এত হাসি-ঠাট্টা ঘনাদাকে যেন স্পর্শই করল না। অবিচলিতভাবে নিজের বিছানার ওপর এসে বসে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তিনি আমাদের সকলের দিকে একবার তাকালেন, তারপর গম্ভীরমুখে বললেন, "একটা পোকা দেখে ভয় পেয়েছি, না?"

পা দুটো গুটিয়ে আর একটু আরাম করে বসে তিনি হঠাৎ জ্বলন্ত দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকিয়ে তীক্ষ্ণ স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন,—"একটা পোকার পেছনে আট হাজার মাইল কখনো ছুটে বেড়িয়েছ? তিন হাজার টন মরা পোকা নিয়ে কি করবে কখনো ভাবতে হয়েছে? পকেটে একটা কাঁচের বন্ধ শিশি আর হাতে একটা কাগজ সম্বল করে আফ্রিকার গহনতম বনে-জঙ্গলে-জলায় কখনো একটা পোকার খোঁজে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে?"

আমাদের হাসি তখন প্রায় শুকিয়ে গিয়েছে। তবু একবার জিজ্ঞাসা করলাম, "কি সে পোকা ঘনাদা! এই নারকুলো পোকা?"

"না, তার নাম—সিস্টোসার্কা গ্রিগেরিয়া!"

"থাক থাক ঘনাদা! পোকা হলেও কৃষ্ণের জীব তো বটে। অমন যা-তা গালাগালি দেওয়াটা কি উচিত?"

শিবুর বলার ধরনে হাসিটা আর একবার উথলে উঠতেই এক ধমকে সেটা থামিয়ে দিয়ে ঘনাদা বললেন,—"গালাগাল নয়, এই হল তার বৈজ্ঞানিক নাম।"

আমরা সিঁড়িটার দিকে পা বাড়াবার আগেই ঘনাদা শুরু করে দিলেন,—

"১৯৩১ সালের ২২শে ডিসেম্বর। ল্যাটভিয়ার রিগা শহরের সমস্ত পথঘাট বরফে ঢেকে গেছে। আগের রাত্রে এমন প্রচণ্ড তুষার-ঝটিকা শহরের ওপর দিয়ে বয়ে গেছে যে, মিউনি-সিপ্যালিটির লোকজন এসে বরফ কেটে পরিষ্কার না করে দেওয়া পর্যন্ত অনেকে বাড়ির দরজাই খুলতে পারে নি। আমি যথারীতি প্রাতঃভ্রমণ সেরে আমার হোটেলে ফিরছি, এমন সময় খটাখট্ শব্দে এক ঘোড়ায় টানা 'ড্রোস্‌কি' আমার কাছেই এসে থামল। মোটা আস্ট্রাকান গায়ে মাথায় রুশ টুপি-পরা মিলিটারি চেহারার একটি লোক তা থেকে নেমে আমায় ভালো করে লক্ষ্য করে হাতে একটি চিঠি দিলে।

সে চিঠি পড়ে সত্যিই অবাক্ হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'জেনারেল ভরনফ এখানে আছেন তা তো জানতাম না!'

লোকটি সবিনয়ে বললে, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, তিনি আজ তিন বছর এখানেই আছেন। আপনার সঙ্গে এখুনি একবার দেখা করতে চান।'

'তা তো চিঠি পড়েই বুঝলাম, কিন্তু তিনি যার সঙ্গে দেখা করতে চান আমি যে সেই লোক, আপনি বুঝলেন কি করে?'

আস্ট্রাকান কোটটার গলাটা একটু তুলে দিয়ে লোকটি বললে,—'তা কি আর বুঝতে দেরি হয়! জেনারেল আপনার অনেক গল্পই আমার কাছে করেছেন, তাছাড়া রিগা শহরের এই রক্ত-জমান শীতে শুধু একটা সোয়েটার চাপিয়ে প্রাতঃভ্রমণে বেরুতে আর কেউ যে পারে না তা আমি ঠিক জানি।"

শিবুর একটু বুঝি কাশি শোনা গেল। সেইসঙ্গে আমাদেরও। ঘনাদা গ্রাহ্য না করে বলে চললেন,—

"গেলাম তারপর জেনারেল ভরনফের বাড়ি। রিগা উপসাগরের দক্ষিণ পাড়ে লোরো পুরোনো শহরের এক ঘিঞ্জি পাড়ায় ভরনফের ভাঙা দু-আমরা আস্তানা দেখে যত অবাক্ হলাম, তার চেয়ে বেশী হলাম স্বয়ং তাঁকে দেখে।

জেনারেল ভরনফের সঙ্গে আফ্রিকায় শিকারের সূত্রে আমার পরিচয়। একসঙ্গে নাইপার নদীতে আমরা ডিঙি বেয়ে দু-শ পাঁচ-শ মাইল ঘুরে বেড়িয়েছি, কঙ্গোর গভীরতম জঙ্গলে গরিলার খোঁজে ফিরেছি প্রাণ হাতে নিয়ে, মাসাইদের সঙ্গে শুধু তীর-ধনুক দিয়ে শিকার করেছি। খাঁটি প্রাশিয়ান বলতে যা বোঝায়, চেহারায় চরিত্রে তিনি ঠিক তাই ছিলেন। শরীর ও মন দুই-ই একেবারে শক্ত ইস্পাতের তৈরী। শারীরিক কষ্ট কাকে বলে জানেন না, মানসিক দুর্বলতা কাকে বলে বুঝতে দেন না কখনো। প্রথম মহাযুদ্ধে জার্মান সেনাপতি হিসাবে তিনি যথেষ্ট নাম করেছিলেন, রাজকীয় সম্মানও পেয়েছিলেন প্রচুর। সেই লোকের এই দুরবস্থা কি করে সম্ভব? আর্থিক অবস্থা তাঁর যত খারাপ হয়েছে, শরীর ভেঙে পড়েছে তার চেয়ে অনেক বেশী। এ যেন আগের ভরনফের ছায়ামাত্র!

ভদ্রতা-বিরুদ্ধ হলেও কি করে এ দুর্দশা তাঁর হল না জিজ্ঞেস করে পারলাম না। অদ্ভুতভাবে আমার দিকে চেয়ে ভরনফ্ বললেন, 'এ শহরে আপনি এসেছেন জেনে সে কথা বলতেই ডেকে পাঠিয়েছি। পৃথিবীর আর কেউ যে কথা জানে না, তাই আজ আপনাকে বলব। আসুন।'

আমায় ভেতরের ঘরে নিয়ে গিয়ে ভরনফ্ একটা দেরাজ খুলে একটা ফটো বার করলেন, তারপর জিজ্ঞেস করলেন, 'এ ফটো কার জানেন?'

ফটোটা দেখেই চিনেছিলাম। অবাক্ হয়ে বল্লাম, 'এ ফটো তো ডাঃ রথস্টাইনের। পনেরো বছর আগে সি-সি মাছি সম্বন্ধে গবেষণা করতে গিয়ে আফ্রিকায় মারা পড়েন।'

ভরনফ্ ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে বললেন, 'না, মারা সে পড়েনি, আজও বেঁচে আছে। নিজের মৃত্যু সে বিশেষ কোন কারণে এইভাবে রটিয়েছিল।'

'কিন্তু আপনি সে কথা জানলেন কি করে?'

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে ভরনফ্ প্রায় অস্পষ্ট স্বরে বললেন,—'সে আমার ভাই।'

'আপনার ভাই! ডাঃ রথস্টাইন হলেন ইহুদী, আর আপনি খাস জার্মান। কি রকম ভাই?'

'সহোদর ভাই। এক বাপ-মায়েরই আমরা সন্তান।' বলে ভরনফ্ অত্যন্ত বিষণ্ণভাবে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনার সঙ্গে যখন আমার আলাপ তখন আফ্রিকায় শিকারের ছুতোয় এই ভাইকেই খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম।'

একটু চিন্তিতভাবে ভরনফের দিকে তাকালাম। দুঃখে অভাবে তাঁর মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে নাকি? ভরনফ্ আমার সে দৃষ্টির অর্থ বুঝে ম্লান হেসে বললেন, 'আপনি মনে করেছেন, আমার বোধ হয় মাথা খারাপ হয়েছে। রথস্টাইন ইহুদী হয়ে কি করে আমার সহোদর ভাই হতে পারে আপনি ভেবে পাচ্ছেন না, নয়? গত মহাযুদ্ধে বীরত্বের জন্যে জার্মানীর শ্রেষ্ঠ সম্মান পেয়েও লাটভিয়ার এই শহরে একটা নোংরা পল্লীতে এই দারিদ্র্যের মধ্যে চোরের মত কেন দিন কাটাচ্ছি ভাবলেই বুঝতে পারবেন।'

আমায় চুপ করে থাকতে দেখে ভরনফ্ আবার বললেন, 'আমায় সবাই খাস জার্মান হিসেবে প্রাশিয়ানদের চেয়েও কড়া দাম্ভিক বলে জানত, এখনও অনেকে জানে; কিন্তু আসলে আমিও ইহুদী। তবে আমার ভাই ইহুদী জাতের গৌরব ছিল একদিন, আর আমি ছিলাম কুলাঙ্গার। জার্মানীতে—আর শুধু জার্মানীতে কেন—সমস্ত ইউরোপে ইহুদী-বিদ্বেষ কি রকম প্রবল, তা নিশ্চয় জানেন। গত দু হাজার বছর ধরে আমাদের ওপর যে অত্যাচার এরা করেছে, তার তুলনা হয় না। মাঝে মাঝে এ বিদ্বেষ কিছুদিনের জন্যে একটু চাপা থেকেছে মাত্র, তারপর আবার দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে আমাদের ধনে-প্রাণে ধ্বংস করেছে। ছেলেবেলা থেকেই এই ইহুদী-বিদ্বেষ আমাদের ক্ষিপ্ত করে তুলেছে—কিন্তু আমাদের দু-ভাইকে দু-ভাবে।

আমার ভাই জ্যাকব, রুস্টাইন আমাদের পদবী—চেষ্টা করেছে বৈজ্ঞানিক হিসেবে ইহুদী জাতের মুখোজ্জ্বল করতে, আর আমি পিতৃপরিচয় ভাঁড়িয়ে জার্মানদের সঙ্গে মিশে যেতে চেয়েছি ইহুদী-বিদ্বেষ এড়াবার জন্যে। বিদ্যাবুদ্ধিতে জ্যাকবের চেয়ে আমি অনেক খাটো। বাপ-মা দুই-ই মারা যাবার পর বিশ বছর বয়সে আমি ভাই একটা খনির চাকরি নিয়ে ব্রেজিলের জঙ্গলে চলে যাই। সেখান থেকে বছর পাঁচেক বাদে যখন জার্মানীতে ফিরে এলাম তখন আমি একেবারে খাঁটি প্রাশিয়ান, চেহারায় চলনে বলনে আমায় অন্য কিছু বলে চেনে কার সাধ্য।

ঘটনাচক্রেই প্রাশিয়ান সাজবার এ সুযোগ আমার মিলে গেছল। বিশুদ্ধ প্রাশিয়ান বংশের একটি ছেলে আবিষ্কার-পর্যটনের নেশায় ব্রেজিলের জঙ্গলে এসে আমাদেরই খনির আস্তানায় মারা পড়ে। তার সঙ্গে আমার চেহারার মিলের কথা অনেকেই সে সময় বলেছিল। তারি সুযোগ আমি নিলাম। মরবার সময়—তার সেবা করার দরুন সে কয়েকটি কাগজপত্র ও জিনিস আমার হাতেই দেয় জার্মানীতে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে। সেই কাগজপত্রের জোরে আমি অনেকটা নির্ভয়ে ভরসাফ্ সেজে বসলাম। সামরিক বিভাগে ঢুকে উন্নতিও করলাম যথেষ্ট। কেউ কোনদিন একটু সন্দেহও করতে পারল না।

এতদিনে ইচ্ছে করেই জ্যাকবের সঙ্গে আমি দেখা করিনি যদিও তার সব খবরই রাখতাম। একদিন হঠাৎ বার্লিন থেকে মিউনিক যাবার পথে ট্রেনের একটি কামরায় তার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। আমি তখন বড় মিলিটারি অফিসার; মিউনিক যাচ্ছি একটা জরুরী তদন্তে, আর জ্যাকব সেখানে যাচ্ছে বৈজ্ঞানিকদের কি একটা সম্মেলনের সভাপতি হিসেবে।

আমি তাকে গোড়াতেই চিনলেও আমার মিলিটারি জেনারেল পোশাকে ও চালচলনে সে প্রথমটা কিছু বুঝতে পারেনি। সন্দিগ্ধভাবে দু-একবার তাকিয়েছিল মাত্র। পরিচয় দেবার আমার ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু দিতে হল ঘটনাচক্রে। মাঝখানের একটা স্টেশনে গাড়ি থামতে আমার একজন তাঁবেদার কর্মচারী আমায় সেলাম দিতে এল আমার কামরায়। জ্যাকবকে দেখলেই ইহুদী বলে চেনা যায়। চেহারায় পোশাকে নিজের জাত লুকোবার কিছুমাত্র চেষ্টা তার নেই। আমার তাঁবেদার অফিসারটি যেমন গোঁড়া তেমনি অভদ্র। সে জ্যাকবের মুখের সামনেই আমায় বললে 'এই ইহুদী জানোয়ারটা আপনার সঙ্গে একগাড়িতে যাচ্ছে! দেব এ কামরা থেকে ঘাড় ধরে বার করে?'

মরমে মরে গিয়েও বাইরে দাম্ভিকতার ভাণ করে বললাম,—'থাক আর দরকার নেই, রাস্তায় কত বেড়াল-কুকুরও থাকে!'

একজন ইহুদীকে একটু জব্দ করবার সুবিধে না পেয়ে একটু অপ্রসন্ন হয়েই অফিসারটি শেষ পর্যন্ত কামরা থেকে নেমে গেল। গাড়িও দিল ছেড়ে। জানলার বাইরে মুখ বাড়িয়ে ছিলাম, হঠাৎ ফিরে দেখি, জ্যাকব একদৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে আছে। অত্যন্ত অস্বস্তির সঙ্গে মুখ ফিরিয়ে নিলাম, কিন্তু খানিক বাদেই তার দিকে না চেয়ে পারলাম না।

এখনও সে আমার দিকে চেয়ে আছে কিন্তু তার মুখে একটু অনুকম্পার হাসি। কামরায় আমরা দুজন ছাড়া আর কেউ নেই—এই ভাগ্যি, নইলে একটা ইহুদীর সামনে কড়া প্রাশিয়ান অফিসারের এরকম অস্বস্তি দেখে তারা সন্দিগ্ধই হয়ে উঠত।

হঠাৎ জ্যাকব বললে, 'ওইটুকুর জন্যেই ধরা পড়ে গেলে আইজ্যাক।'

যতদূর সম্ভব মিলিটারি মেজাজের ভাণ করে বললাম, 'কি বলছ কি তুমি! কার সঙ্গে কথা কইছ জান?'

'আঃ অকফালন করে লাভ কি আইজ্যাক? আমি তোমায় চিনতে পেরেছি। সত্যিকারের প্রাশিয়ান অফিসার একটা ইহুদীকে কামরা থেকে নামিয়ে দেবার এ সুযোগ কক্ষনো ছাড়ত না।'

সজল চোখে খানিক তার দিকে তাকিয়ে থেকে তার হাত দুটো ব্যাকুলভাবে ধরে ফেলে এবার বললাম, 'আমায় ক্ষমা কর জ্যাকব! কি দুঃখে এ ছদ্মরূপ নিয়েছি তা জান?'

'তা জানি; কিন্তু ইহুদী-বিদ্বেষের প্রতিশোধ কি এইভাবে নেওয়া যায়? ওই পোশাক তোমার চামড়া পুড়িয়ে দিচ্ছে না!'—

জ্যাকবের চেহারা একমুহূর্তে এমন বদলে গেল যে, সত্যি ভয় পেয়ে গেলাম! তার চোখ দিয়ে যে আগুন ঠিকরে বেরুল, বুকের ভেতরকার কত বড় আগ্নেয়গিরি থেকে তা উঠে আসছে বুঝে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

একটু শান্ত হয়ে জ্যাকব বল্লে, 'যেমন করে পার লুকিয়ে চুরিয়ে মিউনিকে আমার সঙ্গে দেখা কোরো। ইহুদী বিদ্বেষের কি প্রতিশোধের আয়োজন হচ্ছে, তোমায় বুঝিয়ে দেব।'

মিউনিকে সত্যিই তার সঙ্গে দেখা করেছিলাম এবং যা শুনেছিলাম ও দেখেছিলাম তাতে বুঝেছিলাম, অতবড় বৈজ্ঞানিক হয়েও ইহুদী বিদ্বেষের দরুন পদে পদে প্রত্যেক জায়গায় অপমানিত লাঞ্ছিত হয়ে জ্যাকব একেবারে উন্মাদ হয়ে গেছে। কিন্তু উন্মাদ হয়ে সে যে প্রতিশোধের পরিকল্পনা করছে, তার বৈজ্ঞানিক কূট কৌশল শুধু শয়তানের মাথাতেই জন্মান সম্ভব। তার সঙ্গে কথা কইতে কইতে বুঝলাম, ইহুদী-বিদ্বেষের বিরুদ্ধে লড়বার একই প্রেরণা আমাদের দুজনের মধ্যে কি বিভিন্ন ভাবে কাজ করেছে। জাতের কুলাঙ্গার হয়েও আমি ধীরে ধীরে সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতাকে জয় করে মানুষকে ভালবাসতে শিখেছি, আর জাতির অপমানের শোধ নিতে গিয়ে জ্যাকব মানুষের শত্রুই হয়ে দাঁড়িয়েছে। তার পরিকল্পনায় সমস্ত মানবজাতির কতখানি ক্ষতি হবে বুঝিয়ে তাকে নিরস্ত করবার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু তীব্র বিদ্রূপের হাসি হেসে সে বলেছিল, 'নকল প্রাশিয়ান সাজতে সাজতে তুমি খানিকটা তাই হয়ে গেছ। আমার কথা তুমি বুঝবে না।'

এর কিছুদিন পরে সে 'সি-সি' মাছি সম্বন্ধে গবেষণা করবার নামে আফ্রিকায় চলে যায়; কিন্তু আমি জানতাম ওটা তার একটা ছুতোমাত্র।'

ভরনফের কথা শেষ হ'লে আমি একটু চুপ করে থেকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'জ্যাকব রথস্টাইন যে সত্যি মারা যান নি, আপনি জানলেন কি করে?

'জানলাম প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেয়ে।' একটা কাগজের ফাইল দেরাজ থেকে বার করে ভরনফ্ বল্লেন, 'খবরের কাগজের এই কাটিংগুলো পড়ে দেখলে বুঝতে পারবেন, গত দশ বছরে এশিয়া-ইউরোপের নানা জায়গায় কি রকম অদ্ভুতভাবে ছোটখাট দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে।

দেশভরা সোনার শস্য চক্ষের নিমেষে কি ভাবে ছারখার হয়ে গেছে! এখনও পর্যন্ত জর্জিয়া, রুমানিয়া, মোরাভিয়া প্রভৃতি ছোটখাট রাজ্যের ওপর দিয়েই এ বিপদ গেছে। বড় বড় দেশ এখনো রেহাই পেয়ে আছে। কিন্তু বেশীদিন আর নয়। তার আয়োজন সম্পূর্ণ হলেই সমস্ত ইউরোপ সে বিপদ ঠেকাতে পারবে কিনা সন্দেহ!'

বললাম, কিন্তু এই ব্যাপারে আমাকে কেন ডেকেছেন বুঝতে পারছি না।'

'বুঝিয়ে দিচ্ছি, শুনুন। আমি নিজে বৃদ্ধ অথর্ব হয়ে পড়েছি। জার্মানীর জঙ্গীমহলে এতদিন পরে কেমন করে জানি না আমার সতাকার জাত সম্বন্ধে একটা সন্দেহের হাওয়া ওঠায় আমায় এখানে এসে প্রায় অজ্ঞাতবাস করতে হচ্ছে। যা আর পারি না, তাই আপনাকে করতে হবে। জ্যাকবকে খুঁজে বার করতে হবে। আমি জানি যদি কেউ পারে তো আপনিই পারবেন।'

অবাক্ হয়ে বললাম, 'বলেন কি! পনরো বছর যে লোকের কোন পাত্তা নেই, তাকে আমি কোথায় খুঁজে বার করব? করবই বা কি করে?'

একটা ছোট কাঁচের কৌটা খুলে ধরে ভরনফ্ বললেন, [illegible] করবেন এ [illegible] এই [illegible] নির্বাণ!'

'এ[illegible]' সত্যিই বিমূঢ় হয়ে বললাম 'এ ত একটা [illegible]'

'[illegible] এই [illegible] পোকাই আপনাকে তার সন্ধান [illegible] যে [illegible] তা আজো জানে না। এ [illegible] সেখানে [illegible] ধনুর্যন্ত্র [illegible]'

'[illegible] পেলেই [illegible] কি?'

[illegible] একটা বন্ধ কাঁচের শিশি আর একটা [illegible] দিয়ে [illegible] বললেন,

[illegible]

[illegible] আমি [illegible]

[illegible] আমি

[illegible]

পরে [illegible]

কি করবেন, এই কাগজে লেখা আছে। আজ দশ বছর পরে জ্যাকবের পৈশাচিক চক্রান্ত ব্যর্থ করবার এই অস্ত্র আমি অনেক কষ্টে আবিষ্কার করেছি।'

ঘনাদা চুপ করলেন। গৌর জিজ্ঞাসা করলে, "তারপর। জ্যাকবের খোঁজ আর পেলেন না বুঝি?"

"না, পেলাম বৈকি। না পেলে কর্সিকাতে তিন হাজার টন মরা পোকা জমল কি করে?"

শিবু অধৈর্যের সঙ্গে বললে, "আহা, খুলেই বলুন না একটু।"

ঘনাদা একটু বিজয়-গর্বের হাসি হেসে বললেন, "সমস্ত আফ্রিকা ঘুরে ধার-এল-আরব নদীর ধারে পৃথিবীর সবচেয়ে লম্বা মানুষ ডিঙ্কাদের দেশে তখন এসেছি। পকেটে সেই পোকার কৌটো তখনও আছে, কিন্তু মনে কোনো আশা নেই জ্যাকবকে খুঁজে পাবার। সাত-সাত লম্বা আমার ডিঙ্কামাঝির সঙ্গে তার সালতির চেয়ে সরু লম্বা ডিঙিতে সেদিন জলার মধ্যে কুমীর শিকারে গেছি। হঠাৎ তীরের ঝোপ থেকে একটা পোকা ঠিক আমার কোলের ওপর এসে পড়ল। ছুঁড়ে ফেলে দিতে গিয়ে হঠাৎ চমকে গেলাম। কৌটোটা পকেট থেকে বার করে মরা পোকাটা তার পাশে ধরে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম একেবারে। সেই সিস্টোসার্কা গ্রিগেরিয়া।

[illegible] জলা-জঙ্গল তোলপাড় করে জ্যাকবের আস্তানা খুঁজে বার করতে দেরি হ'ল না। [illegible] হয়ে গেছে; তার সর্বনাশা পরিকল্পনার তোড়জোড় প্রায় শেষ।

পুতুল

ঘনাদা হাই তুলেছেন।

ঘনাদার হাই তোলা একটা অনুষ্ঠান বিশেষ। গল্পের ফাঁক থেকে পাঁচকে [illegible] জানোয়ারগুলোর [illegible] দেশে দেশে সিংহ মশাইদের যখন দিক্ [illegible] আনস্যাক্ [illegible] যদি কারুর হয়ে থাকে তাহলে সে ঘনাদার [illegible], কিঞ্চিৎ মার [illegible] পারো—তেমনি বিরাট মুখব্যাদন, তেমনি দন্তমুচি [illegible] তেমনি তিন [illegible] পাস্ত পাতির চারা আংরেজের নত সরদারি এ [illegible] সরবরা [illegible] তার ঘনাদার মত তুড়ি দিতে পারে না।

[illegible] অনা গতি, ওজর হলা [illegible] তোলবার [illegible], তিনি [illegible] ভুলে। কি করে শুধু এই কথা ভেবে। [illegible] [illegible] সন্ধ্যার [illegible]

[illegible] [illegible] পড়ছে। [illegible] [illegible] [illegible]

হবার সামিল জেনেও এখনো পর্যন্ত একবার ফেরত চায়নি। মেসের ম্যানেজার আমাদের সামনে ভুটিও একবার ছমাসের বাকি পাওনার কথা তোলেনি এবং আমরা সবাই টিফিন চালানো থেকে আটটা বোমা পর্যন্ত হেন প্রসঙ্গ নেই যা ঘনাদার সামনে টোপ গিলতে ফেলে দিইনি।

কিন্তু আরাম-কেদারায়—কেমন রহস্যের একমাত্র আরাম-কেদারায় সেই যে ঘনাদা গা এলিয়ে দিয়েছেন, তারপর তাঁকে একটু সোজা করে বসাতেও পারিনি।

মাছ ধরার প্রসঙ্গ দিয়ে শিবু অনুষ্ঠান শুরু করেছে। সে তাতে জোড়া [illegible] বলেছে, বর্ষার দিনে নাকি টোপ খায় ভাল।

কিন্তু মাছে টোপ খাক বা না খাক আমাদের টোপ খাওয়াই নষ্ট হয়েছে। [illegible] কত বড় এক মহাশের একবার তার ছিপে উঠেছিল, গৌরাঙ্গ সগর্ব তা দুহাত [illegible] করে দেবার পরও ঘনাদার কোন সাড়াশব্দ পাওয়া যায়নি।

মহাশের থেকে ঘনাদা একেবারে দক্ষিণ মেরু সাগরে নহাতিমি শিকারের [illegible] তুলেবল এই আশাই আমরা করেছিলাম, কিন্তু তার বদলে তিনি ক্লান্তভাবে শুধু একটু সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়েছেন।

মাছ থেকে আমরা পাহাড়ে ওঠার কথা তুলেছি। হাতের কাছে এমন [illegible] হিমালয় থাকা সত্ত্বেও বাঙ্গালীর ছেলেদের কেন যে পাহাড়ে চড়ার এতটুকু উৎসাহ ও [illegible] তা নিয়ে গৌরাঙ্গ দুঃখ প্রকাশ করেছে।

আমরা আড় চোখে চেয়ে দেখেছি ঘনাদা আরাম-কেদারার হাতলে পেতে [illegible] তুলে দিয়ে আর একটু আয়েশ করে শুয়েছেন।

পাহাড়ে চড়া থেকে বন্দুক ছোঁড়া ও তা থেকে আবার ছোড়ায় চড়ায় [illegible] হয়েছি।

ঘনাদা সিগারেটে মৃদু-টান দিয়ে চোখ দুটি মুদ্রিত করেছেন।

হতাশ হয়ে শেষ পর্যন্ত আমরা ওয়েট-লিফ্‌টিং অর্থাৎ ওজন তোলায় [illegible] পেড়েছি। বিজ্ঞানের নিয়ম তুলে শিবু বলেছে—পোকামাকড়েরা যখন নিজেদের [illegible] ওজনের [illegible] তুলতে পারে, তখন মানুষেই বা পারবে না কেন?

[illegible] মারা গেছে।

[illegible] বলেছেন এবং আমরা একরা আশা ছেড়ে দিয়েছি।

[illegible] হয়েই শ্রম বোধ হয় শেষ চেষ্টা করেছে। কলা-কৌশল সব [illegible] সোজা শুধু [illegible] করেছে—আচ্ছা ঘনাদা, আপনি কখন ওয়েট-লিফ্‌টিং করেননি?"

[illegible] লিফ্‌টিং?"—ঘনাদা নেহাত অবজ্ঞাভরে বলেছেন—"না। ওয়েট-লিফ্‌টিং করিনি। [illegible] এন্টা পাথর তুলেছিলাম।"

[illegible] উদগ্রীব হয়ে উঠে বসেছি। গৌরাঙ্গ সোৎসাহে জিজ্ঞাসা করেছে, [illegible] ছেন। কত বড় ঘনাদা?"

[illegible] এককথায় দমিয়ে ধরাশায়ী করে ঘনাদা বলেছেন, "কত বড় আর। এই এতটুকু [illegible]—টন-টন খানেক ওজন হবে।"

আমাদের হতাশার দীর্ঘনিশ্বাস শেষ হবার আগে ঘনাদা অত্যন্ত অবহেলাভরে আবার বলেছেন, "মিনিকয় দ্বীপটা তাতেই ত ফেটে চৌচির হয়ে গেল।"

"একটা দ্বীপ ফেটে চৌচির হয়ে গেল। শুধু একটা মাটির ডেলার ওজনে"—নিজেদের অজান্তে আমরা প্রশ্ন করে ফেলেছি।

ঘনাদা যেন অবজ্ঞাভরে আমাদের দিকে তাকিয়ে বলেছেন,—"হ্যাঁ, তাইতেই [illegible] ছোট্ট দ্বীপ [illegible] সমুদ্রে ডুবে গেল।"

না, আর ঘনাদাকে উস্কানি দেবার দরকার হয়নি।

তিনি নিজেই এবার শুরু করেছেন।

"নিউ হেব্রাইডিজ্-এর নাম শুনেছিস্ কখনো?

আর শুনে থাকলেও আসলে কি বস্তু বোধ হয় জানিস্ না। নিউ হেব্রাইডিজ্ হ'ল নিউজিল্যাণ্ডের ঠিক উত্তরে অস্ট্রেলিয়ার উত্তর-পূর্ব কোণে কয়েকটি ছোট ছোট দ্বীপের জটলা।

পৃথিবীর মাইল পঞ্চাশ ওপর থেকে দেখলে মনে হবে যেন সমুদ্রের ওপর কটা পাথর কুচি ফাঁক ফাঁক করে সাজিয়ে ইংরেজি 'ওয়াই' অক্ষরটা লেখা।

এই 'ওয়াই'-এর তিনটে হাতা যেখানে এসে মিলেছে সেখানকার 'এফাটা' দ্বীপটাই হ'ল সমস্ত দ্বীপপুঞ্জের রাজধানী।

এফাটায় দুটো বন্দর,—ভিলা আর হাভানা। ভিলা বন্দরেই সরকারী আস্তানা।

চন্দন কাঠের ব্যবসার জন্যে তখন নিউ হেব্রাইডিজের একেবারে দক্ষিণের 'আনিওয়া' নামে একটি দ্বীপে থাকি। সেখান থেকে সরকারী লাইসেন্স নেবার জন্যে ভিলা বন্দরে কদিনের জন্যে এসেছি।

সরকারী দপ্তরখানা সব দেশেই সমান। আঠারো মাসে তাদের বছর। নিউ হেব্রাইডিজে আবার এ বিষয়ে গোদের ওপর বিষফোড়া আছে। একা রামে রক্ষা নেই সুগ্রীব সেখানে দোসর। নিউ হেব্রাইডিজের রাজধানী এক কিন্তু রাজত্ব দুজনের। ইংরেজ আর ফরাসী এক সঙ্গে মিলে সেখানে শাসন করে। সুতরাং সাত দিনের কাজ সাত সপ্তাহেও সারা হ'ল না। ইংরিজি থেকে ফরাসী আর ফরাসী থেকে ইংরিজিতে তর্জমা হ'তে হ'তে আমার লাইসেন্সের আর্জি, কেন্ লালফিতের জালে যে জড়িয়ে পড়েছে তার হদিসই তখন পাচ্ছি না। ঠিক এই সময়ে মঁসিয়ে পেত্রার সঙ্গে আমার হঠাৎ আলাপ হয়। আলাপ হ'ল আশ্চর্য ভাবে। রাজধানী ও বন্দর হ'লে কি হয়, ভিলাতে ভালো একটা হোটেল নেই। মালানা নামে একটি দেশী লোকের টিনের ঢাল দেওয়া একটা মেটে দোতলার ওপরকার একখানা ঘর ভাড়া করে আছি। সেদিন সরকারী দপ্তরখানা থেকে যত অকর্মণ্য কর্মচারীদের সঙ্গে বচসা করে ক্লান্ত হয়ে বাসায় ফিরছি, এমন সময় ওপরে আমারই ঘরে তুমুল আন্দোলন হচ্ছে বলে মনে হ'ল।

নড়বড়ে কাঠের সিঁড়ি দিয়ে অত্যন্ত অবাক্ হয়ে ওপরে উঠে গেলাম। ঘরের দরজায় যাবার সময় আমি তালা দিয়ে গেছি নিজের হাতে। সে ঘরে গণ্ডগোল হয় কি করে।

সিঁড়ি দিয়ে উঠে মাঝখানের বারান্দাটুকু পার হবার আগেই মালানার সঙ্গে দেখা। আমার ঘর থেকে সে উত্তেজিতভাবে বেরিয়ে আসছে। আমায় দেখতে পেয়েই সে হাত নেড়ে জানালে যে এখুনি আমাদের পুলিসে যাওয়া দরকার।

পুলিসে যাওয়া দরকার—কেন?

আর কেন? কোথাকার এক ফরাসী গুণ্ডা এসে আপনার ঘর দখল করেছে। আমি ঠেকাবার চেষ্টা করলাম, তা শুনলই না। জোর করে তালা ভেঙে ঘরে ঢুকল। এখুনি আমি থানায় যাচ্ছি।

হেসে বললাম,—তার আগে লোকটার চেহারা একবার দেখা দরকার নয় কি।

মালানা সভয়ে বললে,—দেখবেন কি মশাই। সে একেবারে পুত্রব গুণ্ডা। কি [illegible] ঠিক নেই।

হেসে বললাম,—আমি কি করব যখন ঠিক [illegible] এ পর্যন্ত অনেক দেখেছি। [illegible]

মালানা কথাটা ঠিক বুঝতে না পেরে [illegible]

এল। [illegible] সাক্ষাৎ। এবার খুব অদ্ভুত ভাবে।

ঘরে ঢুকেই দেখি আমার [illegible] এসে চন্দন কাঠের পেছনে তখনও লেগে আছি। কিন্তু ব্যবসা ডেক-চেয়ারটিতে গা এলিয়ে [illegible] পর চন্দন কাঠ উজাড় করবার পর বেহিসাবী সদাগরেরা এই দ্বীপে টানছে। পরনে একটা প্যাঁ[illegible] ভাবে চন্দন গাছ কেটে একেবারে সাবাড় করে দিয়েছে বললেই হয়।

জোড়া সব খুলে ফেলেছে। লোকটার গায়ের চামড়া সাদা এবং গৌফ-দাড়ির ছাঁট দেখলে ফরাসী বলেই মনে হয়।

আমায় ঢুকতে দেখেই লোকটা ডেক-চেয়ারে উঠে বসে বাঘের মত কর্কশ ভাষায় হুঙ্কার দিয়ে উঠল—'হেই রে হতভাগা নিগার!'

আলমা ও সেই হুঙ্কার শুনেই তীরের মত ছিটকে গিয়ে পড়ল বারান্দায়। ফ্যাসের আর তার চুলের টিকি দেখা গেল না।

মুখটা একটু হেসে আমি একেবারে পরিষ্কার ফরাসীতে বললাম, কিছু মনে করবেন না সাহেব। আমি ডেকে দিচ্ছি।

সাহেব তবু শান্ত হলেন না। আমায় ঢুকতে দেখে সাহেব একেবারে ক্ষেপে গেলেন। আমায় প্রায় ধাক্কা দিয়ে ফেলবার মতো ভাবে সটান কড়মড় করে দাঁড়িয়ে উঠে এবং ঐ রিভিয়েরা বললেন,—বেরিয়ে যা শীগগির কালা নেটিভ। নইলে তোকে গুলি করে খুন করে ফেলব।

আগের মতই হেসে বললাম—কর্তা কি হয়েছে, আমায় বলেছিলেই তো সব মিটে যেত। কিন্তু তার আগে তোমায় যে একটু গা তুলতে হবে এটা আমি ঘরে ঢুকে।

আমার মুখে ফরাসী ভাষা শুনে সাহেবের প্রথমটা একেবারে ধাঁ হয়ে গেল। তবে সাহেব একেবারে নরখাদক নয়, আমার কথাটা অন্তত তোমার শুনে আমার একটু ঠাণ্ডা হয়ে বসেছে।

প্রথমে মতভাব হলেও পরমুহূর্তেই আমার কথার বিষটুকুন জ্বালাতে গিয়ে একেবারে ফেটে পড়ল—এ ঘর তোমার? প্রমাণ কি তার?

আমার একটা হাসি আমার জিনিসপত্রগুলো দেখিয়ে দিয়ে বললাম,—প্রমাণ তো তবুই ঘরময় ছড়িয়ে রেখেছ।

হুঁ!—বলে সাহেব হঠাৎ আমার সুটকেসটা ধরে বারান্দার ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললেন—তোমার জিনিস ঘরের বার করে ফেলে। আর মুহূর্তমাত্র যদি এখানে না হয় তাহলে একটি লাথিতে তোমাকেও ওই পথের পিছু পিছু পাঠিয়ে দেব।

ঘরের মধ্যে সাহেবের পুরনো লেবিন ট্রাঙ্কটা পড়েছিল। সেটা তুলে নিয়ে বললাম,—সেটা একটা অভদ্রতা হয় না কি? তার চেয়ে বরং তুমিই পথ দেখ। আমি তোমার সমস্যাটা মিটিয়ে দিচ্ছি।

ট্রাঙ্কটা ছুঁড়ে বারান্দা পার করে নিচে ফেলে দিলাম।

সাহেব এক লম্ফ দিয়ে দাঁড়িয়ে থেকে একেবারে ভোপের গোলার মত আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

আমাটা একটু বেঁকে নিয়ে চেয়ে দেখি আলমার হাতে সটকেট যেমন করে গভর্নর সাহেবের সেইভাবেই শুয়ে আছে। নট্ নড়ন-চড়ন নট্ কিচ্ছু!

আলমা কুঁজো থেকে তার মুখে জল ছিটিয়ে দিয়ে নিজেই এবার গিয়ে তুলে বসাল।

সাহেব হাঁফিয়ে উঠে বসে চোখ না খুলেই চেঁচিয়ে উঠল,—আমি মরে গেছি, নির্ঘাত মরে গেছি।

একটা ঝাঁ— —হ্যাঁ, তবে তুমি নরকে এসেছ। যমরাজ তোমায়

—না—মিনি তাহলে! কিন্তু অমন শিরদাঁড়া

তুমি কি জানালী?
না ত এরকম হয় না।

হেসে বললাম, আমি জাপানী নয়—বাঙালী। বাংলাদেশের নাম শুনেছ কখন?

বাংলা দেশ!—সাহেবের চোখ দুটো বড় হয়ে উঠল—বাংলা দেশের নাম শুনিনি আবার? তাগোরের সঙ্গে আমার এত আলাপ ছিল।

তাগোরের সঙ্গে! তাগোর আবার কে?

বাঃ—রাবীন্দ্রা নাত্ তাগোর!

বুঝলাম কবিগুরুর নাম ফরাসী উচ্চারণে এই রকম দাঁড়িয়েছে। জিজ্ঞাসা করলাম—তাঁর সঙ্গে তোমার আলাপ ছিল? কোথায় আলাপ হয়েছিল?

একটু যেন ভড়কে গিয়ে সে বললে,—[illegible] মানে দেখাশোনা আর কি! পারিতে দেখাশোনা হয়েছিল।

বেশ একটু কড়াভাবে জিজ্ঞাসা করলাম,—কি সূত্রে?

সাহেব আরো আমতা আমতা করে বললে—মানে তিনি যখন ওখানে ছিলেন তখন কাগজে তাঁর ফটো দেখেছিলাম।

ধমক দিয়ে এবার বললাম,—দেখো সাহেব, আমার কাছে ওসব ধাপ্পা দিয়ে কোন লাভ হবে না। তোমার পাততাড়ি গুটিয়ে এর থেকে সরে পড়তেই হবে। নাও ওঠ।

সাহেব এবার রীতিমত কাঁদুনি গেয়ে উঠল—উঠব ত। কিন্তু যাবো কোন চুলোয় শুনি? পোড়া শহরে কি একটা হোটেল আছে? সারাদিন ঘুরে একটা ঘরের বারান্দা পর্যন্ত ভাড়া পাইনি। আমি কি রাস্তায় গিয়ে শোব?

এবার হেসে ফেলে বললাম,—আচ্ছা, আমার এখানে থাকতে পারো, কিন্তু বেচাল যেন না দেখি।

সাহেব নিজের গর্দানটায় একবার হাত বুলিয়ে নিয়ে বললে,—না, আমার গর্দানটা বীমা করা নেই।

মালপত্র নিচে থেকে তুলে এনে তারপর আমরা বেশ জমিয়ে বসে আলাপ শুরু করলাম। মঁসিয়ে পেত্রা আমারই মত ভবঘুরে লোক। ঝগড়া দিয়ে শুরু হওয়ার এবং দুজনেই এক ধাতের লোক হওয়ায়, 'দোস্তি'-টা আমাদের খুব তাড়াতাড়ি হয়ে গেল। আমি ইতিমধ্যে আমার চন্দন কাঠের ব্যবসার কথা বলেছি। মঁসিয়ে পেত্রা মাথা নেড়ে বলেছে,—ওসব চন্দন কাঠ-টাট্ কোন কাজের নয়, এ দ্বীপপুঞ্জের আসল মাল হ'ল গন্ধক। দেখো না এক বছরের মধ্যে এই গন্ধকের ব্যবসায় কি রকম লাল হয়ে যাই।

উদারভাবে পেত্রা তারপর আমাকে তার ব্যবসার ভাগীদার করতে রাজী হয়েছে। আমি হেসে বলেছি—আগে তুমি গন্ধকের খনি খুঁজে বার কর, তারপর দেখা যাবে।

পেত্রা অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হয়ে বলেছে—ওঃ তুমি আমায় অবিশ্বাস করছ—পাগল ভাবছ আমায়। আচ্ছা দেখতে পাবে একদিন।

পেত্রার আস্ফালন যে একেবারে মিথ্যে নয় একদিন সত্যিই তার প্রমাণ পেয়েছি। কিন্তু সে প্রায় বছর ছয়েক বাদে। এই ছ বছর তার কোন খোঁজই রাখিনি বা পাইনি। ইভেটা দ্বীপে মালানার বাড়িতে আমার ঘরে দুদিন থাকার পর হঠাৎ একদিন সকাল বেলা বিনা না বলে কবে সে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছল। একটু অবাক হ'লেও তার সম্বন্ধে বিশেষ মাথা ঘামাইনি। এ রকম খামখেয়ালী লোক দুনিয়ায় এ পর্যন্ত অনেক দেখেছি। বিকেলে কি করবো সকালে তারা নিজেরাই জানে না।

ছ বছর বাদে আবার তার সঙ্গে সাক্ষাৎ। এবার খুব অদ্ভুত ভাবে।

আনিওয়া দ্বীপে ফিরে এসে চন্দন কাঠের পেছনে তখনও লেগে আছি। কিন্তু ব্যবসা অত্যন্ত মন্দা। ফিজি দ্বীপের চন্দন কাঠ উজাড় করবার পর বেহিসাবী সদাগরেরা এই দ্বীপে হানা দিয়ে অবাধে যথেচ্ছভাবে চন্দন গাছ কেটে একেবারে সাবাড় করে দিয়েছে [illegible] হয়।

ব্যবসা গুটিয়ে নিয়ে আবার কোথাও পাড়ি দেব কিনা ভাবছি এমন সময় অদ্ভুত একটা ব্যাপারে কৌতূহলী হয়ে উঠলাম। আনিওলা দ্বীপের দক্ষিণ-পূব কোণে সমুদ্রের ধারের একটি ছোট গাঁয়ের সর্দারের বাড়িতে তখন আমি থাকি। কিছুদিন ধরেই গাঁয়ের লোকদের ভেতর একটা চাঞ্চল্য ও উত্তেজনা লক্ষ্য করছিলাম। সেদিন তার কারণটা জেনে অবাক্ হয়ে গেলাম।

আমাদের গাঁ থেকে মাইল দশেক দূরে সমুদ্রের ওপর আর একটি ছোট দ্বীপ দেখা যায়। দ্বীপ না বলে তাকে সমুদ্রের ভেতর থেকে ওঠা একটা পাহাড় বলাই উচিত। যেদিকে যাও সমুদ্রের ওপর থেকে প্রায় খাড়া পাহাড়ের দেয়াল প্রায় দু' হাজার ফুট উঠে গেছে।

এ দ্বীপটিকে এ অঞ্চলের লোকে অপদেবতার বাসা বলেই জানে। মানুষজন সেখানে থাকে না। শুধু ঝাঁকে ঝাঁকে সামুদ্রিক পাখি সন্ধ্যার পর সেই পাহাড়ের নিচের দিকের খাঁজে ও পাথরে তাকে রাত্রিবাস করতে নামে। দুঃসাহসী দু'চার জন দেশী লোক তাদের জাল-ঝোলান 'কাটা মারান' নৌকোয় দিনের বেলা কখন সেখানে সেই পাখিদের জাবজন্তু সার হিসেবে অত্যন্ত দামী 'গুয়ানো' সংগ্রহ করতে যায়। কিন্তু মরে গেলেও সেখানে রাত কাটায় না। এমন কি দিনের বেলাতেও পাহাড়ের ওপর কি আছে তারা কোনদিন সাহস করে চড়ে দেখেনি।

এই ভূতুড়ে পাহাড়ে কিছুদিন থেকে অপদেবতার উৎপাত নাকি আরো বেড়ে গেছে। 'গুয়ানো' কুড়োতে গিয়ে এক দলের জন ছয়েক নাকি আশ্চর্য ভাবে মারা পড়েছে। ওপর থেকে প্রকাণ্ড একটা পাথর ঠিক তাদের লক্ষ্য করেই কে গড়িয়ে দিয়েছিল। আরেক দল পাহাড়ের ওপর বিকট এক মূর্তি দিনের বেলাতেই দেখতে পেয়েছে।

এসব ছাড়া রাত্রে আজকাল পাহাড়ের ওপর এই গাঁ থেকেই অদ্ভুত ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠতে দেখা যায়, মাঝে মাঝে রহস্যজনক শব্দও সেখান থেকে ভেসে আসে।

পাছে পাহাড়ের অপদেবতার কোপ এই গাঁ পর্যন্ত এসে পৌঁছায়, সেই ভয়েই গাঁয়ের লোক সারা। ভূতের ওঝারাও সময় বুঝে নিজেদের ক্ষমতা জাহির করতে ব্যস্ত। অপদেবতাকে ঠাণ্ডা করবার কড়ার দিয়ে তারা ষোড়শোপচারে ভূত পুজোর আয়োজন করেছে।

সর্দারের কাছে ব্যাপারটা সব শুনে, আমি নিজেই পাহাড়ে দ্বীপে যাব ঠিক করলাম। সর্দারের নিষেধ মানা, উপরোধ অনুরোধ যদি বা কাটান গেল, দ্বীপে আমায় নৌকোয় পৌঁছে দেয় এমন লোকই পেলাম না গাঁয়ে।

অবশেষে রেগে ছোট একটা ডিঙি নিয়ে নিজেই একদিন বিকেলে দ্বীপের উদ্দেশে রওনা হলাম। সঙ্গে একটা ধারাল ছুরি। আর কুয়ো থেকে যা দিয়ে ডুবে-যাওয়া বালতি ঘড়া তোলে সেই রকম কাঁটার গোছা বাঁধা একটা লম্বা মজবুত দড়ি। রাত কাটাবার মত কিছু খাবার দাবারও সর্দার সঙ্গে দিয়ে দিয়েছিল, যদিও রাত আমার সেখানে কাটবে কি না সে বিষয়ে তার ঘোরতর সন্দেহ।

আমার ডিঙি সমুদ্রে ঠেলে দেবার সময় সর্দার প্রায় কেঁদে ফেলে আর কি। এতদিন এক সঙ্গে থাকার দরুন আমার ওপর এই সরল অসভ্য মেলানেশিয়ের সত্যি একটা মায়া পড়েছিল। এমন সাধ করে বেঘোরে মরতে যাওয়ায় তাই সে সত্যিই ব্যথা পেয়েছে।

একলা ডিঙি বেয়ে ভূতুড়ে পাহাড়ের দিকে যেতে যেতে নিজেরও কাজটা একটু বেশীরকম গোঁয়ারতুমি বলে মনে হচ্ছিল। কোথায় কোন্ চুলোয় কি ভূতুড়ে কাণ্ড হচ্ছে, তাতে তোর মাথাব্যথা কেন বাপু! কিন্তু ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতে যাওয়াই যার স্বভাব তার উপায় কি।

ভূতুড়ে দ্বীপের ধারে গিয়ে যখন পৌঁছোলাম তখন সন্ধ্যা পার হয়ে গেছে। সামুদ্রিক পাখিদের অধিকাংশই পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে ডানা গুটিয়ে তখন নিজেদের আশ্রয় খুঁজে নিয়েছে। দু-চারটে দেরি করে ফেরা পাখির পাখার ঝটপটানি শুধু শোনা যাচ্ছে।

সুবিধেমত এক জায়গায় পাহাড়ের ধারে নৌকো বেঁধে ছুরিটা আর দড়ি বাঁধা কাঁটাটা নিয়ে তীরে উঠলাম। তীর মানেও পাথর। সে পাথরের তীর গজ কুড়ি পরেই খাড়া পাহাড়ের দেয়ালে শেষ হয়েছে। ছুরিটা কোমরে গুঁজে দড়ি-বাঁধা কাঁটাগুলো ওপরের দিকে ছুঁড়ে দিলাম। একবার ফস্কাবার পর ওপরের একটা খাঁজে কাঁটা আটকে গেল। ঠিক মত আটকেছে কিনা দড়ি নেড়ে একবার দেখে নিয়ে তাই বেয়ে সেই খাঁজের ভেতর পা দিয়ে গিয়ে দাঁড়ালাম। তারপর আবার কাঁটা ছুঁড়ে ওপরের কোন খাঁজে লাগাবার কসরত।

এমনি ভাবে প্রাণ হাতে করে পাহাড়ের মাথায় গিয়ে যখন উঠলাম তখন বেশ রাত হয়েছে। আমি পাহাড়ের পশ্চিম দিক্ দিয়ে উঠেছিলাম। সে দিকটা অন্ধকার হলেও ওপারে কৃষ্ণপক্ষের চতুর্থী না পঞ্চমীর চাঁদের আলো পড়ে চারিদিক বেশ ভালোই দেখা যাচ্ছে।

যা দেখা গেল তাতে আমি সত্যি অবাক্। পাহাড়ের ওপরে ছোট ক এ জলাশয়টির কথা কল্পনাও করা যায় না। কেউ যেন গোল টা যেন পেয়ালার মত এই হ্রদটিকে ওপরে তুলে ধরেছে।

চূড়ায় চাঁদের আলোয় ঝলমলে হ্রদটিকে কি সুন্দর যে দেখাচ্ছিল,

দড়ি বেয়ে ওঠার পরিশ্রমে বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। হ্রদের ধারে একটা পাথরের

চাঁইএর পাশে বসে মুখ চোখে জল দিতে যাচ্ছি, হঠাৎ নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই সমস্ত শরীর একমুহূর্তের জন্য কেমন যেন হিম হয়ে গেল।

হ্রদের ঠিক ওপারে জলের ভেতর থেকে সত্যিই একটা বিকট মূর্তি ওপরে উঠে আসছে। মূর্তিটা মানুষের মত সোজা হয়ে হাঁটছে—কিন্তু মানুষের সঙ্গে আর কোন সাদৃশ্য তার নেই। কবন্ধের মত, বর্তুলাকার বীভৎস একটা ধড় যেন দুটো থামের ওপর দাঁড় করান—তার হাঁটার ভঙ্গীও এমন অমানুষিক যে আপনা থেকে সমস্ত শরীর শিউরে উঠে।

মূর্তিটা জল থেকে উঠে বিশী টলমলে পায়ে দুলতে দুলতে ওপারের পাহাড়ের একটা অন্ধকার গহ্বরের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

না,—এ রহস্যের মীমাংসা না করলে নয়। মন শক্ত করে যথাসম্ভব সাবধান হয়ে হ্রদের পাড় দিয়ে ওপারে দৌড়ে গেলাম।

সামনে সুড়ঙ্গের মত সেই গহ্বর। একমুহূর্ত ইতস্ততঃ করে ছুরিটা কোমর থেকে খুলে নিয়ে তার ভেতর গিয়ে ঢুকলাম। সুড়ঙ্গটা বেশী দীর্ঘ নয়, একটা বাঁক ফিরতেই দূরে একটা আলোকিত জায়গা দেখা গেল। এই কি তাহলে হ্রদের জলের সেই বিকট জীবের আস্তানা? আলো জ্বালবার ক্ষমতাও কি তার আছে!

সন্তর্পণে পা টিপে টিপে সেখানে গিয়ে পৌঁছলাম। সুড়ঙ্গটা এখানে একটা মাঝারি গোছের গুহায় শেষ হয়েছে।

গুহার ভেতরে পৌঁছে একেবারে হতভম্ব হয়ে গেলাম। সেখানে কেউ নেই, কিন্তু এক পাশে একটা কেরোসিনের বাতি জ্বলছে, দেয়ালে পোশাক-আশাক টাঙান।

ভুতুড়ে দ্বীপে এই দুর্গম পাহাড়ের চূড়ায় মানুষ এল কোথা থেকে! জলের তলা ওঠা সেই অমানুষিক জীবটিই বা গেল কোথায়!

অবাক্ হয়ে দেয়ালের ধারের পোশাকগুলো লক্ষ্য করছি এমন সময় সমস্ত গুহা কাঁপিয়ে বিদ্যুৎগতিতে ঘুরে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে আমার ছুরিও হাত থেকে ছুটে বেরিয়ে ওধারের দেয়ালে বিঁধে গিয়ে কাঁপতে লাগল। যে বন্দুক ছুঁড়েছিল তার ডান হাতের আমার আঁটিয়ে সেই ছুরিতে দেয়ালের সঙ্গে আঁট হয়ে গেছে। হাত নাড়বার তার ক্ষমতা নেই।

লোকটার ওপর এবার ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছিলাম হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে সবিস্ময়ে বললাম—এ কি, মঁসিয়ে পেত্রা!

মঁসিয়ে পেত্রা করুণভাবে একটু হেসে বললেন—হ্যাঁ, আপাততঃ তোমার বন্দী!

অনেক রাত তারপর আমাদের পরস্পরের খোঁজ খবর নিতেই কেটে গেল। কি করে বন্দরের খোঁজে নানা জায়গা ঘুরে মঁসিয়ে পেত্রা শেষে এই দ্বীপে উঠেছে, সব কাহিনী শোনার পর জিজ্ঞাসা করলাম—কিন্তু জলের তলার সেই কিম্ভূতকিমাকার জীবটি তাহলে কি?

পেত্রা একটু হেসে আমায় নিয়ে গুহার একদিকের একটি পাথরের দরজা সরিয়ে অন্য একটা ছোট গুহায় নিয়ে গেল। পাথরের দরজাটি এমন কায়দায় বসান যে এমনিতে চোখে পড়ে না। আমারও চোখে পড়েনি।

ছোট গুহার ভেতরে ঢুকে সামনের দিকে আঙুল দেখিয়ে পেত্রা বললে, এই তোমার সেই বিকট জীব।

অবাক্ হয়ে দেখি সামনে দুটো ডুবুরীর পোশাক দেওয়ালের ধারে সাজান হয়েছে। পোশাক দুটি সাধারণ ডুবুরীর পোশাক থেকে একটু অবশ্য ভিন্নভাবে তৈরী।

পেত্রা নিজেই সে কথা আমায় জানালে—পোশাকগুলো আমি নিজেই করমাস দিয়ে গড়িয়ে এনেছি।

কিন্তু কেন? অবাক্ হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম।

কেন?—আচ্ছা দেখবে চল—বলে পেত্রা আমায় নিয়ে আবার সেই হ্রদের ধারে গিয়ে বললে, জলে এখন একটু হাত দাও দেখি।

হাত দিয়ে সবিস্ময়ে বললাম,—একি, এত রীতিমত গরম! ঘণ্টা তিনেক আগেও ত ঠাণ্ডা দেখেছি।

পেত্রা থেমে বললে,—এইটেই এ হ্রদের রহস্য এবং তারই কিনারা করবার জন্যে এই ডুবুরির পোশাক। এ হ্রদ থেকে থেকে হঠাৎ এত গরম হয়ে ওঠে যে ওপারে ঝঞ্ঝার কুণ্ডলী উঠতে থাকে। এদেশে লোকরা তাই দেখে ভাবে এখানে অপদেবতা আছে।

জিজ্ঞাসা করলাম—তুমি ডুবুরীর পোশাকে এ হ্রদের জলে নেমে কি পেয়েছ?

কি পেয়েছি, কাল ঠাণ্ডা হবার পর নিচে নামলেই দেখতে পাবে।

পরের দিন জল ঠাণ্ডা হ'তে প্রায় বিকেল হয়ে গেল। ডুবুরীর পোশাক পরে আমরা দুজনে তারপর হ্রদের নিচে নামলাম। পাহাড়ের ওপার হ'লেও হ্রদটি খুব কম গভীর নয়। কিন্তু জল এমন পরিষ্কার যে দেখতে কিছু কষ্ট হয় না।

জলের তলায় পরস্পরের সঙ্গে কথা বলবার জন্যে আমরা একটা 'স্পিকিং টিউব' অর্থাৎ কথা কইবার রবারের নলের ব্যবস্থা করে গিয়েছিলাম।

হ্রদের তলায় একজায়গায় এসে পেত্রা বললে,—নিচের দিকে চেয়ে কিছু দেখতে পাচ্ছ?

বললাম,—দেখতে পাচ্ছি ত নীলচে একরকম পাথর।

নীলচে পাথর নয়, পৃথিবীর সব চেয়ে দামী রত্ন হীরে যার মধ্যে পাওয়া যায় এ সেই পাথর।

হীরে!—উত্তেজিত ভাবে নিচের দিকে চেয়ে দেখতে দেখতে চমকে উঠলাম। নীলচে পাথরের গায়ে সত্যিই নানা জায়গায় আরেক জাতের পাথর এই জলের তলাতেও জ্বলজ্বল করছে।

হীরে। চারিধারে এত হীরে। এই হ্রদের মধ্যে ত সাতটা সাম্রাজ্যের ঐশ্বর্য তাহলে লুকোন রয়েছে। মনের ওপর যেন রাশ রইল না। ওরই ভেতর প্রকাণ্ড একটা জ্বলজ্বলে পাথর দেখতে পেয়ে সেটা নেবার জন্যে পাগল হয়ে উঠলাম। বাটালি গোছের একটা যন্ত্র পেত্রা সঙ্গে এনেছিল। সেটা দিয়ে ঠুকে ঠুকে ধারের পাথর আলগা করে যখন সেটা তুললাম তখন অবাক্ হয়ে দেখি তার নিচে একটা নলের মত গর্ত বেরিয়ে পড়েছে এবং তার ভেতর দিয়ে হুহু করে জল গলে যাচ্ছে।

এই সামান্য ব্যাপারে পেত্রা কিন্তু হঠাৎ যেন ক্ষেপে গেল। আমার আরো কয়েকটা হীরে সংগ্রহ করবার ইচ্ছে ছিল কিন্তু সে একেবারে পাগলের মত টানতে টানতে আমায় ওপরে নিয়ে গিয়ে তুলল। শুধু তাই নয়, ডুবুরির পোশাক ছেড়ে ফেলেই আমায় কোন কথা বলবার অবসর না দিয়ে, টেনে নিয়ে গেল পাহাড়ের এক প্রান্তে। সেখান থেকে দড়ির একটি সিঁড়ি জলের ধার পর্যন্ত টাঙান এবং জলের ধারে পাহাড়ে একটি বাঁজের আড়ালে একটি ছোট মটর-লঞ্চ দেখলাম লুকোন রয়েছে।

দড়ির সিঁড়ি দিয়ে মোটর বোটে নেমে সেটি চালিয়ে মাইল খানেক দ্বীপটি থেকে দূরে যাবার আগে মুখে কোনা উঠিয়েও পেত্রার কাছ থেকে একটা কথা বার করতে পারলাম না।

অবশেষে অত্যন্ত রেগে বললাম,—আমার কথার জবাব যদি না দাও তাহলে তোমার বোট থেকে আমি সমুদ্রে ফেলে দেব—বুঝেছ! বল,—এ রকম ভাবে হঠাৎ পাগলের মত খালিয়ে আসার মানে কি?

মানে এখনি বুঝতে পারবে। কানে আঙুল দিয়ে শক্ত হয়ে বোটের রেলিং ধরে বসে থাকি।

তার পরের কথা আর শুনতে পেলাম না। আমি দ্বীপটির দিকেই মুখ ফিরিয়ে ছিলাম। হঠাৎ আকাশ ফাটানো শব্দে সেই বিরাট পাহাড়ের দ্বীপটি ডুবুরির খোলের মত চৌচির হয়ে ফেটে গিয়ে সমুদ্রের জলে ডুবে গেল।

প্রলয়ের মত যে ঝড় তারপর উঠল, আর যে প্রচণ্ড ঢেউ এসে দৈত্যের মত কিছুক্ষণ আমাদের খোঁট নিয়ে লোফালুফি শুরু করলে, তাদের হাত থেকে বেঁচে নিরাপদ জায়গায় পৌঁছতে বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেল।

এইবার পেত্রাকে জিজ্ঞাসা করলাম—ব্যাপার কি বল ত পেত্রা।

ব্যাপার আর কি? তোমার ওই হীরে তোলা। ওই এক ছটাক একটা নুড়ি তোলাতেই এত বড় একটা দ্বীপ ফেটে চৌচির হয়ে গেল।

তা যাবে না।—পেত্রা বুঝিয়ে দিল—দ্বীপটা আসলে একটা আগ্নেয়গিরি ছাড়া কিছু নয়। ওপরে যে হ্রদ দেখেছি সেটা এককালে ছিল আগুন বেরুবার মুখ, এখন কোন সুরঙ্গে বুঁজে গিয়ে বহুকালের বৃষ্টির জল জমে হ্রদ হয়ে উঠেছে। কিন্তু নিচেকার আগুন যে একেবারে নিভে যায় নি, তার মাঝে মাঝে গরম হওয়াতেই তা বোঝা যায়।

হ্রদের তলাটি খুব পুরু ত নয়। তুমি নাড়ি তোলার সঙ্গে সঙ্গে কোন গোপন কলটা তাই টেনেছিলে বেরিয়ে পড়ে। সেই ফুটো দিয়ে হ্রদের জল পাতালের প্রচণ্ড আগুনের ওপর গিয়ে পড়ে। সে জলের তারপর বাষ্প হয়ে উঠতে কতক্ষণ। ওপরে ত আর একটা

ফুটো। বেরুবার পথ না পেয়ে সেই বাষ্প তাই ক্রমশ প্রচণ্ড বেগ পেতে পেতে গোটা পাহাড়টাকে ফাটিয়ে বেরিয়ে গেছে। ঐ নুড়িটুকু তুলেই দ্বীপটাকে তুমি ডোবালে।"

ঘনাদার গল্প শেষ হ'লে গৌরাঙ্গ সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলে,—দ্বীপটার নাম কি ছিল ঘনাদা?

ঘনাদা বিরক্ত হয়ে বললেন,—যা ডুবে গেছে তার নামে কি দরকার?

আর সেই ছটাক খানেক হীরেটা?—শিবু জিজ্ঞাসা করলে—সেটা নিশ্চয় হাতছাড়া করেনি।

ঘনাদা হঠাৎ কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন। শিবুর কথাটা বোধ হয় তাই কানে গেল না।

কঙ্কাল

ঘনাদা কোথায়?

কোথায় গেলেন ঘনাদা!!

সবাই মিলে সারাদিন যাকে চোখে চোখে পাহারায় রাখা হয়েছে এই ভয় সন্দেহের সময় সঙ্কটে কী করে মিয়ে তিনি কোথায় পালালেন,—এবং কেমন করে!!!

নিচে ওপরে ছাদ পর্যন্ত আমরা সবাই ঘুরে এলাম। কোথাও ঘনাদার চিহ্ন নেই।

শেষটায় কি ঘনাদা তাঁর গল্পের যাদুকরীর খেল আমাদের প্রত্যক্ষ দেখিয়ে দিলেন?

গবাক্ষের ফাঁক দিয়ে গলিয়েই পড়লেন আমাদের এড়িয়ে?

আমাদের এড়াতে চাইবার কারণ একটা অবশ্য ছিল, কিন্তু সত্যি, সেটা ঘনাদার কাছে ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়তে বাধ্য করবার মত গুরুতর হতে পারে তা আমরা ভাবিনি।

ব্যাপারটা আসলে এমনি সহজই করতে চেয়েছিলাম ঘনাদাকে নিয়ে।

ফাল্গুনী নিয়ে। ঘনাদা সেদিন তাঁর মৌরসী পট্টা করা আরামকেদারায় বসে শিশিরের শিশুসুলভ জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি করতে করতে আমাদের দু চারটে খোশগল্প শোনাচ্ছিলেন, এমন সময় ফাল্গুনী হেসে অত্যন্ত কাচুমাচু ভাবে ঘরে ঢুকে বললে, একটা কথা ঘনাদা!

আপনাকেই শুধুনিয়ম।

ফাল্গুনী কথার বদলে অত্যন্ত একটা অদ্ভুত ভঙ্গি করে, হাতের ওপর দিকে তাকালাম। ঘনাদাই নিজের কাজের ঘনিষ্ঠসময় আমাদের কারুর কথা বরদাস্ত করেন এমন কথা শোনা ছাড়া তাঁকে খুশি করে খোঁজার কোনরূপ আর বিচ্ছু ত কখন দেখা যায়নি।

ফাল্গুনীর পকেট একটা মোটা টেলিগ্রাম নিয়ে বসে ঘনাদা ব্যাপারটা জিজ্ঞাসা করলে,—কাল বিকেলে আপনার ভোলা জয়ন্তী যেন কলে আসে বলে।

ব্যাপারটা এবার অভিনেতাই বলি চলুন। ঘনাদার কথা। এতবড় অভাবনীয় কথা কখনও আমরা শুনিনি।

ঘনাদা শিশুর প্রশ্নে বিব্রত আমাদের মুখই হতভম্ব করেছিলেন। কিন্তু তারপর কি গলাধঃকরণ করলেন, কে জানে? দাঁড়াও ফাল্গুনীর সঙ্গে [illegible]

ওদের মধ্যে সঙ্গে ঘনাদা যা আওড়ালেন তাতে বোঝা গেল, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের চার্চিল সাহেবকে কাঁদিয়ে এতগুলো ঘায় একসঙ্গে সামলাতে হয়নি।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত শিবুর ওপর সদয় হয়ে বললেন,—তা খানিকক্ষণ সময় হতেও পারে, কিন্তু কেন বলত?

না, এমন কিছু না। আমাদের athletic club-এ কাল একটা ব্যাপার আছে কিনা, তাতে আপনাকে একটু থাকতে হবে।

ঘনাদার মুখ তার পক্ষে যতখানি সম্ভব উজ্জ্বল হয়ে উঠল। শিবুদের ক্লাবে এর আগে একবার তাঁর যাবার সৌভাগ্য হয়েছিল। সেখানে শরীরচর্চা যতটা না হোক, এসম্পর্ক অনুষ্ঠানে ভোজটা বেশ জমকালো রকমেরই হয়। ঘনাদা উৎসাহটা যতদূর সম্ভব সংযত করবার চেষ্টা করে বললেন,—তা বলছ যখন এত করে, তা না হয় যাব'খন। কিন্তু কি ব্যাপারটা বলত?

একটা 'বক্সিং কম্পেটিশন'—মুষ্টিযুদ্ধের প্রতিযোগিতা—আপনাকে সালিশী অর্থাৎ রেফারীর কাজ করতে হবে।

মুষ্টিযুদ্ধের শুনে ঘনাদার মুখে যেটুকু ছায়া নেমে এসেছিল, রেফারীগিরি শুনেই সেটুকু কেটে গেল। বললেন,—রেফারী হতে হবে। বেশ বেশ। তা ভালো রেফারী বুঝি আর কাউকে পেলে না।

পাব না কেন?—শিবু গম্ভীরভাবে বললে, কিন্তু এবারে একটু ক্যাসাদ আছে কিনা? আনাশোনায় রেফারীরা কেউ রাজী হচ্ছে না।

কেন বলত?—ঘনাদার ভ্রূ একটু কুঞ্চিত হ'ল।

ব্ল্যাক টাইগারের নাম শুনেছেন কিনা জানি না, মিশকালো নিগ্রো, খড়্গের মতই ছিপ্রে। মাসখানেক হল কলকাতায় এসেছে। তার সঙ্গে আমাদের ওয়েলটার ওয়েট চ্যাম্পিয়ন সুরজিৎ দাসের লড়াই কিনা।

তাতে রেফারীর ভয়টা কিসের?—আমরাই জিজ্ঞাসা করলাম।

ব্ল্যাক টাইগারের পরিচয় তাহলে জানো না মনে হচ্ছে—শিবু আমাদের দিকে একটু অনুকম্পাভরেই তাকাল,—এ পর্যন্ত পাঁচজন রেফারীকে সে হাসপাতালে পাঠিয়েছে, একজন ও আর ফেরে-ই নি। একটু মেজাজ বিগড়োলে কে রেফারী আর কে তার প্রতিদ্বন্দ্বী তার হুঁশই থাকে না।

শিবু ঘনাদাকে সকিয়ে আমাদের দিকে যৎসামান্য একটু চোখ টিপতেই ব্যাপারটা আমাদের আর বুঝতে বাকি রইল না।

শিশির ন্যাকা সেজে জিজ্ঞাসা করলে,—তা এ রকম খুনেদের জন্যে মনস্থাক রেফারী কেন বাপু।

যাতে ঘনাদার মত রেফারীই ত দরকার। রেফারীকে রেফারীগিরিও করতে আবার কিছু বেয়াড়াপনা করলে একটি 'প্রপারকাট'-এ তাকে শুইয়েও ফেলতে পারবে। ব্যাপার ঘনাদা, সেই ফাইটিং স্পিরিট আপনি পাবেন কোথা কি বলুন না? সেখানে কুলোবে?

অনেকদিন হলে ঘনাদাকে আর বেশি বলতে হত না, কিন্তু সেদিন মেজাজটা তাঁর কেন বিগড়ে ছিল বলে মনে হয়। বিছানাটায় একটা হেঁচকা টানে তিনি হঠাৎ উঠে পড়লেন।

শেষ অবধি হবার আগে কেন জিজ্ঞাসা করলে,—ওকি, উঠলেন কেন? কাল রেফারী হবেন ত?

ঘনাদা কিন্তু বলবার আগেই শিবু বলে উঠল,—আরে ওকথা আবার জিজ্ঞাসা করতে হয়। এমন একটা স্পিরিট দেখানো কখনো কাল ওঁকে ছাড়া চলে?

ঘনাদা কি একটা বলতে গিয়ে না বলে বেরিয়ে গেলেন।

ওপরের সিঁড়িতে তাঁর পায়ের শব্দ মিলিয়ে যাবার পর আমাদের ঘর হাসির [illegible] যাবার উপক্রম।

তারপর আজ সেই সন্ধে থেকে ঘনাদাকে [illegible]।

হঠাৎ [illegible] বলে ঘনাদা [illegible] বিছানার চেয়ে [illegible] বেরিয়ে [illegible] তলায় [illegible]। কিন্তু [illegible]

শিবরা [illegible]। [illegible] তার [illegible] শুরু করে [illegible] তলায় সে [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] খাটের তলায় উঁকি মেরে সত্যিই থ হয়ে গেলাম। ঘনাদা খাটের তলায় মেঝেতে উপুড় হয়ে শুয়ে আছেন।

সে [illegible] তোয়াক্কা নয়। খাটের তলায় ঘনাদা আর বাইরে আমরা বিমূঢ় হয়ে পরস্পরের দিকে [illegible] আমাদের [illegible] এমন [illegible] যে হাসতে পর্যন্ত ভুলে গেছি।

[illegible] কেটে গেছে অনন্তকাল। [illegible] মধ্যে নিজেকে সামলে নিলেন। তারপর হামা [illegible] নিঃশব্দে খাটের [illegible] এলেন যেন খাটের তলায় [illegible] থাকলে [illegible] নিজেই [illegible]।

[illegible] অবশেষে মুখে কথা ফুটল।

[illegible] [illegible] খাটের তলায়—জিজ্ঞাসা করলে শিবরা।

[illegible] না বলে [illegible] শুধু তাঁর হাতটা বাড়িয়ে দিলেন। হাতে যা রয়েছে [illegible] কাচি বলে মনে হল।

[illegible] খাটের তলায় ওই একটা ভাঙা কাঁচের টুকরো খুঁজছিলেন।—আমি না বলে [illegible]।

—তার উত্তরে ঘনাদা নাকের ভেতর দিয়ে যে শব্দটা বার করলেন, তার [illegible] সবই একসঙ্গে হতে পারে। তারপর শব্দটাকে ভাষার রূপ দিয়ে আমাদের দিকে [illegible] দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন,—একটা ভাঙা কাঁচের টুকরো—কেমন?

গতিক সুবিধে নয় দেখে শিবরা তাড়াতাড়ি বললে, ওদিকে বলিং কিন্তু [illegible] যাবে....।

আর বক্তৃতা। ঘনাদার গলা তখন শুরু হয়ে গেছে,—এই ভাঙা কাঁচের [illegible] রোদ্দুর না থাকলে হিরোসিমা নাগাসাকির বদলে লন্ডনেই প্রথম অ্যাটম বোমা পড়ত, তা জান?

জানবার আমাদের দরকার নেই;—শিবরা দুর্বলভাবে শেষ চেষ্টা করে বললে,—এখন আপনি চলুন ত।

ঘনে,
সাহেবকে। যাই, বলে ঘাটের ওপরই বেশ আরাম করে বসে ঘনাদা বললেন, ১৯৩৯ সালের ... স্বর।। তারিখটা তোমাদের মনে আছে নিশ্চয়। যে মহাযুদ্ধে সমস্ত পৃথিবী রক্তে ভেসে গেল তার প্রথম স্ফুলিঙ্গ সেইদিন জার্মানী আর পোল্যাণ্ডের সীমান্তে জ্বলে উঠেছিল। হিটলারের দুরন্ত বাহিনী সেদিন পোল্যাণ্ডের ওপর বন্যার মত ঝাঁপিয়ে পড়েছে আর আমি বেঙ্গুয়েলা বন্দর থেকে ছ্যাকড়াগাড়ির মত এক ট্রেনে চেপে অ্যাংগোলার মাঝা-মাঝি কোয়াঞ্জা স্টেশনের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছি। আমার লক্ষ্য অবশ্য কোয়াঞ্জা স্টেশন নয়। সেখানে নেমে কুয়াঞ্জা নদীর যেখানে উৎস সেই বিহে পাহাড়েই যাবার জন্যে আমি বেরিয়েছি।

একটু হেসে আমাদের মুখের ভাবগুলো একটু লক্ষ্য করে ঘনাদা বললেন,—ভূগোলের পরীক্ষার মত লাগছে বুঝি। বুঝিয়ে বলছি দাঁড়াও। অ্যাংগোলার নাম নিশ্চয় শুনেছ। না শুনে থাকলে আফ্রিকার ম্যাপটা একবার খুলে দেখো। তলার দিকে পুবের আতলান্তিক মহাসাগরের ধারে একটা সবুজ রঙের ছাপা রঙ পাবে। দেশটা পর্তুগীজদের দখলে কিন্তু রেলটা ইংরেজদের; আর ওই রেলপথ আর সমুদ্রের ধারের কিছু কিছু জায়গা ছাড়া ভেতরের অধিকাংশ পাহাড় জঙ্গল মরুপ্রান্তর এখনো প্রায় অজানা বললেই হয়। সেখানে বান্টুনিগ্রো জাতের কাফ্রীরা একরকম স্বাধীনভাবেই থাকে।

রেলের যে কামরাটায় উঠেছিলাম সেটা প্রথম শ্রেণীর। নোভা লিস্‌বোয়া স্টেশন পর্যন্ত একাই বেশ আরামে সেটায় কাটালাম। নোভা লিস্‌বোয়াতে নতুন দুজন যাত্রী উঠল। সারা রাস্তা একলাই একটা কামরা দখল করে যেতে পারব এ আশা করিনি, কিন্তু নতুন সঙ্গী দুজন অমন বেয়াড়া অভদ্র না হলে ভালো হোত। কথাবার্তা ও চেহারা দেখে গোড়াতেই বুঝেছিলাম তাদের দুজনেই জার্মান। অ্যাংগোলা পর্তুগীজদের দখলে হলেও জার্মানদের আনাগোনা এখানে কিছুদিন ধরে খুব বেড়েছে জানতাম। শুধু নতুন মাৎসী তেলক বেটে তারা যে এখন সাপের পাঁচ পা দেখেছে তা জানা ছিল না।

নতুন যাত্রীদের লটবহর বড় বেশি। বড় বড় চটে মোড়া থলি প্যাকিং বাক্স প্রভৃতি এক গাড়ি মাল ব্রেকভ্যানে না দিয়ে কামরায় তোলাই অন্যায়। তবু গোড়ায় তা নিয়ে কোন প্রতিবাদ করিনি। কিন্তু জার্মান যাত্রীদের অভদ্রতা ক্রমশ সীমা ছাড়িয়ে গেল। একটি কেবিন-ট্রাঙ্ক ও একটি হোল্ডঅল ছাড়া আমার সঙ্গে কিছু নেই। কেবিনট্রাঙ্কটা বাঙ্ক-এর ওপর রেখে হোল্ডঅলটা খুলে তার ওপর শুয়ে শুয়ে আমি নতুন যাত্রীদের মাল তোলা দেখছিলাম, হঠাৎ একজন আমায় অসভ্যের মত যা হুকুম করলে আমাদের ভাষার অনুবাদ করলে তার অর্থ দাঁড়ায়।—এই কাফ্রাভূত, তোর মোট সরা এখান থেকে।

যেন কিছুই বুঝিনি এইভাবে লোকটার দিকে বোকার মত তাকিয়ে রইলাম। দুজনের মধ্যে এই লোকটাই দেখলাম বেশী জোয়ান। ছ'ফুট লম্বা, পাকা আড়াই মণ লাশ।

আমায় নড়তে না দেখে একটা গালাগাল দিয়ে লোকটা আমার হাত ধরে হেঁচকা টান দিয়ে বলতে শুনতে পাচ্ছে না জানোয়ার কোথাকার! একটি ঝটকায় ঠোক্করে একেবারে গাড়ির বাইরে ফেলে দেয়।

যেন কিছুটা বুঝতে পেরেছি এমনি ভাবে বোকার মত উঠে দাঁড়িয়ে কেবিনট্রাঙ্কটা নীচে নামিয়ে দিচ্ছে ফেললাম। দুর্ভাগ্যের বিষয় তার ডান পা-টা সেইখানেই ছিল। ট্রাঙ্কটাও বেশ ভারী। পায়ের যন্ত্রণায় চেঁচিয়ে উঠে লেংচাতে লেংচাতে লোকটা প্রথম মিনিট খানেক শুধু আমার চতুর্দশ পুরুষ উদ্ধার করলে। তারপর বরফো গণ্ডারের মত তেড়ে এল আমার দিকে।

এবার একটা সিগারেট ধরালাম।

লোকটা তখন জিঘাংসায় ক্ষেপে তার সঙ্গীর ঘাড়েই গিয়ে পড়ে দুজনে মিলে মারিতে সড়কি করিতে লাগিল।

ঘণ্টাখানেক হতচকিত হয়ে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে দুজনে যা বোঝে উঠে হাঁক

বাগিয়ে আমার দিকে এগিয়ে আসছে, এমন সময় দরজা থেকে শোনা গেল,—আরে আরে হের ভস্ নাকি!

তিনজনই অবাক্ হয়ে সেদিকে চাইলাম।

ট্রেন তখন ছেড়ে দিয়েছে। কামরার দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে পিপের মত গোল, বেলের মত চাঁছামাথা মাঝবয়সী যে জার্মান ভদ্রলোকটি আমার দিকে এগিয়ে এলো, প্রথমটা তাকে সত্যিই চিনতে পারিনি।

আমাদের কাছাকাছি এসে, মারমূর্তি তার দুটি সঙ্গীর দিকে চোখ পড়তে একটু অবাক্ হয়ে সে বললে,—ব্যাপার কি হে! তোমরা লড়াই করছিলে নাকি!

এবার দুজনের মুখে খানিকক্ষণ খই ফুটল যেন। কালা আদমির কাছে জব্দ হয়ে গায়ের জ্বালা মুখের তোড়ে বার করতে তারা কিছু বাকি রাখলে না।

তাদের কথা শেষ হবার পর বেলের মত তেলা-মাথা জার্মানের সে কি হাসি। পিপের মত ভুঁড়ি তার ফেটে যায় আর কি!

অনেক কষ্টে হাসি থামিয়ে সে বললে, তোমরা আর ঝগড়া করবার লোক পাওনি!

আমার দিকে ফিরে তারপর বললে,—কিছু মনে কোরো না হের ভস্, এরা সেদিনের ছোকরা, তোমার পরিচয় কোথা থেকে জানবে!

হেসে আবার বললেন,—আমায় চিনতে পারছ ত? চিনতে আমি তখনই পেরেছি। মাথার শেষ কগাছি চুল উঠে গেলেও এবং ভুঁড়িটি বেশ কয়েক ইঞ্চি বাড়লেও আগেই তাকে আমার চেনা উচিত ছিল। দুনিয়ার পাণ্ডববর্জিত সব দুর্গম জায়গায় প্রাণ হাতে নিয়ে দুর্লভ ধাতুর খোঁজে যারা ঘুরে বেড়ায়। ফন্দিবাজ প্যাপেনকে তারা সবাই চেনে। অমন একটি ধূর্ত শয়তান এ লাইনে আর দুটি নেই। আমার সঙ্গে দু'চাববার তার ঠোকাঠুকি আগেই হয়ে গেছে বলেই আমার অত খাতির তার কাছে। শুধু দেশ দেখার জন্যে এত লটবহর নিয়ে প্যাপেন যে এই জঙ্গল মরুভূমির দেশে আসেনি তা বুঝতে পারলেও, মুখে অমায়িক হেসে আমি তার হাত ঝাঁকানি দিলাম।

এইবার শেয়ানে শেয়ানে কোলাকুলি শুরু হল। আমি প্যাপেনকে দেখে যতটা সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছি, প্যাপেনও আমাকে দেখে তার চেয়ে বেশি বই কম নয়। এখন কে কৌশলে কার পেট থেকে কথা বার করে নিতে পারে তারই প্যাঁচ কষাকষি চলল। আমার পাশে বসে প্যাপেন এমন অন্তরঙ্গের মত গল্প শুরু করলে যেন কোন রেষারেষি আমাদের মধ্যে নেই। দুজনের কেউই কম যায় না। ঘণ্টা দুয়েক সমানে নানান কায়দা করেও কেউ কারুর মুখ থেকে একটা বেফাঁস কথাও বার করতে পারলাম না। বাঁকা রাস্তায় সুবিধে করতে না পেরে প্যাপেন হঠাৎ হেসে উঠে সোজাসুজিই জিজ্ঞেস করে বসল, আর লুকোচুরিতে লাভ নেই। সত্যি করে বলত ভস্, কোথায় চলেছ?

হেসে বললাম,—হয়ত সেখানে তোমার সঙ্গে দেখা হবে।

আমার সঙ্গে দেখা! প্যাপেন একেবারে আকাশ থেকে পড়ল, আরে আমি ত যাচ্ছি একেবারে অ্যাংগোলার শেষ প্রান্তে লুয়াও স্টেশনে।

তাই নাকি!—হেসে বললাম, মালপত্র দেখে তাই মনে হচ্ছে বটে।

আরে ওসব মালপত্র ত লুয়াও-র এক হাসপাতালের জন্যে নিয়ে যাচ্ছি। আজকাল আর পাহাড়ে পর্বতে সোনা রুপো খুঁজে বেড়াবার মত শরীরের সামর্থ্য নেই, তাই এই সব মাল যোগাবার কাজ নিয়েছি।—প্যাপেন আমাকে একেবারে জল বনিয়ে দিয়ে আবার জিজ্ঞাসা করলে,—কিন্তু তুমি কোথায় নামবে তা ত বললে না!

আগের মতই হেসে বললাম,—যেখানেই নামি, দেখা আমাদের যথাস্থানে হবে বলে মনে হচ্ছে।

হঠাৎ প্যাপেন গম্ভীর হয়ে বললে,—দেখা কিন্তু এবার আমাদের না হ'লেই ভাল হত।

কেন বলত!—একটু বিদ্রূপের সঙ্গেই বললাম, এবার থার্ড রাইখ্ অর্থাৎ নাৎসী জার্মানীর হয়ে টহল দিতে বেরিয়েছ বলে?

খানিক চুপ করে থেকে প্যাপেন ভেমনি গম্ভীরভাবে বললে,—হ্যাঁ, তাই যদি বলি!

তাহলে বলব নাৎসীদের সে চরেদের দৌড় কত একবার দেখে মরতে চাই।

বাকি দুজন জার্মান গোঁজ হয়ে অন্য এক বেঞ্চিতে বসে এতক্ষণ কান খাড়া করে আমাদের আলাপ শুনছিল। আর থাকতে না পেরে তাদের একজন দাঁত খিঁচিয়ে বলে উঠল,—তোমার বাসনা অপূর্ণ থাকবে না।

তার দিকে ফিরে একটু হাসলাম। কদিন বাদে তার অভিশাপ সত্যিই ফলবার উপক্রম হবে তখন ভাবিনি।

• •

দিন পনরো পরের কথা। বিহে অধিত্যকায় একটা খাড়া পাহাড়ের চূড়ার নিচে তাঁবুর মধ্যে বসে লণ্ঠনের আলোয় সে অঞ্চলের একটা ম্যাপ আঁকছিলাম। অন্ধকার রাত, চারিদিক একেবারে নিস্তব্ধ। সারাদিন দক্ষিণ-পূর্ব মুখে যে ঝড়ের মত হাওয়া বয়েছে তাও এখন যেন ক্লান্ত হয়ে হয়ে থেমে গেছে।

ম্যাপ আঁকায় খুব যে আমার মন ছিল তা নয়। থেকে থেকে কান খাড়া করে যা শোনবার চেষ্টা করছিলাম হঠাৎ তার আভাস পেয়ে ম্যাপের ওপর নিবিষ্টভাবে ঝুঁকে পড়লাম। একটু পরেই ভারী গলার আওয়াজ শুনতে পেলাম—একি এখানেও হের ডস্ যে।

মুখ তুলে তাকিয়ে দেখি প্যাপেন ও তাঁর দুই সঙ্গী যথাসম্ভব নিঃশব্দে আমার তাঁবুর মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে।

সারাদিন পাহাড়ের চূড়া থেকে লটবহর ও কুলির দল নিয়ে দূর থেকে তাদের আসা যে আমি লক্ষ্য করেছি, তাদের আসার জন্যেই যে এমন করে আসর সাজিয়ে বসে আছি একথা ঘুণাক্ষরে বুঝতে না দিয়ে অত্যন্ত অবাক্ হবার ভান করে বললাম,—তাই ত, সত্যিই আমাদের আবার দেখা হ'ল দেখছি।

হুঁ, কিন্তু না হলেই ভালো হত।—প্যাপেনের মুখ রীতিমত গম্ভীর।

কেন বল ত। এ পাহাড়ে সোনাদানা যা আছে তাতে আমি আর কতটুকু ভাগ বসাতে পারব। তোমাদের যত খুশি নাও না।

সোনাদানার খোঁজে আমরা আসিনি, আর তুমিও না—প্যাপেন বেশ একটু রাগের সঙ্গেই বললে,—সোনাদানার জন্যে কেউ 'গেগার কাউন্টার' সঙ্গে আনে না।

মেজের ওপর 'গেগার কাউন্টার'টা যেন সেইমাত্র চোখে পড়ল, এইভাবে বললাম,—তাই ত 'গেগার কাউন্টার'টা ভুলে সঙ্গে এনেছি দেখছি। ইউরেনিয়াম রেডিয়াম প্রভৃতি ধাতুর খোঁজে এ যন্ত্রের দরকার হয় শুনেছি।

আমার বিদ্রূপে এবার তেলেবেগুনে জ্বলে উঠে প্যাপেন বললে,—তুমি যেই খোঁজেই এসেছ আমরা জানি। কিন্তু এ সন্ধান তোমায় ছাড়তে হবে।

কেন, নাৎসী জার্মানীর হয়ে শুদ্ধু তোমরাই সে সন্ধান করবে বুঝি?

হ্যাঁ, আমরাই করব। এ পাহাড়ে যে ইউরেনিয়াম-ঠাসা পিচব্লেণ্ডের শিরা আছে এ খবর পেয়েই আমরা এসেছি। শুদ্ধু তুমি কোথা থেকে এ খবর পেলে বলতে পারছি না।

একটু হেসে বললাম,—নাৎসীদের ওপর কেউ টেক্কা দিতে পারে তা সহজে বিশ্বাস হয় না, না?

যার পায়ে কেবিনট্রাঙ্ক পড়েছিল সে-ই এবার হুংকার দিয়ে উঠল,—নাৎসীদের ওপর টেক্কা দিতে চেষ্টা করলে কি হয় এখনি হাড়ে হাড়ে বুঝিয়ে দেব।

হেসে বললাম, তার আগে একটা কথা বুঝিয়ে দিলে খুশি হতাম। নাৎসী জার্মানীর হঠাৎ ইউরেমিয়ামের ওপর অত ঝোঁক পড়ল কেন?

এবার প্যাপেনের সঙ্গী দুজন হেসে উঠল। তারপর ঘৃণাভরে বললে, তোমরা যার গোলাম সেই ইংরেজ-জাতকে তাদের দ্বীপ সমেত একেবারে নস্যি করে শূন্যে মিশিয়ে দেবার জন্যে।

প্যাপেন বাধা দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু ছোকরাদের মুখ তখন খুলে গেছে। থামায় কার সাধ্য। উত্তেজিতভাবে বলে চলল,—রেডিয়াম থেকে শুধু সামান্য দুএকটা রোগ সারাবার ছেলেখেলাই এতদিন দেখেছ, জার্মানী এবার এমন কিছু তা থেকে তৈরি করবে, দশ হাজার বজ্র যার কাছে পটকাবাজি।

সত্যিই অবাক্ হয়ে বললাম,—যে অ্যাটম-বোমা এতদিন শুধু কল্পনাতেই ছিল, নাৎসীরা তা তৈরি করবে!

হ্যাঁ, আর সেই জন্যেই এ তল্লাটে আর কোন জার্মানীর আমরা সহ্য করব না। সুবোধ ছেলের মত তোমায় ঘরে ফিরতে হবে।

যদি না ফিরি—বলার সঙ্গে সঙ্গে দুটো পিস্তল আমার দিকে উঁচু হয়ে উঠল।

পায়ে চোট খাওয়া জার্মান জোয়ান মুখ বেঁকিয়ে বললে, জন্মের ভালোর এই বেলা যদি সরে না পড় তাহলে....

তার কথা শেষ হবার আগেই প্যাপেন চমকে উঠে বললে,—ওকি। ওটা কিসের আওয়াজ!

পিস্তলের দিকে নজর থাকলেও কান আমার এই আওয়াজের জন্যেই এতক্ষণ সজাগ

হয়ে ছিল। যাক্, কুমারী শহরে গেলে আমার অতি মূল্যবান একটি বেলা নষ্ট করা কিছুই হয়নি। আমার পরলোক অনুচর নোয়ালা তার কথা রেখেছে তাহলে।

নিস্তব্ধ রাতের বুকের স্পন্দনের মত সুদূরের ঢিম ঢিম আওয়াজটা এবার স্পষ্ট শোনা গেল। প্যাপেন কাঁচা আনাড়ি লোক নয়। আফ্রিকায় এতকাল ঘুরে এ শব্দের ভাষা সে বোঝে।

সঙ্গীদের একজন কি বলতে যাচ্ছিল, তাকে ধমকে থামিয়ে অনেকক্ষণ ধরে একমনে সে একটানা সমস্ত শব্দগুলো শুনে গেল, তারপর আপনা হতেই তার চোখ আমার ওপরেই এসে পড়ল।

মুখটা যথাসম্ভব করুণ করে বললাম, আমি সত্যি দুঃখিত প্যাপেন, মনে হচ্ছে আমায় সরিয়ে দিলেও এ তল্লাটে তোমরা বেশীদিন টিঁকতে পারবে না।

প্যাপেনের মুখ তখন বেশ ফ্যাকাশে হয়ে এসেছে। গম্ভীর মুখে বললে, হ্যাঁ জংলীদের ঢাক ত তাই বলছে। কালকের মধ্যেই ওদের পক্ষে আমাদের আক্রমণ করা অসম্ভব নয়।

এত বড় বিপদের মুখে আমার কথাটা প্যাপেন ও তার সঙ্গীদের কাছে তুচ্ছ হয়ে গেল। নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করবার জন্যে তারা বেরিয়ে যাবার পর প্রাণভরে নিজের মনে এক চোট হেসে নিলাম। নোয়ালাকে দিয়ে সময় মত দূর থেকে ঢাক বাজাবার ফন্দিটা এতখানি সফল হবে কিনা সে বিষয়ে মনে একটু সন্দেহ সত্যিই ছিল।

নিজের ফন্দিতে নিজের কি সর্বনাশ ডেকে আনছি তখনও কি জানি? বুঝতে পারলাম হঠাৎ শেষরাত্রে ঘুম থেকে চমকে জেগে উঠে। প্যাপেনরা কি করেছিল জানি না, আমি কিন্তু তাদের ভড়কে দিয়ে বেশ নিশ্চিন্ত মনেই ক্যাম্প খাটে শুয়ে গভীরভাবে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ জেগে টের পেলাম জনকয়েক কালো মুস্কো জোয়ান মুখে কাপড় গুঁজে

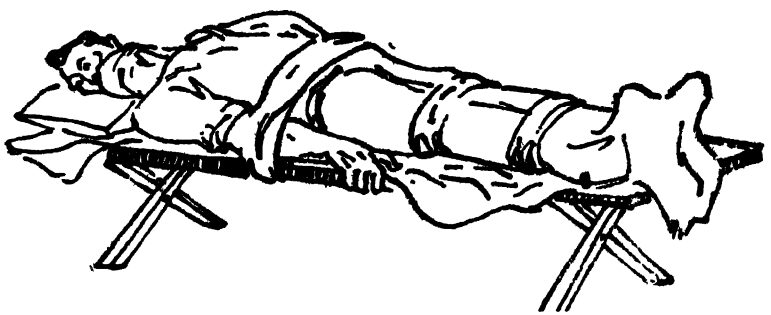

আমারই খাটের সঙ্গে শক্ত করে আমায় বাঁধছে। তাদের উত্তেজিত কথাবার্তা শুনে বুঝতে তখন আমার বাকি নেই যে আমার দুষ্ট বুদ্ধি আমারই কাল হয়েছে। প্যাপেনকে ভয় দেখিয়ে এ অঞ্চল থেকে তাড়াবার জন্যে নোয়ালাকে দিয়ে যে মিথ্যে ঢাকের বাদ্যি বাজিয়েছিলাম, প্যাপেনের কুলিরাও তা সত্যি বলে ধরে নিয়েছে। কাজি কুলিরা এ ঢাকের ভাষা বোঝে। জংলীরা যখন পরের দিন আমাদের শেষ করে দেবে-ই এবং তখন সঙ্গে থাকলে কুলিদেরও যখন মারা পড়তে হবে, তখন সময় থাকতে প্রাণ বাঁচাবার সঙ্গে উপরি লাভ তারা করে নেবে না কেন, এই হল তাদের কথা। জানাশোনা বিশ্বাসী কুলির দল এরকম অবশ্য সাধারণতঃ করে না, কিন্তু ব্যাপারটা লুকিয়ে রাখবার জন্যে প্যাপেন সম্ভবতঃ নতুন অজানা লোক ভাড়া করে এনেছিল। তাইতেই এই সর্বনাশ।

কুলিরা যেভাবে বেঁধে গেছল তাতে পরের দিন নোয়ালা এসে না খুলে দিলে ওই অবস্থাতেই হয় অনাহারে লুকিয়ে, নয় জংলীদের হাতে মরতে হত। কিন্তু নোয়ালা যে খবর

নিয়ে এল তা আরো ভয়ংকর। অবশ্য এই দুঃসংবাদ দেবার দরকার না থাকলে নোয়ালা আমার খোঁজে আসত না এবং আমারও মুক্তি হত না। নোয়ালার খবর শোনবার পর কিন্তু এ মুক্তি পাওয়া না-পাওয়া সমান কথা মনে হল। নোয়ালার মিথ্যে ঢাকের আওয়াজে শুধু কুলিরাই ভুল বোঝেনি, দূর-দূরান্তরের জংলী জাতেরাও তাতে উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। দিনের বেলা এ অঞ্চলের শুকনো লম্বা ঘাসের জংগলের ওপর দিয়ে উত্তর-পশ্চিম থেকে সারাক্ষণ প্রচণ্ড এক হাওয়া বয়। সে হাওয়ার শব্দের জন্যে আর নিজের দুঃখের চিন্তায়, এতক্ষণ যা খেয়াল করিনি এইবার কান পেতে তা শুনতে পেলাম। দক্ষিণের সমস্ত আকাশ ঢাকের আওয়াজে গমগম করছে।

কি এখন করা যায়! যতদূর বোঝা যাচ্ছে জংলীরা দল বেঁধে অনেক আগেই রওনা হয়েছে। ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই হিংস্রবন্যার মত তারা এই অধিত্যকায় এসে পৌঁছবে। এখন পালাবার কথা ভাবা বাতুলতা, অথচ কুলিরা যেভাবে সব লুট করে নিয়ে গেছে তাতে বন্দুক দূরের কথা, যুঝে মরবার মত একটা লোহার ডাণ্ডাও নেই।

এইবার প্যাপেনদের কি অবস্থা হয়েছে দেখতে গিয়ে আরো অবাক্ হলাম। কুলিরা তাদেরও সর্বস্ব লুট করে নিয়ে গেছে সত্যি কিন্তু বাঁধা পড়ে আছে শুধু একা প্যাপেন। বাঁধন খোলবার পর প্যাপেনের কাছে সব খবর পেলাম। তার সংগী দুজন একেবারে আকাট গোঁয়ার নাৎসী। ঢাকের আওয়াজের মর্ম নিয়ে প্যাপেনের সংগে তাদের ঝগড়া হয়েছে। প্যাপেন তাদের ফিরে যেতে পরামর্শ দিয়েছিল। তাতে তারা তাকে ভীরু কাপুরুষ বলে গাল দিয়ে নিজেরাই বন্দুক টর্চ ও 'গেগার কাউণ্টার' নিয়ে সেই রাত্রেই পাহাড়ের দিকে রওনা হয়ে গেছে। জংলীরা আসুক না আসুক ইউরেনিয়ামের খনির খোঁজ তারা করবেই।

ঝোড়ো হাওয়ার শব্দ ছাপিয়ে জংলীদের ঢাকের বাদ্যি আর চীৎকার ক্রমশ আরো কাছে তখন শোনা যাচ্ছে। কিন্তু জংলীদের হাতে প্রাণ যাওয়ার চেয়ে এই বিপদটাই তখন বড় মনে হল। বিহে অধিত্যকায় ইউরেনিয়াম যে কি পরিমাণ আছে তা আমি নিজেই গত কয়েক-দিনে জানতে পেরে অবাক্ হয়েছি। পিচব্লেণ্ডের সে-সব মোটা মোটা শিরার সন্ধান পাওয়া জার্মান ছোকরা দুজনের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব নয়। এত কষ্ট এত ফন্দি ফিকিরের পর এই ঐশ্বর্য শেষ পর্যন্ত তাহলে নাৎসীদের হাতেই পড়বে! না তা কিছুতেই হতে পারে না। কিন্তু জংলীদের হাতে খানিক বাদেই যার প্রাণ যেতে বসেছে তার পক্ষে কি এমন করা সম্ভব!

হঠাৎ প্যাপেনকে একটা চুরুট ধরাতে দেখে মাথার মধ্যে আমার যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। এখনো হয়ত এক ঢিলে দু পাখী অনায়াসে মারা যায়। নাৎসী ছোকরারা দক্ষিণ দিকের পাহাড়েই গেছে, জংলীরাও সেই দিক থেকে আসছে। জংলীদের হাতে তারা পড়ুক বা না পড়ুক, এক উপায়ে দুই শত্রুকেই এখন হার মানান যেতে পারে।

উত্তেজিত কণ্ঠে বললাম, শীগ্‌গির প্যাপেন শীগ্‌গির, তোমার দেশলাইটা দাও।

দেশলাই! দেশলাই কি হবে?

রেগে উঠে বললাম,—জংলীদের হাত থেকে বাঁচতে যদি চাও ত শীগ্‌গির দেশলাইটা দাও।

দেশলাই দিয়ে তুমি হাজার হাজার জংলী ঠেকাবে!—প্যাপেন যেভাবে আমার দিকে তাকাল তাতে বুঝলাম আমার মাথা নিশ্চিত বিপদের মুখে খারাপ হয়েছে বলে তার ধারণা।

এবার ধমকে উঠলাম,—দেশলাই তুমি দেবে কিনা?

প্যাপেনের কথায় কিন্তু একেবারে বসে পড়লাম। আমার মারমূর্তি দেখে সভয়ে সে বললে,—দেশলাই কোথায় পাব। মাত্র ওই একটা কাঠিই ছিল। কুলিরা কি কিছু রেখে গেছে।

সত্যিই এবার হতাশ হলাম। সামান্য একটা দেশলাই-এর কাঠির অভাবে এত বড় সুযোগটা নষ্ট হয়ে যাবে! হঠাৎ নিজের পকেটে কি একটা হাতে ঠেকল। তুলে দেখি একটা কাঁচের টুকরো। আগের দিন দূরবীন থেকে খুলে গেছল বলে পকেটে রেখে দিয়েছিলাম। কুলিরা দূরবীণটা নিয়ে গেছে, কাঁচটায় আর হাত দেয়নি।

ঘনাদা একটু থেমে সগর্বে আমাদের দিকে চেয়ে বললেন,—এই কাঁচের টুকরোর জোরেই জংলীদের হাত থেকে সে যাত্রা বেঁচে ফিরলাম, নাৎসীরাও অ্যাটম-বোমা তৈরি করবার মত ইউরেনিয়াম পেল না।

শিশির ভুরু কুঁচকে বললে,—তার মানে?

অনুকম্পার হাসি হেসে ঘনাদা বললেন,—এই সোজা ব্যাপারটা আর বুঝতে পারলে না। আগেই ত বলেছি বিহে অধিত্যকায় সারাদিন উত্তর-পূব থেকে একটা ঝোড়ো হাওয়া বয়, সমস্ত অধিত্যকাটা তার ওপর শুকনো ঘাসের জংগলে ঢাকা। এই কাঁচের ভেতর দিয়ে সূর্যের আলো ফোকাস করে সেই ঘাসে আগুন ধরিয়ে দিলাম। দেখতে দেখতে কোটি কোটি নাগ-নাগিনীর মত সে আগুন দক্ষিণ দিকে যতদূর চোখ যায় ছড়িয়ে গেল। জংলীরা আমাদের আক্রমণ করবে কি প্রাণ নিয়ে পালাতে পারলে তখন বাঁচে; আর নাৎসী ছোকরারা সে আগুনে যদি রক্ষাও পেয়ে থাকে তাহলেও ইউরেনিয়াম খোঁজবার ফুরসত আর তাদের মেলেনি।

হঠাৎ শিশিরের হাতটা টেনে নিয়ে হাত-ঘড়িটা দেখে ঘনাদা বললেন,—তাইত শিবু তোমাদের ক্লাবের অনুষ্ঠানটা ত শেষ হয়ে গেল দেখছি। আজ আর গিয়ে ত লাভ হবে না কিছু।

শিশিরের সিগারেটের টিনটা তুলে তুলে নিয়ে ঘনাদা উঠে গেলেন। আমরা থ হয়ে বসে রইলাম।

মাছ

ঘনাদা একেবারে ব্যাঘ্রঝম্প দিয়ে থালার উপর দু'বাহু মেলে ধরে হাঁ-হাঁ করে উঠলেন। রামভুজ নেহাত আমাদের মেসের অনেক পুরনো ঠাকুর তাই, নইলে আর কেউ হলে বোধ হয় গামলা-টামলা সুদ্ধ উল্টে পড়ে খাবার ঘরে একটা কেলেঙ্কারি বাধিয়ে ফেলতো।

রামভুজ ঘনাদাকে চেনে। তাই শুধু এক পা পিছিয়ে গিয়ে, বাঁ-হাতের বাটি-বসানো থালাটা চীনে ভেল্কিবাজের মত অদ্ভুত কায়দায় সামলে নিয়ে বললে,—কি হোইলো বাবু, মাছের ঝোল খাইবেন না! ভালো মাগুর মাছের ঝোল।

মাগুর মাছের ঝোল খাব আমি!—ঘনাদার কথায় মনে হোলো, হিন্দু ধর্মের সবচেয়ে নিষিদ্ধ খাদ্য যেন তাঁকে জোর ক'রে খাওয়াবার চেষ্টা করা হচ্ছে।

আসল ব্যাপারটা যে কি তা আমরা অবশ্য সবাই জানি—ঘনাদা নিজের ফাঁদে নিজেই ধরা পড়ে বেরুবার জন্যে এখন ছটফট করছেন।

দুটির দিন, আর তার ওপর গৌরের পাসের খবর বার হবার দরুন সকালবেলা সবাই মিলে ব'সে একটা খাওয়া-দাওয়ার আয়োজনের ব্যবস্থা করছিলাম। এমন সময়ে শিশিরের কাছে একটা সিগারেট ধার করতে—এ পর্যন্ত মাত্র ২৩৫৭টা তিনি ধার নিয়েছেন—ঘনাদা ঘরে ঢুকেছেন। যথারীতি সিগারেটটা ধরিয়ে চলে যাবার মুখে আমাদের ভাবগতিক দেখে বোধহয় সন্দিহান হয়ে জিজ্ঞাসা করেছেন—ব্যাপার কি হে! সকালবেলা এত ঘরুরী মিটিং কিসের?

—এই একটু ফিস্টের ব্যবস্থা করছি আজ। আপনি—

—ফিস্ট!—ঘনাদা শিবুকে কথাটা আর শেষ করতে দেননি। 'ফিস্ট' শুনলেই তাঁর ভয় হয়, পাছে কেউ তাঁর কাছে চাঁদা চেয়ে বসে! তাই অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বলেছেন, তোমাদের নিত্যি ওই এক হুজুগ। আমার বাপু পেটটা আজ তেমন ভালো নেই।

যেন অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে গৌর বলেছে—আচ্ছা, আপনার জন্যে তাহ'লে আলাদা ব্যবস্থাই করবো।

—হ্যাঁ, তাই কোরো। বলে ঘনাদা বেরিয়ে গেছেন।

সেই আলাদা ব্যবস্থার দরুন মাংসের কালিয়ার বদলে তাঁকে সত্যিই মাগুর মাছের ঝোল পরিবেশন করা হবে, ঘনাদা তখন ভাবতেই পারেননি! আপত্তিটা তাই তাঁর এত তীব্র। সব বুঝেসুঝেও শিবু কিন্তু ন্যাকা সেজে জিজ্ঞাসা করলে,—আপনিই না সকালে বললেন, পেটটা তেমন ভালো নেই, তাই তো আপনার জন্যে আলাদা ক'রে—

শিবুকে কথাটা শেষ করতে না দিয়ে ঘনাদা যেন আর্তনিনাদ ক'রে উঠলেন,—তাই বলে—মাগুর মাছ?

গৌর যেন অত্যন্ত সংকুচিত ভাবে জানালে—কেন, মাগুর মাছ তো রুগীর পাথ্যি, হাল্কা বলেই জানি।

জানো যদি তো তোমরাই খাও না! আমার অত উপকার নাই করলে।—খেঁকিয়ে উঠলেন ঘনাদা।

এবার আমাকেই কথা বলতে হলো। বেশ একটু কাঁচুমাচু মুখ ক'রে বললাম—তা হ'লে তো বড় মুশকিল হলো ঘনাদা, আমাদের জন্যে যে আবার মাংসের কালিয়া রান্না হয়েছে,—তাও আবার চর্বিওয়ালা খাসির মাংস, সে তো আপনার চলবে না!

ঘনাদা যেন অত্যন্ত অনিচ্ছা-সহকারে বললেন,—যেমন করে হোক তাই চালাতে হবে। অন্য যে-কোনো মাছ হলেও হতো, কিন্তু মাগুর মাছ প্রাণ থাকতে তো মুখে তুলতে পারবো না।

—মাগুর মাছে এত আপত্তি কেন বলুন তো? অবাক্ হয়ে জিজ্ঞাসা করলে গৌর। ঘনাদার পাতের ধারে রামভুজ তখন মাংসের কালিয়ার বাটি ধরে দিয়েছে। পর পর সে-রকম দুটি বাটি শেষ না করা পর্যন্ত ঘনাদা মুখ তুলে তাকাবার পর্যন্ত ফুরসত পেলেন না।

মাংসের পর চাটনি এবং তারপর দই ও সন্দেশ পর্যন্ত ঘনাদা যেন এক নিশ্বাসে ঘোর কান বুজে চালিয়ে গেলেন। সন্দেশের পর পান্তোয়ায় এসে তাঁর গতি একটু মন্থর হতে দেখে ভরসা পেয়ে বললাম—পেটটা আপনার সত্যিই আজ খারাপ ছিল দেখছি ঘনাদা।

আমার কথার খোঁচা যদি কিছু থাকে তা ঘনাদাকে স্পর্শই করলো না Actule angle-এ তিনি খাওয়া শুরু করেছিলেন, এখন Oblus- angle-এ পৌঁছে তাঁর শরীর মন মেজাজ শরতের আকাশের মত প্রসন্ন হয়ে গেছে।

মধুর ভাবে একটু হেসে বললেন,—সেইজন্যেই বুঝি মাগুর মাছের ব্যবস্থা করেছিলি? ভালো—ভালো! তা, তোদের আর দোষ কি বল, মাগুর মাছ যে কেন খাই না, তোরা কি করে বুঝবি!

—একটু বুঝিয়েই দিন না: সকাতর অনুনয় করলে গৌর।

ঘনাদা উদারভাবে আশ্বাস দিলেন—আচ্ছা দেবো, দেবো, এই—

প্রকাণ্ড পান্তোয়াটায় কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে যাওয়ার দরুন তাঁর শেষ কথা আর শোনা গেল না।

খাওয়া দাওয়ার পর বসবার ঘরে তাঁর মৌরসীপাট্টাওয়ালা আরাম-কেদারাটি দখল করে শিশিরের একটা সিগারেট—২৩৫৮টা হোলো—ধার নিয়ে আরাম করে ধরিয়ে ঘনাদা শুরু করলেন:

১৯২৯ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর যে চন্দ্রগ্রহণ হয়, তার কথা তোমাদের না জানাই স্বাভাবিক, কারণ সে চন্দ্রগ্রহণ বাংলাদেশে দূরে থাক, ভারতবর্ষ থেকেও দেখা যায়নি। তবে ডাঃ আলফ্রেড হিল যে কারণে ১৯৩০-এ এফ. আর. জি. এস, অর্থাৎ 'ফেলো অফ দি রয়্যাল জিওগ্র্যাফিকাল সোসাইটি' রূপে মনোনীত হয়ে সম্মানলাভ করেন....কিভু এবং এডোয়ার্ড হ্রদের মধ্যে সেই নতুন একটি নদী জন্মাবার কিছু বিবরণ তোমরাও হয়তো শুনে থাকবে।

ভূগোলের জ্ঞান আমাদের সকলেরই সমান। ওরই মধ্যে শিবু যা একটু-আধটু চর্চা করে! ঘনাদা ওই পর্যন্ত বলে চুপ করবার পর সে জিজ্ঞাসা করলে—কিভু আর এডওয়ার্ড হ্রদ কোথায় বলুন তো? আফ্রিকায় না?

—হ্যাঁ। আফ্রিকায় বেলজিয়ান কঙ্গোর একেবারে পুবে বিরুবেরেখার কিছু দক্ষিণে।

আমরা কেউই সেখানে নতুন নদী জন্মাবার কথা শুনিনি জেনে, ঘনাদা দ্বিগুণ উৎসাহ-ভরে আবার আরম্ভ করলেন :

জার্মানীর এক নামজাদা সার্কাস কোম্পানী আর স্পেনের এক চিড়িয়াখানার বায়না নিয়ে আফ্রিকার জঙ্গলে-জঙ্গলে তখন নানা জাতের অদ্ভুত দুষ্প্রাপ্য প্রাণী ধরে বেড়াচ্ছি। চিড়িয়াখানার ফরমাশ মত প্রায় সবকিছুই তখন ধরা হয়ে গেছে। জিরাফ আর জেব্রার মাঝা-মাঝি অদ্ভুত প্রাণী ওকাপি, কঙ্গোর লাল বামন মোষ, বাঘা বেড়াল, চিতা হায়না, এ সব তো আমার সঙ্গে আছেই, তাছাড়া নানা জাতের পাখি, মাছ, সাপও যোগাড় করেছি। সার্কাস কোম্পানীর ফরমাশটাই তখন হাসিল করতে বাকি। সেটা বেশ একটু শক্ত। তাদের জন্যে একটা বাচ্চা গরিলা ধরে নিয়ে যেতে হবে। গরিলা ধরা বড় সোজা কথা নয়। তার ওপর এমন দুর্ভেদ্য জঙ্গলে ও পাহাড়ে তারা লুকিয়ে থাকে যে, তাদের সন্ধান পাওয়াই মুশকিল। কঙ্গো ও ক্যামেরুনস্-এর নিবিড় জঙ্গলে প্রথমে বনমানুষদের মধ্যে সবচেয়ে বিশাল এই প্রাণীটি আবিষ্কৃত হয়। তার পরে কঙ্গোর পুবে কিভু হ্রদের কাছাকাছি পাহাড়ের প্রায় দশ হাজার ফুট উঁচু জঙ্গলে, আর এক আরো বড় জাতের গরিলার সন্ধান পাওয়া যায়। আপাততঃ সেই গরিলার আস্তানার দিকেই যাচ্ছিলাম। আফ্রিকার—বিশেষ করে কঙ্গোর জঙ্গলে চলাফেরা যে কি ব্যাপার, ভুক্তভোগী না হলে কল্পনাই করতে পারবে না। এসব জঙ্গল এমন দুর্ভেদ্য যে প্রতি পদে কুড়ুল-কাস্তে দিয়ে পথ পরিষ্কার না করলে এক পাও এগুনো যায় না। দেড় শ থেকে দু শ ফুট উঁচু বড় বড় গাছ লতায়-পাতায় আকাশ এমন ঢেকে রেখেছে যে দিনের বেলাতেও সেখানে সূর্যের আলো অতিকষ্টে চুইয়ে আসে। সেই ঘন গাছের জটলার তলায় আগাছার জঙ্গলই ১৫ ফুট উঁচু। তারই ভিতর আবার অর্চিলা ও লতানে রবার গাছের দুর্ভেদ্য জট।

যে জায়গাটায় সেদিন বিশ্রাম করবার জন্যে তাঁবু ফেলেছিলাম, সেখানে এই জঙ্গল অনেকটা হাল্কা হয়ে 'সাভানা' অর্থাৎ ঘাসের প্রান্তর শুরু হয়েছে। এই ঘাসও অবশ্য যেমন-তেমন নয়। ছ ফুট উঁচু একটা জোয়ান মানুষ তার ভেতর অনায়াসে ডুবে যায়। একটা প্রকাণ্ড বাওবাব গাছের তলায় বেশ খানিকটা জায়গা পরিষ্কার করে আমাদের আস্তানা পাতা হয়েছিল। আফ্রিকার জঙ্গলে শিকারে বেরুনোকে বলে 'সফরি'। আমাদের সফরিতে লোকজন তো বড় কম নয়। আসবাবপত্র, রসদ ও জন্তু-জানোয়ারের খাঁচা বাক্স ইত্যাদি বইবার জন্যেই একশ'জন 'কাফির'-জাতের মজুর আছে, তার ওপর আছে পাঁচজন 'মাসাই'-জাতের শিকারী।

এ অঞ্চলে সিংহের উপদ্রব খুব বেশি ব'লে আস্তানার চারদিকে চারটে আগুন জ্বালাবার ব্যবস্থা ক'রে দুজন শিকারীকে পাহারায় রেখে সবে তখন নিজের তাঁবুতে এসে শোবার বন্দোবস্ত করছি।

আমার তাঁবুতে দু-চারটে দামী পাখির খাঁচা ও মাছ-গিরগিটি ধরনের দুষ্প্রাপ্য প্রাণীর কাঁচের জারগুলো সাধারণতঃ থাকে। একটা মাছের জার কি ক'রে ভেঙে ফুটো হয়ে সমস্ত জলটা দেখলাম মাটিতে গড়িয়ে পড়েছে। মাছটা কাঁচের জারের তলায় খাবি খাচ্ছে দেখে সেটাকে অন্য একটা জারে তুলে রেখে জল ঢালছি এমন সময়ে 'জগন' এসে ঘরে ঢুকলো।

জগন আমার সবচেয়ে বিশ্বাসী অনুচর ও সমস্ত কাফির-কুলি ও মাসাই-শিকারীদের সর্দার। যেমন দৈত্যের মত তার চেহারা, সাহসও তেমনি অসীম। খাটো একটা বল্লম হাতে মানুষ-খেকো সিংহের সামনে সে নির্ভয়ে এগিয়ে যেতে পারে। চোখে দেখা যায়—এমন কোন প্রাণীকে সে গ্রাহ্যই করে না। কিন্তু তার সব সাহস শুধু দিনের বেলায়। রাত হয়েছে কি—একটা পাতা নড়লেও ভূত প্রেত জুজুর ভয়ে সে আঁতকে ওঠে। যাদের ধরা-ছোঁয়া দেখা যায় না সেই অশরীরী-জীবেরা সেই সময়েই তার মত শিকারীদের ঘাড় মটকাবার জন্যে ওৎ পেতে থাকে ব'লে তার ধারণা।

জুগনের মুখ-চোখের ভাব দেখেই বুঝলাম, রীতিমত ভয় পেয়েই সে এতরাত্রে আমার তাঁবুতে ঢুকেছে।

আবার কোন জুজু কোথায় দেখেছে ব'লে তাকে ঠাট্টা করতে যাচ্ছি, এমন সময় নিজেই একটা অদ্ভুত শব্দ শুনতে পেয়ে চমকে গেলাম।

ভাঁটার মত চোখগুলো বড়-বড ক'রে আমাব দিকে তাকিয়ে সভয়ে জুগন বললে, শুনতে পাচ্ছেন বোয়ানা ?

শুনতে তখন ভালোরকমই পেয়েছি। না, সিংহ কি ক্ষ্যাপা হাতীর ডাক নয়। অন্ধকার রাত্রির কোন সুদূর প্রান্ত থেকে সমস্ত আকাশের বুক কাঁপিয়ে অস্ফুট একটা ভয়ের স্পন্দন যেন উঠছে—গুম্ গুম্ গুম্।

একদিকে সে শব্দ শেষ না-হতে আরেক দিকে সে শব্দের অবিকল প্রতিধ্বনি শুরু হয়ে গেল। সে প্রতিধ্বনি তাবপরেই অন্য আর-এক দিক্-প্রান্ত ধরে নিতে দেরি কবলে না। এমনি করে সে শব্দ—অন্ধকাব আকাশের এককোণ থেকে আর-এক-কোণে কোন অদৃশ্য বিরাট দৈত্য যেন লোফালুফি কবছে মনে হলো।

ভালো ক'রে খানিকক্ষণ শুনে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—কিছু বুঝলে জুগন ?

জুগন সভয়ে বললে—হ্যাঁ, বোয়ানা। বলছে, দেবতার দুশমন, শয়তানকে চাই। কোন পাহাড জঙ্গল তাকে লুকিয়ে রাখতে পাববে না। তেলের কড়া তৈরী।

বললাম—ঠিকই বুঝেছো, তবে আর-একটু মন দিয়ে শোনো! বুঝবে, শুধু শয়তান নয়—বলছে, সাদা শয়তানকে চাই।

আর একবার কান পেতে জগন আমার কথায় সায় দিয়ে বললে—সাদা শয়তানই বলছে বটে বোয়ানা। কিন্তু কার কথা বলছে বুঝতে পারছি না। আমাদের নয় তো?

এবার হেসে বললাম—তোমাদের কথা তো বাদই দিলাম। কাফ্রীদের মধ্যেও আমাকে সাদা শয়তান—কানা না হ'লে কেউ বলবে না। সুতরাং আক্রোশটা যার ওপরই হোক, আমরা নির্ভয়ে থাকতে পারি।

ইতিমধ্যে ওই শব্দের অস্পষ্টতর মানে বুঝে আমায় কাফির কুলি ও 'মাসাই' শিকারীদের অনেকে সভয়ে আমার তাঁবুর সামনে এসে জড়ো হয়েছিল। তাদেরও ওই-কথাই বলে রাত্রের মত বিদায় করলাম।

মুখে ওদের অভয় দিলাম বটে, কিন্তু সারারাত দুর্ভাবনায় ভালো ক'রে ঘুমোতে পারলাম না। আফ্রিকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় যাদের আছে, এ-শব্দের অসামান্য ক্ষমতা ও ভয়ংকর মর্ম তারা ভালো করেই জানে। এ-শব্দ আফ্রিকারই অত্যাশ্চর্য নিজস্ব জিনিস। আসলে বিশেষ এক ধরনের বিরাট ঢাকের শব্দ ছাড়া এ-আর কিছু নয়। কিন্তু যে-দেশের দুর্ভেদ্য জঙ্গলে, দশ মাইল দূরের গাঁয়ের লোকেরা পরস্পরের ধারে-কাছে ঘেঁষে না ও পরস্পরের ভাষা বোঝে না, সেই দেশে এই ঢাকের শব্দের মারফত টেলিগ্রাফের মত তাড়াতাড়ি শত-শত মাইল দূর-দূরান্তরে খবর পাঠিয়ে দেওয়া যায়। এ-ঢাকের শব্দের নিজস্ব একটা ভাষা আছে। সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতের এবং ভিন্ন ভাষার লোকেরা এই ঢাকের ভাষা অনায়াসে বুঝতে পারে। এ-ঢাকের শব্দ বিলি করবার ব্যবস্থাও অদ্ভুত। এক গাঁ থেকে ঢাকের শব্দ শোনামাত্র অন্য গাঁ তৎক্ষণাৎ সে-খবর ঢাকের আওয়াজে প্রচার ক'রে দেয়। এমনি ক'রে দেখতে দেখতে বহুদূরে সে খবর ছড়িয়ে যায়। কারুর বিরুদ্ধে এ-ঢাক যদি একবার বেজে ওঠে, তা হ'লে যতদূরে পালাক, এ-ঢাকের নাগাল থেকে পরিত্রাণ পাবার আশা নেই।

বহুদিন আফ্রিকার বহু জায়গায় ঘোরার দরুন এ-ঢাকের ভাষা আমি ভালো করেই বুঝি। আপাততঃ ঢাকের খবর যা শুনলাম, তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক কিছু নেই বলেই মনে হোলো। তবু অস্বস্তিটা একবারে গেল না।

পরের দিন সকালে তাঁবু তুলে আমরা সাভানা পেরিয়ে পাহাড়ের দিকে রওনা হলাম। এই পাহাড়ের প্রায়-হাজার-দশেক ফুট উঁচুতে পৌঁছোলে গরিলার রাজ্যের সন্ধান পাওয়া যাবে ব'লে আমার বিশ্বাস। পাহাড় যেমন খাড়াই, তেমনি গভীর জঙ্গলে ঢাকা। যত ওপরেই উঠি, ঢাকের শব্দ কিন্তু আমাদের সঙ্গ ছাড়ে না। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত সে-শব্দ আমাদের পিছুতে লেগেই রইলো।

চারদিনের দিন কিভু-হ্রদের কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছলাম। আশপাশের ঘন কাঁটা-ঝোপে ভর্তি দুর্ভেদ্য জঙ্গলের চেহারা দেখে মনে হলো, গরিলাদের আস্তানা খুব দূরে নেই। সুবিধে মত একটা জায়গা দেখে সন্ধ্যের আগেই তাঁবু ফেলে এদলা একটু এদিক-ওদিক জঙ্গলটার অবস্থা বুঝতে বেরুলাম। গরিলা শিকার করা দস্তুরমত কঠিন ব্যাপার, কিন্তু জ্যান্ত গরিলা ধরা তার চেয়েও অনেক শক্ত। বড় ধাড়ী গরিলাকে জ্যান্ত ধরা তো অসম্ভব বললেই হয়। এমনিতে তারা মানুষ দেখলে গা ঢাকা দিয়ে এড়িয়েই যায়, নিজে থেকে কখনো আক্রমণ করে না। কিন্তু একবার ঘাঁটালে আর রক্ষে নেই। তখন তাদের মত হিংস্র ভয়ংকর প্রাণী পৃথিবীতে আর দেখা যায় না। একেবারে অব্যর্থভাবে গুলি না মারতে পারলে তাদের রোখা তখন অসম্ভব। শিকারীর নাগাল একবার পেলে, ঢাকের মত নিজের বুক চাপড়াতে-চাপড়াতে এসে তাকে পাঁকাটির মত মটকে ভেঙে দিতে পারে।

ধাড়ী গরিলা ধরার আশা তাই কেউ করে না। ধরতে হলে বাচ্চা গরিলাই ধরবার চেষ্টা করতে হয়। বাচ্চা গরিলাকে একা-একা পাওয়া কিন্তু শক্ত। ছোট-ছোট পরিবারে ভাগ হয়ে গরিলারা দলবদ্ধ হয়েই দিনের বেলা গাছের ফলমূল খেয়ে বেড়ায়। রাত্রে ধাড়ী গরিলা কোনো গাছের তলায় পাহারায় থাকে, আর বাচ্চা আর মেয়ে গরিলারা গাছের ওপর ডালপালা দিয়ে

তৈরী ম্যাচার মত বাসায় ঘুমোয়। কোনো রকমে কোনো বাচ্চা কোথাও একবার ছুটকে না পড়লে তাকে ধরা-ভাই কঠিন।

পরের দিন কি ভাবে কোন্ দিক্ দিয়ে গরিলা ধরবার ব্যবস্থা করবো তাই এক জায়গায় দাঁড়িয়ে ভাবছি। এমন সময় জগন হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে যা বললে তাতে আমি একেবারে থ হয়ে গেলাম।

সে নাকি আমাদেরই তাঁবু থেকে কিছু দূরে পাহাড়ের এক গুহার মধ্যে একটা গরিলাকে যেতে দেখেছে। সে গরিলাটা নাকি দেখতে কতকটা সাদা রঙের।

সাদা রঙের গরিলাই তো অসম্ভব আজগুবি ব্যাপার। তবু সন্ধ্যার আবছা-অন্ধকারে জগনের দেখবার কোনোরকম ভুল হয়েছে ভাবা যেতে পারে। কিন্তু গরিলা একা-একা গুহায় থাকে এ-রকম তো কখন শুনিনি। না, ব্যাপারটার সন্ধান নিতেই হয়।

জগনকে সঙ্গে নিয়ে সেই গুহার মুখে যখন পৌঁছলাম তখন চারিদিকে বেশ অন্ধকার হয়ে গেছে।

গুহাটা খুব বড় নয়। পাহাড়ের গায়ে একটা বড় ফাটলের মত। কিন্তু ভেতরটা একেবারে জমাট অন্ধকার। সেই অন্ধকার গুহায় গরিলার মত সাংঘাতিক প্রাণীর খোঁজে ঢোকা প্রায় আত্মহত্যা করারই সামিল।

প্রথমে তাই গুহার মুখে বারকয়েক বন্দুকের আওয়াজ করলাম। ভয় পেয়ে যদি গুহা থেকে বেরিয়ে পড়ে। তাতে কোনো ফল না পাওয়ায় একটা শুকনো কাঠ মশালের মত জেলে নিয়ে বাধ্য হয়েই ভেতরে ঢুকলাম।

ফাটলটা খানিকটা সোজা গিয়ে, ডানদিকে বেঁকে গেছে। সামনে আমি বন্দুক হাতে সন্তর্পণে এগুচ্ছি। পেছনে জগন মশাল হাতে আসছে। গরিলাটা যদি হঠাৎ ঝাঁপিয়ে আসে, গুলি অন্ততঃ একটা চালাবো। তারপর যা হয় হোক।

বাঁকটা ঘুরেই কিন্তু স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম।

এই কি জগনের গরিলা?

পেছনে পাথরের দেয়ালে আটার মত লেপ্টে সভয়ে আমাদের দিকে চেয়ে যে দাঁড়িয়ে আছে, তার রঙ সাদা এবং চেহারা বিরাট হলেও গরিলা সে নয়।

আমাদের থামতে দেখে হাতের পিস্তলটা উঁচিয়ে সে বিশুদ্ধ ইংরেজীতে বললে,—খবরদার। এক পা এগিয়েছো কি গুলি করবো।

ততক্ষণে আমি নিজেকে সামলে নিয়েছি। হেসে বললাম,—তাতে কি কেউ জখম হবে মনে করেছেন, ডাঃ হিল। আপনার তাগ যে কত তা তো আমার জানা।

অবাক্ হয়ে পিস্তল নামিয়ে ডাঃ হিল এবার এগিয়ে এসে বললেন, এ কি, দাস? তুমি এখানে?

গম্ভীর হবার ভান করে বললাম, নিয়তির টানে বোধ হয়। নইলে কোথায় দক্ষিণ-আমেরিকার ব্রেজিলের জঙ্গল, আর কোথায় আফ্রিকার কঙ্গোর সীমান্ত। পাঁচ বৎসর বাদে আচমকা এমন আশ্চর্যভাবে দেখা হবে কেন?

ডাঃ হিল কৃতজ্ঞভাবে বললেন,—হ্যাঁ, সেবারে তুমি হঠাৎ উদয় না হলে প্রাণটা সেখানে রেখে আসতে হ'ত বটে।

হেসে বললাম, আপনার বন্দুকের টিপ কি রকম সেইখানেই তো টের পাই। কুমীর মারতে গিয়ে প্রায় আমাকেই মেরে বসেছিলেন।

তা প্রায় বসেছিলাম বটে,—বলে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ডাঃ হিল বললেন, তবে এবার তোমার সঙ্গে দেখা হয়েও কোনো লাভ হলো না দাস। এবার আমায় বাঁচানো তোমার ক্ষমতার বাইরে।

আচ্ছা, আসুন তো আমার সঙ্গে, তারপর দেখা যাবে,—বলে ডাঃ হিলের হাত ধরতেই

তিনি বাধা দিয়ে বললেন,—আমায় সঙ্গে নেওয়া মানে, তোমার নিজের সমূহ বিপদ ডেকে আনা, তা তো বুঝতে পারছো?

গুহার ভেতরেও জংলীদের সুদূর ঢাকের আওয়াজ তখন শোনা যাচ্ছে। এক-মুহূর্ত চুপ করে থেকে হেসে বললাম,—গায়ে পড়ে বিপদ ডেকে আনাই যে আমার বাতিক তা কি এতদিনে বোঝেননি, ডাঃ হিল?

ডাঃ হিলকে নিজের তাঁবুতে এনে তারপর তাঁর কাছে সমস্ত কাহিনীই শুনলাম।

ডাঃ হিলকে ভূগোল-বিলাসী বললে বোধ হয় ঠিকভাবে বোঝানো যায়। জীবনে তিনি বন্দুকটা পর্যন্ত ভালো করে চালাতে শেখেননি, কিন্তু পৃথিবীর সবচেয়ে বিপজ্জনক দুর্গমতম জায়গা আবিষ্কার করা তাঁর একটা নেশা। আমাজন নদীর উৎসের কাছে পাঁচ বৎসর আগে তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয়। তাঁর ধারণা, সেবারে আমিই নাকি আমাজন নদীর বিদ্‌ঘুটে এক 'অ্যালিগেটর' কুমীরের কবল থেকে তাঁকে বাঁচাই।

ডাঃ হিলের সমস্ত কথা শুনে এবারে তাঁকে বাঁচানো এবং সেই সঙ্গে নিজেদের বাঁচবার ব্যবস্থা করা কিন্তু সত্যিই কঠিন বলে মনে হলো।

এ-ক'দিন জংলীদের যে ঢাকের খবর শুনেছি তার লক্ষ্য যে ডাঃ হিল স্বয়ং, এ-কথা বোধ হয় আর বলে দিতে হবে না।

কঙ্গোর এই অঞ্চলে ভৌগোলিক-অভিযানে এসে শুধু নিজের ভালোমানুষীর দরুন তিনি এখানকার ভয়ংকর জংলীদের বিষ-দৃষ্টিতে পড়েছেন।

এ অঞ্চলের জংলীরা এখনো সেই আদিমতম যুগে পড়ে আছে। তাদের জঙ্গলের বাইরে কোনো দুনিয়া আছে বলে তারা জানে না। ঘুরতে-ঘুরতে তাদের এক গাঁয়ে ডাঃ হিল গিয়ে পড়েন। ডাঃ হিলকে তারা প্রথম অদ্ভুত এক জাতের মানুষ ভেবে একটু সমীহই করেছিল। তাঁকে ও তাঁর লোকজনকে আশ্রয় দিয়েছিল সসম্মানে। ডাঃ হিল সেখানে পরোপকার করতে গিয়েই নিজের সর্বনাশ করলেন।

সে-গাঁয়ের সর্দার বহুদিন ধরে মাথা-ধরার রোগে ভুগছিল। গাঁয়ের ওঝা-পুরুতেরা নানারকম ঝাড়ফুঁক করে ভূত প্রেত মানত করেও তাকে ভালো করতে পারেনি। ডাঃ হিল দেখে-শুনে একটি অ্যাসপিরিন বড়ি দিয়ে একদম তাকে চাঙ্গা করে তোলেন। আর যাবে কোথায়? সর্দারের কাছে তাঁর খাতির যেমন দশগুণ বেড়ে গেল, গাঁয়ের ওঝা-পুরুতেরাও তেমনি তাঁর ওপর খাপ্পা হয়ে উঠলো হাজার গুণ। জংলীদের মধ্যে তাদের মান-ইজ্জত বজায় রাখবার জন্যে ওঝা-পুরুতেরা না করতে পারে হেন শয়তানি নেই। ভাগ্যচক্রে তাদের একটা সুবিধেও হয়ে গেল। কি একটা ছোঁয়াচে রোগে গাঁয়ের কয়েকটা গরু-বাছুর তখন মারা গেছে। ওঝারা রটিয়ে দিলে যে, ডাঃ হিলই তাঁর যাদুতে এইসব গরু-বাছুর মারছেন। প্রথমে গরু-বাছুর, তারপর মানুষ মারাই তাঁর মতলব। সর্দারকে পর্যন্ত তারা তাই বোঝালে।

বেগতিক দেখে দলবলসুদ্ধ লুকিয়ে পালাতে গিয়েই ডাঃ হিল আরো বিপদ ডেকে আনলেন। তিনি কোনো রকমে তাদের চোখ এড়িয়ে এই পাহাড়ে এসে পৌঁছলেন বটে কিন্তু তাঁর লোকজন সব কচুকাটা হয়ে গেল। এখানে পালিয়ে এসেও অবশ্য তাঁর রক্ষা আছে বলে মনে হয় না। ঢাকের খবরে চারিদিকের জংলীদের যে-ভাবে তারা জাগিয়ে তুলেছে, তাতে শেষ পর্যন্ত তাদের খপ্পর থেকে মুক্তি পাওয়া প্রায় অসম্ভব।

সে-গাঁয়ের সর্দার বহুদিন ধরে মাথা-ধরার রোগে ভুগছিল। গাঁয়ের ওঝা-পুরুতেরা ঘেরাও করে তারা এই পাহাড়ের দিকেই ক্রমশঃ এগিয়ে আসছে। এখন তাদের বেতাজাল থেকে পালাবার একমাত্র উপায় এই দুর্গম পাহাড় ডিঙিয়ে পুবদিকে টাঙ্গানাইকায় নামবার চেষ্টা করা।

মাঝ-রাত্রের পর ঢাকের আওয়াজ কিছুক্ষণের জন্যে থামতে দেখে মনে একটু আশাও

হলো। হয়তো তারা ভোরের আগে আর অগ্রসর হবে না। লোকজনকে তুলে ডাঃ হিলকে সঙ্গে নিয়ে রাতারাতি তাই রওনা হয়ে পড়লাম।

কিন্তু বেশিদূর আর যেতে হলো না। সকালবেলা কিভু-হ্রদের ধারে গিয়ে সবে পেঁাছেচি, এমন সময় সমস্ত পাহাড়-জঙ্গল যেন একসঙ্গে বজ্রের হুংকার দিয়ে উঠলো। চমকে দেখি, রঙবেরঙের বিদঘুটে উল্কি-আঁকা হাজার-হাজার জংলী, ঢাক আর বল্লম হাতে যেন ভোজ-বাজিতে মাটি ফুঁড়ে উঠে আমাদের ঘিরে ধরেছে।

তারপর যে দারুণ কাণ্ড শুরু হলো তা আর বর্ণনা করা যায় না। ওঝা-পুরুতের লম্ফ-ঝম্ফই সবচেয়ে বেশি। আমাদের পিছমোড়া করে বেঁধে আমাদেরই মালপত্রের মধ্যে ফেলে রেখে তারা যে তাণ্ডব-নৃত্য ও আস্ফালন শুরু করলো তা থেকে বুঝলাম, আমাদের সোজা-

সুদ্ধ পুড়িয়ে মারা হবে, না, ফুটন্ত কড়াই-এ সেদ্ধ করা হবে এটুকু তারা এখনো ঠিক করতে পারছে না। জংলী-কাঠের আগুনে বড় বড় কড়াই তখনই কিন্তু চাপানো হয়ে গেছে।

দুপুরের পর স্বয়ং সর্দার আসরের মাঝে দেখা দিলে। তার চোখের চেহারা ও ঘন ঘন নিজের কপাল টেপা দেখে বুঝলাম, আপাততঃ একটা অ্যাসপিরিন পেলে সে বর্তে যায়। শুধু ওঝা-পুরুতের কাছে ছোট হবার ভয়েই বোধ হয় সোজাসুজি এসে চাইতে সাহস করছে না।

জংলী হলেও সর্দার একেবারে অকৃতজ্ঞ নয়। মাথাধরা সারানোর জন্যে ডাঃ হিলের ওপর তার শ্রদ্ধাটা একটু নরমই ছিল। এগিয়ে এসে তাই ডাঃ হিলকে সে জিজ্ঞাসা করলে, কড়াই-এ সেদ্ধ হয়ে, না, সোজা আগুনে পুড়ে তিনি মরতে চান—এইটুকু বেছে নেবার সুযোগ দিয়ে সে তাঁকে অনুগ্রহ করতে চায়।

দুনিয়ায় আর সব জায়গার মত এই জংলীদের মধ্যেও ভড়ং আর চালের দামই সবচেয়ে বেশি।

পিছমোড়া অবস্থাতেই যতদূর সম্ভব ভারিক্কি চালে ডাঃ হিলের হয়ে গম্ভীর ভাবে বাণ্টু-

ভাষায় বললাম,—আমাদের সেদ্ধ করে, কি পুড়িয়ে মারার আগে তোমার একটু মাথাধরার যাদু-দাওয়াই পেলে ভালো হয় না কি?

ওঝা-পুরুতরা তৎক্ষণাৎ হাঁ-হাঁ করে উঠলো। ও যাদু-দাওয়াই সর্দার যেন কিছুতে না খায়। গোড়ায় ভালো হলে কি হবে, ও-দাওয়াই শেষে সর্বনাশা বিষ হয়ে উঠবে।

সর্দার কিন্তু একটু যেন দোমনা হয়েছে বুঝে হেসে বললাম,—এত যাদের হম্বিতম্বি, সেই তোমার ওঝা-পুরুতরাই তাহলে মাথা-ধরার একটা যাদু-দাওয়াই দিক দেখি।

সর্দার আর একটু নরম হয়েছে বুঝেই তৎক্ষণাৎ ডাঃ হিলকে দেখিয়ে বললাম,—কট ভণ্ড ওঝা-পুরুতদের কথায় কাকে তুমি ক্ষেপিয়ে তুলছো জানো! রঙ আর চেহারা দেখে বুঝতে পারছো না যে, এই জঙ্গল-পাহাড় নয়, উনি সেই আকাশের চাঁদ থেকে দয়া ক'রে এখানে নেমেছেন।

চাঁদ থেকে নেমে এসেছেন? একবার ডাঃ হিলের দিকে, একবার আকাশের দিকে চাওয়ার ধরন দেখে বুঝলাম, সর্দার বেশ কাবু হয়েছে।

ওঝা-পুরুতরাও তাই বুঝেই মরিয়া হয়ে চেঁচিয়ে উঠলো,—সব বাজে কথা! চাঁদ থেকে নেমে এসেছেন তার প্রমাণ কি?

প্রমাণ ওঁর চেহারা! দেখতে পাচ্ছো না ওঁর গায়ের রঙ!

না—ও-প্রমাণ চলবে না! আমরা অন্য প্রমাণ চাই।—ওঝা-পুরুতদের কথায় সর্দারকেও অনিচ্ছাসত্ত্বে সায় দিতে হলো।

যেন ব্যাপারটা নেহাত তুচ্ছ এমনি ভাবে বললাম,—বেশ, চাঁদ থেকেই আজ রাত্রে প্রমাণ পাবে!

আমার নিশ্চিতভাব দেখে বেশ একটু হতভম্ব হয়ে জংলীরা নিজেদের মধ্যে গিয়ে জটলা শুরু করার পর ডাঃ হিল হতাশভাবে বললেন,—এটা কি করলে দাস! যদি-বা শুধু পুড়িয়ে মারতো, এখন যে গায়ের ছাল জ্যান্ত ছাড়িয়ে নেবে! চাঁদের ধাপ্পাটা কেন মিছে দিতে গেলে।

হেসে বললাম—আপনার কোন ভয় নেই। চাঁদের প্রমাণ আমি সত্যি দেবো দেখবেন।

হতাশভাবে আমার দিকে চেয়ে তিনি বললেন,—না, ভয় ভাবনায় তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে দেখছি। চাঁদের আবার কি প্রমাণ হতে পারে!

আজ কি তারিখ আপনার মনে নেই, নইলে প্রমাণটা বুঝতে পারতেন।

ডাঃ হিল খানিক বিমূঢ় হয়ে থেকে হঠাৎ প্রায় লাফিয়ে উঠে বললেন,—ওঃ ভুলেই গেছলাম! আজ তো এখানে চন্দ্রগ্রহণ দেখা যাবে!

হেসে বললাম,—হ্যাঁ, ওর চেয়ে বড় প্রমাণ আর কি হতে পারে!

কিন্তু ভাগ্য যে তখনো আমাদের ওপর অত বিরূপ তা কি ক'রে জানবো।

সন্ধ্যে হতে না হতেই কোথা থেকে রাশি রাশি মেঘ এসে আকাশ ছেয়ে ফেলতে লাগলো। ওঝা-পুরুতদের আস্ফালন তখন দেখে কে! তাই নিজেদের ভেল্‌কিতে মেঘ আকাশে তুলছে বলে সর্দারকে তখন বোঝাচ্ছে।

অগ্নিমূর্তি হয়ে সর্দার আমাদের কাছে এসে এবার বললে,—কই, কোথায় তোমাদের চাঁদের প্রমাণ—দেখাও!

ভেতরে ভেতরে নাড়ি তখন প্রায় ছাড়বার উপক্রম, তবু বাইরে বেপরোয়া সাহস দেখিয়ে বললাম,—তোমার ওঝা-পুরুতদের কিছু ক্ষমতা আছে মানছি, কিন্তু চাঁদের মানুষের তেজ যে কত বেশি, আর একটু বাদেই টের পাবে!

আমাদের সামনে একটা আধ-পোড়া মশাল মাটিতে পুঁতে দিয়ে সর্দার বললে—বেশ, এই মশাল যতক্ষণ না নেভে ততক্ষণ তোমাদের সময় দিলাম। তারপর জ্যান্ত তোমাদের কলিজা কেটে বার করবো।

তাই কোরো। বলে বেশ জোরে জোরেই হাসলাম। মনে মনে তখন জপছি,—হে আকাশের দেবতা, দয়া ক'রে একটা ঝড় তুলে মেঘগুলোকে তাড়াও। নইলে আর যে রক্ষা নেই।

আকাশের দেবতার দয়া করার কোনো লক্ষণ কিন্তু দেখা গেল না। মেঘগুলো যেন আরো গাঢ় হয়েই জমতে শুরু করলো।

মশালটা প্রায় তখন শেষ হয়ে এসেছে। সেই দিকেই চেয়ে ইষ্টনাম স্মরণ করবার চেষ্টা করছি, এমন সময় ছলাৎ ক'রে একটা শব্দ শুনে ফিরে দেখি, কাঁচের জারের মধ্যে রাখা একটা মাছ কি-রকম যেন ছটফট করছে।

ডাঃ হিল নিজের ভাগ্য তখন বোধ হয় মেনে নিয়েছেন। একটু দুঃখের হাসি হেসে বললেন,—মাছটাও আমাদের পরিণাম বোধ হয় বুঝতে পেরেছে।

কয়েক মুহূর্ত মাছটার দিকে চেয়ে হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে বলে উঠলাম,—না, ডাঃ হিল, আর ভয় নেই। মাছটা আমাদের পরম বন্ধু, আমাদের উদ্ধারের পথই বাতলাচ্ছে।

তারপরে উঠে দাঁড়িয়ে চীৎকার ক'রে ডাকলাম,—কোথায় সর্দার! কোথায় সব ওঝা-পুরুত, চাঁদের মানুষের তেজটা একবার দেখে যাও।

সবাই অবাক্ হয়েই কাছে ছুটে এলো।

উচ্চৈঃস্বরে হেসে বললাম,—সামান্য একটা মেঘ দিয়ে আকাশ ঢেকে তোমার ওঝা-পুরুতেরা বাহাদুরী নিচ্ছিলো সর্দার। চাঁদের মানুষ এবার এই পাহাড়-জঙ্গল দুলিয়ে দিচ্ছে দেখ।

ওঝারা চেঁচিয়ে উঠলো—সব মিথ্যে কথা! সব ধাপ্পা!

জংলীরা ক্ষেপে আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আর কি! এমন সময় মাটির তলা থেকে অদ্ভুত একটা প্রচণ্ড গোঙানির শব্দ যেন শোনা গেল। পরমুহূর্তে সমস্ত পাহাড়টা ঢেউ-এর মাথায় নৌকার মত দুলে উঠলো আর সেই কিভু-হ্রদের জল লাফ দিয়ে তীর ছাপিয়ে উপচে পড়লো বিশাল স্রোত হয়ে।

সেই প্রচণ্ড ভূমিকম্পে ভয়ে দিশাহারা হয়ে জংলীরা কে যে কোথায় পালালো ঠিক নেই। ভূমিকম্প যখন থামলো তখন দেখি, আমরাই শুধু আমাদের মালপত্রের মধ্যে প্রায় বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছি, আর কিভু-হ্রদের এক পাড় ভেঙে দুরন্ত এক নদীর স্রোত নিচে বয়ে যাচ্ছে।

ঘনাদা গল্প শেষ করে থামবার পর শিবু জিজ্ঞাসা করলে,—ওই মাছের ছট্‌ফটানি দেখেই ভূমিকম্পের কথা টের পেলেন নাকি? কি মাছ সেটা?

ওদেশের একরকম মাগুর মাছ। গম্ভীরভাবে বললেন ঘনাদা,—ইংরেজীতে বলে cat fish জাপানে থাকতে ও-মাছের ক্ষমতার কথা জেনেছিলাম। জাপানে তো ভূমিকম্প নিত্য লেগেই আছে। সেখানকার বৈজ্ঞানিকেরা লক্ষ্য ক'রে দেখেছেন, ভূমিকম্পের ঠিক আগে মাগুর-জাতের মাছ কি ক'রে যেন তা টের পেয়ে অদ্ভুতভাবে ছট্‌ফট করে। অনেকে সেখানে তাই ভূমিকম্প আগে থাকতে ধরবার জন্যে মাগুর মাছ পোষে।

একটু থেমে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঘনাদা বললেন,—যার জন্যে সেবার প্রাণ ফিরে পেলাম, সে মাছ আর কি ক'রে খাই বলো।

টুপি

'চু মদ লান্ মি।'

'উঁহুঃ! চো মো লঙ্ মা!'

'নাহে না। আসলে ওটা 'জা মো লাং মা।'

'তার চেয়ে বল না,—কাং তন তিং, কিম্বা শেরিং চেড়ংগা পোতাং-ও বলতে পার।'

বাহাত্তর নম্বর বনমালী নস্কর লেনের মেসের ব্যাসিল্লারা হঠাৎ ক্ষেপে গেছে বলে এ থেকে যদি কারুর ধারণা হয়, তাহলে খুব দোষ দেওয়া যায় না।

ব্যাপারটা কিন্তু তা নয়। এ সব অনুস্বার, বিসর্গ মেশানো কিচিরমিচিরের আসল লক্ষ্য হ'লেন ঘনাদা।

ঘনাদা আজ দুদিন হ'ল আমাদের সঙ্গে বাক্যালাপ বন্ধ করেছেন। তার যথেষ্ট কারণও অবশ্য বর্তমান।

দু'দিন আগে ঘনাদা যথারীতি মেসের বসবার ঘরের সবচেয়ে লোভনীয় আরাম-কেদারাটি দখল করে বসে খবরের কাগজে চক্ষু নিবদ্ধ করে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে শিশিরের দিকে ডান হাতটি নিঃশব্দে বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। তর্জনি ও মধ্যমা অঙ্গুলটি তাতে এমন করে ফাঁক করে ধরা যে, তা থেকেই তাঁর ইঙ্গিতটুকু পরিস্ফুট।

শিশির সে ইঙ্গিত অমান্য করেনি। অবিলম্বে একটি সিগারেট সেই আঙুলের মধ্যে গুঁজে দিয়ে সেটি জ্বালবার পরিশ্রমটুকু থেকেও ঘনাদাকে বাঁচাবার জন্যে দেশলাই-এর কাঠি জ্বেলে ধরেছিল।

অপরাধের মধ্যে সে শুধু সেইসঙ্গে মুখ টিপে আমাদের দিকে একটু হেসে বলেছিল, 'তিন হাজার দু'শ তেইশটা হ'ল ঘনাদা।'

ঘনাদা শিশিরের হাসিটুকু দেখতে পাননি, কিন্তু তৎক্ষণাৎ যেন বিছুটি গায়ে লেগেছে এমনিভাবে খবরের কাগজ থেকে মুখ তুলে উঠে বসেছিলেন।

'কি রকম!'

প্রথমটা আমরা সবাই একটু হকচকিয়ে গেছলাম। ঘনাদার হঠাৎ হ'ল কি?

গৌরই সকলের আগে ব্যাপারটা বুঝে হাসি চেপে বলেছিল, 'গোণায় কিছু ভুল হয়েছে বুঝি!'

'ভুল হয়েছে, মানে?'—ঠাকিয়ে যেন আমরা তাঁর সর্বনাশ করে ফেলছি, ঘনাদা এইভাবে বলেছিলেন, 'একেবারে চার-চারটে বাড়িয়ে বলা।'

অন্যদিন হলে শিশির তৎক্ষণাৎ সায় দিয়ে হ্যাঙগাম চুকিয়ে দিত। কিন্তু সেদিন সেও কেমন বেয়াড়া জেদ ধরে বসেছিল, 'না ঘনাদা, ও তিন হাজার দু'শ তেইশ-ই হবে।'

'না, তিন হাজার দু'শ ঊনিশ!'—ঘনাদা প্রবল প্রতিবাদ করে জানিয়েছিলেন।

শিশির তবু নাছোড়বান্দা। মাথা নেড়ে বলেছিল, 'না, আপনি যাই বলুন, ও দু'শ তেইশ; আমার গণতে ভুল হয় না।'

'গণতে ভুল তাহলে আমারই হয়েছে বলতে চাও!' ঘনাদা গরম হয়ে উঠেছিলেন, 'বেশ গণতেই যখন জানি না, তখন তোমার সিগারেট আমার না খাওয়াই ভালো।'

ঘনাদা হঠাৎ আরাম-কেদারা থেকে উঠে ঘর থেকেই বেরিয়ে গেছলেন। অবশ্য সিগারেটটি হাতে নিয়েই।

সেই থেকে তিনি যে আমাদের সঙ্গে বাক্যালাপ বন্ধ করেছেন, তাঁর অভিমান তারপর আর ভাঙানই যায়নি।

এদিকে আমাদের দিন কাটান দায় হয়ে উঠেছে। এবারের বর্ষা একটু বিলম্বে দেখা দিয়ে শেষের দিকে একেবারে সদলবলে ঝাঁপিয়ে নিচ্ছে। ফুটবলের রথী-মহারথীরা সব হেলমিঙ্কিতে কি রাজ্য জয় করতে গেছেন, তাঁরাই জানেন। ওদিকে খেলার মাঠে যেতে মন চায় না, এদিকে আমাদের বর্ষার সন্ধ্যাগুলো মাঠেই মারা যাচ্ছে।

ঘনাদাকে অনেকরকম ঘুষ দিয়ে দলে ভেড়াবার চেষ্টা এ দু'দিন করা হয়েছে। প্রথম দিন পাড়ার বিখ্যাত তেলেভাজার দোকান থেকে ফুলুরি বেগুনি ভাজিয়ে এনে ওপরের বসবার ঘরে একেবারে থালাসুদ্ধ সাজিয়ে নিয়ে বসেছিলাম, ঘনাদা যদি গন্ধে এসে বসেন।

ঘনাদা তাঁর ওপরের ঘর থেকে নেমে এলেন ঠিকই, কিন্তু তারপর মাত্র দু' সেকেণ্ড আমাদের আড্ডা-ঘরের দরজায় দ্বিধাভরে দাঁড়িয়ে আবার নিচে চলে গেলেন।

দ্বিতীয় দিন ঘনাদার জন্যে আস্ত একটা সিগারেটের টিন শিশির টেবিলের ওপর রেখে দিয়েছে। সেই সঙ্গে পাড়ের রেস্তোরাঁ থেকে চিংড়িমাছের কাটলেট।

এদিন চৌকাঠ থেকে চলে না গিয়ে ঘনাদা ঘরের ভেতর এসে বসেছেন, কিন্তু আমরা যে ঘরে আছি, তা যেন তিনি দেখতেই পাননি।

শিশির অন্যমনস্কভাবে সিগারেটের টিনটা তাঁর দিকে বাড়িয়ে ধরতেই কিন্তু সব মাটি হয়ে গেছে। সিগারেটের বদলে শিশিরকেই যেন জ্বলন্ত চোখের দৃষ্টিতে ভস্ম করে ঘনাদা উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে গেছেন।

আজ তিনদিনের দিন আমরা একেবারে তাই নতুন প্যাঁচ কষেছি।

আজ টেবিলের ওপর ফুলুরি, বেগুনি বা কাটলেট নয়, গরম হিঙের কচুরি একগাদা সাজান আছে, সেই সঙ্গে সিগারেটের টিনও বটে। কিন্তু ওগুলো আসল টোপ নয়, চার মাত্র।

আসল টোপ হ'ল আমাদের এই কিচির-মিচির, এবং সেই টোপেই ঘনাদাকে গাঁথা গেল শেষ পর্যন্ত।

গৌর, শিশির ও আমার চালিয়াতি পর্যন্ত ঘনাদা কোনরকমে সহ্য করছিলেন, শিবুর 'শেরিং চেড়াংগা পোতাং' শুনে একেবারে চিড়বিড়িয়ে উঠে আর থাকতে পারলেন না!

'চো—মো—হিয়ান মি!'—ঘনাদা ক্ষ্যাপা ঘোড়ার মত ঘর কাঁপিয়ে যেন চিঁহি চিঁহি ডাক ছাড়লেন।

ঠিকমত টোপ দিয়ে ঘনাদাকে গাঁথতে পেরে আমরা যেমন খুশি তেমনি বেশ একটু হতভম্বও হলাম।

ঘনাদার মান ভাঙানর সঙ্গে সত্যি কথা বলতে গেলে তাঁকে একটু জব্দ করার ইচ্ছেও আমাদের ছিল। যত বড় সবজান্তা হবার ভানই করুন, আমাদের ও কিচির-মিচিরের মর্ম বোঝা ঘনাদার পক্ষেও সম্ভব নয় বলে আমরা মনে করেছিলাম।

সত্যি কথা বলতে কি গত দু'দিন ধরে শিবু আর গৌর একরাশি পুঁথি পত্র বই কাগজ ঘেঁটে ওই সব উদ্ভট আজগুবি আওয়াজ জড় করেছে।

এত করেও ঘনাদার ওপর টেক্কা দেওয়া কিন্তু গেল না।

'চো—মো—হিয়ান মি!' বলে, চিঁহি ডাক ছেড়ে ঘনাদা তিনদিন বাদে তাঁর নিজস্ব আরাম-কেদারায় এসে বসে মুখ বেঁকিয়ে বললেন, 'চালবাজি ত করছ, মানে জান এসব কথার?'

আমরা যতখানি সম্ভব বেকুবের মত তাঁর দিকে নীরবে তাকিয়ে রইলাম।

তিনি ততক্ষণে থালার হিঙের কচুরির দিকে মনোনিবেশ করেছেন। পুরো থালাটাই প্রায় সাবাড় করে সিগারেটের টিনটার দিকে হাত বাড়িয়ে তিনি হঠাৎ থেমে ভুরু কুঁচকে শিশিরের দিকে তাকালেন।

'আমারই ভুল হয়েছিল ঘনাদা',—শিশির তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'তিন হাজার দু'শ উনিশই হ'বে।'

'না, তিন হাজার দু'শ কুড়ি।' বলে শিশিরের ভুল শুধরে ঘনাদা সিগারেট ধরালেন। তারপর আগেকার প্রশ্ন আবার তুলে বললেন,—'বল দেখি কথাগুলোর মানে কি?'

এবার চুপ করে থাকলে আর চলে না। গৌর তাই আমতা আমতা করে বললে,—'ও সব হল মাউণ্ট এভারেস্টের নাম।'

'হ্যাঁ, নাম ত বটে, কিন্তু ও সব নামের মানে কি, আর কোন্ নামটা ঠিক?—ঘনাদা অবজ্ঞাভরে আমাদের দিকে চাইলেন। আমাদের মুখে আর কথা নেই দেখে ঘনাদাই আবার করুণার দৃষ্টিতে আমাদের ওপর চোখ বুলিয়ে শুরু করলেন,—

'কথাগুলো যা আওড়াচ্ছিলে, সবই হ'ল মাউণ্ট এভারেস্টের তিব্বতী নাম। চো সো লঙ্ মা মানে হ'ল লঙ্ মা দেবী। লঙ্ মা বলে কোন শব্দের অর্থ কিন্তু হয় না। লঙ্ বলতে অবশ্য দেশ বোঝায়। জা সো লাং মা মানে হ'ল একসঙ্গে পক্ষিণী-দেবী আর গো-দেবী। কাং তন্ তিং মানে হ'ল ঊর্ধ্ব-লোকের নীল তুষার। নামটায় কবিত্ব আছে, কিন্তু এটা বা শেরিং চেড়াংগা পোতাং অর্থাৎ অমর পঞ্চ দেবীর প্রাসাদও আসল নাম নয়। পৃথিবীর সর্বোচ্চ চূড়ার আসল তিব্বতী নাম হ'ল, চো মো হিয়ান মি অর্থাৎ 'বিশ্বজননীর পাত সলিল।' চীনারা তিব্বতের রাজধানী লাসা অধিকার করার পর এই তিব্বতী নামটিই চাল করেছে। ভুল করে অনেকে এটা অবশ্য চু মু লান্ মি বলে বানান করে।

বলা বাহুল্য আমরা এতক্ষণ হাঁ করে ঘনাদার দিকে চেয়ে ছিলাম। গৌরই প্রথম যেন সামলে উঠে জিজ্ঞাসা করলে 'আপনি তিব্বতী ভাষা জানেন নাকি?'

আইনস্টাইনকে যেন গুণ-ভাগ জানেন কি না জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, ঘনাদা এমনি একটু অনুকম্পার হাসি হাসলেন।

শিবু হঠাৎ অন্য প্রসঙ্গ তুলে বললে,—'কিন্তু নাম যাই দিক, মাউণ্ট এভারেস্টে চড়া আর মানুষের সাধ্যে কুলোল না। সুইসরাও ত হার মেনে ফিরে এল।'

'হ্যাঁ!' ঘনাদা অবজ্ঞাভরে বললেন,—'রুন-এর শেকড় ত আর চেনে না।'

'রুন-এর শেকড় মানে?'—আমাদের চোখ কপালে উঠেছে তখন।

'রুন-এর শেকড় চিনলে কি হ'ত?'—অবাক্ হয়ে আমরা আবার জিজ্ঞাসা না করে পারলাম না।

'কি আর হ'ত! টুপিটা তাহলে ফিরিয়ে আনতে পারত!'—ঘনাদা তাচ্ছিল্যের সঙ্গে কথাটা বলে ওঠবার উপক্রম করলেন।

রুন-এর শেকড় আর টুপিতে মিলে আমাদের মাথা তখন ঝিমঝিম করছে, তবু একরকম জোর করেই চারজনে তাঁকে ধরে বসিয়ে দিলাম।

ঘনাদা যেন নেহাত নিরুপায় হয়ে অনিচ্ছার সঙ্গে শুরু করলেন,—

ঘরে

ছবি

'ডাঃ তানাকার নাম তোমরা বোধ হয় শোননি। অত বড় পণ্ডিত-পর্যটক সোয়েন হেডিন এর পর কমই দেখা গেছে। ইউরোপ-আমেরিকার লোক হলে তাঁর নাম অনেক বেশি ছড়িয়ে পড়ত। এসিয়ার লোক বলেই তাঁর নাম অনেকে এখনো জানে না। অনেক কাল আগে সেই বৃটিশ আমলে তিব্বতে যাবার নতুন একটা পথ, যাকে বলে 'গিরিবর্ত্ম', খুঁজে বার করবার জন্যে বেরিয়ে 'থিয়াং বোচ' মঠে সেবার তিনি ক'দিনের জন্যে বিশ্রাম করেছিলেন। নেপালের উত্তরে 'নামচে'। সেখান থেকে 'থিয়াং বোচ' আসতে হলে প্রথমে দু'কোশি নদীর ওপরকার খাড়া পাহাড়ের গায়ে দু'হাজার ফুট উঁচু দুর্গম পথ পার হতে হয়। সে পথ ছাড়িয়ে গিয়ে আবার দু'কোশিতে নেমে যায়। সেখানে কাঠের একটা নড়বড়ে পোল পার হলে—সামনের একটি দু'হাজার ফুট উঁচু চূড়ার মাথায় 'থিয়াং বোচ' মঠ দেখা যায়।

ভারতবর্ষের দিকে এর চেয়ে উঁচু বৌদ্ধ মঠ আর নেই। তিব্বতে যাওয়া-আসার পথে এ মঠের বৌদ্ধ মোহান্তদের সঙ্গে তানাকার বেশ আলাপ হয়ে গেছল। এবারে অন্তর্ধানটা তাই ভালোই হ'ল। মোহান্তদের অনুরোধে দু'দিনের জায়গায় প্রায় পাঁচ দিন কাটিয়ে

দেবার পর হঠাৎ একদিন সকালবেলা একজন ছোট-মোহান্তকে দেখে তিনি অবাক্ হয়ে গেলেন। এ লোকটির সঙ্গে এ ক'দিন তাঁর বিশেষ দেখাশোনাই হয়নি। শুনলেন—তিব্বতের পাঞ্চেন লামার চিঠি নিয়ে তিনি 'থিয়াং বোচি' মঠের প্রাচীন তিব্বতী ধর্মগ্রন্থগুলির তালিকা করতে এসেছেন। লোকটির যা পরিচয় পাওয়া গেল, তাতে তাঁর সঙ্গে তানাকার কোনদিন দেখাশোনা হওয়া অসম্ভব। তবু মনের খট্‌কা তাঁর গেল না। কেন জানি না তাঁর মনে হ'ল তাঁর অত্যন্ত চেনা কোন একজনের সঙ্গে এই মোহান্তর অত্যন্ত মিল আছে। সঠিক পরিচয়টা তবু কিছুতেই মনে আনতে পারলেন না।

তানাকার সন্দেহ যে অমূলক নয়, তার পরের দিন সকালেই তার প্রমাণ পাওয়া গেল। খোদ মোহান্ত ঘুম ভাঙতে না ভাঙতেই তাঁর ঘরে এসে হাজির। তাঁদের মঠের নাকি সর্বনাশ হয়ে গেছে। পাঞ্চেন লামার চিঠি নিয়ে যে লোকটি এসেছিল, সে নাকি জাল। গত রাত্রে 'থিয়াং বোচি' মঠের অত্যন্ত মূল্যবান ক'টি পুরনো তিব্বতী পুঁথি নিয়ে সে নাকি সরে পড়েছে।

খোদ মোহান্তর কথা শুনে তানাকা বুঝলেন, তিনি ঠিক না চিনলেও জাল মোহান্ত তাঁকে ঠিক চিনেছিল এবং সেই জন্যেই ধরা পড়বার ভয়ে সে নিজে থেকেই আগে পালিয়েছে।

কিন্তু পালিয়ে সে যাবে কোথায়। এখান থেকে নেপালের দিকে যাবার একটিমাত্র সংকীর্ণ পথ। সে পথে এখনকার যে-কোন 'শেরপা' জোয়ান একদিনে তাকে ধরে ফেলবে। আর [illegible] নুপৎসে ও লোৎসে এই দুই চূড়ার মাঝখানে বিরাট পঁচিশ হাজার ফুট পাহাড়ের সেখানে যেন মাউণ্ট এভারেস্টের চূড়া আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছে। সেদিকে [illegible] আত্মহত্যা ছাড়া আর কিছু নয়।

খোদ মোহান্তকে সেই আশ্বাসই দিয়ে তানাকা বললেন যে, দক্ষিণে নামচে দু'জন 'শেরপা' জোয়ান তিনি যেন পাঠিয়ে দেন। উত্তর দিকে তিনি নি[illegible] পথের সন্ধানে। সেদিকে যাওয়ার দুর্বুদ্ধি যদি তার হয়ে থাকে, জীবন্ত [illegible] অবস্থায় তার কাছ থেকে সমস্ত পুঁথি তিনি উদ্ধার করবেনই।

খোদ মোহান্ত তানাকার কথায় কিছু আশ্বস্ত হলেন। ধর্মচক্র ঘুরিয়ে নিয়ে সেই দিনই দুপুরের আগে চারজন 'শেরপা' কুলি নিয়ে তানাকা বেরিয়ে [illegible]

থিয়াং বোচি থেকে উত্তরে যাবার একটিমাত্র পথ দেবদারু, সরল ও ভুজ[illegible] ভেতর দিয়ে প্রথমে ইমজাখোলা নদীর ধারে নেমে গিয়েছে। ইমজাখোলা যেখানে জুনিপার গাছের ঝোপের ওপর দিয়ে পাগলাঝোরা হয়ে নিচের অতল গহ্বরে ঝাঁপি[illegible] তার একটু আগে দড়ির পোল দিয়ে তানাকা এই দুরন্ত নদী পার হলেন। সেখান থে[illegible] বোচি পর্যন্ত ওঠবার পরই বড় গাছপালা শেষ হয়ে শুধু মোটা পাহাড়ী ঘাসের প্রান্তর শুরু, সে প্রান্তরেও মানুষের সীমানা—ফারিচে গাঁয়ে এসে শেষ। তারপর চিরতুষারের দেশ, লোৎসে ও নুপৎসের মত বিরাট সব গিরিচূড়া মাউণ্ট এভারেস্টকে ঘিরে যেখানে অলঙ্ঘ্য নিষেধের প্রাচীর তুলে দাঁড়িয়ে আছে। এখানে মানুষের পদচিহ্ন কালেভদ্রে যদি বা কখনও পড়ে, তাও বেশীদূর পর্যন্ত পৌঁছোয় না।

যে ফারিচে গাঁয়ের কথা আগে বলেছি, তাকে গাঁ ঠিক বলা উচিত নয়। ও অঞ্চলের চমরী গাই যারা চরায়, সেই রাখালদের এটা একটা অস্থায়ী আস্তানা। শরৎকালে চমরী গাই চরিয়ে শীতের আগেই তারা এখান থেকে নেমে যায়। তারপর পাথর-কাঠ দিয়ে তৈরী ক'টা পরিত্যক্ত কুঁড়ে শুধু পড়ে থাকে।

তানাকা ফারিচে গাঁয়ে যখন এসে পৌঁছোলেন, তখন সেখানে জনমানব নেই। শীত এবার একটু তাড়াতাড়ি পড়েছে। রাখালরা তাই তাদের চমরী গরু-বলদ নিয়ে আগেই নেমে গেছে।

ফারিচে গাঁয়ে এসে মনে হ'ল পুঁথিচোর জাল মোহান্তকে ধরা বোধ হয় খুব শক্ত হবে না। এখান থেকে উত্তরে ছাড়া আর কোনদিকে তার যাওয়া অসম্ভব। অথচ উত্তরে যাওয়া

মারাত্মক পাগলামি ছাড়া আর কিছু নয়। সেখান থেকে তিব্বতের দিকে যাওয়ার কোন 'পাস্' বা গিরিপথ যদি থাকেও, তা অত্যন্ত দুর্গম হতে বাধ্য। তা ছাড়া এদেশের সবচেয়ে সাহসী ও ঝানু 'শেরপা' জোয়ানদের পক্ষেও একলা সে-পথ খুঁজে বার করা সম্ভব নয়।

ফারিচে গ্রাম ছাড়িয়ে পরের দিন তানাকা 'লবুজ্যা খোলায়' গিয়ে পড়লেন। এই উপত্যকা দিয়েই খুম্বু 'গ্লেসিয়ার' বা হিমবাহ নেমে এসেছে। লবুজ্যা খোলা উপত্যকার একটু ওপরে উঠতেই পুমোরি, লোলা, লিঙ্‌ট্রেন প্রভৃতি মাঝারি চূড়ার সঙ্গে মাউণ্ট এভারেস্টের পশ্চিম ঢাল দেখা গেল। ওদিকে নুপৎসে লোৎসে আর এদিকে এই সব চূড়া যেন পারিষদবর্গের মত মহা-মহিম সম্রাট্ এভারেস্টকে ঘিরে আছে। পারিষদেরাও কেউকেটা নয়। বিশ থেকে আটাশ হাজার ফুট তাদের উচ্চতা।

লবুজ্যা খোলায় এসেও জাল মেহান্তের খোঁজ না পেয়ে তানাকা একটু অবাক্ হলেন। তাঁর সমস্ত অনুমানই কি তাহলে ভুল? সন্ধ্যের দিকে সেদিন দারুণ তুষার-ঝড় উঠল। চারজন শেরপা কুলি একটি তাঁবুতে আর একটিতে তানাকা একলা। সমস্ত রাত প্রায় জেগেই কাটালেন। ঝড়ে তাঁবু উড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার ভয় যথেষ্ট, কিন্তু তখন তাঁর মনে আর এক ভাবনা তার চেয়ে বেশী প্রবল।

মাঝ-রাত্রে তুষার-ঝড় থেমে গেল। সামান্য ঘণ্টা দু'য়েক ঘুমিয়ে ভোর হতে না হতেই জ করে বন্দুক আর দূরবীন হাতে তানাকা বেরিয়ে পড়লেন।

কুলিরা তখনও বোধ হয় অঘোরে ঘুমোচ্ছে। তাদের তাঁবুর চারিধারে নরম একটা তুষার-চিতার পায়ের দাগ তাঁর চোখে পড়ল। তুষার-চিতাটা অচেনা জিনিস গোঁকাশুঁকি করে নিচের দিকে নেমে গেছে।

তাঁবু থেকে আধ মাইলটাক এগিয়ে যাবার পর তিনি তুষারের ওপর আবার এক দেখে কিন্তু একেবারে অবাক্ হয়ে গেলেন। উপত্যকার একদিকের পাহাড়ের সে পদচিহ্ন তুষার-নদী পেরিয়ে আর একদিকে চলে গেছে।

প্রাণীর পায়ের দাগ তা কিন্তু নয়, মানুষের মতই দু'পায়ে হাঁটা কোন পায়ের অতবড় প্রকাণ্ড মাপ কোন মানুষের হওয়া ত অসম্ভব। তাছাড়া এই তুষারের দেশে, খালি পায়ে হাঁটবার মত মানুষ কে থাকতে পারে!

কটা কথা মনে পড়ায় তানাকা উত্তেজনার আনন্দে অধীর হয়ে উঠলেন। সব কিছু পায়ের দাগ অনুসরণ করলেন এবার। তুষারনদীর ওপর দিয়ে হাঁটা খুব সহজ ও নয়। কোথাও কোমর পর্যন্ত নরম তুষারে ডুবে যায়, কোথাও বিরাট তুষারের খাদ হাঁ আছে, অতি সাবধানে তার ধার দিয়ে পার হতে হয়। পায়ের দাগ অনুসরণ করতে গিয়ে কিন্তু বুঝলেন, যাকে অনুসরণ করছেন, এ তুষার-রাজ্যের কায়দা-কানুন তাঁর চেয়েও তার অনেক বেশী জানা। অনায়াসে দুর্গম বিপজ্জনক সমস্ত জায়গা কখনো লাফ দিয়ে, কখনো পাশ কাটিয়ে সে পার হয়ে গেছে।

কিছুদূর গিয়ে সে-পদচিহ্ন আর কিন্তু অনুসরণ করতে পারা গেল না। তুষার-নদীতে এক জায়গায় প্রায় মাইলখানেক লম্বা ও প্রায় ত্রিশ ফুট চওড়া একটি গভীর খাদ তৈরী হয়েছে। সে-খাদের ওপারের পদচিহ্ন বেশ স্পষ্ট দেখতে পেলেও তাঁর পক্ষে শীতের পোশাক পরে তা লাফ দিয়ে পার হওয়া অসম্ভব। মাইলখানেক ঘুরে আবার তা অনুসরণ করারও তখন সময় নেই।

এমনিতেই আগ্রহে উত্তেজনায় অনেক দূর এসে পড়েছিলেন। তাঁবুতে যখন ফিরে গেলেন, তখন বেশ বেলা হয়ে গেছে। পায়ের নিচে ঠাণ্ডা বরফ আর আকাশে জ্বলন্ত সূর্যের এমন তেজ যে, মুখ যেন পুড়িয়ে দিচ্ছে। সেই অবস্থায় তাঁবুতে এসে তানাকা একেবারে অবাক্ হয়ে গেলেন। শেরপা কুলিরা সব গেল কোথায়? এতক্ষণে ত তাদের খাওয়া-দাওয়া সেরে তাঁবু তোলবার জন্যে প্রস্তুত হওয়ার কথা।

বাইরে থেকে শেরপাদের সর্দার দাওয়া আংডুপকে ডাক দিলেন। কোন সাড়া না পেয়ে এবার তাদের তাঁবুর ভেতরেই গিয়ে ঢুকলেন। চারজনের মধ্যে একটিমাত্র শেরপা কুলি সেখানে বসে তার জিনিসপত্র বাঁধছে। আর কোন শেরপা কুলির চুলের টিকি দূরে থাক, জিনিসপত্র পর্যন্ত সেখানে নেই।

যে জিনিসপত্র বাঁধছিল, বাইরের আলো থেকে তাঁবুর ভেতরে এসে তানাকা প্রথমটা তাকে চিনতে পারলেন না। তবু অত্যন্ত কড়া গলায় অন্য শেরপারা কোথায় গেছে জিজ্ঞাসা করলেন।

মুখ না তুলেই লোকটা বললে, 'তারা পালিয়েছে।'

'পালিয়েছে। হঠাৎ এরকম পালাবার মানে?'

'জানি না।'

তার উত্তরে নয়, তার কথা বলবার ধরনে হঠাৎ চমকে উঠে সজোরে দু'হাতে তার গলাটা ধরে তানাকা তাকে তাঁবুর বাইরে নিয়ে এলেন।

'আরে ছাড়ো ছাড়ো বন্ধু! গায়ের জোরটা 'ইয়েতি'দের জন্যেই মজুদ রাখো।' শেরপা কুলির মুখে বিশুদ্ধ জাপানী ভাষা শুনে তানাকা একেবারে হতভম্ব।

অবাক্ হয়ে, তার গলা ছেড়ে দিয়ে বললেন, 'একি! মিঃ দাস।'

গলায় হাত বুলোতে বুলোতে এবার হেসে বললাম, 'যেরকম হাতের জোর দেখিয়েছ, আর একটু হলেই ঁদাস হয়ে যেতাম।'

রসিকতার মত মনের অবস্থা তানাকার তখন নয়। বললেন,—'তুমিই তাহলে জাল মোহান্ত সেজে পুঁথি চুরি করেছ—!'

অম্লান বদনে বললাম, 'তা করেছি' তবে চালুনি হয়ে ছুঁচের ছিদ্র ধরা তোমার কি উচিত? সিনকিয়াং-এর সেই মঠের কথা মনে পড়ে? এ বিদ্যে তোমার কাছেই তখন শিখি।

সিনকিয়াং-এর এক প্রাচীন গোম্ফা বা বৌদ্ধ মঠের পুরনো পুঁথি সরানোর ব্যাপারে ডাঃ তানাকাকে আমায় সাহায্য করতে হয়েছিল।

সে-কথা এখন গায়ে না মেখে তানাকা রাগের সঙ্গে বললেন, 'কিন্তু আমার কুলিদের তুমি তাড়িয়েছ কেন?'

'এখানকার ঠাণ্ডায় তোমার বুদ্ধিটা একটু জমে গেছে মনে হচ্ছে!' হেসে বললাম, 'নইলে 'ইয়েতি' নামটা যখনই উচ্চারণ করেছিলাম, তখনই ব্যাপারটা বুঝতে!'

এক মুহূর্তে শেরপাদের পালাবার কারণটা তানাকার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠল। উদ্বিগ্নভাবে জিজ্ঞাসা করলেন,—'ওরাও কি 'ইয়েতি'র পায়ের চিহ্ন তাহলে দেখেছে?'

'হ্যাঁ, বন্ধু হ্যাঁ, ইংরেজী ভাষায় ভুল ব্যাখ্যা করে যার নাম দেওয়া হয়েছে, জঘন্য তুষার-মানব! তোমার ফিরতে দেরি দেখে খুঁজতে গিয়ে সেই 'ইয়েতি'র পদচিহ্নই তাদের চোখে পড়ে। তারপর তল্পিতল্পা গুটিয়ে তারা হাওয়া।'

তানাকা হতাশ ভাবে এবার বললেন, 'কিন্তু এখন আমার সমস্ত প্ল্যানই যে মাটি হয়ে যাবে।'

'কিছু হবে না বন্ধু, বরং তোমার উদ্দেশ্যসিদ্ধির সুবিধেই হয়ে গেল!'

তানাকা সন্দিগ্ধ ভাবে আমার দিকে চেয়ে বললেন, 'আমার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তুমি কি জান?'

'জানি বইকি বন্ধু, নইলে শেরপা কুলি সেজে নামচে থেকে তোমার সঙ্গ নিই?'

'তুমি শেরপা কুলি সেজে আমার সঙ্গে এসেছ?'

এবারে তাকে সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলাম। যেখান থেকে 'শেরপা' কুলি সে সংগ্রহ করে, সেই নামচে গাঁয়ে কি করে তার আগেই আমি উপস্থিত হয়ে 'শেরপা' মোড়লকে আগে ঘুষ দিয়ে হাত করে রাখি, তারপর 'শেরপা' কুলি সেজে তার সঙ্গে থিয়াং বোচিতে এসে কি করে আবার ভোল বদলে জাল চিঠি দেখিয়ে মোহান্তদের পুঁথিঘরে ঢোকবার সুবিধে করে নিই। তারপর সকলে যখন জাল মোহান্ত কোন্ দিকে গেছে ভেবে আকুল, তখন কেমন করে আবার 'শেরপা' কুলি সেজে তানাকার সঙ্গেই সকলের চোখের ওপর দিয়ে চলে আসি। 'শেরপা' কুলিদের সাহায্য না পেলে অবশ্য এসব সম্ভব হ'ত না। এখান থেকে পালাবার সময় তাই তাদের মোটা বকশিশও দিয়েছি। 'ইয়েতি'দের ভয়ে ততটা নয়, আমার কথাতেই তারা যে তল্পি-তল্পা নিয়ে চলে গেছে, এ-কথাটাও তানাকাকে জানিয়ে দিলাম।

এ সব শুনে তানাকা একেবারে খাপ্পা। রেগে উঠে বললে, 'কি সর্বনাশ যে তুমি করেছ তা জান না! আমার উদ্দেশ্য তুমি যদি সত্যি জানতে তাহলে 'শেরপা' কুলিদের অন্ততঃ তাড়াতে না।'

'তোমার উদ্দেশ্য জানি বলেই 'শেরপা'দের তাড়িয়েছি।'

তানাকা এ কথায় আরো রেগে উঠল—'তোমার হেঁয়ালি রসিকতা আমার এখন ভাল লাগছে না।'

'হেঁয়ালি নয় বন্ধু, সহজ কথা। শোন; তুমি যে তিব্বতে যাবার নতুন রাস্তা খুঁজতে এদিকে আসনি সে আমি আগেই বুঝেছিলাম, তোমার আসল উদ্দেশ্য—হিমালয়ের যে চূড়া কেউ জয় করতে পারেনি, তারই আটঘাট জেনে যাওয়া। পরে যাতে দলবল নিয়ে এ চূড়া জয়ের চেষ্টা করতে পার। পাছে সে কথা বললে বৃটিশ সরকার তোমায় নেপালের ভেতর দিয়ে যাবার অনুমতি না দেয়, তাই তুমি ওই মিথ্যে অজুহাত দিয়েছ।'

আমার দিকে অবাক্ হয়ে চেয়ে তানাকা বললে, 'আশ্চর্য! আমার এ মনের কথা আমি জাপানেও কাউকে বলিনি। কিন্তু তুমি 'শেরপা' কুলি সেজে আমার সঙ্গ নিয়েছ কেন?'

হেসে বললাম, 'এখনো এ দেশে বৃটিশদেরই রাজত্ব বলে। স্বাধীন দেশের লোক বলে তোমায় যেটুকু অনুমতি দিয়েছে, কালা ভারতবাসী হিসেবে আমায় তাও দিত না। তাই তোমার পাসপোর্ট দিয়েই আমি কাজ চালিয়ে নেবার ব্যবস্থা করেছি। তবে আমার উদ্দেশ্য শুধু এভারেস্টের সুলুক-সন্ধান জানা নয়, বিজ্ঞানের জগতের যা সবচেয়ে বড় হেঁয়ালি, সেই 'ইয়েতি'দের সঠিক পরিচয় নেওয়াও বটে। এখনো পর্যন্ত পায়ের দাগ ছাড়া কোন সভ্য মানুষ তাদের চোখেও দেখেনি।'

তানাকার রাগ এতক্ষণে ঠাণ্ডা হয়েছে, তবু সে হতাশ ভাবে বললে, 'কিন্তু 'শেরপা' কুলিদের তাড়িয়ে আমাদের কি লাভটা হ'ল?'

'লাভ হ'ল এই যে, আমরা কি করছি না করছি তার সাক্ষী কেউ রইল না। 'শেরপা'রা সঙ্গে থাকলে পরে তোমার আসল উদ্দেশ্য জানাজানি হয়ে যেতই। আর আমার দিক্ দিয়ে 'শেরপা'দের তাড়ান দরকার ছিল এই জন্য যে, দলবল নিয়ে 'ইয়েতি'দের সন্ধান পাওয়া অসম্ভব। তারা যেমন চালাক তেমনি সতর্ক। দলবল দেখলেই তারা সে-তল্লাট ছেড়ে পালাবে। একা একা তাদের খোঁজ পাওয়ার বরং আশা আছে।'

তানাকাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ঠাণ্ডা করলাম, কিন্তু তারপর এক হপ্তা পর্যন্ত চারিদিকে খোঁজ করেও 'ইয়েতি'দের কোন চিহ্ন না পেয়ে নিজেই ভেতরে ভেতরে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলাম। আমাদের খাবার রসদ ক্রমশই ফুরিয়ে আসছে। আর ক'দিন এভাবে গেলে ফেরবার উপায়ও থাকবে না।

সেদিন রাত্রে খুন্দুর হিমবাহ দিয়ে উঠে আমরা পাহাড়ের ধারের একটি গুহায় আশ্রয় নিয়েছি। গুহা না বলে পাহাড়ের একটা সংকীর্ণ ফাটলই তাকে বলা উচিত। এমনিতে সে ফাটলে রাত কাটালে শীত জমে যাবার কথা। আমরা কিন্তু এস্কিমোদের মত বরফ দিয়েই শীত নিবারণের ব্যবস্থা করেছি। বরফের চাঁই দিয়ে এমন ভাবে ফাটলের বেরুবার দিকটা ঢেকে দিয়েছি যে, হাওয়া বেরুবার সামান্য একটু ফুটো ছাড়া আর কিছু সেখানে নেই।

যাই করি না কেন সেই বরফ-জমানো শীতে আরামে ঘুমোনো অসম্ভব। সামান্য যেটুকু তন্দ্রা এসেছিল শেষরাত্রে হঠাৎ কিসের শব্দে তা ভেঙে গেল। তানাকাও তখন জেগে উঠেছে। দু'জনে কান পেতে শুনলাম—কিসের বরফের চাঁই দিয়ে আমাদের ফাটল আমরা বন্ধ করেছিলাম, সেগুলো কে যেন সরাবার চেষ্টা করছে। ফাটলের ওপর দিকে হাওয়া যাবার যে ফুটো রেখেছিলাম, তার ভেতর দিয়ে সামান্য ভোরের আলো গুহার ভেতর তখন এসে পড়েছে। ঘুমোবার থলে থেকে দু'জনেই ধীরে ধীরে বেরিয়ে সেখানে গিয়ে দাঁড়ালাম। বাইরের শব্দটা সেই সময়েই থেমে গেল। মিনিটখানেক কোন শব্দ আর না পেয়ে ফাটলের একটা পাথরের খাঁজে পা দিয়ে উঠে হাওয়ার ফুটোয় চোখ লাগিয়ে যা দেখলাম, অনেক বড় বৈজ্ঞানিক তা দেখবার জন্যে নিজের ডান হাতটা কেটে দিতে পারত। আমাদের সামনে তুষার-প্রান্তরে তিন-তিনটি 'ইয়েতি' জামা-গুড়ি দিয়ে বরফের ওপর ঘুরে বেড়াচ্ছে ও মাঝে মাঝে যেন পাগলের মত দু'হাতে সেই বরফ খুঁড়ছে।

আর একটি ফুটোয় চোখ লাগিয়ে তানাকাও তখন ব্যাপারটা দেখেছে। দেখে উত্তেজনায় সে আর চুপ করে থাকতে পারল না।

'ইয়েতি! ইয়েতি! দুনিয়ায় কেউ যা কখন দেখেনি, সেই ইয়েতি!'

রেগে আগুন হয়ে আমি তাকে চুপ করতে বললাম। কিন্তু ক্ষতি যা হবার, তখন হয়ে গেছে। সামান্য যে শব্দ ফুটোর ভেতর দিয়ে বাইরে পেঁাঁছেচে, 'ইয়েতি'রা তাই শুনেই সবাই একসঙ্গে উধাও। সব চেয়ে ছোট 'ইয়েতি'কে মাঝখানে রেখে তারা যেভাবে ছুটে পালিয়ে গেল, তাকে বাপ, মা ও বাচ্চা নিয়ে তারা একটি পরিবার বলেই মনে হ'ল।

নিজের বোকামির জন্য লজ্জিত হওয়া দূরে থাক, তানাকা তখনও উত্তেজিত ভাবে বলছে, 'ভালো করে লক্ষ্য করেছ দাস? সমস্ত বৈজ্ঞানিক জগৎকে আমরা স্তম্ভিত করে দেব। কে বলে 'ইয়েতি' একরকম বাঁদর বা হনুমান। ওরা দস্তুরমত নতুন এক শ্রেণীর বনমানুষ—গরিলা বা শিম্পাঞ্জির চেয়ে অনেক উঁচু স্তরের। ওদের পরনে চিতার চামড়া আর ঈগলের পালক লক্ষ্য করেছ?'

তাকে থামিয়ে বিরক্ত হয়ে বললাম, 'সবই করেছি। কিন্তু তুমি আহাম্মকের মত না চেঁচালে ওরা এত তাড়াতাড়ি পালাত না,—সে খেয়াল আছে?'

এবার তানাকা সত্যিই অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে পড়ল। 'ছি ছি, উত্তেজনায় আমার আর কিছু হুঁশই ছিল না!'

কিন্তু লজ্জা তার বেশীক্ষণের নয়। পরমুহূর্তেই সে আবার জিজ্ঞাসা করলে উত্তেজিত ভাবে, 'আচ্ছা, ওদের বরফ খোঁড়ার ধরনটা ভারি অদ্ভুত, না?'

'হ্যাঁ, ওই বরফ খোঁড়া দেখেই বুঝেছি, প্রাচীন তিব্বতী পুঁথির কথা মিথ্যে নয়।'

'প্রাচীন তিব্বতী পুঁথির কথা!'—তানাকা প্রথমটা হতভম্ব হয়ে গেল, তারপর সবিস্ময়ে বলল, 'তোমার সেই চুরি-করা তিব্বতী পুঁথি,—তাতে এসব কথা কিছু আছে না কি?'

'আছে বই কি!' ব'লে সঙ্গের ছোট তুষার-গাঁইতি দিয়ে ফাটলের মুখের বরফের চাঁই কেটে সরিয়ে বাইরে এলাম। তারপর ঝুলির ভেতর থেকে আসল পুঁথিটি বার করে তার হাতে দিয়ে বললাম, 'এই জায়গাটা পড়ো দেখি।'

বাইরে তখন বেশ আলো হয়ে গেছে। তানাকা দু'বার জায়গাটা পড়ে বিমূঢ় হয়ে আমার দিকে তাকাল!

হেসে বল্লাম, 'পড়েও হেঁয়ালি মনে হচ্ছে বুঝি? ওতে লিখেছে,—বরফের মধ্যে থেকেও যা আগুনের চেয়ে গরম, সেই রুন-এর শেকড় যারা চেনে, দেবতা না হয়েও দেবতাদের দেশে 'ইয়েতি'দের মত তারা থাকতে পায়। রুন-এর শেকড় যে পায়, চো সো হিয়ান মি অর্থাৎ বিশ্বজননীর পূত সলিল সে-ই আনতে পারে।'

তানাকা তখনও অবাক্ হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে দেখে বললাম, 'ইয়েতি'রা এই রুনের শেকড়ই খুঁজছিল,—বুঝলে? 'ইয়েতি'দের দেখা দূরে থাক, তারা এই চির-তুষারের দেশে কি খেয়ে থাকে, তাও বৈজ্ঞানিক পর্যটকেরা এখনো বুঝতে পারেননি। আমরাই বোধহয় প্রথম সে-জিনিস দেখব। চল।'

'ইয়েতি'রা যেখানে ভোরের বেলা বরফ খুঁড়ছিল সেখানেই গিয়ে কিছুক্ষণ সন্ধান করবার পর সত্যি কয়েকটি আশ্চর্য জিনিস পেলাম। নেহাত আগে থাকতে জেনে খোঁজ করছিলাম তাই, নইলে সে জিনিস যে বরফেরই লম্বা টুকরো নয়, কে বলবে! ওপর থেকে দেখে কোন তফাতই বোঝা যায় না। জিনিসটা সাধারণ কোন মূল নয়, ছাতা-জাতীয় কোন উদ্ভিদ্ বলেই মনে হ'ল, বরফের মধ্যেও যা বেঁচে থাকে।

কৌতূহলী হয়ে সেই রুনের মূল একটু মুখে দিলাম। স্বাদগন্ধহীন কাগজ চিবোচ্ছি বলেই মনে হ'ল। প্রধানতঃ এই জিনিস খেয়ে 'ইয়েতি'রা ওই বিরাট দানবের মত শরীর নিয়ে কি করে বেঁচে থাকে, বুঝতে পারলাম না।

বুঝলাম সেই দিনই সন্ধ্যের দিকে। তানাকাও আমার সঙ্গে রুন-এর মূলে কিছু খেয়েছিল। সন্ধ্যের সময় আমাদের সেই ফাটলে ঢুকে সে বললে,—'হঠাৎ ঠাণ্ডা কিরকম কমে গিয়েছে দেখেছ দাস?'

আমারও তাই মনে হয়ে একটু অবাক্ লাগছিল। এ-সময়ে হিমালয়ের এ-জায়গায় ঠাণ্ডা তো দিন দিন বাড়বারই কথা, বিশেষ করে সন্ধ্যের সময়ে। সঙ্গে-করে-আনা তাপমান-যন্ত্রটা দেখলাম।

এ কি ব্যাপার! ঠাণ্ডা কমেছে কোথায়! তাপমান-যন্ত্রের পারা ত আরো দু'ডিগ্রি নেমে গিয়েছে!

পরের মুহূর্তেই রহস্যটা পরিষ্কার হয়ে গেল। প্রাচীন তিব্বতী পুঁথির কথা ত দেখছি অক্ষরে অক্ষরে সত্যি!

তানাকাকে সে কথা জানিয়ে বললাম,—'শুধু শেষ কথাগুলো বাজে কবিত্ব বলে মনে হচ্ছে।'

আমাদের অনুমান যে কতখানি ভুল, দু'দিন বাদেই তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাব কে জানত।

একদল 'ইয়েতি' ভয় পেয়ে পালালেও, রুন-এর শেকড়ের খোঁজে অন্য 'ইয়েতি'রা এখানে পরে আসতে পারে—এই আশায় আমরা দু'দিন ধরে সেই পাহাড়ের ফাটলেই তখন আছি। ফাটলের মুখে তেমনি বরফের চাঁই আটকান। তার দু'টি ফুটোয় চোখ রেখে সারারাত আমরা পালা করে পাহারা দিই।

তিন দিনের দিন ভোরে সত্যিই আমাদের আশা পূর্ণ হ'ল। ভোর হবার আগেই যে 'ইয়েতি'কে সেখানে দেখা গেল, 'ইয়েতি'দের মধ্যেও তাকে দানব বলা চলে। লম্বায় সাড়ে পাঁচ ফুটের সামান্য কিছু ওপরে হ'লেও তার লোমশ চওড়া দেহ যেন হিমালয়ের একটা প্রকাণ্ড পাথর। তার পরনেও চিতাবাঘের ছাল, কিন্তু ঈগলের পালক কোথাও নেই।

ফাটলের মুখে বরফের চাঁই এমন ভাবে এবার আমরা সাজিয়েছিলাম যে, এক ধাক্কায় তা সরিয়ে ফেলা যায়।

তানাকাকে নিঃশব্দে নজর রাখতে ইঙ্গিত করে আমি আমার ঝুলি থেকে একটা লম্বা দড়ি বার করলাম।

সাবধান করা সত্ত্বেও তানাকা ফিসফিস করে বললে, 'ও দড়ি কেন, পিস্তল কোথায়!'

'পিস্তল দিয়ে জ্যান্ত প্রাণী ধরা যায় না।'

'তুমি জ্যান্ত 'ইয়েতি' ধরতে চাও!' প্রথমটা অবাক্ হলেও তানাকা তারপর ঠাট্টা করে বললে, 'ইয়েতি' ত আর তোমার ও-দড়িতে আপনি বাঁধা পড়বে না!'

'না, তা পড়বে না, তবে আর্জেনটাইনের 'পাম্পাস'-এ ঘুরাই যদি 'গাউচো'দের সঙ্গে না মিশে থাকি, তাহলে এই দড়িতেই তাকে ধরতে ও বাঁধতে পারব।' বলে বরফের ফুটোয় চোখ লাগিয়ে দেখলাম 'ইয়েতি'-দানব বেশ নিঃসন্দিগ্ধ ভাবেই রুন-এর শেকড় তখনও খুঁজছে।

তানাকাকে পেছনে তৈরী থাকতে বলে এক ধাক্কায় বরফের দরজা ঠেলে দিয়ে বাইরে এসে দাঁড়ালাম।

চক্ষের নিমিষে পিছু ফিরে তাকিয়ে 'ইয়েতি'টা তৎক্ষণাৎ ঝড়ের বেগে দৌড় মেরেছে।

কিন্তু ঝড়ের চেয়ে বেশী বেগ আমার 'লাসো'র। বিদ্যুৎ-গতিতে 'লাসো'র দড়ির ফাঁস গিয়ে 'ইয়েতি'র কোমরে আটকে গেল।

এক সেকেণ্ডের মধ্যে হকচকিয়ে সে থেমে গেল, প্রাণপণে সেই বাঁধন খোলার চেষ্টাও করল একবার। তারপর বিফল হয়ে সে যা করে বসল, তা আমি কল্পনাও করতে পারিনি।

হঠাৎ দেখি ঝড়ের বেগে আমি সামনে ছুটে চলেছি! বাঁধন খুলতে না পেরে 'ইয়েতি' আমায় সুদ্ধ সামনেই টেনে নিয়ে যাচ্ছে জাহাজের পেছনের ল্যাং-বোটের মত। বিপদ দেখে তানাকাও পেছন থেকে এসে আমার সঙ্গে দড়িটা টেনে ধরবার চেষ্টা করল। কিন্তু 'ইয়েতি'র তাতে ভ্রূক্ষেপও নেই। সে সমানে আমাদের দু'জনকে টেনে উড়িয়ে নিয়ে তখন ছুটছে।

'ইয়েতি'ও থামবে না, আমাদের জেদ আমরাও দড়ি ছাড়ব না। পাছে হাত ফস্‌কে যায় বলে দড়িটা আমরা তখন নিজেদের কোমরে জড়িয়ে নিয়েছি।

কিন্তু 'ইয়েতি' ক্লান্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত ধরা দেবে বলে আমরা যা ভেবেছিলাম, তার কোন লক্ষণই দেখা গেল না। যদি বা সে একবার একটু থামে, আমি দড়ির আর এক ফাঁস বাগিয়ে লাগাবার আগেই আবার দৌড় দেয়। তুষার-প্রান্তরে বিপদের অন্ত নেই। কোথাও বিরাট ফাটল, কোথাও নরম তুষার, যার মধ্যে চোরা-বালির মত ডুবে যাওয়ার সম্ভাবনা। কিন্তু যেন মুখস্থ রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে এমনি অনায়াসে সে সমস্ত বিপদ এড়িয়ে যেতে লাগল।

ঠোকাঠুকি আঁচড় ইত্যাদি একটু লাগলেও অত বেগে যাওয়া সত্ত্বেও তার বাহাদুরীতেই আমাদেরও কোন বিপদে পড়তে হ'ল না।

কিন্তু 'ইয়েতি' চলেছে কোথায়। 'পরমোরি' চূড়া বাঁয়ে রেখে 'লো-লা' চূড়ার দিকে উঠতে উঠতে হঠাৎ 'লো-লা'ও বাঁয়ে ফেলে সে উঠতে লাগল। এরপর যেখানে এসে সে প্রথম

থামল, সেখানে ডান দিকে নুপৎসে ও লোৎসের চূড়া, আর সামনে একটু বাঁ দিকে ঘেঁষে স্বয়ং মাউণ্ট এভারেস্ট। পাহাড়ের দেয়াল-ঘেরা মাঝখানের এত উঁচুতে না হলে তুষার-প্রান্তরের বদলে হ্রদ হতে পারত। এখানে একটু থেমেই সে সোজা সেই তুষার-প্রান্তরেই নেমে গেল আমাদের নিয়ে।

তারপর তুষার-প্রান্তর ছেড়ে সে আবার যেই উঁচুতে উঠতে শুরু করল, তখনই আমাদের দুর্দশা চরম হয়ে উঠল। দাঁড়ি দিয়ে নিজেদের ভালো করে বেঁধে নিয়েছিলাম তাই, নইলে কখন শিথিল হাত খুলে গিয়ে একেবারে অতলে আছড়ে পড়তাম। এই অবস্থাতেও তানাকা খানিক বাদে চিৎকার করে উঠল, 'আমার সমস্ত শরীর অবশ হয়ে যাচ্ছে দাস। নিশ্বাস নিতে পারছি না।'

পশমী আলখাল্লার ঝোলা পকেটেই 'অল্টিমিটার' অর্থাৎ উচ্চতা মাপবার যন্ত্রটা ছিল। বার করে দেখি ছাব্বিশ হাজার সাত শ ত্রিশ ফিট। বুঝলাম—এত উঁচু জায়গায় পাতলা হাওয়ায় অক্সিজেনের স্বল্পতার দরুনই এমন হচ্ছে। এসব জায়গায় প্রথমটা শরীর বেশ হাল্কা লাগে, তারপর শরীর অবশ হয়ে মৃত্যু ঘনিয়ে আসে।

কিন্তু এখন উপায়? হঠাৎ তিব্বতী পুঁথির শ্লোকটার শেষ অংশ মনে পড়ে গেল। দু'জনেরই পকেটে খানিকটা করে রুন-এর শেকড় ছিল।

নিজেরও তখন মাথাটা ঘুরতে শুরু করেছে। তাড়াতাড়ি রুন-এর শেকড়টা বার করে এক কামড় দিয়ে তানাকাকে তৎক্ষণাৎ তাই করতে বললাম।

হাঁফাতে আরম্ভ করলেও 'ইয়েতি' তখনও সমানে উঠছে। যেখান দিয়ে যে ভাবে সে উঠছে, তা মানুষের কল্পনার অতীত। আমরা দু'জন তখন তার কোমরের দাঁড় থেকে এক-রকম ঝুলছি বললেই হয়।

ছাব্বিশ থেকে 'অল্টিমিটারে' সাতাশ হাজার দেখা দিল। তারপর সাড়ে সাতাশ। আটাশের কাছে চোখ প্রায় ঝাপসা হয়ে গেছে, কানে যেন ভেতর থেকে ঢাক পিটছে। জ্ঞান হারাতে আর বেশী দেরি নেই। রুন-এর শেকড় তাহলে পুরনো পুঁথির গালগল্প?

হঠাৎ 'অল্টিমিটারে' সাড়ে আটাশ স্পষ্ট হয়ে উঠল। না, এই ত মাথা পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে! নিশ্বাসের কোন কষ্ট আর নেই। আশ্চর্য! রুন-এর শেকড়ে তাহলে ডাক্তারী শাস্ত্রের অজানা এমন কিছু আছে, যা ফুসফুসের অক্সিজেন নেবার ক্ষমতা অনেকগুণ বাড়িয়ে দেয়। এ ওষুধ ত চিকিৎসার রাজ্যে যুগান্তর আনবে।

কিন্তু এ কি! এ যে উনত্রিশ হাজার ফিট। একেবারে পৃথিবীর ওপরের চূড়োর ওপর দিয়ে 'ইয়েতি'-দানব আমাদের টেনে নিয়ে যাচ্ছে। যেতে যেতে সেই চূড়োর ওপরও দু'কুট আন্দাজ একটা ঢিবি দেখে মাথার টুপিটা খুলে তাতে লাগিয়ে দিলাম।

'তারপর শুরু হল একেবারে উল্টো দিকে নামা।'

ঘনাদা একটু থামতে শিবু জিজ্ঞাসা করলে,—'ইয়েতিকে শেষ পর্যন্ত ধরলেন তাহলে!'

'নাঃ, ধরতে আর পারলাম কই!' ঘনাদা একটু দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। 'পাহাড়ে পাহাড়ে ঘষে ঘষে দাঁড়িটা অত জখম হয়ে গেছল বুঝতে পারিনি। তিব্বতের দিকে রং ব্যাক গ্লেসিয়ারে নামবার পরই সেটা ছিঁড়ে গিয়ে 'ইয়েতি' পালিয়ে গেল।'

'আচ্ছা, সেই 'রুন-এর' শেকড় ত আপনার পকেটেই ছিল?'—জিজ্ঞাসা করলে গৌর, 'তা একটু এনেছেন নিশ্চয়!'

ঘনাদা এবার যেন একটু বিরক্তই হয়ে উঠলেন, 'কি করে আনব শুনি, রং ব্যাক গ্লেসিয়ার থেকে তিব্বতের লোকালয়ে যাবার পথে তাই খেয়েই ত কাটিয়েছি।'

'আচ্ছা, এভারেস্টের মাথায় যা পরিয়ে দিলেন, সেটা কি টুপি ছিল?'—জিজ্ঞাসা করলে শিশির।

'টপ হ্যাট্ বোধহয়!'—ঘনাদার বদলে গৌরই উত্তর দিলে এবং ঘনাদা আমাদের দিকে ভ্রূকুটি হেনে শিশিরের একটা সিগারেট তুলে নিয়ে উঠে গেলেন।

ছুরি

ফন্দিটা ভালোই আঁটা হয়েছিল।

ঘনাদাকে জব্দ করার ফন্দি।

রোজ রোজ তিনি আমাদের মাথায় আষাঢ়ে গল্পের চাঁটা মেরে যাবেন, আর আমরা মুখ বুজে তাই সয়ে থাকবো, সেটি আর হচ্ছে না।

এবার তাঁর ওপরেও টেক্কা দেওয়া চাই।

ঘনাদা তখনও এসে পেঁাছোননি।

ইতিমধ্যে চর পাঠিয়ে খবর নেওয়া হয়েছে যে সন্ধ্যেবেলায় লেকের ধারে বেড়ানো সেরে তিনি এইমাত্র মেসের গলির মুখে দেখা দিয়েছেন।

সিঁড়িতে তাঁর পায়ের শব্দ শোনার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা বেশ তটস্থ হয়ে যে যার জায়গায় বসে পড়লাম।

ঘনাদা যখন ঘরে ঢুকলেন তখন আমরা রুদ্ধনিশ্বাসে সবাই শুনছি আর গৌর বলে যাচ্ছে,—

যেদিকে তাকাই, শুধু সাদা বরফ,—আকাশ সাদা, সব কিছু সাদা, আর ঠিক আমার পেছনে সেই সাদা ভালুক, সাক্ষাৎ যমের মত পেছনের দু-পায়ে ভর দিয়ে আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে আসছে।

ঘনাদা যে ঘরে ঢুকেছেন আড়চোখে সবাই দেখে নিলেও বাইরে একেবারে কেউ টের পাইনি এমনি ভান করে রইলাম। ঘনাদার মুখখানা সত্যি তখন দেখবার মত। এরকম অবস্থায় আগে কখন বোধহয় পড়েননি। চিরকাল সভার মধ্যমণি হয়ে জাঁকিয়ে বসাই যাঁর অভ্যাস—তাঁর প্রতি আজ কিনা কারুর ভ্রূক্ষেপও নেই।

গৌর তখন উত্তেজিত ভাবে বলে চলেছে,—রাইফেলের সব গুলি আগেই ফুরিয়ে গেছল, এবার কোন উপায় না দেখে সেটা লাঠির মত করে ধরে ফিরে দাঁড়ালাম....

ভয়ে শিবুর যেন গলা দিয়ে স্বর বার হচ্ছে না, এমনি ভাবে বললে,—তারপর?

কিন্তু গৌর কিছু বলবার আগেই ঘনাদার গলা-খাঁকারি শোনা গেল।

এবার আর তাঁকে অবজ্ঞা করা যায় না। গৌর তাঁর মৌরসীপাট্টা ইজিচেয়ারটা ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললে,—আরে ঘনাদা যে! কখন এসেছেন টেরই পাইনি।

নির্বিকার মুখে ইজিচেয়ারটায় এসে বসে ঘনাদা বললেন,—তা পাবে কি করে? যে রকম মশগুল হয়ে গল্প করছিলে। তা গল্পটা হচ্ছিল কোথাকার?

আজ্ঞে, দক্ষিণ মেরুর।—পাছে ঘনাদার দিকে চাইলে নিজেকে সামলাতে না পারে সেই ভয়ে গৌর মুখটা অন্যদিকে ফিরিয়ে যতদূর সম্ভব সহজ গলায় বলে গেল,—সেবার একটা অভিযানে দক্ষিণ মেরুতে যেতে হয়েছিল কিনা!

হাসি চাপবার জন্যে আমরা মুখ নিচু করে রইলাম।

ঘনাদার কিন্তু কোন প্রকার ভাবান্তর দেখা গেল না। গৌরের পক্ষে দক্ষিণ মেরু যাওয়াটা যেন নিতান্তই বোটানিক্স্ কি চিড়িয়াখানা যাওয়ার সামিল এইভাবে তিনি বললেন,—তা সাদা ভাল্লুকটাকে করলে কি? বন্দুকের বাড়িতেই সাবাড় করে দিলে নাকি?

গৌরের সেইরকমই কিছু বলবার বাসনা ছিল, কিন্তু ঘনাদার ওপর আর এক কাঠি সরেস হবার এমন সুযোগ কি ছাড়া যায়! একটু হেসে সে বললে,—আজ্ঞে না, তার দরকার হল না। বন্দুকের ঘা দেবার আগেই দেখি ভাল্লুক ভায়া চিৎপটাং। বরফের মেঝে একেবারে কাচের মত তেলা কিনা?

ঘরময় এমন কয়েকটা শব্দ শোনা গেল যা অন্য কেউ হলে চাপা হাসি বলেই মনে করত।

কিন্তু ঘনাদার সেদিকে গ্রাহ্য নেই। গম্ভীরভাবে বললেন,—সাদা ভাল্লুকটার ছাল-চামড়া না হোক নিদেনপক্ষে একটা দাঁত কি নখও যদি আনতে পারতে বিজ্ঞানের রাজ্যে হুলুস্থুল পড়ে যেত।

এবার আমাদেরই হতভম্ব হবার পালা।

কেন বলুন তো?—অবাক্ হয়ে জিজ্ঞাসা করলে গৌর,—বৈজ্ঞানিকেরা কি সাদা ভাল্লুক দেখেননি?

অন্ততঃ দক্ষিণ মেরুতে কখন দেখিনি। পেঙ্গুইন পাখী ছাড়া সেখানে ডাঙায় চরবার মত কোন প্রাণীই নেই।—ঘনাদা হাই তুলে দু'বার তুড়ি দিলেন।

এমনভাবে জব্দ হব ভাবিনি। কথাটা তাড়াতাড়ি ঘুরিয়ে দিয়ে শিবু জিজ্ঞেস করলে,—দক্ষিণ মেরুতেও গিয়েছিলেন আপনি?

হ্যাঁ গেছলাম একবার। যা গরম!

এবার আমাদের চোখ কপালে উঠল। ঘনাদাকে আমরা চিনি, তবু তাঁর মুখে দক্ষিণ মেরুতে গরম শুনে খানিকক্ষণ মুখ দিয়ে কথা বেরুল না।

শুধু বললাম,—দক্ষিণ মেরুতে গরম!

হ্যাঁ, গরম বলে গরম! কবে সেখানে গরমে গলে পচে মরতাম। ভাগ্যিস এই ছড়িটা ছিল।—ঘনাদা হাতের ছড়িটা যেন আমাদের দিকেই দু'বার আস্ফালন করলেন।

আমাদের আর কিছু বলতে হ'ল না। ঘনাদা শিশিরের দিকে ফিরে বললেন,—কই হে, একটা সিগারেট ধার দাও না!

ঘনাদার আবার হিসেবে ভুল হবার জো নেই। শিশিরের কাছে সিগারেট নিয়ে ধরিয়ে বললেন,—এই নিয়ে ২৩৯৮টা হল কিন্তু।

তারপর সিগারেটটায় একটা সুখটান দিয়ে শুরু করলেন,—সেবার সমুদ্রে যেন তিমির গাঁদি লেগেছিল। দক্ষিণ মেরুর দিকে তিমিধরা জেলেদের নজর কয়েক বছর হ'ল তখন পড়েছে। অবাধ বেপরোয়া তিমি শিকারের দরুন উত্তর অঞ্চলের তিমি প্রায় নিঃশেষ হওয়ার ফলেই দক্ষিণ দিকে ইংরেজ, নরউইজিয়ান, জাপানী আর আর্জেন্টাইন জেলেরা হানা দিতে শুরু করে বটে, কিন্তু দক্ষিণ মেরু অঞ্চলেও এত তিমি এর আগে কখন দেখা যায়নি। নেহাত

আনাড়ী জেলে-জাহাজও সেবার তিমির চর্বিতে বোঝাই হয়ে ঘাঁটিতে ফিরেছে। তুখোড় *তিমি-শিকারীদের ত কথাই নেই।*

আমার জাহাজ যে তিমির চর্বিতে বোঝাই তা বোধহয় বলতে হবে না। নরওয়ের এক জেলে-জাহাজ আধাআধি বখরায় বন্দোবস্ত করে আর সব দল থেকে আলাদা হয়ে ক্যাম্পবেল দ্বীপে তখন আমার ঘাঁটি করেছি। আমার বখরাদারকে আমি সেন বলে ডাকি। তবে সে বাঙালী নয়, নরওয়ের লোক; পুরো নাম ওলাফ সোরেনসেন। আমি তাকে ছোট করে নিয়েছি 'সেন' বলে।

সেন পাকা তিমি-শিকারী। বিশ বছর ধরে উত্তর দক্ষিণের দুই মেরুর হেন জাতের তিমি নেই যে শিকার করেনি। দূর থেকে শুধু তিমির নিশ্বাসের ফোয়ারা দেখে সে নারওয়াল না স্পার্ম, কুঁজো না নীল তিমি, বলে দিতে পারে। আমাদের জাহাজের নাম আমি রেখেছিলাম 'যমুনা'। জাহাজ বললে অবশ্য খানিকটা ভুল বোঝানো হয়। মাত্র চার শ' টনের বড় স্টীমার মোট ১৭৫ ফুট লম্বা। তবে তিমি-ধরা জাহাজের মধ্যে একেবারে সেরা আর সবচেয়ে হালফ্যাসানের। এই 'পিল্যাজিক' জাহাজে তিমি ধরে চর্বি ছাড়াবার জন্যে আর ঘাঁটিতে বয়ে নিয়ে যেতে হয় না। জাহাজের খোলের ভেতরেই সব বন্দোবস্ত আছে।

আমাদের জাহাজে মাঝি-মাল্লা নিয়ে লোক সবসুদ্ধ আমরা ১৮ জন। সেন জাহাজের 'কাকের বাসা' অর্থাৎ মাস্তুলের ওপরকার পাহারা-মাচায় দূরবীন ধরে সমুদ্রে তিমির সন্ধান করে। আর আমি হারপুন-ছোঁড়া কামান চালাই। আমাদের জাহাজে সম্পূর্ণ আধুনিক Svend Foyn হারপুন-কামান বসানো। চার ফুট লম্বা সওয়া মণ ওজনের হারপুন তা থেকে বিদ্যুৎগতিতে তিমির গায়ে গিয়ে বেঁধে। সে হারপুনের মাথায় আবার ছোট বোমা গাঁথা। একবার ঠিক মত তাগ করতে পারলেই তিমির গায়ে বেঁধবার তিন সেকেণ্ডের মধ্যে সে বোমা ফেটে গিয়ে তিমিকে কাবু করে ফেলবেই।

ডিসেম্বর মাসের শেষ। তিমি-ধরার মরশুম প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। আর কিছুদিন বাদেই দক্ষিণ মেরুর শীত চরমে নামতে শুরু করবে। আমাদের জাহাজ তিমির চর্বির ভারে প্রায় ডুবুডুবু। যা চর্বি আমরা পেয়েছি তাতে বছর তিনেক দু'হাতে খরচ করেও রাজার হালে বসে বসে আমরা কাটাতে পারব। সেন রোজ তাই ফেরার জন্যে পেড়াপীড়ি করে। কিন্তু আমি কিছুতেই রাজী নই।

সেদিন সকালবেলা 'কাকের বাসায়' পাহারা দিতে দিতে সেন হঠাৎ নিচে নেমে এল। আমি তখন একজন খালাসীকে দিয়ে হারপুন-কামানটা পরিষ্কার করাচ্ছি। সেনকে দেখে একটু অবাক্ হয়ে বললাম—নেমে এলে যে বড়! এইটুকুর মধ্যে বড় কোন শিকার যদি ফসকে যায়।

ফসকে গেলে ক্ষতিটা কি?—সেনের মুখ বেশ বিরক্ত—আর শিকার গাঁথলে মাল কোথায় রাখবে বলতে পারো? জাহাজে আর জায়গা আছে?

সেনের বিরক্তি দেখে একটু হেসে বললাম,—আমি যে শিকারের সন্ধান করছি তার মাল রাখবার যথেষ্ট জায়গা এখনো জাহাজে আছে! আর সে মালের কাছে তোমার জাহাজভর্তি চর্বি নেহাত তুচ্ছ।

সেন খানিকক্ষণ অবাক্ হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বললে,—তার মানে এখনো তুমি 'অ্যাম্বারগ্রিস'-এর আশায় আছ?

আমাদের মুখের ভাব দেখে ঘনাদা গল্প থামিয়ে একটু যেন করুণার সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন, 'অ্যাম্বারগ্রিস' কাকে বলে, জানো না বুঝি?

আমরা মাথা নাড়লাম। ঘনাদা ঈষৎ বিদ্রূপের হাসি হেসে বললেন,—সাপের মাথার মণির কথা শুনেছ ত? সে মণি শুধু আজগুবি কল্পনা, কেউ কখনো পায়নি। কিন্তু 'অ্যাম্বারগ্রিস' তিমির মাথার নয়, পেটের সত্যিকার মণি। শুধু একজাতের তিমির নাড়িভুঁড়ির

মধ্যে পাওয়া যায়। তাও আবার সে জাতের সব তিমির নয়, দু'চারটির। তিমির পেট থেকে ছাড়া সমুদ্রের জলে আর সমুদ্রের ধারের পলিতেও অনেক সময় হালকা নুড়ির মত কালচে ধোঁয়াটে রঙের 'অ্যাম্বারগ্রিস' পাওয়া যায়। এসেন্স আতরের কারবারে সে নুড়ির দাম তার ওজনের সোনার চেয়ে কম নয়।

হ্যাঁ তারপর যা বলছিলাম। সেনের কথা শুনে একটু হেসে বললাম,—'অ্যাম্বারগ্রিস'-এর আশায় আছি মানে? তুমি কি মনে করো তোমার ওই নোংরা চর্বির লোভে এই যমের দক্ষিণ দুয়ারে তিমি-শিকারে এসেছি। না হে না, আমার নজর আরো অনেক উঁচুতে। 'অ্যাম্বারগ্রিস' বেশ ভাল রকম আছে, এমন একটা তিমি যদি পাই, তাহলে ও চর্বির বখরা তোমায় এমনিই দিয়ে দেব।

তোমার উদারতার জন্য ধন্যবাদ।—সে একটু বিদ্রূপ করেই বললে,—তবে 'অ্যাম্বারগ্রিস' ও আর যেখানে সেখানে ছড়ানো নেই। স্পার্ম-তিমি ছাড়া ও জিনিস পাওয়া যায় না জানো বোধ হয়, আর স্পার্ম-তিমি এ অঞ্চলে খুব কমই পাওয়া যায়।

হেসে বললাম,—কিন্তু পাওয়া যা যায় তা দস্তুর মত বড় গোছের। এ অঞ্চলে ছুটোছাটা ছিটকে যে কটা স্পার্ম-তিমি এসে পড়ে সেগুলো সবই বুড়ো ধাড়ী। 'অ্যাম্বারগ্রিস' তাদের পেটেই পাওয়ার সম্ভাবনা বেশী।

যেন আমার কথার মান রাখবার জন্যেই আধ মাইলটাক দূরে একটা জলের ফোয়ারা হঠাৎ সমুদ্র থেকে লাফ দিয়ে উঠল।

হাজার হলেও সেন জাত শিকারী। এক মুহূর্তে ঝগড়াঝাঁটি ভুলে দূরবীন চোখে লাগিয়ে সে উত্তেজিত হয়ে উঠল।

তিমি! স্পার্ম-তিমি! সমুদ্রের দেবতা তোমার কথা শুনেছে দাস। আর ভাবনা নেই।

হায়! সমুদ্রের দেবতার মনে কি ছিল তখন যদি জানতাম!

উত্তেজনার ঝোঁকে সেন দূরবীন ছেড়ে তখন হারপুন-কামানে হাত দিয়েছে। আমি বাধা দেবার আগেই প্রচণ্ড শব্দে 'ভেণ্ড-ফয়েন' কামানের হারপুন ছুটে বেরিয়ে গেল।

সেন এমনিতে বেশ ভালো শিকারী। কিন্তু উত্তেজনাতেই তার টিপ তখন বুঝি খানিকটা নষ্ট হয়ে গেছে। বোমামুখো হারপুন তিমিটার গায়ে না লেগে কাছাকাছি পড়ে ফেটে গেল। আর তাইতেই হল সর্বনাশ। সঙ্গে সঙ্গে একটি ফোয়ারা ছেড়ে তিমিটা এমন ডুব মারল যে আর পাত্তাই নেই।

কিন্তু আমরাও তখন নাছোড়বান্দা। এত বড একটা স্পার্ম-তিমির সন্ধান পাওয়ার পর আর আমরা তাকে বেহাত হতে দিই। যত গভীর জলেই ডুব দিক না কেন বাছাধনকে নিশ্বাস নিতে দূরে হোক কাছে হোক কোথাও উঠতেই হবে। খুব বেশীক্ষণ ডুবে থাকাও তার চলবে না, কারণ আমাদের হারপুনের হুমকিতে ভালো করে নিশ্বাস নেবার ফুরসত তার মেলেনি। তিমিরা নিশ্বাস নেবার পর বহুক্ষণ ডুবে থাকতে পারে বটে, কিন্তু পুরোপুরি দম নেওয়া তাদের একেবারে সারা হয় না। জল থেকে হাওয়ায় এসে তারা বারকয়েক ফোয়ারা ছেড়ে, নিশ্বাস নিয়ে তবে আবার অনেকক্ষণের জন্যে ডুব পাড়ে। এ বেচারাকে কিন্তু একটিবার ফোয়ারা ছেড়েই তাড়াহুড়ো করে ডুব দিতে হয়েছে। সুতরাং সাধারণ অবস্থায় মিনিট পঁয়তাল্লিশ ডুব মেরে থাকা সম্ভব হলেও এখন মিনিট দশ-পনরোর বেশী জলের তলায় থাকতে সে পারবে না।

সেনকে কাকের বাসায় পাঠিয়ে হারপুন-কামান ধরে আমি সজাগ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। সারেঙ আমাদের হুকুমমত তখন মাইলখানেক ব্যাস ধরে জাহাজটাকে চক্কর দেওয়াতে শুরু করেছে।

কিন্তু স্পার্ম-তিমি নয়, নিয়তিই ওই ছদ্মবেশে আমাদের নাকাল করতে এসেছে কি করে বুঝব! তিমির দেখা আবার কেন, অনেকবার পেলাম, কিন্তু সে যেন মন্ত্রপড়া তিমি, হারপুন

দিয়ে তাকে কিছুতেই ছুঁতে পর্যন্ত পারা গেল না। সে যেন ভেলকি জানে। হারপুন-কামান থাকে জাহাজের সামনের দিকে। তিমিটা যেন তা জেনেই প্রত্যেকবার ঠিক জাহাজের পেছন দিকে ভেসে ওঠে। জাহাজ ঘুরিয়ে ভালো করে তাকে তাগ করবার আর সুযোগ মেলে না। তার আগেই সে ডুব দেয়। দু'চারবার এমনি করে ফসকাবার পর হঠাৎ আমাদের হারপুন-কামানটাই গেল আশ্চর্যভাবে বিগড়ে। কামান মেরামত যতক্ষণ না হয় ততক্ষণ তিমিটাকে নজরে রাখা ছাড়া আর আমাদের কোন উপায় নেই। তিমিটা যেন আমাদের মতলব বুঝেই তখন ক্রমশ আরো দক্ষিণে পাড়ি দিতে শুরু করেছে। কিন্তু আমরাও তখন মরিয়া হয়ে উঠেছি। হারপুন-কামান ঠিক যদি না হয় তাহলে হাতে-ছোঁড়া হারপুন দিয়েও আগেকার যুগের তিমি-শিকারীদের মত তাকে আমরা ধরবই এই আমাদের পণ।

কিন্তু সে পণরক্ষা আর হল না। দু'দিন দু'রাত্রি তার পিছু পিছু ধাওয়া করে আমরা তখন মেরুবৃত্তের দিকে অনেকখানি এগিয়ে গেছি। হঠাৎ তারপর এল ঝড়। দক্ষিণ মেরু অঞ্চলের ঝড় যে কি বস্তু, এখানে কল্পনাই করা যায় না। ঘণ্টায় এক শ' মাইল ঝড়ের বেগ সেখানে নেহাত স্বাভাবিক ব্যাপার।

কোথায় রইল তিমি-শিকার, নিজেদের জাহাজ বাঁচাতেই তখন আমাদের প্রাণান্ত ক'দিন ক'রাত্রি যে ঝড়ের সঙ্গে যুদ্ধলাম খেয়ালই নেই। এইটুকু শুধু বুঝতে পেরেছিলাম যে ক্রমশ দক্ষিণ দিকেই আমাদের ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। তুষার-ঝড়ে দিগ্বিদিক অন্ধকার, তারই ভেতর উত্তাল সমুদ্রের ঢেউ আর পাহাড়ের মত বিরাট সব বরফের স্তূপ প্রতি মুহূর্তে যেন আমাদের পিষে ফেলবার জন্যে ষড়যন্ত্র করছে। সে ষড়যন্ত্র শেষ পর্যন্ত সফলই হ'ল। কয়েকদিন ঝড়ের সঙ্গে অবিরাম যুদ্ধের পর বিরাট এক বরফের পাহাড়ের সঙ্গে ধাক্কা লেগে আমাদের জাহাজ চৌচির হয়ে গেল। কি যে তারপর হয়েছে কি যে করেছি কিছুই মনে নেই।

জ্ঞান যখন হ'ল তখন দেখি বিরাট এক তুষার-প্রান্তরের ওপর পড়ে আছি। চোখ মেলতেই মনে হ'ল কেতাদুরস্ত ভাবে ডিনার সুটের সাদা শার্ট কালো কোট-পরা ক'জন ভদ্রলোক যেন আমায় নিবিষ্ট মনে দেখছে।

চোখের ঘোর একটু কাটবার পর বুঝলাম কোটপ্যাণ্ট পরা ভদ্রলোক নয়, সেগুলি পেঙ্গুইন পাখী।

পেঙ্গুইনরা এই তুষারের রাজ্যে মানুষ কখনো দেখেনি। ভয় না পেয়ে তারা নিজেদের ভাষায় আমার সম্বন্ধে খোলাখুলি ভাবেই তখন আলোচনা শুরু করে দিয়েছে।

উঠে বসে এবার চারিদিকে তাকালাম। আমাদের জাহাজের নানা টুকরো তুষারময় তীরের ওপর চারিদিকে ছড়ানো। বুঝলাম একই ঢেউয়ের মাথায় ভাঙা জাহাজের টুকরোর সঙ্গে আমি এই তুষার-উপকূলে এসে পৌঁছেছি। পেঙ্গুইনদের কথা আগে অনেক শুনেছি। এখানে তাদের আস্তানা দেখে মনে হ'ল রস দ্বীপের কাছাকাছি কোন জায়গায় আছি। এ জাতের পেঙ্গুইন এই অঞ্চলেই শীতের আগে ডিম থেকে বাচ্চা ফুটিয়ে বড় করতে আসে।

কিন্তু আমি ছাড়া আমাদের জাহাজের আর কেউ কি রক্ষা পায়নি?

চারিধারে অনেক দূর পর্যন্ত খুঁজে দেখলাম। জীবিত দূরে থাক কোন মানুষের মৃত-দেহও একটা দেখতে পেলাম না। দেখবার আশা করাই অবশ্য ভুল। তুষার-ঝড়ে জাহাজডুবির পর যদি বা কেউ বেঁচে গিয়ে থাকে, এখানকার সমুদ্রের হিংস্র গ্রাম্পস তিমির কবল থেকে তার রক্ষা পাওয়া অসম্ভব। এই দিকের সমুদ্রে নেকড়ের পালের মত ঝাঁকে ঝাঁকে তারা ঘুরে বেড়ায়। তাদের নজরে পড়লে বিরাট নীল তিমি থেকে অক্টোপাস আর সীল পর্যন্ত কারুর আর রক্ষা নেই। হাঙরের চেয়ে তারা অনেক বেশী বুদ্ধি ধরে; শক্তি, সাহস এবং হিংস্রতা—তাতেও তারা অনেক ওপরে।

আমি যে তাদের কবলে পড়িনি এটা নেহাত আমার সৌভাগ্য!

কিন্তু খানিকক্ষণ সেই তুষার-শ্মশানে কাটাবার পর বেঁচে যাওয়াটা সৌভাগ্য না দুর্ভাগ্য বেশ একটু সন্দেহ হ'তে লাগল। জলে ডুবে বা হাঙর-তিমির কবলে পড়ে মারা গেলে সঙ্গে সঙ্গে সব চুকে যেত, কিন্তু সে-সব বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়ে এই তুষার-রাজ্যে যে তিলে তিলে মরতে হবে। এখান থেকে উদ্ধার পাওয়ার কোন সম্ভাবনাই কখনো নেই। তিমি-ধরা জাহাজ সাধ করে এ জায়গার ধারে কাছে কখনও আসে না। কালেভদ্রে তোড়জোড় করে যারা মেরু অভিযানে এ অঞ্চলে আসে তাদের সঙ্গে দেখা হওয়ার আশা সমুদ্রের বালির গাদায় একদানা চিনি খুঁজে পাওয়ার সমান।

তবু প্রাণ থাকতে হাল ছেড়ে দিতে নেই। যতদিন পারা যায় এই তুষার মরুভূমিতে বেঁচে থাকবার জন্যে যা সাধ্য তাই করবার চেষ্টায় মন দিলাম। জাহাজের ভাঙা যে সব টুকরো-টাকরা চারিধারে ছড়িয়ে ছিল তা থেকে এত সাহায্য পাব ভাবি নি। সে সাহায্য না পেলে একটা দিনও আমায় টিঁকে থাকতে হ'ত না বোধ হয়।

বরফের ওপর ঘুরতে ঘুরতে প্রথমেই পেলাম এই ছড়িটি। সাউথ জর্জিয়ার বন্দর থেকে তিমি-শিকারে বেরুবার সময়ে শখ করে এই ছড়িটি কিনেছিলাম। এই তুষার-রাজ্যে ছড়িটিকে পেয়ে যেন পুরনো বন্ধুকে ফিরে পেলাম মনে হ'ল। ছড়িটি বাদে কিছু টিনে ভর্তি খাবার-

দাবারও এখানে সেখানে কুড়িয়ে পেলাম। দিন দশেক অন্ততঃ সে খাবারে চলে যেতে পারে। কিন্তু সবচেয়ে দরকারী যে জিনিসটি পেলাম সেটি একটি রেশম আর পাতলা রবারের তৈরী গোল তাঁবু! এমনিতে গোটা তাঁবুটা এমন হালকা যে পাকিয়ে কাঁধে ফেললে একটা আলোয়ানের চেয়ে বেশী ভারী লাগে না। কিন্তু ফাঁপিয়ে মাটিতে খাটালে জন চারেক লোক তার মধ্যে অনায়াসে রাত কাটাতে পারে। তিমি-ধরা জাহাজ বিগড়ে হঠাৎ যদি দক্ষিণ মেরুর কোন দ্বীপে শীতকালটা কাটাতে হয় সেই জন্যে সেন এই তাঁবুটা দেশ থেকে বিশেষভাবে অর্ডার দিয়ে তৈরি করিয়ে এনেছিল। সেটা যে দক্ষিণ মেরুর তুষার-রাজ্যেই কাজে লাগবে সে বা আমি ভাবতেই পারিনি।

এই তাঁবুটি না পেলে এই রক্ত জমান শীতের দেশে এস্কিমোদের মত বরফের ঘর তৈরি করবার চেষ্টাই হয়তো আমায় করতে হ'ত। তাও কতদূর কি পারতাম জানি না।

তাঁবু খাটিয়ে বসবার পর কয়েকটা দিন ভাঙা জাহাজের টুকরো-টাকরা থেকে আর কি পাওয়া যায় তারই খোঁজে কেটে গেল।

পেঙ্গুইন ও সামুদ্রিক স্কুয়া চিলই আমার একমাত্র সঙ্গী। যে জায়গায় আমি তাঁবু ফেলেছিলাম তা থেকে মাইলখানেক দূরে হাজার হাজার পেঙ্গুইন ডিম ফুটিয়ে বাচ্চা বড় করবার জন্যে তখন নুড়ি সাজিয়ে বাসা তৈরি করতে ব্যস্ত। পুরুষ পাখীরা নুড়ি মুখে করে নিয়ে আসে। মেয়ে পাখীরা তা সাজায়। পেঙ্গুইনদের হাব-ভাব চাল-চলন দেখলে পাখীর বদলে মানুষ বলেই ভুল হয়। তাদের আচার ব্যবহারে সামাজিক সভ্যতার আভাস বেশ স্পষ্ট।

স্কুয়া চিলেরা পেঙ্গুইনদের চিরশত্রু। ইতিমধ্যেই তারা পেঙ্গুইনদের জ্বালাতন করতে শুরু করেছে। পেঙ্গুইনরা ডিম পাড়বার পর তাদের লুটতরাজ আরো বেড়ে যাবে। পেঙ্গুইনদের সজাগ পাহারা একটু ঢিলে হলেই ছোঁ মেরে ঠোঁটে ডিম বিঁধে নিয়ে যাওয়া তাদের দস্তুর।

কিন্তু পেঙ্গুইন আর স্কুয়া চিলের ঝগড়া দেখে দিন কাটালে আমার চলবে না। মাত্র দশ দিনের খোরাক আমার হাতে। পেঙ্গুইনরা ডিম পাড়বার পর স্কুয়া চিলদের মত আমাকেও হয়ত তাদের ওপর ডাকাতি করতে হবে কিন্তু তার আগে কিছু খাবার সংগ্রহ না করলেই নয়। ভাঙা জাহাজের ছড়ানো মাল থেকে একটা লম্বা লোহার সিক যোগাড় করেছিলাম। তাই দিয়ে এ অঞ্চলের একটা চিতা-সীল শিকার করবার চেষ্টায় বেরিয়ে পড়লাম। জলে নেমে সড়কিতে সীল মাছ গাঁথা অসম্ভব। কিন্তু সীল অনেক সময়ে বরফের মধ্যে নিশ্বাসের একটা ফুটো তৈরি করে তার তলায় শীতটা কাটায়। সেইরকম একটাকে সুবিধেমত পাওয়াই আমার উদ্দেশ্য।

বরফের ওপর দিয়ে একমনে শিকার খুঁজতে খুঁজতে কতদূর গিয়ে পড়েছিলাম জানি না, হঠাৎ চোখ তুলে একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। মাত্র আধমাইলটাক দূরে বরফের প্রান্তরের ওপর একটা বহুদূরব্যাপী লম্বা সাদা ধোঁয়ার কুণ্ডলী দেখা যাচ্ছে। যেন মেঘের একটা লম্বা ফিতে বরফের ওপর নেমে এসেছে।

সীল শিকার মাথায় রইল। এ রহস্যের মীমাংসা আগে না করলে নয়। কাছে গিয়ে যা দেখলাম তাতে আরো হতভম্ব হয়ে গেলাম। মেঘের ফিতের মত দূর থেকে যা দেখেছিলাম তার তলায় তরতর করে একটা জলের ধারা বয়ে যাচ্ছে আর সে জল আগুনের মত গরম। এখানকার দারুণ ঠাণ্ডায় সেই জল থেকে বাষ্প উঠে তুষারকণা হয়ে জমে যাবার দরুনই তার চেহারা দূর থেকে মেঘের মত দেখাচ্ছে।

এই তুষার-রাজ্যে এরকম জলের স্রোত কোথা থেকে আসছে?

সেদিন তৈরী ছিলাম না। তাই পরের দিন লম্বা পাড়ির জন্যে প্রস্তুত হয়েই বেরিয়ে পড়লাম। প্রস্তুত হওয়া মানে আর কিছুই নয়, কাঁধের একটা ঝোলায় টিনের খাবারের কৌটো-

গুলো, কোমরে চাদরের মত জড়ানো সেই তাঁবু, আর হাতে এই ছড়ি। যদি দরকার হয় যেখানে খুশি তাঁবু খাটিয়ে রাত কাটাতে পারব এই জন্যেই এসব নেওয়া।

ঘণ্টা চারেক বরফের ওপর দিয়ে হাঁটবার পর গরম জলের স্রোতের রহস্য পরিষ্কার হয়ে গেল বটে কিন্তু যা দেখলাম সে আরেক বিস্ময়।

সামনে তুষার-প্রান্ত ঢালু হয়ে ওপর দিকে উঠে গেছে আর তারই মাঝে আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে এক খাড়া পাহাড়ের চূড়া। পাহাড় এখানে চারিদিকেই, কিন্তু সেগুলি আগাগোড়াই বরফে ঢাকা। এই পাহাড়ের গায়ে শুধু নেড়া পাথর ছাড়া একটি বরফের কুচিও নেই। এই পাহাড়েরই নিচের দিকের একটি গুহা থেকে ফুটন্ত গরম জলের স্রোত বেরিয়ে আসছে তা বলাই বাহুল্য।

দক্ষিণ মেরুতে মাউণ্ট ইরেবাস ও আরেকটি আগ্নেয়গিরি আবিষ্কৃত হয়েছে বলে আগেই জানতাম। আমি কি তাহলে ভাগ্যক্রমে সে দু'টির চেয়েও আশ্চর্য আরেকটি আগ্নেয়গিরি আবিষ্কার করে ফেলেছি। আনন্দের সঙ্গে দুঃখও হ'ল এই যে, এ আবিষ্কারের কথা পৃথিবীর কেউ জানতেও পারবে না। এই তুষার-রাজ্যে এ আবিষ্কার আমার সঙ্গেই শেষ হয়ে যাবে।

তবু এ আগ্নেয়গিরির সন্ধান ভালো করে না নিয়ে ফিরতে পারি না।

সামনের দিকে পাহাড় অত্যন্ত খাড়াই। ডানদিকের পাহাড় কিছুটা ঢালু দেখে সেই দিক দিয়েই উঠতে শুরু করলাম।

ওপরে গিয়ে যখন পেঁছিলাম তখন দক্ষিণ মেরুর এই সময়কার ছোট রাত শুরু হয়ে

গেছে। সন্তর্পণে কিছুদূর যেতেই আগ্নেয়গিরির বিরাট মুখটার প্রান্ত দেখা গেল। সাধারণ আগ্নেয়গিরির চেয়ে এই পাহাড়ের হাঁ অনেক বেশী প্রকাণ্ড।

কিন্তু ঠিক মুখটার কাছে ওটা কি প্রাণী!

দক্ষিণ মেরুতে পেঙ্গুইন ছাড়া ডাঙায় চরবার মত কোন প্রাণীই নেই জানি। এ বিশাল প্রাণীটা তা হলে কোথা থেকে এল? আবছা অন্ধকারে সেটাকে প্রকাণ্ড একটা পাখী বলেই মনে হচ্ছিল। কিন্তু এত বড় আকারের কি-পাখী এখানে থাকতে পারে! দক্ষিণ মেরুর সম্রাট পেঙ্গুইনই সবচেয়ে বড় আকারের পাখী, কিন্তু সে পাখী ত কখনো এত বিশাল হতে পারে না। তাছাড়া সেরকম পাখী একলা এই পাহাড়ের চূড়ায় কি করে আসবে!

ভালো করে একটু খোঁজ নেবার জন্যে সন্তর্পণে যেই একটু এগিয়েছি, অমনি বিরাট পাখীটা হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে কি একটা চীৎকার করে উঠল।

পরমুহূর্তে হঠাৎ চমকাবার দরুনই হোক বা তলার পাথর সরে গিয়েই হোক সে সশব্দে আগ্নেয়গিরির মুখের ভেতর গড়িয়ে পড়ল এবং এক লাফে তাকে ধরতে গিয়ে দেখলাম সঙ্গে সঙ্গে আমিও সবেগে নিচে গড়িয়ে যাচ্ছি।

একেবারে নিচে এসে গড়িয়ে পড়ার পর জখম খুব বেশী না হলেও আরেক দিক দিয়ে অবস্থা যা হল তা বর্ণনা করা যায় না।

দারুণ গ্রীষ্মের দিনে দার্জিলিঙ থেকে শিলিগুড়িতে নামলে যে অবস্থা হয় তা এর কাছে কিছুই নয়। পাহাড়ের ওপর ছিল দক্ষিণ মেরুর দুরন্ত শীত আর পাহাড়ের এই গহ্বরের তলায় একেবারে যেন আফ্রিকার কঙ্গোর জঙ্গলের দারুণ ভ্যাপ্‌সা গরম। সমস্ত শরীর জ্বলে গিয়ে যেন দম বন্ধ হয়ে মরে যাবার যোগাড় হল।

যার জন্যে এই গহ্বরে পড়তে হল সেও তখন উঠে বসে আমার দিকে অবাক্ হয়ে তাকিয়ে আছে। বিরাট কোনো অজানা পাখী নয়, সে আমারই বন্ধু সেন।

সেনের মুখে সমুদ্র থেকে উদ্ধার পাওয়া আর পাখী সাজার বৃত্তান্ত তারপর শুনলাম। আমার মত সমুদ্রের ঢেউ তাকেও তুষার-তীরের ওপর ফেলে যায়। কিন্তু আমার মত রবারের তাঁবুর সুবিধে না থাকায় শীতে প্রাণ বাঁচাবার জন্যে কয়েকটা পেঙ্গুইন পাখী মেরে তাদের চামড়া আর পালক তাকে গায়ে আঁটতে হয়। তারপর গরম জলের স্রোত দেখে আমারই মত কৌতূহলী হয়ে সে এই পাহাড়ের সন্ধানে আসে।

অন্য সময় হ'লে এ গল্প হয়ত যথেষ্ট উপভোগ করতাম, কিন্তু দারুণ গরমে যখন প্রাণ যাবার উপক্রম তখন অন্য কিছুতে কি মন যায়!

দু'দিন দু'রাত সেই আগ্নেয়গিরির খোল থেকে বেরুবার প্রাণপণ চেষ্টা করলাম, কিন্তু কোন ফল হল না। চারধারে পাথরের দেওয়াল কতকটা ঢালু হলেও এমন উল্টোভাবে খাঁজ-কাটা যে তা বেয়ে গড়িয়ে পড়া সহজ হলেও ওঠা একেবারে অসম্ভব।

ইতিমধ্যে আগ্নেয়গিরির গরম জলের স্রোতের রহস্য আমরা বুঝে ফেলেছি। যে খোলের ভেতর আমরা পড়েছি তার দু'দিকে দুটি ছোট ছোট ফোকর আছে। একদিকের ফোকর দিয়ে বাইরের তুষার ভেতরে এসে মাঝখানের একটা কড়াই-এর মত গর্তে জমা হয়ে নিচেকার প্রচণ্ড উত্তাপে ফুটে উঠছে। তারপর সেই ফুটন্ত জল আর একদিকের ঢালু ফোকর দিয়ে স্রোত হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। নামবামাত্র একেবারে সেদ্ধ হয়ে যাবার ভয় না থাকলে সেই স্রোতের জলের সঙ্গেই বেরুবার চেষ্টা হয়ত আমরা করতাম, কিন্তু তার কোনো উপায় নেই।

এদিকে প্রচণ্ড গরমে মারা যাবার আগেই আমাদের পাগল হবার উপক্রম। আগ্নেয়গিরিটা এখনও একরকম ঘুমন্ত বলা চলে। স্রোতের জলকে ফুটিয়ে তোলা ছাড়া তার কোন উপদ্রব এখনও দেখা দেয় নি। কিন্তু দেখা দিতে কতক্ষণ!

বাইরের তুষার-প্রান্তরে থাকলেও খুব বেশী দিন আমরা বেঁচে থাকতে পারতাম না জানি কিন্তু এই বন্ধ গুহায় মরার চেয়ে সে যেন অনেক ভালো।

দ'দিন দ'রাত ধরে এ গহ্বর থেকে বেরুবার ব্যর্থ চেষ্টায় হয়রান হয়ে সেনকে সেই কথা বলতে গিয়ে রাগের মাথায় ছড়িটা যেই গহ্বরের মেঝেতে ঠুকেছি অমনি এক ভয়ংকর আশ্চর্য কাণ্ড ঘটে গেল।

দমকলের মুখ দিয়ে যেমন তোড়ে জল বেরোয় আমার ছড়ির ডগায় মেঝের সেই জায়গাটা ফুটো হয়ে তেমনি প্রচণ্ড বেগে সাতটা ইঞ্জিনের শিষের মত আওয়াজ করে ধোঁয়াটে গ্যাসের পিচকিরি আগ্নেয়গিরির মুখ ছাড়িয়ে লাফিয়ে উঠল। গ্যাসের সে ফোয়ারা আর থামে না।

সেই গ্যাসের তোড়েই সে যাত্রা বেঁচে গেলাম—বলে ঘনাদা থামলেন।

অবাক্ হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, গ্যাসের তোড়ে বাঁচলেন কি রকম?

একটু অনুকম্পার হাসি হেসে ঘনাদা বললেন,—এটা আর বুঝতে পারলে না? কোমরে যে তাঁবুটা বাঁধা ছিল সেটা খুলে ধরে গ্যাসে ভর্তি করে নিলাম। তারপর দুজনে সেই বেলুনের দু'দিকে দড়ি দিয়ে নিজেদের বেঁধে হাওয়ায় ভেসে গহ্বর থেকে বেরিয়ে এলাম।

এই বেলুনেই দক্ষিণ মেরু থেকে দেশে পৌঁছলেন নাকি?—গৌর গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করলে।

না, ও বেলুনে আর কতদূর যাওয়া যায়! ঘনাদা একটু যেন বিরক্ত হয়ে বললেন,—সে বেলুন থেকে গিয়ে পড়লাম এক পাহাড়ের ওপর। সাধারণ পাহাড় সেটা নয়,—বিরাট Iceberg অর্থাৎ বরফের পাহাড়। এই সময়ে এই সব বরফের পাহাড় ঝড়ের বেগে ক্রমশ উত্তর দিকে ভেসে যেতে যেতে গলতে থাকে। আমাদের পাহাড়টা যখন গলতে গলতে কোন-রকমে দুজনের দাঁড়াবার মত ছোট হয়ে এসেছে তখন ভাগ্যক্রমে একটা তিমি-ধরা জাহাজ সেইখান দিয়ে যেতে যেতে আমাদের দেখতে পেয়ে আমাদের তুলে নেয়। আমরা ভাসতে ভাসতে যে ম্যাকওয়ারী দ্বীপ পর্যন্ত এসে পড়েছিলাম তা ভাবতেও পারিনি।

ঘনাদা বলা শেষ করে শিশিরের দিকে ২৩৯৯তম সিগারেট ধার করবার জন্যে হাত বাড়ালেন।

গৌর হঠাৎ বলে উঠল,—ছড়িটা আপনি সাউথ জর্জিয়া থেকে কিনেছিলেন বললেন না! আমাদের পাড়ার মিত্র ব্রাদার্সও বোধহয় সেখান থেকে ছড়ি আমদানি করছে আজকাল। ঠিক এইরকম ছড়ি সেখানে কটা দেখলাম যেন!

ঘনাদার সিগারেট ধার করা আর হল না। আমাদের, বিশেষ করে গৌরের দিকে অগ্নি-দৃষ্টি হেনে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

লাট্টু

ঘনাদা গম্ভীরভাবে বললেন, 'না, প্লেন নয়, লাট্টু।'

কোন্ সূত্রে আমাদের একেবারে থ' করে দিয়ে ঘনাদা এ-কথা বললেন, সেইটে আগে তাহ'লে বলি।

পুজোর সময় দার্জিলিং যাবার কথা হচ্ছিলো। ট্রেনে যাওয়ার হাঙ্গামও যত, সময়ও তত বেশী লাগে। তাই প্লেনেই যাবার ব্যবস্থা ঠিক করছিলাম। ট্রেনেই হোক আর প্লেনেই হোক ঘনাদার পক্ষে একই কথা হওয়া উচিত। কারণ, আসলে পরস্মৈপদী হয়ে তিনি আমাদের ঘাড়ে চড়েই যাবেন। ঘাড় অবশ্য আমরা সাধ করেই পেতে দিয়েছি, বিদেশে তিনি সঙ্গে থাকলে একটু ভালো জমবে বলে। কিন্তু প্লেনের নাম শুনেই তিনি এমন বেঁকে দাঁড়াবেন কে জানতো!

গৌর একটু অবাক্ হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, 'প্লেনে যেতে আপনার আপত্তিটা কি? কোথায় একরাত একবেলা ঢিকিয়ে-ঢিকিয়ে যেতেন; তার বদলে, ঘণ্টা-দেড়েকেই সব ঝামেলা শেষ।'

ঘনাদার কিন্তু তবু ধনুক-ভাঙা পণ, প্লেনে তিনি কিছুতেই চড়বেন না।

অনেকক্ষণ ধরে রাজী করাবার চেষ্টা করে আমরা শেষ পর্যন্ত চটেই গেলাম। শিবু তো বলেই ফেললে,—'ঘনাদার বোধহয় ভয় করে প্লেনে!'

ঘনাদা তার দিকে যে দৃষ্টিটা হানলেন, তাতে শিবুর ভস্ম হয়ে যাবার কথা। কিন্তু শিবুর বোধহয়, অ্যাসাবেস্টসের চামড়া। এ দৃষ্টির সামনেও বেশ অক্ষত থেকে সে আবার অম্লানবদনে জিজ্ঞাসা করলে,—'প্লেনে কখনও চড়েননি বুঝি, ঘনাদা?'

শুধু চোখের দৃষ্টিতে এ অপমানের উত্তর দেওয়া যায় না, তাই ঘনাদা এবার মুখ খুললেন। যতখানি সম্ভব অবজ্ঞার সঙ্গে বললেন,—'প্লেনে চড়া ছেড়ে দিয়েছি।'

'ছেড়ে দিয়েছেন? কি দুঃখে?'—এবার প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপটা শিশিরের।

এর ওপর আবার একটু ফোড়ন দিয়ে গৌর বললে,—'অত ধীরে-সুস্থে যাওয়া বোধহয় ঘনাদার পছন্দ না। ঘণ্টায় মাত্র তিন-চার শ' মাইলে কি ঘনাদার পোষায়!'

'আহা, তিন চার-শ' কেন?'—শিবু প্রতিবাদ করলে, 'জেট্-প্লেন তো রয়েছে। ঘণ্টায় শুনি, ছ শ' মাইলও ছাড়িয়ে যায়।'

ঘণ্টায় ছ শ' মাইলের ওপর শুনেও ঘনাদার মুখে যে অবজ্ঞার হাসি ফুটে উঠলো তাইতে অবাক্ হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—'ঘনাদা যে জেট্-প্লেনে চড়েছেন, তার বেগ বুঝি এর চেয়েও বেশী?'

ঘনাদা আমাদের স্তম্ভিত ক'রে বললেন,—'হ্যাঁ, কিন্তু তা জেট্-প্লেন নয়।'

'জেট্-প্লেন নয়? তাহ'লে অন্য কোন প্লেন তো বটে?'—আমরা হতভম্ব হয়ে প্রশ্ন করলাম।

কয়েক সেকেণ্ড আমাদের দিকে অনুকম্পাভরে তাকিয়ে ঘনাদা বললেন,—'না, প্লেন নয়, লাট্টু।'

এই লাট্টু শুনেই বিস্ময়-বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়ে আমাদের মুখে আর কথাই সরলো না।

ঘনাদাই এবার করুণা করে তাঁর মন্তব্য পরিষ্কার ক'রে বললেন,—'হ্যাঁ, লাট্টু,—কিন্তু

সে শুধু চেহারায়। তবে লোহার আলবাঁধা যে লাট্টু ছেলেবেলা ঘুরিয়েছো সে লাট্টু নয়, অনেকটা ছোটদের খেলার কলের লাট্টুর মত—চেপ্টা চাকতির মত সেগুলো দেখতে।'

এ পর্যন্ত শুনেই আমরা তখন পরে কি আসছে বুঝে, প্রস্তুত হয়ে বসে গেছি। আমাদের ওপর একবার চোখ বুলিয়ে ঘনাদা শুরু করলেন,—'চার বছর আগে জানুয়ারী মাসের এক দুপুরবেলা ইংলণ্ড থেকে আমেরিকায় ত্রিশ জন যাত্রী নিয়ে যেতে-যেতে একটি মাঝারি আকারের ড্যাকোটা বিমান আশ্চর্যভাবে যে নিখোঁজ হয়, এ খবর অনেকেরই হয়তো আর মনে নেই। এ দেশে না হোক, ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় এই নিয়ে তখন কিন্তু দারুণ উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল। এ উত্তেজনা কিন্তু বেশী দিন থাকেনি। প্লেনের মালিকেরা ও মার্কিণ সামরিক-বিভাগ একটা কৈফিয়ত দিয়ে সকলকে ঠাণ্ডা ক'রে দিয়ে দিলেন। কৈফিয়তটা কিন্তু সম্পূর্ণ মিথ্যা।

উড়ো জাহাজটির নিখোঁজ হওয়া সত্যিই একটু অদ্ভুত ধরনের। জল-ঝড় নেই, প্লেনের যন্ত্রপাতির কোনো গোলমাল হয়নি, তবু একেবারে আমেরিকার কূলের কাছে এসে শূন্য-আকাশে সকলের চোখের সামনে যেন উড়োজাহাজটি হাওয়ায় মিলিয়ে যায়।

সকলের চোখের সামনে কথাটা একটু ঘুরিয়ে বলছি মাত্র। সত্যি-সত্যি চর্মচক্ষে না দেখলেও, অন্ততঃ দুটো এরোড্রোম ও একটি বোমারু-বিমানের 'র‍্যাডার-স্ক্রীন' তখন সেই প্লেনটির সমস্ত গতিবিধি লক্ষ্য করছে।

এই ঘটনার আধ মিনিট আগেও যাত্রীবাহী প্লেনটির সঠিক অবস্থান জানা গিয়েছে। ক্যানাডার পূর্বদিকে সমুদ্রের একেবারে ধারে—নোভা স্কোসিয়া। সেই নোভা স্কোসিয়ার লিভারপুলে. নয় হ্যালিফ্যাক্সের উড়ো জাহাজের ঘাঁটিতেই যে প্লেনটি নামতে যাচ্ছে, সে কথাও তখন অজানা নেই। কিন্তু তারপরই লিভারপুল ও হ্যালিফ্যাক্স দুই জায়গায় এরোড্রোমের র‍্যাডার-স্ক্রীন হঠাৎ অদ্ভুতভাবে নীরব হয়ে গেছে।

ইংলণ্ড থেকে আমেরিকা যাবার প্লেন, যুক্তরাষ্ট্রের কোনো ঘাঁটিতে না নেমে, নিরাপদ অবস্থাতেও ক্যানাডার মাটিতে কেন নামতে যাচ্ছিলো সেটা একটা রহস্য মনে হতে পারে। যে কাহিনী বলতে যাচ্ছি, ওই রহস্যটুকু গোড়ায় না থাকলে তার সূত্রপাতই হতো না।

ইংলণ্ডের ক্রয়ডেন-এরোড্রোম থেকে উড়োজাহাজটি যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশেই রওনা হয়। কিন্তু কয়েক ঘণ্টা পার হবার পরই প্লেনের বেতার-যন্ত্রী একটি জরুরী আদেশ পায় ইংলণ্ড থেকে—প্লেন যেন অবিলম্বে ইংলণ্ডে ফিরিয়ে আনা হয়।

আদেশের মর্ম না বুঝলেও, প্লেনের পাইলটের তা পালন করা অবশ্য কর্তব্য। ইংলণ্ডের দিকেই আবার প্লেনের মুখ তাই ঘোরানো হয়, কিন্তু এ ব্যাপারে বিস্মিত ও বিরক্ত হওয়া যাদের পক্ষে স্বাভাবিক, সেই যাত্রীরা খানিক বাদেই বুঝতে পারে যে, কিছুদূর গিয়েই প্লেন আবার আমেরিকার দিকেই ফিরছে।

ব্যাপারটা তাদের কাছে দুর্বোধ্য হলেও, ইংলণ্ডের সামরিক ও পুলিশ-বিভাগের কর্তাদের কাছে তখন আর নয়।

সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্যক্রমে জানি না, ক্রয়ডেনের পুলিশকর্তা মিঃ ডোনাটের বাড়ী সেই-দিনই আমি অতিথি। মিঃ ডোনাট্ এককালে নিউগিনির পোর্ট মোরেসবি বন্দরে কাজ করতেন। সেখানে গত যুদ্ধের আগে একটি জাপানী গুপ্তচরদের চক্রান্ত ধরে দেওয়ার ব্যাপারে আমি তাঁকে সাহায্য করেছিলাম। মিঃ ডোনাট্ সে ঋণের কথা ভোলেননি। যুদ্ধের পর ইংলণ্ডে একরকম বেড়াতেই গেছি। কি ক'রে জানি না, আমার খোঁজ পেয়ে ডোনাট্ সাদরে তাঁর বাড়ীতে আমায় নিমন্ত্রণ ক'রে পাঠান।

সাদর নিমন্ত্রণ করলেও, অতিথির সম্মান রাখা সেদিন তাঁর ভাগ্যে নেই। খাবার টেবিলে বসে সবে সুপের প্লেট শেষ করেছি, এমন সময় পাশের ঘরে তাঁর ফোন বেজে উঠলো। মিঃ

ডোনাট্ বিরক্ত হয়েই খাবার ফেলে উঠে গেলেন, কিন্তু ফোন সেরে ফিরে যখন এলেন তখন তাঁর মুখ আষাঢ়ের মেঘের মত গম্ভীর।

'কি ক'রে আপনার কাছে যে ক্ষমা চাইবো বুঝতে পারছি না, মিঃ দাস, কিন্তু আপনাকে একলা ফেলে এখুনি আমার না গেলে নয়।'—মিঃ ডোনাট্ যে অত্যন্ত অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছেন তা তাঁর গলার স্বরেই বোঝা গেল।

তাঁকে আশ্বস্ত ক'রে হেসে বললাম,—'আপনি বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হবেন না। পুলিশের চাকরির মজাই যে এই, তা কি আমি জানি না মনে করেছেন। এখন ব্যাপারটা কি? খুন-জখম নিশ্চয়?'

'খুন-জখম!'—মিঃ ডোনাট্ একটু দুঃখের হাসি হেসে, টুপিটা মাথায় দিয়ে বেরিয়ে যেতে যেতে বললেন, 'খুন-জখম হলেই ভালো হতো, তাহ'লে অন্ততঃ এই এক সেকেণ্ডের নোটিশে, তিন হাজার মাইল পাড়ি দিতে হতো না।'

আমার মাথাটি কথার শেষের এই ধাঁধায় গুলিয়ে দিয়ে মিঃ ডোনাট্ বেরিয়ে গেলেন। খাওয়ায় তখন আর আমার রুচি নেই, তবু গৃহস্বামীর মান রাখতে যথাসাধ্য সেদিকে মন দিয়ে ব্যাপারটার অর্থ বোঝবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু খানিক বাদেই অবাক্ হয়ে দেখি, মিঃ ডোনাট্ আবার ফিরে এসেছেন।

ঘরে ঢুকেই উত্তেজিতভাবে তিনি বললেন,—'আচ্ছা, মিঃ দাস, সেনর গ্যালিকো সম্বন্ধে আপনি কিছু জানেন?'

হেসে বললাম,—'আমায় এমন সবজান্তা মনে করছেন কেন, যে দুনিয়ার যে-কোনো একটা নাম শুনলেই পরিচয় বলতে পারবো?'

মিঃ ডোনাট্ বেশ একটু অধৈর্যের সঙ্গেই বললেন,—'রসিকতার সময় নেই মিঃ দাস। দু'এক মুহূর্তের দেরিতে হয়তো সমস্ত ইউরোপের সর্বনাশ হয়ে যেতে পারে। সেনর গ্যালিকো সম্বন্ধে যা জানেন, বলুন তাড়াতাড়ি!'

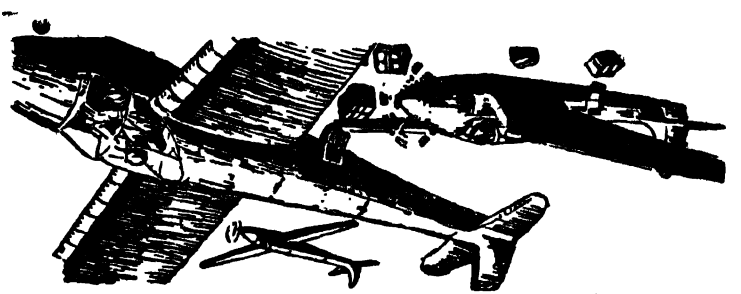

মিঃ ডোনাটের গলার স্বরে বুঝলাম, সত্যিই ব্যাপারটা গুরুতর। বললাম,—'সেনর গ্যালিকো সম্বন্ধে কি আপনি জানতে চান, বুঝতে পারছি না। গ্যালিকো তার শত নামের একটিমাত্র, একটা নিশ্চয় জানেন? দুনিয়ায় আজ পর্যন্ত অত বড় গুপ্তচর যে জন্মায়নি, তাও নিশ্চয় আপনাকে বলে দিতে হবে না।'

'হ্যাঁ সে-সব জানি। কিন্তু গত যুদ্ধের শেষ দিকে প্লেন থেকে সাবমেরিনে ব্রেজিলে পালাতে গিয়ে সে যে সাবমেরিন-ডুবি হয়ে মারা যায় বলে' খবর রটেছিল, তা সত্যি কিনা?

'সে কথা তো আমার চেয়ে আপনাদেরই ভালো জানবার কথা।'

মিঃ ডোনাট্ এবার বেশ বিরক্ত হয়েই উঠলেন, 'কেন মিছে কথা বাড়াচ্ছেন, মিঃ দাস। যদি কিছু জানেন তো, তাড়াতাড়ি বলুন।'

মিঃ ডোনাটের বিরক্তিতে হেসে ফেলে বললাম,—'বেশ, বলছি শুনুন। সেনর গ্যালিকো সাবমেরিন-ডুবি হয়ে মারা যায়নি। নিজের মৃত্যুর মিথ্যে খবর রটিয়ে সে এতদিন বেশ বহাল-তবিয়তে আর্জেনটাইনে কাটিয়েছে বলেই আমি জানি। কিন্তু এতবড় জরুরী খবর যার কাছে জেনে নিচ্ছেন, ব্যাপারটা আসলে কি, তার তা জানবার অধিকার নেই?'

'খুব আছে। সব কথা, যেতে-যেতেই বলবো। আসুন।'

অবাক্ হয়ে বললাম,—'সে কি! আমি যাবো কোথায়?'

'কোথায় তা এখনও জানি না। কিন্তু আপনাকে আসতেই হবে আমার সঙ্গে মিঃ দাস। সেনর গ্যালিকোর ছদ্মবেশ ভেদ করে তাকে চেনার মত দ্বিতীয় লোক এখন আর আমাদের হাতের কাছে নেই।'

গাড়ী বাইরেই তৈরী ছিল। রাস্তার নিয়মকানুন, হেলায় লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে বিদ্যুৎ-বেগে সে গাড়ী, মিনিট কয়েকের মধ্যেই দেখলাম, ক্রয়ডেন এরোড্রোমেই আমাদের পেঁাছে দিলে।

সেখানে নেমে, বৃটিশ সামরিক-বিভাগের যে মহাশয় ব্যক্তিটিকে দেখা গেল, ব্যাপারটা অত্যন্ত গুরুতর না হলে তিনি সশরীরে সেখানে হাজির থাকিতেন না।

আমাকে দেখে মিঃ ডোনাট্‌কে কাছে ডেকে তিনি নীচু-গলায় কি জেনে নিলেন, তারপর এগিয়ে এসে আমার করমর্দন করে' বললেন,—'আপনি যে সাহায্য আমাদের করতে এসেছেন, তার জন্যে সমস্ত ইউরোপ আপনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে।'

হঠাৎ শিবুর কাশিতে ঘনাদার কথায় ছেদ পড়লো। শিবুর কাশির ধরনটা সত্যি বড় বেয়াড়া। হাসি চাপতে গিয়ে কাশি বলে, যদি কেউ তাকে সন্দেহ করে, তাকে খুব দোষ দেওয়া যায় না।

কাশি শুনেই ঘনাদার মুখের চেহারা যা হলো, তাতে মাঝ-নদীতে ভরাডুবি হবার ভয়ে আমরা সবাই শিবুর ওপর একেবারে মারমুখো হয়ে উঠলাম।

'কাশবার আর সময় পেলি না!' গৌর ধমকে উঠলো।

'অত যদি কাশি, তো 'বাসক সিরাপ' খেলেই হয়।' শিশির মন্তব্য করলে রূঢ়ভাবে।

'কাশি পায় তো, বাইরে গিয়ে বোস্!'—আমিও বকুনি দিতে ছাড়লাম না।

বলা বাহুল্য, শিবুর কাশি তৎক্ষণাৎ থেমে গেল এবং ঘনাদা শান্ত হয়ে আবার শুরু করলেন :

হেসে তখন বললাম,—'ইউরোপের কৃতজ্ঞতায় আমার কোনো লোভ নেই। গ্যালিকোর কাছে আমার একটা পুরনো দেনা আছে শোধ দেবার; আমি সেই আশাতেই যাচ্ছি।'

কিছু দূরে যে বিরাট অদ্ভুত চেহারার প্লেনটা দাঁড়িয়ে ছিল, সেই দিকেই এবার সবাই অগ্রসর হলাম।

প্লেনের কাছে এসে দ্বিধাভরে দাঁড়িয়ে পড়ে' সামরিক-বিভাগের বড়কর্তা আমায় বললেন,—'একটা বিপদের কথা কিন্তু আপনাকে আগে বোধহয় জানিয়ে দেওয়া দরকার, মিঃ দাস। মিঃ ডোনাট্ তাঁর দেশের জন্যে কর্তব্যের ডাকে যাচ্ছেন, কিন্তু আপনি এসেছেন, স্বেচ্ছায় সাহায্য করতে। যে প্লেনে আপনাদের পাঠাচ্ছি—'

তাঁর কথায় বাধা দিয়ে হেসে বললাম,—'সেটা কয়েকদিন আগে টেম্‌সের খাঁড়ির ওপর যে জেট্-প্লেন ফেটে গিয়ে মিঃ জিওফ্রে ডে হ্যাভিল্যাণ্ড প্রাণ হারান, তারই যমজ বলা যায়। আমি দেখেই তা চিনেছি। সুতরাং আপনার সংকুচিত হবার কিছু নেই।'

সামরিক বড়-কর্তার নির্বাক বিস্ময়টুকু উপভোগ করেই প্লেনের ভেতরে গিয়ে উঠলাম।

শব্দের চেয়ে যা আগে ছোটে, সেই সুপারসোনিক জেট্ বম্বার-এ উল্কাবেগে অতলান্তিক সাগরের ওপর দিয়ে উড়ে যেতে-যেতে ডোনাটের কাছে সমস্ত ব্যাপারটাই ভালো করে জেনে নিলাম।

ব্যাপারটা সংক্ষেপে এই—কিছুদিন থেকেই ইংলণ্ডের কর্তাব্যক্তিরা সন্দেহ করছিলেন যে অত্যন্ত চতুর কোন গুপ্তচরের কারসাজিতে সামরিকবিভাগের অত্যন্ত গোপন সব সংবাদ কিভাবে যেন অদৃশ্য ছিদ্র-পথে বার হয়ে যাচ্ছে। ঠিক আগের দিনই সে সন্দেহ যে মিথ্যা নয়, তার নির্ভুল প্রমাণ পাওয়া যায়। দেশরক্ষা-বিভাগের একজন বড়-কর্তার সুরক্ষিত সিন্দুক থেকে অত্যন্ত মূল্যবান একটি তাড়া কাগজ আশ্চর্যভাবে উধাও হয়ে গেছে। 'ফাইল'টি তার আগের দিনই সে-সিন্দুকে রাখা হয়। এ 'ফাইলে' এমন কিছু আছে, শত্রুপক্ষ যা জানতে পারলে শুধু ইংলণ্ড নয়,—ইউরোপেরও সর্বনাশ হয়ে যাবে। খবরের কাগজে এসব কথা জানানো যায় না। পুলিশ ও গোয়েন্দা বিভাগ তাই গোপনে যা করবার সবই করেছে। ফাইল কিভাবে চুরি গেছে তারা এখনও বুঝতে পারে নি, কিন্তু 'ফাইল'-এর সঙ্গে দেশরক্ষা-বিভাগের অফিস থেকে নগণ্য যে একজন চাকর উধাও হয়ে গেছে,—তার খোঁজ করতে গিয়ে কেঁচো খুঁড়তে গোখরোর সন্ধান তারা পেয়েছে। চুরির অপরূপ কৌশল দেখে তাদের ধারণা হয়েছে যে, বিশ্ববিখ্যাত গুপ্তচর সেনর গ্যালিকোরই কাজ এটা। কিন্তু সেনর গ্যালিকো বছর চারেক হলো মারা গেছে বলে সবাই জানে। তা সত্ত্বেও এ মূল্যবান কাগজপত্র যেসব পথে ইংলণ্ড থেকে বেরিয়ে যেতে পারে, তার সবগুলির ওপরই গোয়েন্দা-বিভাগ কড়া নজর রেখেছে। যে প্লেনটি ক্রয়ডেন থেকে আমেরিকায় রওনা হয়, তার যাত্রীদের মধ্যেও একজন গোয়েন্দাকে সেজন্যে রাখা হয়। প্লেনটি ছাড়বার সময় তার সমস্ত যাত্রীর পরিচয়ই অবশ্য ভালো করে খুঁটিয়ে দেখা হয়। তাদের কারুর পরিচয়েই কোনো খুঁত পাওয়া যায় নি। তা সত্ত্বেও প্লেনটি ছেড়ে যাবার পরই গোয়েন্দা পুলিস এমন একটি সূত্র পায়, যাতে মনে হয়, ওই প্লেনেই গুপ্তচর তার চুরির মাল নিয়ে পালিয়েছে। তৎক্ষণাৎ বেতার-টেলিগ্রামে প্লেনটিকে তাই ফিরে আসবার আদেশ দেওয়া হয়। প্লেনটি ফিরেও আসছিল, কিন্তু হঠাৎ মাঝপথে কি যে হয় কিছুই বোঝা যায় না। প্লেনটি ইংলণ্ডের দিকে না এসে, আবার ওপারের দিকেই যাত্রা করে। আমেরিকা ও কানাডার পূর্ব-উপকূলের সমস্ত এরোড্রোম ও সামরিক ঘাঁটিকেই তখন সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে, প্লেনটির অপেক্ষায় সতর্ক থাকবার জন্যে। গুপ্তচর যদি সেনর গ্যালিকোই হয়,—তাহ'লে অবশ্য তার মত ধড়িবাজ না বার করতে পারে, এমন ফন্দি নেই। বিরাট আমেরিকার পূর্ব-উপকূলে যে কোনো জায়গায় নেমে সে সরে পড়তে পারে। তাই আমেরিকার যেখানে যত ঘাঁটি আছে, তারা তো র‍্যাডার-স্ক্রীনে আকাশের সমস্ত দিকের ওপর কড়া নজর রাখছেই, আমাদের এই পৃথিবীর সবচেয়ে দ্রুতগামী সুপারসোনিক বম্বারও পেছনে ছুটছে তাকে ধরবার জন্যে। যাত্রীবাহী প্লেনটি কয়েক ঘণ্টার সুবিধে পেয়েছে সত্য, কিন্তু তার দৌড় ঘণ্টায় বড়-জোর সাড়ে-তিন শ মাইল। আমাদের জেট-বম্বার যেভাবে দূরত্বকে গিলে খায়, তাতে কয়েক ঘণ্টার তফাত তার কাছে কিছু নয়।

কথাটা যে কতখানি সত্য, কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তার প্রমাণ পাওয়া গেল। আমাদের র‍্যাডার-অপারেটার হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে জানালে, তার র‍্যাডার-স্ক্রীনে একটি উড়ো জাহাজের সন্ধান সে পেয়েছে। আমরা যাকে শিকার করতে যাচ্ছি, সেই যাত্রীবাহী প্লেনটি বলেই মনে হয়। আমাদের বম্বারের বেগ, পাঁচ শ থেকে ছ'শ মাইল বাড়িয়ে দেওয়া হলো। আমরা আমেরিকার উপকূলের কাছে এসে পড়েছি। আর খানিক বাদে শুধু র‍্যাডার-স্ক্রীনে নয়, প্লেনটিকে চোখেই বোধ হয় দেখা যাবে।

মিঃ ডোনাট্ ও আমি তখন র‍্যাডার-যন্ত্রীর পাশে দাঁড়িয়ে তার স্ক্রীনের দিকে উদ্‌গ্রীব হয়ে চেয়ে আছি।

মিঃ ডোনাট্ বুঝি কিছুক্ষণের জন্যে অন্যমনস্ক হয়ে সামনের কাঁচের ভেতর দিয়ে বাহিরের দিকে চেয়ে ছিলেন। হঠাৎ তিনি চিৎকার করে উঠলেন,—'ওটা আবার কি!'

চমকে মুখ তুলে সামনের দিকে তাকিয়ে যা দেখতে পেলাম, তাতে একেবারে হতভম্ব হয়ে গেলাম। উইণ্ড-শিল্ডের কাঁচের ভেতর দিয়ে, সামনের সমস্ত আকাশটাই দেখা যায়। সেই আকাশ-

পটের এক প্রান্ত থেকে একটি অদ্ভুত আকারের জিনিস প্রায় বিদ্যুৎগতিতে—আমাদের সামনে দিয়ে দেখতে দেখতে পার হয়ে গেল।

আমরা যা খালি চোখে দেখেছি, র‍্যাডার অপারেটরও তার পর্দায় তার আভাস তখন পেয়েছে। অবাক্ হয়ে সে জিজ্ঞাসা করলে,—'এটা আবার কি ব্যাপার! বিরাট কোনো উল্কা নাকি!'

উল্কা যে হতেই পারে না, তা তখন ভালো ভাবেই বুঝেছি। কিন্তু সুপারসোনিক জেট্-বম্বারকে দ্রুতগতির পাল্লায় যা গরুর গাড়ীর মত পেছনে ফেলে যেতে পারে—সে আকাশ-যান যে কি ও কাদের হতে পারে, ভেবে কোনো হদিস্ পেলাম না।

যত অদ্ভুত ব্যাপারই হোক, আমরা যে উদ্দেশ্যে চলেছি, তা ছাড়া অন্য কিছুতেই আমাদের মন দেওয়া তখন উচিত নয়। কিন্তু হঠাৎ সেদিকেও আশ্চর্যভাবে বাধা পাবো কে জানতো।

র‍্যাডার-স্ক্রীন থেকে বুঝতে পারছিলাম, আমাদের সামনের প্লেনটি আর বেশী দূরে নেই। বড়-জোর কুড়ি-পঁচিশ মিনিটের মধ্যেই তাকে আমরা ধরে ফেলবো। কিন্তু হঠাৎ আমাদের স্তম্ভিত করে' র‍্যাডার-স্ক্রীনটা যেন ঝাপসা হয়ে গেল। যন্ত্রপাতির কোনো গোলোযোগ মনে করে' অপারেটার সব-কিছু প্রাণপণে পরীক্ষা করে দেখলে, কিন্তু সেখানে কোনো ত্রুটিই পাওয়া গেল না।

কয়েক সেকেণ্ড বাদে,—যেভাবে ঝাপসা হয়ে গেছলো, সেইভাবেই পর্দা আবার পরিষ্কার হয়ে গেল বটে, কিন্তু চতুর্দিকে র‍্যাডার-তরঙ্গ পাঠিয়ে খোঁজ করেও আমাদের প্লেনটির আর কোন পাত্তা পাওয়া গেল না। হঠাৎ প্লেনটি যেন শূন্য আকাশে হাওয়ার মত মিলিয়ে গেছে।

এই ব্যাপার নিয়ে কাগজে কিছুদিন সোরগোলের পরই সামরিক বিবৃতিতে সব যে ঠাণ্ডা হয়ে যায় তা আগেই বলেছি। সামরিক বিবৃতিতে বলা হয় যে, প্লেনটি সমুদ্রের ওপরই ভেঙে পড়ে ডুবে গেছলো। র‍্যাডার-স্ক্রীন ঝাপসা হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা একেবারে অস্বীকার করা হয়।

কিন্তু, আসল কথা যে তা নয়, তা বলাই বাহুল্য। সাধারণে জানতে পারলে পাছে আতঙ্ক-গ্রস্ত হয়, সেইজন্যেই ওরকম মিথ্যে খবর দেওয়া হয়েছিল। সাধারণ লোককে আশ্বস্ত করলেও, দেশের ওপরওয়ালারা তখন রীতিমত চিন্তিত হয়ে উঠেছেন।

ইতিপূর্বে নানা দিকে—বিশেষ করে' আমেরিকার বহু জায়গা থেকে রহস্যজনক ওইরকম আকাশযানের সংবাদ বহুবার পাওয়া গেছে। দর্শকদের চোখের ভুল ও বাজে লোকের আজগুবি কল্পনা বলে' উড়িয়ে দিয়েও সাধারণের গুজব বন্ধ করা যায় নি। এবার সামরিক কর্তারা নিজেরাও মনে মনে স্বীকার করতে বাধ্য হ'লেন যে, সাধারণের গুজবের মধ্যে কিছু সত্য অবশ্যই আছে। বাইরে উচ্চবাচ্য না করলেও গোপনে গোপনে এ-বিষয়ে ব্যাকুলভাবে তাঁরা অনুসন্ধান চালাতে লাগলেন। সে অনুসন্ধানের কোনো ফলই কিন্তু পাওয়া গেল না। ব্যাপারটার কোন হদিস্ না পেয়ে তাঁরা ক্রমশ দিশাহারা হয়ে পড়লেন।

আজ পর্যন্ত দিশাহারা হয়েই তাঁদের থাকতে হতো, যদি—নিউ-ইয়র্কের বাজারে মিঙ্ক সেবল্ আর মাইন প্রভৃতি বিরল পশুলোমের দাম হঠাৎ অসম্ভব চড়ে না যেতো।

যাত্রী-প্লেনটির খোঁজ না পেয়ে আমরা তখন জেট-বম্বারে আমেরিকাতেই নেমে নিউ-ইয়র্কের এক হোটেলে আছি। দিন দুই বাদে, বিলেতেই আবার আমাদের ফিরে যাবার কথা। মিঃ ডোনাট্ আমার সঙ্গে এক ঘরেই ছিলেন। সেদিন সকালবেলা খবরের-কাগজ পড়তে পড়তে বিরক্ত হয়ে তিনি কাগজটা ফেলে দিয়ে বললেন,—'এমন হুজুগে-জাত দুনিয়ায় নেই!'

ইংরেজরা মনে-মনে মার্কিনদের ওপর একটু চটা জেনে হেসে জিজ্ঞাসা করলাম,—'মার্কিনদের আবার নতুন কি হুজুগ দেখলেন?'

কাগজটা তুলে আমার হাতে দিয়ে ডোনাট্ বললেন,—'দেখুন না, এত বড়-বড় কাণ্ড দুনিয়ায় চলছে, তার জায়গায় কোথায় ল্যাব্রাডরে পশুলোম দুষ্প্রাপ্য হয়েছে তাই নিয়ে কাগজে

হৈ-চৈ লাগিয়ে দিয়েছে। আবার কোন্ এস্কিমো শিকারী কি আজগুবি গল্প ফেনিয়ে বলেছে তাও সবিস্তারে ছাপা হয়েছে।

কাগজটা পড়ে দেখলাম, ডোনাট্ ঠিকই বলেছে। সেব্‌লে মিঙ্ক প্রভৃতি যে সব পশুলোম পৃথিবীর সেরা ধনীদের অত্যন্ত আদরের জিনিস, যে সব মেরুপ্রদেশ বিশেষ করে ল্যাব্রাডরের উত্তর-অঞ্চল থেকেই আমেরিকায় আসে। যারা ফাঁদ পেতে তুষার-অঞ্চলের এসব প্রাণী ধরে তাদের বলে—'ট্র্যাপার'। এ-বছর ট্র্যাপাররা তাদের শিকারের জায়গায় একটি প্রাণীর ল্যাজও দেখতে পায় নি। নানুক নামে সেখানকার একজন বুড়ো ট্র্যাপার নাকি এস্কিমোদের কাছে এ বিষয়ে একটা আজগুবি গল্পও শুনে এসেছে। গল্পটা এই যে, ল্যাব্রাডরে এককালে যে-দেবতাদের ভয়ে কোনো সাদা মানুষ পা দিতে সাহস করতো না, তাঁরা নাকি ফিরে আসছেন। পশু-পাখীরা তাই ল্যাব্রাডর ছেড়ে পালাচ্ছে। এর পর মানুষকেও পালাতে হবে।

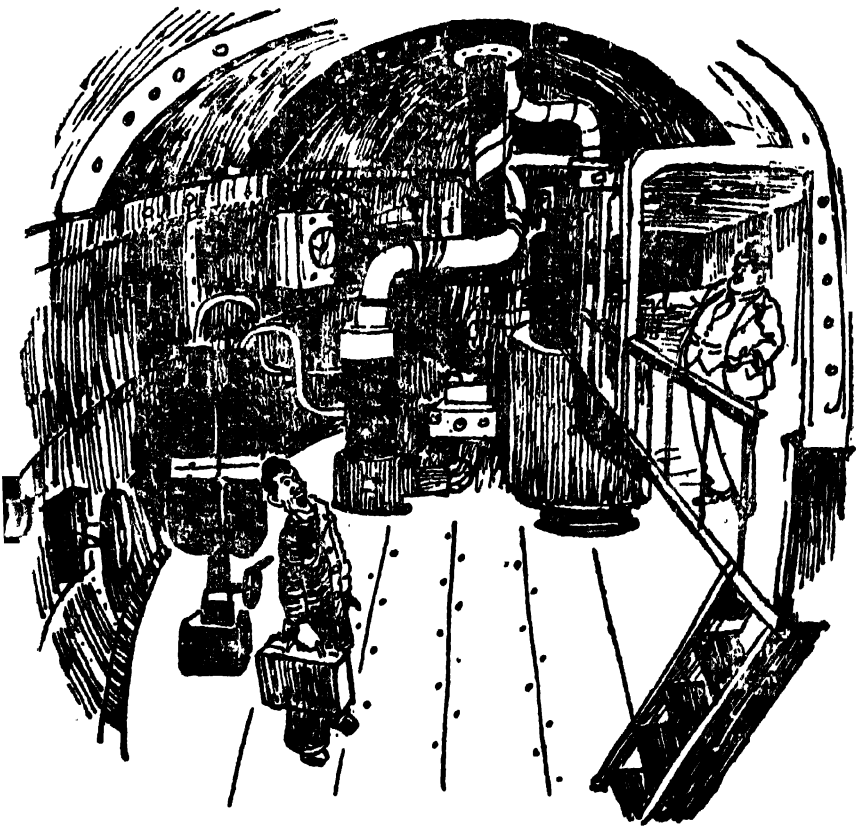

এ গল্পের সঙ্গে, পাশে আর একটা খবর পড়ে' আমি কিন্তু উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, 'মিঃ ডোনাট্, তৈরী হয়ে নাও। এখুনি আমাদের ল্যাব্রাডরে যেতে হবে।'

'তুমি কি পাগল হোলে নাকি!' মিঃ ডোনাট্ অবাক্ হয়ে বললেন, 'পরশু আমাদের বিলেতে যেতে হবে। এখন ল্যাব্রাডরে যাবো কি!'

'হ্যাঁ, ল্যাব্রাডরেই আমাদের যেতে হবে। বম্বার নিয়ে যাদের ফিরে যাবার তারা যাক। সেনর গ্যালিকো আর যাত্রী-প্লেনের রহস্য যদি ভেদ করতে চাও তো আমার সঙ্গে চলো।'

'কিন্তু যাবো কিসে? ল্যাব্রাডর তো আর বোস্টন সিকাগো নয় যে, ট্রেনে চেপে বসলেই হলো।'

'যাবো, প্লেন ভাড়া করে। তুমি তৈরী হও।'

প্লেন ভাড়া করে সেইদিনই ল্যাব্রাডরের ব্যাটল্-হারবারে গিয়ে নামলাম। সেখান থেকে—বিশেষ ধরনে তৈরী, কতকটা শালতির মত লম্বা মোটর-বোট ভাড়া করে হ্যামিলটন নদী দিয়ে চললাম, ডাইক-লেকের দিকে। ডাইক-হ্রদে পেঁাছোবার আগে লবস্টিক-হ্রদের কাছেই বিরাট হ্যামিলটন জলপ্রপাত। সেখানে পেঁাছে মোটর-বোট ছেড়ে, হাঁটা-পথে রওনা হলাম একজন পথ-প্রদর্শক নিয়ে। সে পথপ্রদর্শক আর কেউ নয়; নিউ-ইয়র্কের কাগজে যার গল্প বেরিয়েছিল সেই এস্কিমো ট্র্যাপার নানুক। ব্যাটল্-হারবারে নেমেই 'ফার' অর্থাৎ পশুলোমের ব্যবসাদারদের কাছে নানুকের খোঁজ করে' জেনেছিলাম, হ্যামিলটন-জলপ্রপাতের কাছে ট্র্যাপারদের প্রথম যে চটি আছে, সেখানেই তাকে পাওয়া যাবে। ব্যবসা মন্দা হওয়ার দরুন সে আজকাল সেই চটিতেই ফাইফরমাশ খেটে দিন কাটায়।

আমরা ডাইক-লেকেরও উত্তরে যেতে চাই শুনে প্রথমে নানুক আমাদের পথ দেখাতে রাজীই হয় নি। ভালোরকম বকশিশের লোভ দেখিয়ে শেষ পর্যন্ত তাকে রাজী করাই। রাজী হয়েও তার বিস্ময় কিন্তু সে চেপে রাখতে পারেনি। ডাইক-লেকের উত্তরে কোনো জানোয়ার পর্যন্ত আজকাল পাওয়া যায় না। সেখানে কি সুখে আমরা যেতে চাই?

তার কথার উত্তর না দিয়ে, পাল্টা প্রশ্ন করেছিলাম, 'হঠাৎ ও-অঞ্চলের অমন দুর্দশা হবার কারণ কি?'

নানুক এমনিতেই কম কথা বলে। এ-প্রশ্নের উত্তরে অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে বলেছিল, 'গেলেই জানতে পারা যাবে।'

জানতে সত্যিই শেষ পর্যন্ত পারা গেল। কিন্তু যা জানলাম তা সত্য, না স্বপ্ন, এখনো মাঝে-মাঝে সন্দেহ হয়।

পাঁচদিন হাঁটা-পথে চলবার পর আমরা সেদিন এ-অঞ্চলের শেষ একটি চটিতে রাত্রের মত আশ্রয় নিয়েছি। চটিটি অবশ্য পরিত্যক্ত। পশুলোম দুষ্প্রাপ্য হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, চটি যারা চালায় তারা নিরুপায় হয়ে চলে' গিয়েছে। শুধু জংলা-গাছের তৈরি তাদের আস্তানাটা আছে পড়ে।

রাত্রে খাওয়া-দাওয়া সেরে ঘুমোতে যাবো এমন সময় নানুক এসে খবর দিলে, জঙ্গলের পথে কে একজন লোক আমাদের এই চটির দিকেই আসছে।

পশুপক্ষী পর্যন্ত যেখানে নেই, সেই শ্মশান-রাজ্যে কে লোক এদিকে আসতে পারে! মিঃ ডোনাট্ তো অবাক্ হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন,—'এই অন্ধকারে, লোক আসছে, তুমি দেখলে কি করে?'

'দেখিনি, শুনতে পাচ্ছি!'—নানুক সংক্ষেপে জানালে।

কান পেতে আমরা কিন্তু কিছুই শুনতে পেলাম না। মিঃ ডোনাট্ বিরক্ত হয়ে নানুককে বকুনি দিতে যাচ্ছিলেন। তাঁকে বাধা দিয়ে বুঝিয়ে দিলাম যে, আমাদের কাছে যেমন ছাপানো বই, নানুকের কাছে তেমনি জঙ্গল। সে এখানে সামান্য ঝরাপাতা দেখে বা অস্ফুট একটা শব্দ শুনে যা বুঝতে পারে আমাদের পক্ষে তা অসাধ্য।

নানুকের কথা যে সত্যি, খানিকবাদেই তার প্রমাণ পাওয়া গেল। বাইরের পদশব্দ এবার আমরাও শুনতে পেলাম। কিন্তু কে এই লোক? বন্ধু, না শত্রু? এ-অঞ্চলের অ্যালগনকুইন-জাতির রেড-ইণ্ডিয়ানরা, শ্বেতাঙ্গদের অত্যাচারে আজকাল কখনো কখনো অত্যন্ত হিংস্র হয়ে

ওঠে। সুবিধে পেলে, নির্জন জায়গায় তারা যে খুনজখম করতে দ্বিধা করে না, তার যথেষ্ট নজির আছে।

পিস্তলটা বার করে তাই কোলের ওপর রাখলাম।

কিন্তু পিস্তলের কোনো প্রয়োজন হলো না।

ক্লান্তপদে প্রায় টলতে টলতে যে লোকটি কাঠের দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলো, তাকে দেখে মি. ডোনাট্ ও আমি দুজনেই অবাক্।

মিঃ ডোনাট্ উঠেই তাকে ধরে' ফেলে বললেন,—'একি, কর্ণেল মিচেল! আপনি এখানে কোথা থেকে?'

আমিও উঠে দাঁড়িয়ে লোকটাকে ধরেছিলাম। তাকে আমাদের বিছানার ওপর বসিয়ে দিয়ে মিঃ ডোনাটের দিকে অবাক্ হয়ে ফিরে জিজ্ঞাসা করলাম,—'কর্ণেল মিচেল কাকে বলছেন?'

'বাঃ—এই তো আমাদের সামরিক-বিভাগের গোয়েন্দা, কর্ণেল মিচেল। যাত্রী-ট্রেনে, ইনিই তো পাহারা দেবার জন্যে ছিলেন।'

'তাই নাকি!' একটু হেসে বললাম, আমি কিন্তু এঁর আরেকটা নাম জানি।'

'আরেকটা নাম!' মিঃ ডোনাট অবাক্।

'হ্যাঁ। সে নাম হলো—সেনর গ্যালিকো।'

'না, আপনাকে ফাঁকি দেওয়া অসম্ভব, মিঃ দাস।' ক্লান্তভাবে একটু হেসে গ্যালিকো তার জামার ভেতরের পকেট থেকে একটি কাগজের প্যাকেট বার করে আমার হাতে দিয়ে বললে, 'যার জন্যে এতদূর ধাওয়া করেছেন, এই নিন সেই ফাইল। এতে আর আমার দরকার নেই। গুপ্তচরবৃত্তি আমার শেষ।'

কঠিনস্বরে বললাম,—'তোমাকে আমি চিনি গ্যালিকো! তুমি কি ভেবেছো, সামান্য একটু অভিনয় করে আমায় ফাঁকি দেবে! এ ফাইল যে তুমি নকল করে রাখোনি তার প্রমাণ কি?'

'প্রমাণ!' গ্যালিকো একটু হাসলে, 'হ্যাঁ, বিপদ যতই থাক, এখনো আমার সঙ্গে গেলে বোধহয় তার প্রমাণ দিতে পারবো। তখন আশা করি, বুঝবেন যে, পরস্পরের তুচ্ছ ক'টা অ্যাটমিক অস্ত্রের গোপন কৌশল জানবার জন্যে আর জাতিতে জাতিতে আমাদের কাড়াকাড়ি মারামারির কোনো দরকার নেই। এখন শুধু আমায় একটু বিশ্রাম করতে দিন। কাল সকালে আমি আপনাদের প্রমাণ দিতে নিয়ে যাবো।'

সত্যিই পরের দিন একটু সুস্থ হয়ে গ্যালিকো, নানুক বাদে, আমাদের দু'জনকে সঙ্গে নিয়ে, ডাইক-হ্রদের উত্তর দিকেই রওনা হলো। সেদিকে যত এগিয়ে যাই, ততই অবাক্ হয়ে যেতে হয়। ল্যাব্রাডর অত্যন্ত ঠাণ্ডা মেরু-প্রবাহ-ঘেঁষা দেশ হলেও, বন্ধ্যা তুষার-প্রান্তর নয়। ভূর্জ দেবদারু ইত্যাদি জাতের গাছ ও নানা লতাগুল্ম সেখানকার অধিকাংশ পাহাড়ী উপত্যকা ছেয়ে আছে। কিন্তু এদিকে সমস্ত গাছপালা কি এক অভিশাপে যেন বিবর্ণ হয়ে শুকিয়ে যাচ্ছে। জন্তু-জানোয়ার অনেক আগে থেকেই বিরল হয়ে আসছিল, এদিকে অগ্রসর হওয়ার পর একটা পাখীর ডাকও সারাদিনে শোনা গেল না! দু'দিন এইভাবে এগিয়ে আমরা যে অনুচ্চ পাহাড়ের ধারে গিয়ে পেঁছিলাম, তার মাথা ডিঙিয়ে গেলেই পশ্চিমে ডাইক-হ্রদ ও তার চারিধারের উপত্যকা পাওয়া যাবে।

সেদিন সন্ধ্যা হয়ে গেছলো বলে, এপারেই রাতটা কাটিয়ে, পরের দিন সকালে পাহাড়ের মাথা ডিঙিয়ে গিয়ে যা দেখলাম, তাতে একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম! ডাইক-হ্রদের চারিধারটা যেন একটা বিরাট ভগাড়, গরু-মহিষের নয়,—এরোপ্লেনের! এত ভাঙা এরোপ্লেন এখানে কি-করে' জড় হলো?

গ্যালিকোই আমাদের মনের কথা অনুমান করে' এবার সেই ভয়ংকর রহস্য আমাদের বুঝিয়ে দিলে।

বললে,—'একরকম চোখের ওপর ঘটেছে বলে আমাদের প্লেনের অন্তর্ধানের ব্যাপারটাতেই তোমাদের টনক নড়েছে, কিন্তু তার আগে গত তিন বছর ধরে যে সব এরোপ্লেন নিখোঁজ হয়েছে, কোনো দুর্ঘটনাই তার কারণ হবে বলে' লোকে অনুমান করে। কিন্তু অধিকাংশই তার দুর্ঘটনা নয়।'

'কিন্তু এখানে এসব প্লেন এল কি করে?' অবাক্ হয়ে ডোনাট্ জিজ্ঞাসা করলেন!

'যেমন করে' আমাদের প্লেন এসে পড়েছিল।' বলে গ্যালিকো সমস্ত বিবরণই এবার দিলে,—'আসল কর্ণেল মিচেলকে তার ঘরেই বন্দী করে'—কর্ণেল মিচেল সেজে আমি গোপনীয় কাগজ নিয়ে প্লেনে এসে উঠি। ক্রয়েডেন থেকে যখন প্লেন ফেরাবার হুকুম আসে, তখন বিপদ বুঝে, বম্বারের কণ্ট্রোল-রুমে গিয়ে কথা বলতে বলতে কৌশলে রেডিও অপারেটারকে বিষাক্ত ছুঁচ ফুটিয়ে অজ্ঞান করে ফেলি। পাইলট আর অপারেটার ছাড়া সে-কামরায় কেউ থাকে না। পাইলট তার নিজের কাজেই তন্ময়। ব্যাপারটাকে স্বাভাবিক অসুস্থতা বলে' সে মনে করে। যেন নেহাত বাধ্য হয়ে আমি তখন অপারেটারের কাজ হাতে নিই এবং খানিক বাদেই পাইলটকে খবর জানাই যে, ক্রয়েডেন থেকে ভুল করে' প্রথম হুকুম পাঠানো হয়েছিল, এখন ভুল সংশোধন করে' তারা আমাদের আবার আমেরিকা যেতেই বলেছে। পাইলট সরল বিশ্বাসে তাই করে। আমেরিকার কাছে প্রায় যখন পেঁাছে গেছি, তখন একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে। হঠাৎ র‍্যাডার-যন্ত্র বিকল হয়ে যায়। সেই সঙ্গে এরো-প্লেনের ইঞ্জিনও। কিন্তু পড়ে না গিয়ে, কোনো অদৃশ্য শক্তির টানে আমাদের প্লেন অসম্ভব বেগে আরো উঁচুতে উঠে যায়। ওই অসম্ভব বেগ আর আকাশের ওপরের স্তরের হাওয়ার অভাব ও ঠাণ্ডায় সবাই প্রায় জ্ঞান হারায়। জ্ঞান যখন ফিরে আসে, তখন দেখি এই এরো-প্লেনের ভাগাড়ে পড়ে আছি।'

'কিন্তু, আর-সব যাত্রীরা কোথায়?'

'জানি না। হয়তো কোথাও চালান হয়ে গেছে। নিজে যে কিভাবে তাদের নজর এড়িয়ে বেঁচে গেছি, তাও বলতে পারি না। তবে, বেঁচে গেছি বলা ভুল; কারণ তারা....'

গ্যালিকোর অবান্তর কথায় বাধা দিয়ে বললাম,—'তারা বলছো কাদের? আর এখানে এসব প্লেন এনে ফেলার মানে-ই বা কি!'

'তারা কারা, জানি না। চোখে অন্ততঃ তাদের দেখিনি, দেখা যায় না বলেই আমার ধারণা। কিন্তু এখানে এসব প্লেন এনে ফেলার মানে তো অতি সহজ।'

'কি মানে?'—ডোনাট্ অবাক্ হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন।

গ্যালিকো অত্যন্ত দুঃখের হাসি হেসে বললে,—'কোনো অজানা জঙ্গলের দেশে আমাদের কোনো বৈজ্ঞানিক-অভিযান পাঠালে প্রথম কি করা হয়? ভালো দেখে একটা থাকবার জায়গা বেছে তার চারিধার পরিষ্কার করে' যতদূর সম্ভব ওষুধ ছড়িয়ে বিষাক্ত পোকা-মাকড় ও জন্তু-জানোয়ার মারবার ব্যবস্থা করা হয়। ল্যাব্রাডরের এ-অঞ্চলে যে গাছপালা পশুপক্ষী আর নেই, তার কারণ, এদের এমন কোনো ওষুধ বা রশ্মি আছে যা আমাদের বিজ্ঞানের কল্পনার অতীত। নিজেদের থাকবার জায়গা নিরাপদ করে' আমাদের বৈজ্ঞানিকেরা তারপর কি করে? জঙ্গল থেকে যা-কিছু দরকারী মনে হয়, জ্যান্ত বা মরা সংগ্রহ করে' আনে পরীক্ষা করবার জন্যে। এরাও তাই করছে। এদের কাছে পৃথিবী একটা অজানা জঙ্গলমাত্র।'

'কিন্তু এরা কি রকম জীব এবং কোথা থেকে এসেছে তার কিছু আভাস পেয়েছো?'

'না তা কিছুই পাইনি, তবে যাতে এসেছে তার একটা বোধহয় এখনো দেখাতে পারি।' বলে গ্যালিকো এবার হ্রদের কাছে আমাদের নিয়ে নেমে গেল।

সবিস্ময়ে দেখলাম, সেখানে ডাইক-হ্রদের জলের ওপরে যে জিনিসটি ভাসছে, তাকে এক-মাত্র ছেলেদের খেলবার চাকতি লাট্টুর সঙ্গে তুলনা করা যায়। আকারে কিন্তু তা ছোটো-খাটো একটা জাহাজের মত বিরাট।

গ্যালিকো সেটা দেখিয়ে বললে,—'আমার ধারণা, গত ক'বছর ধরেই এরা এখানে আসছে। এসে ক'দিন তাদের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার মাল-মশলা সংগ্রহ করে' নিয়েই আবার চলে যায়। এবার যাবার সময় কেন যে এটি ফেলে গেছে বলতে পারি না।'

হ্রদের ধারেই অনেক বড় বড় গাছ কাটা পড়েছিল। গ্যালিকোর কথা শেষ হবার আগেই আমি তার একটা হ্রদের জলে ভাসিয়ে তার ওপর ঘোড়ার মত করে' চেপে বসলাম।

'ওটা কি করছো কি!' ডোনাট্ অবাক হয়ে চেঁচিয়ে উঠলো।

'যা করছি, তোমরাও তাই করো। ও যন্ত্র-যানের ভেতর কি আছে দেখতে হবে।'

এক মুহূর্ত দ্বিধা করলেও গ্যালিকো ও ডোনাট্ তারপরই আমার মত দু'টি কাঠের গুঁড়ি নিয়ে ভেসে পড়লো।

সেইভাবে হাত দিয়ে জল কেটে সেই বিরাট যন্ত্র-যানটার কাছে গিয়ে, অনেক কষ্টে পোর্ট হোলের মত একটা বড় ফোকর খুঁজে পেয়ে কোনোরকমে ভেতরে ঢুকলাম।

ভেতরে তো ঢুকলাম, কিন্তু এ যন্ত্র-যানের রহস্য তো কিছুই বোঝা যায় না। চারিধারে শুধু উজ্জ্বল রুপালী একরকম ধাতুর দেওয়াল-দেওয়া করিডর এদিকে-ওদিকে চলে গেছে। এ যন্ত্র-যান যাদের—তারা থাকে কোথায়, খায় কি, যন্ত্র-যান চালায়ই বা কি করে'?

কি করে' না হোক, কোথা থেকে চালায় খানিকবাদেই বুঝতে পারলাম মনে হলো। যন্ত্র-যানের ঠিক মাঝামাঝি আগাগোড়া ঝাপসা কাঁচে-ঢাকা একটা ঘর, তার মাঝখানে একটা প্রকাণ্ড নীচু টেবিলের ওপর অসংখ্য নানা রঙের বোতাম যেন আঁটা আছে।

আমি সেই বোতামগুলো এলোপাথাড়ি টিপতে শুরু করতেই ডোনাট্ হাঁ-হাঁ করে উঠলো—'ওকি করছেন কি! কিসে কি হয়ে এটা হয়তো চলতে শুরু করবে।'

উত্তেজিতভাবে বললাম, 'আমি তো তাই চাই। এ যন্ত্র-যান যদি সভ্য-জগতে নিয়ে গিয়ে, ভেঙে পড়েও মরি, তবু এর ভাঙা টুকরো থেকে আমাদের বৈজ্ঞানিকেরা হয়তো তাদের অজানা-বিদ্যা শিখতে পারবে।'

কথা বলতে-বলতে বোতাম টিপে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ ঘরের ঝাপসা-কাঁচ পরিষ্কার হয়ে গিয়ে ডাইক-লেকের চারিধার ঘরের দেওয়ালে স্পষ্ট হয়ে উঠলো। তারপর যেন বিদ্যুৎগতিতে সে হ্রদ নীচে কোথায় তলিয়ে গেল।

আমরা আকাশে উঠেছি, উল্কাবেগে আকাশে ছুটে যাচ্ছি, কিন্তু কোন্ দিকে! নীচে যেন সাদা তুষার-প্রান্তর দেখা যাচ্ছে। তবে কি—উত্তর মেরুর দিকেই চলেছি? যেমন খুশি আবার আর ক'টা বোতাম টিপলাম। হঠাৎ গোঁত্তা খেয়ে যন্ত্র-যান ঘুরে চললো। একি? ওই তো সেণ্ট লরেন্স উপসাগর। নীচে যেন ম্যাপের মত আঁকা রয়েছে। ওই তো নিউফাউণ্ড-ল্যাণ্ড। আমরা আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের দিকেই চলেছি। কিন্তু সমুদ্র যেন হু-হু করে আমাদের দিকে ছুটে আসছে! আমরা নীচে পড়ে যাচ্ছি নাকি? আর কয়েকটা বোতাম টিপলাম। হঠাৎ আবার পাকখেয়ে আমাদের যন্ত্র-যান উঠে যাচ্ছে! এবার শুধু আকাশ, আর নীচে মেঘের ফাঁকে আতলান্তিক সমুদ্র। খানিকক্ষণ এভাবে চললেই বোতামগুলোর রহস্য কিছু হয়তো বুঝতে পারবো। তখন নিউ-ইয়র্ক বা সে-রকম কোনো শহরের কাছে কোনো হ্রদ বা উপসাগরে এ যন্ত্রযান নামানো শক্ত হবে না। উত্তেজনায় আমার সমস্ত শরীর তখন কাঁপছে! খুঁড়তে খুঁড়তে গোখরো নয়, একেবারে অজগর আমিই ধরবো। কোথায় গুপ্তচরের সন্ধান, আর কোথায় দুনিয়ায় কেউ যা কখনো ভাবেনি সেই অন্য গ্রহের যন্ত্র-যান দখল করে নিয়ে আসা! অ্যাটমিক বোমার যুগকেও যারা পেছনে ফেলে গেছে, তাদের বৈজ্ঞানিক বিদ্যার সন্ধান পাওয়া!

হঠাৎ গ্যালিকো চীৎকার করে উঠলো—'ওই দেখ!'

দেখলাম এবং বুঝলাম, আমার সব আশায় ছাই পড়তে চলেছে।

আকাশে হঠাৎ কোথা থেকে আমাদের মত আরো তিনটি চাকতি-লাট্টু এসে উদয় হয়েছে।

বুঝলাম, যন্ত্র-যানের আসল মালিকেরা ফিরে এসেছে। ফিরে এসে তাদের যন্ত্র-যান দেখতে না পেয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে আমাদের খোঁজে বেরিয়ে এতক্ষণে সন্ধান পেয়েছে। এরা ওস্তাদ আর আমি চালাবার বিদ্যা কিছুই জানি না। এরা আমায় ধ্বংস করে ফেলবেই।

তবু উন্মত্তের মত বোতাম টিপে চললাম। আকাশে যেন চারটে উল্কার পাগলামির খেলা শুরু হয়ে গেল। এই আমি উঠি, তারা নামে। এই তারা আমাদের একেবারে গা ঘেঁষে চলে যায়।

হঠাৎ কিভাবে জানি না তাদের অনেক দূর পিছিয়ে ফেলে আমাদের যন্ত্র-যান ছুটে বেরিয়ে গেল। আমি বোতাম টেপা ছেড়ে দিয়েছি। তারা কিছুতেই আর দৌড়ের পাল্লায় পারছে না। আমাদের যন্ত্র-যান আতলান্তিকের ওপর দিয়ে আমেরিকার দিকেই চলেছে। ভেঙে পড়তে হয় সেখানেই গিয়ে পড়বো।

কিন্তু তা আর হলো না। হঠাৎ প্রচণ্ড ঝাঁকুনি খেয়ে বুঝতে পারলাম আমাদের যন্ত্র-যান থেমে গেছে। থেমে, দুরন্ত বেগে নিচের সমুদ্রে পড়ছে। কোন অদৃশ্যশক্তিতে তারা আমাদের কল বিগড়ে দিয়েছে।

সমুদ্রে পড়ার আগে পর্যন্ত মনে আছে। তারপর যখন জ্ঞান হলো তখন জেলেদের একটা ট্রলারে শুয়ে আছি। ডোনাট আর গ্যালিকো যন্ত্র-যানের সঙ্গেই আতলান্তিকের অতলে তলিয়ে গেছে।

ঘনাদা প্রকাণ্ড একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলে চুপ করলেন। শিবুর কাশি আবার শুরু হতেই, গৌর তাকে ধমক দিয়ে শাসিয়ে বললে, 'আচ্ছা, আপনি হঠাৎ ডাইক-হ্রদের দিকে যাওয়ার হদিস পেলেন কোথায়?'

ঘনাটা একটু হেসে বললেন, 'ডোনাটও এ কথা জিজ্ঞাসা করেছিল। হদিস পেয়েছিলাম যে উড়ন্ত-চাকতি নিয়ে আমেরিকায় এখনো হুলুস্থুল চলছে, তার সমস্ত গুজব ভালো করে বিশ্লেষণ করে। সেই সমস্ত গুজব থেকেই মনে হয়েছে এই সব লাট্টু আকারের অদ্ভুত জিনিসগুলো আমেরিকার উত্তর-পূর্ব কোন দিক থেকেই সাধারণতঃ প্রথম দেখা দিয়েছে। এর সঙ্গে ল্যাব্রাডরের পশুলোমের ব্যবসায়ে মন্দা পড়ার খবর যোগ দিয়েই আমার মনে হয়, পশুলোম যেখান থেকে বেশী পাওয়া যায় সেই ডাইক হ্রদের কাছেই সূত্র পাওয়া যেতে পারে।

শিবুর কাশি এবার আর ধমক দিয়েও থামানো গেল না। ঘনাদা বিষদৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে মনের ভুলে বোধ হয় শিশিরের গোটা সিগারেটের টিনটাই হাতে নিয়ে উঠে গেলেন।

ঢিল

ঘনাদা তাঁর তেতালার ঘর থেকে অকারণে কয়েকবার নিচেরতলা পর্যন্ত নামাওঠা করেছেন, আমাদের আড্ডাঘরের সামনে ঘুরঘুর করেছেন খানিকক্ষণ, শুধু মান খুইয়ে ভেতরে ঢুকতে আর পারেননি এ পর্যন্ত।

এখন হঠাৎ বাইরে দোতালার বারান্দায় দাঁড়িয়ে তিনি তাঁর বাজখাঁই গলায় আমাদের বারো নম্বর বনমালী নস্কর লেনের নতুন চাকর বনোয়ারীকে তুলোধোনা বকুনি দিচ্ছেন শোনা গেল।

ঘনাদার কর্ণকুহরে জ্বালা ধরাবার জন্যেই যে উচ্চ হাসিটা ঘরে আমরা তুলেছিলাম সেটা থামিয়ে হঠাৎ ঘনাদার এ উত্তেজনা ও তম্বি-র হেতুটা বোঝবার চেষ্টা করলাম।

শিশির তার ঘর থেকে সিগারেটের টিন আনবার ছলে চট করে একবার ঘুরেও এল বারান্দা দিয়ে, ঘনাদার চোখের সামনে নতুন সিগারেটের টিন খোলাতেই যেন তন্ময় হয়ে।

ব্যাপার কি?—আমরা মুচকি হাসির সঙ্গে উৎসুক।

ঢেলা।—শিশির সিগারেটের টিনটা মাঝখানের টেবিলে রেখে একটি সংক্ষিপ্ত কথাতেই রহস্য ঘনীভূত করে তুলল।

ঢেলা!—আমরা হতভম্ব।

আমাদের বনোয়ারী ঘনাদাকে ঢেলা মেরেছে!—শিশিরের বিস্মিত শঙ্কিত অভিনয়ের ধরনে আমরা প্রয়োজনের চেয়ে বেশী জোরেই হেসে উঠলাম। কারণে অকারণে হেসে উঠে আমাদের জটলাটা জানান দেওয়াই অবশ্য আমাদের উদ্দেশ্য।

না হে না, ঢিল মারার চেয়ে বেশী অন্যায় করেছে।—শিশির এবার ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলে,—ঘনাদার ঘরে একটা ভাঙা কাঁচের পেপারওয়েট পড়ে থাকে দেখেছ তো। বনোয়ারী ভাঙা কাঁচের ঢেলা ভেবে ঝাঁট দেবার সময় সেটি কোথায় নাকি ফেলে দিয়েছে!

এই ব্যাপার!

আরেক চোট আমাদের হাসির হর্রা উঠল। ব্যাপার যাই হোক আমাদের মতলব যে

হাসিল হয়েছে সামান্য একটা ভাঙা কাঁচের ঢেলা নিয়ে ঘনাদার হৈ চৈ বাধানোতেই তা বোঝা গেল।

ঘনাদার এখন একবার-ডাকিলেই-যাইব গোছের অবস্থা।

কিন্তু সেই ডাকটি আর আমরা দিচ্ছি না। আমাদের ক'দিন যা জ্বালিয়েছেন তার একটু শোধ নিতেই হবে।

কি বিশ্রী কটা দিনই গেছে আমাদের। আমাদের কেন, শহরসুদ্ধ সবার! করপোরেশনের কল্যাণে একটু বর্ষণেই আমাদের মেস-বাড়িটি একেবারে দ্বীপ হয়ে যায় বলে আমাদের দুরবস্থা একটু বেশী।

এদিকে আকাশ যেন ফুটো হয়ে দিনের পর দিন অবিশ্রান্ত বৃষ্টিতে সমস্ত শহর থৈ থৈ; ওদিকে দেশজোড়া ধর্মঘট। মেস থেকে নড়বার উপায় নেই কিন্তু মেসে সারাক্ষণ ভাজবার মত ভেরেণ্ডাও কই ছাই!

তাসপাশায় অরুচি ধরে গেছে, ক্যারম পিটে পিটে আঙুল টনটন। সময় যেন আর কাটে না।

ঘনাদা একটু কৃপা করলেই এ বন্দীদশা শাপে বর হয়ে ওঠে, কিন্তু তিনি মুখে একেবারে যেন ডবল তালা লাগিয়েছেন পাছে কিছু বেরিয়ে যায় এই ভয়ে।

বড়জোর একটু হুঁ কি অ্যাঁ, হাঁ কি না। তার বেশী শব্দজ্ঞানই যেন তাঁর হয়নি।

সাধ্যসাধনার ত্রুটি আমরা করিনি, ঘুষ দিয়েছি দরাজ হাতে,—কিন্তু কিছুতেই ভবী ভোলবার নয়।

লোভ আমরা কম দেখাইনি, বাকি রাখিনি যত রকম সম্ভব উস্কানি দিতে।

বিকেল বেলা ঘনাদার ঘর খোলা দেখে এক এক করে গিয়ে ঢুকেছি। ঘনাদা আপত্তি অবশ্য করেননি, কিন্তু এমনভাবে দরজার ভেতর দিয়ে বাইরের ছাদের বৃষ্টি পড়া মনোযোগ দিয়ে দেখেছেন যেন আমরা মশা মাছির মত অবাঞ্ছিত হলেও সইতে বাধ্য হওয়া উপদ্রব মাত্র।

শিশির তবু সিগারেটের টিনটা খুলে ধরেছে, এবং ঘনাদা অন্যমনস্কভাবে তা থেকে সিগারেট তুলে নেওয়ার পর উৎসাহিত হয়ে লাইটার জেবলে ধরিয়ে দিতে দিতে জিজ্ঞাসা করেছে,—এ রকম নাগাড়ে বৃষ্টি কলকাতায় আগে হত না, না ঘনাদা?

হুঁ,—ঘনাদা সিগারেটে টান দিয়ে শব্দটুকু যেন নাকের ভেতর ধোঁয়ার সঙ্গে ছেড়েছেন।

এসব অ্যাটম বোমা থেকে হচ্ছে, বুঝলি স না?—গৌর উস্কে দিতে চেয়েছে,—দুনিয়ার আবহাওয়া সব বদলে যাবে দেখিস, বাংলা দেশে বরফ পড়বে আর অ্যালাস্কায় চলবে লু।

ঘনাদা একবার শুধু গৌরের দিকে চেয়েছেন মাত্র, কিন্তু সলতে ধরেনি।

শিবু আর-এক মাত্রা চড়িয়েছে এবার,—তাই যদি হয় তো নতুন কি এমন? এই পৃথিবী একবার সত্যি উল্টে গেছল জানিস। সাইবিরিয়ার তখন এ হাল নয়। গাছপালা সবুজ ঘাস সবই ছিল। তারপর এক নিমিষে সেই সাইবিরিয়া একেবারে জমে বরফ।

শিশির সায় দিয়ে বলেছে,—হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিকই তো। সাইবিরিয়ার তুষারে ঢাকা তেপান্তরে যে-সব মরা ম্যামথ পাওয়া গেছে তাই থেকেই বোঝা যায় চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে ব্যাপারটা ঘটেছিল। ম্যামথের লাশগুলো পাওয়া গেছে একদম নিখুঁত তাজা। একটা লোম পর্যন্ত নষ্ট হয়নি। তাদের পেটে যে ঘাস পাওয়া গেছে তা গরম দেশে ছাড়া হয়ই না। হঠাৎ পৃথিবী উল্টে না গেলে ওরকম গোটা টাটকা ওসব লাশ থাকত না।

আমরা সবাই আড় চোখে ঘনাদার দিকে চেয়েছি।

ফাকস্য পরিবেদনা।

ইতিমধ্যে আমাদের গোপন নির্দেশমাফিক ঠাকুর তেলমাখা ডালমুট মেশানো মুড়ির কাঁসি আর বনোয়ারী চায়ের ট্রে নিয়ে এসেছে।

ঘনাদা চায়ে চুমুক দিতে দিতে মুড়ির কাঁসিতে হাত চালাতে ভোলেননি; কিন্তু মুড়ি কড়াই চিবোনোর আওয়াজ ছাড়া মুখ দিয়ে তাঁর কিছু বার করা যায়নি।

হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে আমাদের চলে যেতে হয়েছে। রাগও জমেছে মনে মনে।

ঘনাদার এ বেয়াড়াপনার কারণ যে বুঝিনি তা নয়, কিন্তু সে তো পান থেকে চুন খসার বেশী কিছু নয়। এত তেয়াজেও তার মাপ নেই।

বৃষ্টি দুদিন নাগাড়ে পড়বার পরই ঘনাদা বায়না ধরেছিলেন খিচুড়ির সঙ্গে ইলিশ মাছ ভাজার।

ঘনাদাকে খুশি করতে বৃষ্টির মধ্যে গৌরই গেছল বনোয়ারীকে নিয়ে বাজার করতে।

তারপর খেতে বসে খিচুড়ির সঙ্গে পাতে মাছভাজা পড়তেই ঘনাদা আইসেনহাওয়ারের দেখে ক্রুশ্চেফের মত ভুরু কুঁচকে গৌরের দিকে তাকিয়েছিলেন।

গৌর শশব্যস্ত হয়ে কৈফিয়ত দিয়েছিল—ভালো ইলিশ পেলাম না ঘনাদা—তাই পার্শে নিয়ে এলাম। খেয়ে দেখুন, একেবারে আসল ক্যানিং-এর কুলীন পার্শে, ইলিশের মত হেঁজি-পেঁজির সঙ্গে এক জলে সাঁতরায় না পর্যন্ত—

ঘনাদার পাতে অন্তত যে ভাজা পার্শেটি পড়েছে, আমাদের সকলের পাতের লিলিপুটদের তুলনায় তা গালিভার। কিন্তু তাতে কি হয়। তখন আকাশের মেঘ ঘনাদার মুখে নেমেছে। ভাজা পার্শের সদ্ব্যবহার করতে করতে তিনি গম্ভীর মুখে যেন কাউকে উদ্দেশ না করে স্বগতোক্তি করেছেন,—হুঃ, আমি আর কিছু বুঝি না! কাল ইস্টবেঙ্গল জিতেছে। আজ ইলিস কখনো আসে।

বোঝানো-শোঝানো, খোসামোদ অনেক তারপর হয়েছে, ইলিশও এসেছে সেদিন রাত্রেই। কিন্তু ঘনাদাকে গলানো যায়নি। বৃষ্টির কটা দিন আমাদের মাঠে মারা গেছে।

অনেক চেষ্টাচরিত্র করেও কিছু ফল না পেয়ে শেষে আমাদেরও মেজাজ গেছে বিগড়ে। থাকুন ঘনাদা বোবা কালা হয়ে। ওঁকেও জব্দ না করে আমরা ছাড়ছি না।

সেই জব্দ করারই ফন্দিতে সেদিন তিনটে না বাজতেই আড্ডাঘরে আমরা সবাই জড়। শিবুর এক মামাত ভাই সম্প্রতি আফ্রিকায় ক-বছর চাকরি করে ফিরেছেন। সকালে তিনি এসেছিলেন শিবুর সঙ্গে দেখা করতে। তাঁকে পেয়েই বুদ্ধিটা মাথায় এসেছিল। ভদ্রলোক রসিক। সব-শুনে-টুনে আমাদের সঙ্গে জুটতে আপত্তি করেননি। জীবনে কোন দিন বন্দুক না ধরলেও ভদ্রলোকের চেহারাটা জমকালো। আমাদের কথায় আধা মিলিটারি পোশাকে বিকেলে সেজে এসেছেন। আপাতত শিখিয়ে পড়িয়ে নিয়ে ঘনাদার মৌরসী আরামকেদারায় তাঁকে বসিয়েছি, আর আমরা মুগ্ধ শ্রোতা সেজে তাঁকে নিয়ে ক্ষণে ক্ষণে উচ্ছ্বাস উল্লাস বিস্ময় ও হর্ষধ্বনিতে যেন বাড়ি সরগরম করে তুলেছি।

দুপুরের দিবানিদ্রা সেরে ওঠবার পর যথারীতি গড়গড়ায় তামাকুট সেবন করতে করতে ঘনাদাও নির্ঘাত সে আওয়াজ মাঝে মাঝে পেয়ে কৌতূহলী হয়েছেন। ঠাকুর রামভুজের মারফত খবরটাও তাঁর কাছে পৌঁছে দিতে ভুল হয়নি। যেমন মহলা দিয়ে শেখানো ছিল, রামভুজ সেইভাবে একটু সকাল সকালই চা নিয়ে গেছে এবং ঘনাদার প্রশ্নের অপেক্ষায় না থেকে নিজে থেকেই নালিশ জানিয়ে বলেছে,—তিন বাজতে না বাজতে চা! বোলেন ত বড়বাবু হামাদের কেতো মুশকিল!

ঘনাদা নিচের গোলমাল সম্বন্ধে প্রশ্ন করবার সুযোগ পেয়েছেন আর রামভুজ তার হিন্দি-বাংলার খিচুড়িতে যতখানি সম্ভব বিস্ময় ঢেলে দিয়ে বলেছে—আরে বাস রে! বহুৎ বড়া এক শিকারী আসিয়েছে সমুন্দরকে পারসে! কেত্না শের গণ্ডার হাঁথী মারিয়েছে! বাবুলোগ সব ওহি কিস্সা শুনতে আছে!

আর ঘনাদা স্থির থাকতে পারেন!

তারপর রামভুজও চা দিয়ে নিচে নেমেছে। আর তার প্রায় পিছু পিছুই ঘনাদা।

আড্ডাঘরে একবার এসে দাঁড়াবার জন্যে প্রাণটা তাঁর ছটফট করছে তখন, পারছেন না

শুনব মানের দায়ে। ছটফটানিটাই বনোয়ারীর ওপর বকুনি হয়ে বেরিয়েছে, কিন্তু তাতেও যা ভেবেছিলেন তা হয়নি।

গল্প শুনতে আমরা এমন যেন মশগুল যে ঘনাদার ওই পাড়াজাগানো চীৎকার কানেই যায়নি।

এতক্ষণ পর্যন্ত যাও বা রাশ টানা ছিল—বনোয়ারীর এক চেঙাড়ি বেগুনি ফুলুরি পাঁপরভাজা নিয়ে আড্ডাঘরে ঢোকার সঙ্গে তা ছিঁড়ে গেল।

বনোয়ারী টেবিলের ওপর চেঙাড়িটা রেখে বেরিয়ে যাবার আগেই, যেন ঘরে কেউ আছে কি নেই খেয়াল না করে টেবিল থেকে খবরের কাগজটা নিতেই ঘনাদা ঢুকে পড়লেন।

ঢুকে পড়েই দাঁড়ালেন থমকে তাঁরই মৌরসী পাট্টা আরামকেদারায় শিবুর আধা মিলিটারি পোশাক-পরা মামাত ভাইকে দেখে।

আমরা কিন্তু তখনো যেন গল্পেই মশগুল।

তারপর নিঃ রাহা,—গৌর চোখ বড় বড় করে ভয়ে বিস্ময়ে ধরা গলায় জিজ্ঞাসা করলে—বোমার ভেতর থেকে দুটো কিফারু তিনটে ফারু চারটে কিবাকো ছুটে আসছে আর আপনার হাতে স্রেফ একটা পাঙ্গা। কি করলেন আপনি তখন?

ঘাস কাটলেন!

এবার আর চমকে ফিরে ঘনাদাকে লক্ষ্য না করে উপায় নেই। আমাদের সকলের মুখেই হঠাৎ যেন অবাঞ্ছিত উপদ্রবে বিরক্তির ভান। কিন্তু তাতেও বিস্ময় যেন আর চাপা থাকছে না।

ঘনাদা আমাদের দিকে অনুকম্পাভরে তাকিয়ে জ্বালা-ধরানো ব্যাঙ্গের সুরে বললেন,—ঘাস ছাড়া আর কি কাটবে! কারণ আফ্রিকার সোহাইলি ভাষায় ঘাস কাটবার লম্বা ধারালো ছুরিকেই পাঙ্গা বলে। তা ছাড়া বোমা হল গ্রাম কি তাঁবু-টাবুর চার ধারে গাছপালার তৈরী কাঠের দেওয়াল। তার ভেতর মানুষ থাকে, জানোয়ার সেখান থেকে বেরোয় না। আর কিবাকো যদিও হিপোপোটেমাসের সোয়াহিলি নাম কিন্তু কিফারু আর ফারু—আলাদা জানোয়ার নয়, কিফারুকেই সংক্ষেপে বলা হয় ফারু—মানে গণ্ডার।

আমরা ধাতস্থ হয়ে কিছু বলবার আগেই ঘনাদা রাহার দিকে আঙুল তুলে হাসিমুখে শাসানির ভঙ্গিতে বললেন,—বোকাদের নিয়ে তামাশা করার স্বভাব এখনো তাহলে তোমার শোধরায়নি কাসিম? এঁদের কাছে আবার রাহা হয়েছ? মনে আছে বোদরুম-এ আমার সেই ব্রেচান্দিরি-র কথা—

আমাদের সঙ্গে রাহারও তখন চোখ কপালে উঠেছে। প্রায় তোতলা হয়ে গিয়ে তিনি বলবার চেষ্টা করলেন,—দেখুন আমি . . কি বলে . .

বুঝেছি! বুঝেছি!—ঘনাদা রাহাকে কথাটা আর শেষ করতে না দিয়ে বললেন,—সে-সব দিনের কথা মনে করালে লজ্জা পাও একটু। সেও ভালো। তবে তোমার আর বিশেষ কি দোষ। মনিবের হুকুম তামিল করেছ মাত্র। এখানেও আজ তারই হুকুমে এসেছ জানি। দাম যা চেয়েছিলাম তা নিয়েও এসেছ নিশ্চয়, কিন্তু বড়ই দুঃখের কথা, তোমার মনিব স্যাণ্ডেজকে বোলো গিয়ে সে জিনিস আর তাকে দিতে পারলাম না। যার জন্যে স্যাণ্ডেজ প্রাণটা বাদে সব কিছু দিতে প্রস্তুত, সে জিনিস আর আমার কাছে নেই।

ঘনাদার নাক থেকে ফোঁস করে একটা স্টীম ইঞ্জিনের মত আওয়াজ বার হ'ল। তাঁর বোধহয় ধারণা তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

আমরা তখনও অবশ্য হাঁ হয়ে আছি। রাহাই আমতা আমতা করে বললেন,—আমার নাম কিন্তু, ওই কি বললেন কাসিম নয়, আমি হলাম শিবুর মামাত ভাই। অনিল রাহা।

কি?—ঘনাদা যেন আকাশ থেকে পড়ে রাহার দিকে তাকালেন, তারপর ধীরে ধীরে ভুল ভেঙে গিয়ে লজ্জা পাবার ভঙ্গিতে বললেন,—ছি ছি, আমারই ভুল। আশ্চর্য কিন্তু চেহারার

মিল! যাক, তবু ভালো, স্যাভেজের কাছে কথার খেলাপটা আপাতত হ'ল না। দেখি এখনো সেটা খুঁজে পাই কিনা।

ঘনাদা দরজার দিকে পা বাড়ালেন।

বলা বাহুল্য এবার আমাদেরই উঠে গিয়ে ধরে আনতে হ'ল।

শিবুর চোখের ইশারায় রাহা তখন আরামকেদারা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন। সেই আরামকেদারায় ঘনাদাকে প্রায় পাঁজাকোলা করে নামিয়ে দিয়ে যে যেখানে পারি বসে পড়ে জিজ্ঞাসা করলাম—কি খুঁজতে চান ঘনাদা?

ওই তোমাদের মূর্তিমান বনোয়ারী যা ফেলে দিয়েছে!—ঘনাদার রাগটা যেন সঙ্গে সঙ্গে চেঙাড়ির বেগুনি ফুলুরির ওপরই গিয়ে পড়ল! শিশিরের এগিয়ে দেওয়া সিগারেটটা অগ্রাহ্য করে সেগুলো সাবাড় করবার জন্যে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন।

বনোয়ারী ফেলে দিয়েছে? সেটা তো একটা ভাঙা কাঁচের পেপারওয়েট!—আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছল।

ভাঙা কাঁচের পেপারওয়েট!—প্রায় অর্ধেক চেঙাড়ি শেষ করে মিনিট দশেক বাদে ঘনাদা আমার দিকে কটমটিয়ে তাকালেন,—জানো ওটা কি বস্তু? জানো ওটা কোথা থেকে পাওয়া?

রাস্তায় কোথাও পড়ে-টড়ে ছিল বোধ হয়!—শিবুর মন্তব্য।

কেউ বাজে জঞ্জাল বলে ফেলে-টেলে দিয়েছে!—শিশিরের ফোড়ন।

কিংবা কেউ হয়তো কাউকে ছুড়ে মেরেছে!—গৌরের গবেষণা।

হ্যাঁ, ছুড়ে মারা জিনিসই বলতে পারো!—ঘনাদার মুখে রাগের বদলে আমাদের ওপর অবজ্ঞা মেশানো অনুকম্পাই ফুটে উঠল, —ছুড়ে মারা একটা ঢিলই বটে। ওই ঢিলের কল্যাণে ভারতবর্ষের ইতিহাস যদিও বদলে লেখা যেত। কিন্তু ঢিলটা কোথা থেকে এসেছে ভাবতে পারো?

আর ঘনাদাকে জ্বালানো উচিত হবে না, তাই মুখে অক্ষমতা ফুটিয়ে আমরা বোকা সেজে রইলাম এবার।

ঘনাদাই নিজের জবাব নিজে দিলেন,—এ ঢিল এসেছে এক কোটি দু কোটি নয়, অন্তত দশ হাজার কোটি কোটি মাইল দূর থেকে!

মোটে!—শিবু যেন হতাশ।

আমাদের গলায় কিরকম সব শব্দ, যা হাসি চাপবার চেষ্টা বলে ভুল হ'তে পারে।

হ্যাঁ, তবে তার দশ-বিশ হাজার লক্ষগুণ দূর থেকেও হ'তে পারে।—ঘনাদা নির্বিকার ভাবে বলে চললেন, অঙ্কের শূন্যগুলো যেন কালির ফোঁটা মাত্র।

কিন্তু আমাদের সব চেয়ে দূর গ্রহ প্লুটোই তো সূর্য থেকে তিন শ' ষাট কোটি মাইলের বেশী দূর নয়।—গৌর বিদ্যে জাহির করলে দুদিন আগে কোথায় একটা প্রবন্ধে পড়েছিল বলে।

হ্যাঃ, প্লুটো!—ঘনাদা অবজ্ঞার নাসিকাধ্বনিতে প্লুটোকে নস্যাৎ করে বললেন,—আমাদের সৌরমণ্ডলের সূর্য যে ছায়াপথ অর্থাৎ নক্ষত্রপুঞ্জের একটা নগণ্য তারা মাত্র, সেই ছায়াপথের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত কুড়ি হাজার কোটি কোটি মাইল দূর। প্লুটো-টুটো নয়, এ ঢিল সেই ছায়াপথেরও বাইরে থেকে এসেছে।

আমাদের গলা দিয়ে কিছু বেরুবার আগেই প্রতিবাদটা যেন অনুমান করে ঘনাদা আবার বললেন,—না, উল্কা নয়, এ সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস, বৈজ্ঞানিকেরা এর নাম দিয়েছেন টেক্‌টাইট। উল্কার সঙ্গে এর অনেক তফাত। উল্কা আমাদের সৌরমণ্ডলের না হোক নিজেদের এই ছায়াপথেরই জিনিস। উল্কাপিণ্ডের ভেতর অন্য সব হাল্কা ধাতুর সঙ্গে লোহা নিকেল থাকবেই। কিন্তু টেক্‌টাইটে লোহা নিকেল নেই। দেখতে তা রঙীন কাঁচের গোলগাল ডেলার মত। তার ভেতর এলুমিনিয়াম আর বেরিলিয়মের রেডিও-আইসোটোপও পাওয়া গেছে।

টেক্‌টাইটের সব রহস্য এখনো জানা যায় নি কিন্তু পণ্ডিতদের ধারণা মহাশূন্যের এসব ঢিল আমাদের ছায়াপথের সীমানার বাইরে অন্য নক্ষত্রলোক থেকে সম্ভবত এসেছে।

এই টেক্‌টাইট এতদিন আপনার কাছে ছিল! আর আপনি তা হেলায় অছেদ্দায় যেখানে সেখানে ফেলে রাখতেন?—শিশির অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলে।

তোমাদের ওই ধনুর্ধর ধনেশাখী না আসা পর্যন্ত তাতে তো কোন ক্ষতি হয় নি। তোমাদের কাছে তো ওটা কাঁচের কাগজচাপা!—ঘনাদা টিটকিরি দিলেন।

যথাসম্ভব লজ্জিত হবার ভান করে বললাম,—কিন্তু এ কাঁচের ঢিল খুঁড়ি টেক্‌টাইট আপনি পেলেন কোথায়?

শিবুটাকে নিয়ে পারা যায় না। হঠাৎ দুম করে বলে বসল—মাথায় পড়েছিল বোধ হয়!

আহাম্মক কোথাকার!—আমরা সামলাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠলাম,—দশহাজার কোটি কোটি মাইল, কি তার চেয়ে দূরের ঢিল মাথায় পড়লে কেউ বাঁচে! অবশ্য তোর মত নিরেট মাথা হলে কথা নেই।

ঘনাদার মুখের গোঁফটা জমতে গিয়েই কেটে গেল! প্রসন্ন মুখে তিনি বললেন, না, মাথায় ওটা পড়ে নি। কারুর মাথায় টেক্‌টাইট কখনো পড়েছে বলে শোনা যায় নি। যদিও টেক্‌টাইট নানা দেশে মাটির ওপরেই ছড়ানো পাওয়া যায়। উল্কাপিণ্ডের মত মাটিতে গেঁথে যায় না। হ্যাঁ, কোথায় পেয়েছিলাম জিজ্ঞেস করছ? ও টেক্‌টাইট পেয়েছিলাম বোদ্‌রেরুম-এ।

ঘনাদা থামলেন।

তারপর আমাদের মুখগুলোর ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন,—বোদ্‌রেরুম শহর কোথায় জানো না নিশ্চয়! বোদ্‌রেরুম-এর নাম না শুনে থাকো প্রাচীন হ্যালিকারনেসস-এর কথা আশা করি জানো। সেকালের সপ্তম আশ্চর্যের একটি আশ্চর্য। রাজা মৌসোলসের স্মৃতিস্তম্ভ ওই-খানেই ছিল। শুধু তাই নয়, পাশ্চাত্য জগতের প্রথম ঐতিহাসিক হেরোডোটাস-এর ওই হ'ল জন্মস্থান। সেকেন্দার শাহ এসিয়া জয় করতে যাওয়ার পথে হ্যালিকারনেসস ধ্বংস করে লুট করে যান। সেই ধ্বংসাবশেষের ওপর পেট্রোনিয়ম বলে এক শহর গড়ে ওঠে। পেট্রোনিয়ম নামটাই তুর্কীদের মুখে বিকৃত হয়ে হয়েছে বোদ্‌রেরুম।

প্রাচীন ইতিহাস যাই হোক বোদ্‌রেরুম শহর এখন তুরস্কের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে একটা নগণ্য বন্দর মাত্র। বড় জাহাজ নয়, ঈজিয়ান সাগরের তলা থেকে স্পঞ্জ তোলা যাদের কাজ তাদেরই 'ত্রেচান্দিরি' নৌকো সেখানে ভিড় করে থাকে।

স্পঞ্জ তোলার ব্যবসা করার নামে একটা 'ত্রেচান্দিরি' নৌকো ভাড়া নিয়ে তখন বোদ্‌রেরুমে থাকি। 'ত্রেচান্দিরি' নেহাত ছোট নৌকো। ঠিক লগ্‌ও তাকে বলা যায় না। আমার নৌকোটি লম্বা মাত্র কুড়ি-বাইশ হাত, পালও আছে আবার একটা ঝড়ঝড়ে পুরনো ডিজেল মোটরও। এই দুইএর জোরেও ঘণ্টায় ছ'সাত মাইলের বেশী যায় না।

এসব নৌকোর অবশ্য জোরে যাবার দরকার নেই। জায়গা বুঝে ডুবুরী নামিয়ে সমুদ্রের তলা থেকে স্পঞ্জ তোলাই হ'ল তার আসল কাজ। তার জন্যে চাই সত্যিকার ভালো ডুবুরী। বোদ্‌রেরুম-এর সেরা ডুবুরী আঙ্কা কাপুকিন মানে কাপুকিন খুড়ো আমার নৌকোয় কাজ করে। আমি নৌকো চালাই আর ডুবুরীর নিশ্বাসের নল ধরা থেকে অন্য ফাই-ফরমাশ খাটে স্যামি বলে এক নিগ্রো ছোকরা। বোদ্‌রেরুম আর কারাবাকলা দ্বীপের মাঝে চুকা প্রণালী থেকে কুমালী অন্তরীপ ঘুরে সিমি দ্বীপ পর্যন্ত আমাদের ত্রেচান্দিরি ঘোরাফেরা করে। কিন্তু স্পঞ্জ তোলা আর হয় না।

মাস দুয়েক বিনা কাজে মাইনে নিয়ে কাপুকিন খুড়োই একদিন বেঁকে দাঁড়াল। খুড়োর সঙ্গে এই দু' মাসে আমার একটা সত্যিকার স্নেহের সম্পর্কই গড়ে উঠেছে। ত্রেচান্দিরির পাটাতনে বসে দুজনে কফি খাচ্ছি, হঠাৎ সে আমার পিঠে একটা চাপড় মেরে কফির পেয়ালাটা উপুড় করে রেখে বললে,—তোমার পয়সা আর খাব না দাস। এই শেষ!

কেন, হ'ল কি খুড়ো?—হেসে বললাম,—আমার তো আর জাল জুয়াচুরির পয়সা নয়। আর তা ছাড়া তুমি তো নিজের রোজগারের পয়সায় খাচ্ছ।

নিজের রোজগারের পয়সা খাচ্ছি?—খুড়ো চটে উঠে বললে,—এই দু মাসে ক'বার ডুবুরীর পোশাক চড়িয়েছি বলো তো? জাত ব্যবসা শেষে ভুলিয়ে ছাড়বে দেখছি। স্পঞ্জ যদি নাই তোমার দরকার তাহলে আমাকে বসিয়ে বসিয়ে মাইনে দিচ্ছ কেন?

হেসে বললাম,—মাইনে কি মিছিমিছি দিচ্ছি! স্পঞ্জ তোমায় দিয়ে তোলাব। তবে আমার তো যে-সে স্পঞ্জে চলবে না, আসল ইউস্পঞ্জিয়া অফিসিনালিস্‌ মলিসিমা চাই।

আমরা শুধু কেশে উঠলাম। কিন্তু রাহা নতুন লোক, জিজ্ঞাসা না করে পারলেন না,—কি বললেন?

সব চেয়ে দামী স্পঞ্জের বৈজ্ঞানিক নাম। ঘনাদা একটু হেসে বুঝিয়ে দিলেন,—চলতি নাম অবশ্য সরেস তুর্কী পেয়ালা। ওরকম নরম মোলায়েম উঁচু দরের স্পঞ্জ আর হয় না। এক সের তুলতে পারলেই শ' খানেক টাকা।

যেন আমাদের প্রতিবাদের আশায় একটুক্ষণ থেমে ঘনাদা আবার বলতে শুরু করলেন,—কিন্তু যাই বলি কাপ্‌তান খুড়োকে বিশ্বাস করাতে পারলাম না। খানিক চুপ করে থেকে সে গম্ভীর হয়ে বললে,—তোমার মতলব আমি বুঝেছি!

কি আমার মতলব?—আমি অবাক হবার ভান করলাম।

আচ্ছা তোমার মতলবই হাসিল করব।—বলে খুড়ো সেই যে চুপ করল আর তার কাছে কোন কথা বার করতে পারলাম না।

সত্যি করে মুখ সে খুলল প্রায় দু হপ্তা বাদে। বোদ্‌রুম থেকে বেরিয়ে কুমালী অন্তরীপ ঘুরে সিমি দ্বীপের উত্তর দিয়ে তখন মার্মারিস উপসাগরের ভেতর ঢুকে এক সন্ধ্যায় আমরা নোঙর ফেলেছি।

এতদিন সাধারণ দরকারী আলাপ ছাড়া দুজনের মধ্যে এই অজানা গাড়ির ব্যাপারে কোন কথাই হয়নি। এবারের যাত্রার আয়োজন খুড়ো কাপ্‌তান একাই সব করেছে আমায় চুপ করে শুধু দেখতে বলে। আমাদের ত্রেচান্দিরিতে এবার মাসখানেকের রসদ তো আছেই, তা ছাড়া আছে ডুবুরীর পোশাকের বদলে দুজনের অ্যাকোয়া-লাংস বা জল-ফুসফুস। কাঁচের মুখোশ সুদ্ধ এই অ্যাকোয়া-লাংসের হাওয়ার থলি পিঠে বেঁধে আর পায়ে ফ্লিপার বা পা ডানা পরে সমুদ্রের তলায় মাছের মতই চরে বেড়ানো যায়।

নোঙর যেখানে আমরা ফেলেছিলাম সে জায়গাটা একেবারে নির্জন। আমাদের বাঁ দিকে পাথুরে জনমানবহীন সমুদ্রতীর। উত্তরে সংকীর্ণ উপসাগরের ওপারে সন্ধ্যার অন্ধকারে কয়েকটা ঝাপসা পাহাড় মিলিয়ে আসছে।

অন্ধকারে আরো গাঢ় হবার পর পাটাতনে বসে তুর্কী হুঁকোয় তামাক খেতে খেতে খুড়ো প্রথম আমাদের এবারের পাড়ির আসল উদ্দেশ্যের কথা তুললে।

হেসে বললে,—এখানে কি আছে জানো তো?

বোকা সেজে বললাম,—যে স্পঞ্জের জুড়ি নেই সেই সরেস তুর্কী পেয়ালা বোধ হয়!

হুঁ, তুর্কী পেয়ালাই বটে!—খুড়ো হেসে উঠে বললে,—আর চালাকিতে দরকার নেই। শোনো তাহলে, যে খবর আমার সঙ্গে কবরেই নিয়ে যাব ঠিক করেছিলাম তাই আজ তোমার কাছে বলছি। বলছি তোমার ওপর আমার মায়া পড়ে গেছে বলে। আর তোমার চামড়া কালো বলে। এই খবর নেবার জন্যে টাকা যাদের কাছে খোলামকুচি সেরকম কত মার্কিন আমীর আমায় সোনায় মুড়ে দিতে চেয়েছে। বুড়ো হয়ে আসছি। ডুবুরীর কাজ করতে করতে একদিন হয়তো দম ফেটে কি পক্ষাঘাত হয়ে মরব। ওদের কাছে এ খবর বেচে সেই টাকায় শেষ বয়সটা পায়ের ওপর পা দিয়ে কাটাতে পারি। কিন্তু তবু ওদের এ খোঁজ আমি দিই নি, দেব না। চাঁদির জোরে ওরা ধরাকে সরা দেখছে, দুনিয়ার সব জিনিস ওরা যেন পয়সা দিলেই কিনতে

পারে। এখানে এই সমুদ্রের তলায় যা আছে ওরা তা চায় শুধু নিজেদের বাড়িতে বড় জোর জাদুঘরে রেখে জাঁক দেখাবার জন্য। আমাকে দু বছর ধরে লোভ দেখিয়ে এমন কি শাসিয়ে যে অতিষ্ঠ করে মারছে তার এসব জিনিসের ওপর ভক্তিশ্রদ্ধাও নেই। সে শুধু মালিক হবার দেমাকেই দুনিয়ার সব কিছু দুর্লভ জিনিস কিনতে চায়। কানাঘুষায় আমার এ আবিষ্কারের কথা সে শুনেছে, কিন্তু রাজত্বের লোভ দেখিয়েও পেটের কথা বার করতে পারে নি।

খুড়োর কথা শুনতে শুনতে মাথায় যেন ঘোর লাগছিল। ধরা গলায় বললাম,—সত্যিই এমন দুর্লভ জিনিস এখানে আছে?

আছে, আছে। সকালেই ডুব দিয়ে নিজের চোখে দেখতে পাবে। পাঁচ বছর আগে স্পঞ্জের খোঁজে এ অঞ্চলে এসে দৈবাৎ আমি আবিষ্কার করি। বোদ্‌রুম-এ ফিরে গিয়ে দু'চার জন ইয়ার-বন্ধুর কাছে আসল জায়গায় হদিশ না দিলেও একটু-আধটু গল্প করেছিলাম। তাই থেকেই ওই সব শকুনগুলোর টনক নড়েছে। কিন্তু তারাও কল্পনা করতে পারে না কি ঐশ্বর্য এই নোনা জলের তলায় লুকনো আছে। আমি আধামুখখু ডুবুরী কিন্তু ডাঙার ওপর বেকুফ হ'লেও ডুব দিলেই আমি খলিফা। জলের তলার জিনিস আমি চিনি। তা ছাড়া দু বছর জার্মানীর এক মিউজিয়মের হয়ে ডুবুরীর কাজও করেছি। বোদ্‌রুম ছেড়ে যে জলপথ ধরে আমরা এলাম, হাজার হাজার বছর আগে রোড্‌স সাইপ্রাস রোম এমন কি মিশর থেকে এই ছিল সেদিনকার পালতোলা সদাগরী জাহাজের রাস্তা। এখানকার ডুবো পাহাড়ে লেগে কত জাহাজ তলিয়ে গেছে। সমুদ্রের তলায় সে-সব জাহাজের সওদা ছড়ানো। সে যুগের আশ্চর্য সব জিনিস, কাঁসার, তামার, সোনার। তা ছাড়া অ্যাম্ফোরা যাকে বলে সেই দুদিকে হাতল দেওয়া অপরূপ কারু-কাজের গ্রীস ও রোমের মাটির পাত্র'ত অঢেল। ইউরোপ আমেরিকা থেকে কত দল এসে ডুবুরী লাগিয়ে সেসব জিনিস খুঁজে নিয়ে গেছে, কিন্তু তারা যেসব ডুবো জাহাজের জিনিস পেয়েছে সেগুলো বড় জোর দু হাজার বছর আগেকার। কিন্তু সেইখানে যা আছে তার বয়স কম পক্ষেও তিন হাজারের ওপর। শুধু পেতল কাঁসা সোনার জিনিস নয়, এখানে যে জাহাজ ডুবেছিল তাতে ছিল কাঁসা আর এক রকম চুনা পাথরের অদ্ভুত কয়েকটা মূর্তি। সমুদ্রের তলায় এতদিন থেকেও সেগুলি একেবারে নষ্ট হয়নি। অন্য কিছু আমি ছুঁইনি, শুধু একটি ছোট বুড়ো আঙুল প্রমাণ মূর্তি কুড়িয়ে নিয়ে গেছলাম। ঘসে ধুয়ে পরিষ্কার করে সে মূর্তি একজনকে শুধু দেখাই। তিনি একজন ফরাসী পণ্ডিত। এক মিউজিয়ামের হয়ে এই সব ডুবো জাহাজের খোঁজেই এসেছিলেন। মূর্তি দেখে তাঁর চক্ষুস্থির। চমকে বলে উঠেছিলেন, আরে, এ তো ভারতবর্ষের জিনিস। মূর্তিতে খোদাই কটা অক্ষরের মত চিহ্ন দেখে কি একটা নামও যেন করেছিলেন। মনে পড়ছে না এখন।

উত্তেজিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম,—মহেঞ্জদরো? হারাপ্পা?

খুড়ো উৎসাহিত হয়ে বললে,—হাঁ হাঁ—ওই নাম। কি তাঁর আগ্রহ কোথায় পেয়েছি জানবার। ও জিনিস এদিকের সদাগরী জাহাজে পাওয়াই নাকি কল্পনার বাইরে। লোকটা ভালো, কিন্তু তবু তাকে বলিনি কিছু। ও দেশের কাউকে এ জিনিস আবিষ্কারের বাহাদুরি নিতে দেব কেন?

ব্যাকুল হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম,—জায়গাটা তুমি ঠিক চিনেছ তো খুড়ো?

হ্যাঁ হ্যাঁ, কিছু ভাবনা নেই। এখান থেকে পঞ্চাশ গজ দূরে এক ডুবো পাহাড়ে লেগে জাহাজটা ডুবেছিল। ভাগ্যক্রমে তার অনেক জিনিস ডুবো পাহাড়ের একটা গুহা গোছের গহ্বরে গিয়ে পড়েছিল। সেখান থেকে তিন হাজার বছর ধরে যখন তারা খোয়া যায়নি, তিন প্রহর রাতেও....ওকি!

কথার মধ্যে খুড়ো হঠাৎ চীৎকার করে ওঠায় আমিও চমকে ফিরে তাকালাম। কিন্তু কোথায় কি? চারিদিক একেবারে অন্ধকারে লেপা।

কি, দেখলে কি খুড়ো? অবাক্ হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম।

একটা আলো। ওই দূরের সমুদ্রের বাঁকটার কাছে যেন জ্বলেই নিভে গেল।

এখানে আলো কোথা থেকে আসবে? আর ভুলে কোন নৌকো কি জাহাজ যদি এসেও থাকে তার আলো জ্বলেই নিভে যাবে কেন? ও তোমার মনের ভুল।

তাই হবে। বলে খুড়ো সায় দিলে।

কিন্তু খুড়োর মনের ভুল যে নয় সাংঘাতিক ভাবে বুঝলাম তার পরের দিন ভোর না হতেই।

উত্তেজনায় প্রথম দিকটা ভালো করে ঘুমই হয়নি। মহেঞ্জদরোর মূর্তি বলতে তো ব্রোঞ্জ বা অ্যালাবাস্টারের তৈরী কোন দেবীমূর্তিই হবে। ফরাসী পণ্ডিত যদি অক্ষর দেখে মহেঞ্জদরোর বলে চিনে থাকেন তাহলে এ মূর্তিতে সেই মহেঞ্জদরোর মার্কামারা গড়ন নিশ্চয় আছে। এ মূর্তি এখানে পেলে তো ইতিহাসই বদলে লিখতে হবে। ভারতের সিন্ধুনদের প্রাচীন সভ্যতার সঙ্গে এদিকের যোগাযোগের এর চেয়ে স্পষ্ট প্রমাণ তো আর হ'তে পারে না! এই মূর্তি যদি সত্যি এখানে উদ্ধার করতে পারি তো আমায় পায় কে?

অর্ধেক রাত এই সব ভাবনায় কাটিয়ে শেষে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ভোরের দিকে খুড়োর ঠেলাঠেলিতে ধড়মড় করে জেগে উঠলাম।

সর্বনাশ হয়ে গেছে বেটা দাস!

কি সর্বনাশ খুড়ো!—চোখ রগড়ে তখন উঠে বসেছি।

আমাদের অ্যাকোয়া-লাংস দুটোই কে চুরি করে নিয়ে গেছে।

চুরি করে? এই জনমানবহীন জায়গায় আমাদের নৌকো থেকে? এ কি ভূতুড়ে কাণ্ড নাকি!

ভূতুড়ে নয়। কাল আমি ভুল দেখিনি। দূরের সমুদ্রে একটা আলো কাল সত্যিই জ্বলেছিল। সে আলো জ্বলা আর আমাদের নৌকায় চুরির রহস্যের পেছনে কি আছে তাও আমি বুঝেছি। কিন্তু চলো। এখন ফিরে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই।

ফিরেই গেলাম তারপর।

হপ্তাখানেক বাদে বোদ্‌রুম-এর বন্দরে আমাদের ত্রেচান্দিরি ঠেকতে না ঠেকতেই খুড়ো লাফিয়ে পড়ল জেটির ওপরে।

এখুনি কোথায় যাচ্ছ খুড়ো?—অবাক্ হয়ে চীৎকার করে জিজ্ঞাসা করলাম।

আঙুল তুলে খুড়ো যা দেখালো সেটা দূরের বড় জেটিতে বাঁধা একটা ঝক্‌ঝকে ছোট-খাট শৌখীন জাহাজ।

আরে, ওটা তো বোদরুম শহরটাই যে প্রায় কিনে রেখেছে সেই স্যাভেজ সাহেবের 'কেচ্'—আমিও তখন নেমে খুড়োর পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছি।

খুড়ো আমার দিকে অদ্ভুত ভাবে খানিক চেয়ে থেকে বললে,—এখনো তুমি কিছু বোঝনি! ওই স্যাভেজ সাহেবের সঙ্গেই আমার বোঝাপড়া। লোভ দেখিয়ে ভয় দেখিয়ে যা পারেনি, স্যাভেজ শয়তানি করে সেই কাজ হাসিল করেছে এতদিনে। সেদিন ওই 'কেচ্'-এর আলোই এক মুহূর্তের জন্যে দেখছিলাম। লুকিয়ে পিছু নিয়ে আসল জায়গাটা জেনে নিতে দূরে ও জাহাজের আলো নিভিয়ে অপেক্ষা করছিল। অসাবধানে একবার বুঝি কোন আলো হঠাৎ জ্বলে ওঠে। আমি আহাম্মক, তাই সাবধান হইনি। রাত্রের অন্ধকারে আমাদের ঘুমের সুযোগ নিয়ে কেউ সাঁতরে এসে আমাদের ত্রেচান্দিরিতে ওঠে। তারপর অ্যাকোয়া-লাংস দুটি চুরি করে আমাদের ঠুঁটো করে দিয়ে যায়। আমরা ওখান থেকে যতদিনে এসেছি তার মধ্যে ওখানকার সব কিছু নিশ্চয় লুট করেই ও জাহাজ ফিরেছে। আমাদের সাতদিনের রাস্তা ও 'কেচ্'-এর কাছে একদিনের ওয়াস্তা। না, আমায় বাধা দিও না। যত বড় বিদেশী আমীরই হোক তুরস্কের বুকে বসে এ শয়তানি করার শোধ আমি নেবই।

খুড়ো কাপ্‌কিন চলে গেল। চেহারা তার দশাসই পালোয়ানের মত হলেও সরল হাসি-মাখানো মুখই এতদিন দেখেছি। কিন্তু আজ যেন সে সত্যি ক্ষ্যাপা দানব হয়ে উঠেছে।

সমস্ত সকাল খুড়োর জন্যে বৃথাই অপেক্ষা করলাম। দুপুর বেলা খবর এল হাসপাতাল থেকে। আঙ্কা কাপ্‌কিন নাকি জেটি থেকে পড়ে গিয়ে দারুণ জখম হয়েছে। এক্ষুনি আমার যাওয়া দরকার।

গিয়ে যা দেখলাম তাতে শরীরের সমস্ত রক্ত আগুন হয়ে উঠল। খুড়োর প্রায় সর্বাঙ্গে ব্যাণ্ডেজ। আমার দিকে করুণ চোখে চেয়ে বললে,—পারলাম না বেটা দাস, পারলাম না। স্বয়ং যমকে যে ও পাহারায় রেখেছে কেমন করে জানব।

আচ্ছা, যমের চেহারাটাই একবার দেখে আসি, বলে উঠে পড়লাম।

ওই অবস্থাতেই কাৎরে উঠে খুড়ো বললে,—না না, যেও না তুমি দাস। সে যে কি ভয়ানক দৈত্য তুমি ভাবতে পারো না, তোমায় গুঁড়িয়ে পিষে ফেলবে।

কোন উত্তর না দিয়ে বেরিয়ে গেলাম।

সেখান থেকে সোজা জেটিতে স্যাভেজ সাহেবের 'কেচ'-এ।

জেটি থেকে জাহাজে পা দিতেই সামনের এক কেবিন থেকে একজন বেরিয়ে এসে অত্যন্ত অমায়িক ভাবে হেসে বললে,—আসুন, আসুন, জাহাজ দেখতে এসেছেন বুঝি? আপনার নামটা একটু জানতে পারি?

নামটা জানা কি বিশেষ দরকার?

আজ্ঞে হ্যাঁ,—মিছরির মত মিষ্টিগলায় সে বললে,—কার পায়ের ধুলো এ জাহাজে পড়ল আমাদের একটু জানতে ইচ্ছে হয় বই কি।

বেশ সাধু ইচ্ছে। নামটা মুখস্থ করে নিন। দাস। ঘনশ্যাম দাস। আপনার নামটা তাহলে?

অধীনের নাম কাসিম।—বিনয়ে লোকটা যেন গলে যাবে। লোকটাকে একটু ভালো করে লক্ষ্য করলাম। তুর্কী না গ্রীক, মিশরী না সিরিয়ান কিছুই বোঝা যায় না। এমন কি বাঙালীও ভাবা যায়। অবিকল এই রাহার মত চেহারা।

নাম তো জেনেছেন, কড়া গলায় এবার বললাম,—এখন জাহাজটা একটু ঘুরে দেখতে পারি?

নিশ্চয়, নিশ্চয়। শুধু ঘুরে দেখতেই চান বুঝি?—বিনয়ের অবতার জিজ্ঞাসা করলে।

না, শুধু ঘুরে দেখতে নয়, জাহাজের মালিক স্যাভেজ সাহেবের একটা পাওনাও মিটিয়ে দিতে। পাওনাটা আঙ্কা কাপ্‌কিনের হয়ে।

তাহলে সে পাওনা আমাকেই দিতে পারিস মর্কট!

বাজ পড়ার মত পিলে-চমকানো আওয়াজে পেছন ফিরে চেয়ে সত্যিই খুশি হলাম। একটা চেহারার মত চেহারা বটে! জমাট কালো লোহার তৈরি একটা বিরাট দৈত্য। পরনে খাটো প্যাণ্ট আর একটা সোয়েটার। শরীরের ইস্পাতের পেশীগুলো একটু ফোলালেই যেন সে সোয়েটার ফাটিয়ে দেবে।

সসম্ভ্রমে বললাম,—ও আপনাকেই! কিন্তু খোদ স্যাভেজ সাহেবকে দিলেই ভালো হয় না?

তাহলে তো স্যাভেজ সাহেবের নাগাল পাবার জন্যে তোকে তুলে ধরতে হয়।—ক্রেনের মত শক্ত এক হাতেই আমার টুঁটিটা ধরে সে শূন্যে আমায় তুলে ফেললে।

আরে করেন কি! করেন কি! ভয় পেয়ে যাচ্ছি যে!—কাতর ভাবে বললাম।

সোনা বাঁধানো দাঁত একটু ফাঁক করে শয়তানের মত হেসে সে আমায় ওপর থেকেই ছেড়ে দিয়ে বললে,—কি! শখ মিটেছে? স্যাভেজ সাহেবের নাগাল আর পেতে চাস?

তা চাই বই কি! আমি তাঁর নাগাল না পেলে তাঁরই বা তাঁর হয়ে আপনারই আমায় নাগাল পাওয়া দরকার।

এক টানে ডেকের ওপর ধনুবড়ে পড়ার পর সেই সাক্ষাৎ যমের ভাঁটার মত চোখ দুটো যেন টাটার কারখানার 'ফারনেস্' হয়ে উঠল।

তবে রে নোংরা উকুন!—লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে কলের মুগুরের মত সে একটি ঘুষি চালাল।

জাহাজের রেলিংগুলো মজবুত। ভাঙল না, একটু বেঁকে গেল মাত্র। ধীরেসুস্থে গিয়ে তাকে তুলে ধরে বললাম,—লাগল নাকি আপনার? আহা, আমাদের আঙ্কা কাপ্‌কিনেরও লেগেছিল। তবে এটা বোধ হয় অত লাগবে না।

এবার তুলতে হল কেবিনের ভেতর থেকে। দরজাটা পুরু, ভেঙে গেছে।

মাপ করবেন!—তুলে ধরে সবিনয়ে বললাম,—ভুলে ডান দিকে মেরে ফেলেছি। আঙ্কা কাপ্‌কিনের বাঁ চোয়ালটা ভেঙেছিল।

ডেকের ওপর থেকে আবার তাকে তুলে ধরেছি এমন সময় পেছন থেকে গলা-ছাড়া হাসির শব্দের সঙ্গে শুনতে পেলাম—আরে! আরে! করছেন কি? গুণ্ডাদের মত মারপিট করে কখনও আপনার মত লোক!

যমপুরুষকে ডেকের ওপরেই গড়িয়ে দিয়ে ফিরে দাঁড়ালাম।

হ্যাঁ, স্বয়ং স্যাভেজই এসে হাজির হয়েছেন। নামে স্যাভেজ বটে কিন্তু চেহারায় যেন গোলগাল হাসিখুশি সদাশিব। আমার দিকে চেয়ে হাসছেন, যেন কত কালের চেনা।

আমিও হেসেই বললাম,—কি করব বলুন। গুণ্ডা পোষবার মত পয়সা তো নেই, তাই নিজেকেই কষ্ট করতে হয়।

আপনি যেন বড্ড রেগেছেন মনে হচ্ছে!—স্যাভেজ হেসে উঠলেন আবার।

হ্যাঁ, আমারও সেই রকম সন্দেহ হচ্ছে। তবে আপনার সঙ্গে একটু আলাপ করলেই বোধ-হয় সব রাগ জল হয়ে যাবে।

তাহলে আর ভাবনা কি! আসুন আসুন, যত খুশি আলাপ করবেন। স্যাভেজ আমাকে তাঁর খাস কেবিনের দিকে নিয়ে চললেন।

যেতে যেতে বললাম, আপনার ওই পদার্থটিকে একটু হাসপাতালে পাঠালে হত না! আঙ্কা কাপ্‌কিনের পাশে একটা বেড বোধহয় খালি আছে এখনো!

স্যাভেজ হেসে উঠে বললেন, যা বলেছেন। দুজনের পাশাপাশি থাকাই ভালো।

ততক্ষণে স্যাভেজের খাস কেবিনে আমরা পৌঁছে গেছি।

বসুন। বসুন। আলাপ করা যাক। স্যাভেজ একটা সোফা আমায় দেখিয়ে দিলেন।

না, বসবার দরকার হবে না। আলাপও বেশী কিছু করবার নেই। শুধু মারমারিসের উপ-সাগরের ডোবা জাহাজ থেকে কি আনলেন একটু যদি জানান।

কি যে বলেন?—স্যাভেজের আবার সেই প্রাণখোলা হাসি।—ওখানে ডোবা জাহাজ আছে নাকি? আর থাকলেও তাতে আছে কি!

যাই থাক্ আমার দরকার শুধু কয়েকটা ব্রোঞ্জ আর অ্যালাবাস্টারের মূর্তির। শুধু সেই-গুলোর জন্যেই আপনাকে বিরক্ত করতে আসা।

বিলক্ষণ! বিরক্ত আবার কিসের। কিন্তু মূর্তি-টূর্তি আমি পাব কোথায়? আমার নানান জিনিস যোগাড় করবার বাতিক আছে বটে। কিন্তু এখানে তো শখ করে বেড়াতে এসেছি। এই যা দেখছেন, তা ছাড়া কিছু এ জাহাজে নেই।

কেবিনের চারিদিকে সাজানো জিনিসগুলোর ওপর চোখ বুলিয়ে বললাম,—এ ছাড়া আর কিছুর কথা তাহলে আপনার মনে পড়ছে না? আপনার স্মরণশক্তিটা সত্যি দুর্বল দেখছি। একটা দাওয়াই দেওয়াই দরকার। আচ্ছা, এখান থেকে একটা কিছু যদি নিয়ে যাই কেমন হয়? যেটা নেই সেটার কথা ভাবতে ভাবতে যা আছে তার কথা মনে পড়ে যেতে পারে।

আপনার হেঁয়ালি বুঝলাম না। তবে নিন না আপনি যা খুশি!—স্যাভেজ উদার হয়ে উঠলেন।

পাশের টেবিলের ওপর কটা কাগজপত্র যা দিয়ে চাপা দেওয়া ছিল সেইটে তুলে নিয়ে বললাম,—এইটেই তাহলে নিই।

এক পলকের জন্যে স্যাভেজের মুখ ফ্যাকাসে মেরে গেল। তারপরেই হেসে উঠে তিনি বললেন, আরে এত ভালো ভালো জিনিস থাকতে ওই একটা ভাঙা সস্তা পেপারওয়েট নিচ্ছেন!

সস্তা যদি হয় তো আপনার আপত্তি কিসের! এ তো আর যে জিনিস সংগ্রহ করবার জন্যে আপনি ফুতুর হতে প্রস্তুত, আপনার চেয়ে যে জিনিসের দুর্লভ সংগ্রহ দুনিয়ার কারুর নেই সেই টেকটাইট নয়!—উঁহু ওদিকে ঘেঁষতে যাবেন না স্যাভেজ! কে জানে ওই ড্রয়ারে হয়তো একটা পিস্তল-টিস্তল থাকতে পারে। আপনার যেরকম মুখের চেহারা হয়েছে তাতে পিস্তল হাতে পেলে এই সামান্য পেপারওয়েটটার জন্যে আপনি হয়তো ছুড়েই বসবেন!

এক ঝাপে টেবিলটার কাছে গিয়ে ড্রয়ারটা খুলে পিস্তলটা বার করে নিলাম। তারপর দরজা দিয়ে রেলিং ডিঙিয়ে সমুদ্রের জলে সেটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে বললাম,—আমি গরিব চাষাড়ে মানুষ, টেকটাইটের আর কি জানি। নিজের দেশের বাড়িতেও রেখে আসতে সাহস না করে আপনি সঙ্গে সঙ্গে নিজের কাছে নিয়ে ফেরেন বলে এইটেই দুনিয়ার সবচেয়ে দুর্লভ টেকটাইট মনে করে নিয়ে চললাম। সেই মূর্তিগুলোর কথা যদি কখনো মনে পড়ে তাহলে আমার কাছে পৌঁছে দিলেই এ টেকটাইট খুড়ি পেপারওয়েট ফেরত পাবেন। আমার নামটা আপনার কাসিম জানে, ঠিকানাও একটা যাবার সময় দিয়ে যাচ্ছি।

সেই টেকটাইট নিয়েই চলে এসেছিলাম। আশা ছিল সুবুদ্ধি হয়ে স্যাভেজ একদিন সেই মূর্তিগুলো ফিরিয়ে দিয়ে যাবে।

ঘনাদা থামলেন। সঙ্গে সঙ্গে শিশিরের দীর্ঘ নিঃশ্বাস।

ওঃ, কি লোকসানটাই হল দুনিয়ার। এখন যদি স্যাভেজের সুবুদ্ধিও হয় টেকটাইট না পেলে সে কি আর সে মূর্তিগুলো ফেরত দেবে। ভারতের ইতিহাসের ছেঁড়া পাতাটা আর জোড়া লাগবে না!

সব দোষ ওই বনোয়ারীর!

গৌরের আক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গেই দরজায় মূর্তিমানের নাটকীয় আবির্ভাব।

হামি রাস্তাসে বহুত খুঁজে খুঁজে আনলাম হুজুর। ভালো কোরে ধোকে আনিয়েছি।—কাঁচুমাচু মুখে ভেতরে ঢুকে টেবিলের ওপর যে জিনিসটি বনোয়ারী রাখল তার দিকে চেয়ে আমরা একেবারে থ!

হুররে!—শিবু চেঁচিয়ে উঠল,—এই তো সেই সাত রাজার ধন এক মানিক। ছায়া-পথের ওপারের ঢিল। ইতিহাসের হারানো খেই টেনে বার করবার চুম্বক!

এই? এই আমার সেই টেকটাইট! ঘৃণাভরে টেবিল থেকে কাঁচের ডেলাটা ফেলে দিয়ে শিশিরের সিগারেটের টিনটা প্রায় ছোঁ মেরে নিয়ে ঘনাদা গট গট করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

পেপারওয়েট, খুড়ি, ঘনাদার টেকটাইট মেঝেয় পড়ে চুরমার।

ছুঁচ

আগুন! আগুন!

সত্যিকার আগুন নয়, ঘনাদাকে তাতাবার একটা ফিকির।

ফিকিরটা একেবারে মাঠে মারা যায় নি। ঘনাদা তাঁর সান্ধ্যভ্রমণ সেরে এসে বসবার ঘরে ঢুকতে গিয়ে এক পা চৌকাঠের এপারে চালিয়ে সভয়ে থমকে দাঁড়ালেন। তাঁর মুখের চেহারাটা দেখবার মত। প্রায় পিছু ফিরে ছুট মারেন আর কি!

শেষ পর্যন্ত আমাদের জমায়েত হয়ে বসার ধরনেই বোধহয় সাহস পেয়ে নিজেকে সামলে নিয়ে একটা ভিগাতে ঘরে এসে ঢুকে তাচ্ছিল্যভরে জিজ্ঞাসা করলেন,—কোথায় আগুন হে!

শিশির ঘনাদার মৌরসী আরামকেদারাটা সসম্ভ্রমে ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললে,—আজ্ঞে, বাজারের কথা বলছি।

আরামকেদারায় নিজেকে এলিয়ে দিয়ে ঘনাদা মৃদু কৌতূহল প্রকাশ করলেন,—বাজারে আগুন লেগেছে নাকি?

আজ্ঞে, লেগেছে তো অনেক দিনই। ক্রমশই বাড়ছে যে!—শিবু উদ্বেগ দেখালে।

বাড়বে, আরো বাড়বে!—ঘনাদার নির্লিপ্ত ভবিষ্যদ্বাণী।

কি বলছেন ঘনাদা! তাহলে তো সর্বনাশ হয়ে যাবে। এখনই তো কোন জিনিস ছোঁবার জো নেই। আলু বারো আনা, বাঁধাকপি দেড় টাকা, মাংস চার টাকা, মাছ সাত টাকা।

আজই সকালের বাজারটা নিজের হাতে করতে হয়েছে বলে গতখানি রয় সয় বাড়িয়ে ফিরিস্তি দিলাম।

কিন্তু ঘনাদা তাতেও অবিচলিত। নিশ্চিন্ত ভাবে বললেন,—ও তো কিছুই নয়। কলির এই তো সবে সন্ধ্যে।

গৌরকে এবার উল্টো দিক থেকে আঁচ দিতে হল। ঘনাদাকেই সমর্থন করে আমাদের জ্ঞান বিতরণ করে বললে,—মানুষ কি রেটে বাড়ছে জানিস! পঞ্চাশ বছরে মানুষের ভারেই নেদিনী টলমল করবে। ডাঙায় ফসলে তো কুলোবেই না, সমুদ্রে চাষ করেও কূল পাওয়া যাবে না। উপোস করে মরতে হবে।

আপনার বক্তৃতায় কিছুটা বুঝি কাজ হল। তিনি স্বয়ং উপস্থিত থাকতে আর কারুর উঠলেন। করতে ঘনাদা একান্ত নারাজ। গৌর থামবার পর একটু নাসিকাধ্বনি করে পাশের বললেন, পাস করে মরতে হবে।

হবে না?—গৌর নিজের কথা প্রমাণ করতে ব্যস্ত হল,—অত খাবার আসবে কোথা থেকে? সমুদ্রের জলের প্ল্যাংকটন ছেঁকে খাবার তৈরির কারখানা বসিয়েও সে রাক্ষুসে দুনিয়ার ক্ষিদে মেটাতে পারবে কি? ছাদে ছাদে অ্যালজির চাষ করেও না।

বটে!—ঘনাদার টিটকিরির ধরনে আশান্বিত হয়ে উঠলাম।

কিন্তু ওই পর্যন্তই।

পলতেটা ফুরফুর করে দুটো ফুলকি ছেড়েই ঠাণ্ডা। ধরল না।

তার বদলে শিশিরের কাছে চার হাজার আটশো অষ্টআশীতম সিগারেট ধার করে ঘনাদা শিশিরেরই দেশলাই দিয়ে ধরিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে বললেন,—আচ্ছা উঠি।

সেকি! এখনই উঠবেন কি! এই তো এলেন!—আমরা শশব্যস্ত।

কিন্তু ঘনাদাকে ঠেকানো গেল না। সত্যিই উঠে দাঁড়িয়ে হাই তুলে বললেন—না, একটু জরুরী কাজ রয়েছে।

ঘনাদার জরুরী কাজ! এই সান্ধ্যভ্রমণে ক্ষিদেটা শানিয়ে আসার পর!

আমরা কোন রকমে হাসি চাপলাম।

কিন্তু এত হেঁটে শেষে শক্ত অসুখে পড়বেন যে! শিবু গভীর সহানুভূতি জানাল, এক-আধ দিন একটু বিশ্রাম নিলে হয় না?

ঘনাদা জবাব না দিয়ে যেভাবে ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে আমাদের দিকে চেয়ে বেরিয়ে গেলেন, তাতে মনে হল মুরি গ্যাগারিন-কে ভোস্টকে চড়বার মুখে আমরা যেন পিছু ডেকেছি।

অতএব আবার মন্ত্রণা-সভা বসাতে হল।

ঘনাদাকে এবার চাগানো যায় কি করে?

গতিক এবার মোটেই সুবিধের নয়। সমস্যাটাই গোলমেলে।

রাগারাগি ঝগড়াঝাঁটি কিছু হয় নি যে ঘনাদা জেদ করে গরম হয়ে আছেন। দিব্যি খাচ্ছেন দাচ্ছেন, ঘুরছেন ফিরছেন, আলাপ-সালাপ করছেন, কিন্তু আসল টোপটি গেলাতে গেলেই কেমন পিছলে বেরিয়ে যাচ্ছেন। এ ক'দিন হেন চেষ্টা নেই যে করিনি, কিন্তু সবই পণ্ডশ্রম। আমাদের জ্বলন্ত দেশলাইয়ের কাঠি যেন বারুদের বদলে ভিজে বালিতে পড়ে নিভে গিয়েছে।

এখন করা যায় কি।

তোয়াজ করা ছেড়ে চটিয়ে দেখা যাক!—শিবুর পরামর্শ।

আহা, চটাতেই তো গেলাম।—গৌরের হতাশা,—কিন্তু কাজ হল কই।

আরো কড়া দাওয়াই চাই।—আমার সিদ্ধান্ত।

আমার ধার দেওয়া সিগারেট সব ফেরত চাইব?—শিশিরের দ্বিধা।

না তাতে হিতে বিপরীত হতে পারে।—আমাদের আশঙ্কা।

তাহলে ধার বাড়িয়ে দি? একেবারে পাঁচ হাজার?—শিশিরের উৎসুক জিজ্ঞাসা।

মন্দ নয় মতলবটা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেটাও বাতিল করতে হল। প্যাঁচটা পুরোনো। দাঁত কেটে গেছে। ঠিক ধরবে না।

হঠাৎ গৌর বলে উঠল,—ঠিক হয়েছে, আর ভাবনা নেই।

কি ঠিক হয়েছে, কি?—আমরা উৎসুক।

কানের জল কি করে বেরোয়?—গৌর প্রশ্ন করে নিজেই জবাব দিলে—জল ঢেলে। তাই ভাঁওতা দিয়েই ভাঁওতা বার করতে হবে।

সেটা কি রকম?

ভাঁওতাটা দেব কি?

ভবী কি ভুলবে?

আমাদের প্রত্যেকের নানারকম সন্দেহ।

চল, দেখাই যাক না।

আমাদের তেতালার সিঁড়ির নিচে দাঁড় করিয়ে রেখে গৌর ঘরের মধ্যে কি করতে গেল জানি না।

খানিকবাদে যখন বেরিয়ে এল, তখন হাতে তার একটা বাঁধানো খাতা।

আমাদের সরব ও নীরব কৌতূহল অগ্রাহ্য করে সে আগেভাগে সিঁড়ি দিয়ে বেশ একটু সশব্দেই ওপরে উঠল। আমরা তার পিছু-পিছু।

তেতালায় ঘনাদার একানে একটি ঘর। সামনে ছোট একটু খোলা ছাদ।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতেই খোলা দরজার ভিতর দিয়ে দেখতে পেলাম ঘনাদা আমাদের পায়ের শব্দ পেয়ে তাড়াতাড়ি একটা জামা আর হাতের ছুঁচসুতোটা তক্তপোশের তলাতেই সরিয়ে ফেলে চোখের চশমাটা খুলছেন।

তাঁকে এসব তুচ্ছ কাজ যে করতে হয়, ঘনাদা তা জানাতে চান না।

গৌরই এখন সর্দার। কি তার প্যাঁচ না জেনে শুধু তার মুখের দিকে সজাগ দৃষ্টি রেখে সকলে মিলে ভেতরে গিয়ে ঢুকলাম।

ব্যবস্থা সব করে ফেললাম ঘনাদা!—গৌর একেবারে মূর্তিমান উৎসাহ।

আমরাও চোখেমুখে যথাসাধ্য উল্লসিতা ফুটিয়ে তুললাম দেখাদেখি।

হুঁ, করে ফেললে তাহলে!—ঘনাদা চশমাটা খাপে ভরতে ভরতে এমন ভাবে মন্তব্য করলেন যেন গৌর আর তাঁর মধ্যে এক ড্রয়ার ভর্তি চিঠিপত্র চালাচালি ইতিমধ্যে হয়ে গেছে। কমিটি মীটিং-টিটিং পার হয়ে ব্যাপারটা বিশেষজ্ঞদের অনুমোদন নিয়ে এবার শুধু আইন-সভায় পাস হবার অপেক্ষায়।

আমরাই মাঝে থেকে ভ্যাবাচাকা। একবার গৌরের মুখের দিকে তাকাই, আর একবার ঘনাদার দিকে।

সাংকেতিক গৌর-ঘনাদা সংবাদ আরো কিছুক্ষণ এমনি ভাবে চলল।

এ তো আর ফেলে রাখবার জিনিস নয়!—গৌর যদি বলে তো ঘনাদা তৎক্ষণাৎ সায় দিয়ে বলেন—ফেলে রাখলে চলবে কেন! সেরকম পরামর্শ কেউ দিচ্ছে বুঝি?

দিলেই বা শুনছে কে?—গৌরের মুখ থেকে খসতে না খসতে ঘনাদা বলেন,—না, উচিতই নয়। এ কি একটা ছেলেখেলা!

এর মধ্যে শিবুও আছে তা ভাবতেও পারিনি। সে হঠাৎ বলে উঠল,—একটু অসুবিধে অবশ্য হবে!

আমার একেবারে চক্ষুস্থির করে দিয়ে শিশির তাতে চটে উঠে বললে—হোক না অসুবিধে, তাতে আমরা পেছপাও নাকি! কাজের উদ্দেশ্যটা তো ভাবতে হবে।

উদ্দেশ্যটাই তো আসল। কমল হেরি ভ্রান্ত কেন কাঁটাবনে যেতে! না না, কাঁটা ঘেরি শান্ত কেন কমল, কমল....ওই মানে যা বলে আর কি!—আমার মুখ দিয়েও ফস করে কি ভাবে বেরিয়ে গেল দেখে আমিই অবাক।

মুখে মুখে পাক খেতে খেতে ব্যাপারটা যখন বেশ ঘোরালো ধোঁয়া হয়ে উঠেছে, গৌর তখন একটুখানি আলো ছাড়ল—মাটি অবশ্য অনেকটা ফেলতে হবে।

ঘনাদার চোখদুটো একটু বড় হল কি? ও চোখ দেখে বোঝা কঠিন।

আমরা তখন যা হোক একটা জো পেয়ে গেছি। আর আমাদের পায় কে।

হ্যাঁ, বেশ ভালো মাটি,—বললে শিশির।

গঙ্গামাটিই ভালো।—শিবু সুপরামর্শ দিলে।

কতই বা আর খরচ! একটা ঠেলা বোঝাই করে আনলেই হবে—আমি ব্যবস্থাটাও করে ফেললাম।

গৌর আরেকটু আলোকপাতের জন্যেই বোধ হয় উঠে দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে ছাদটার দিকে তাকিয়ে যেন মনে মনে মেপে ফেলে বললে,—ছোটখাট একটা বাগান হবে,—যাকে বলে, roof garden আর কি! তবে ফুল-টুল কিছু নয়, স্রেফ তরি-তরকারি। আলু-বেগুন-ঢ্যাঁড়স-ঝিঙে-পটল,—পটলই বা নয় কেন?

গৌর ঘনাদার দিকে চেয়ে তাঁকে সমর্থন জানাবার সুযোগ দিলে।

কিন্তু ঘনাদার মুখে কোন শব্দ নেই। শব্দ যদি বেরোয় তো মেঘের ডাকই শোনা যাবে মনে হয়। কারণ, ঘনাদা ছাড়া আর কারও মুখ হলে আষাঢ়ের মেঘের সঙ্গে তার মিলটা আরও স্পষ্ট বোঝা যেত।

ঘনাদা কিছু বলুন না বলুন, আমাদের থামতে হবে না। আমরা ধরতাই পেয়ে গেছি।

শিবুই ঘনাদার হয়ে জবাব দিলে, পটল নয় বলছেন, কি বলছিস! আলবৎ পটল, একশোবার পটল। পাটনাই পটল। পটলই যদি না ফলাতে পারলাম তো ছাদের উপর বাগান করা কেন? চেষ্টায় কি না হয়।

শিবু দম নেবার জন্যে থামতেই আমি ধরে নিলাম,—নিশ্চয়! আত্মবিশ্বাস লিঙ্কনের কথা মনে করো না! কুড়ুল দিয়ে সেই গাছ কাটার পর বাবা জিজ্ঞেস করতেই কি বলেছিল?

জুৎসই দৃষ্টান্তগুলো যথাসময়ে আমার কেমন করে ঠিক জুগিয়ে যায়।

শিশির শুধরে একটু শুধরে দিলে,—লিঙ্কন নয়, স্যার আইজাক নিউটন!

বন্ধুবিচ্ছেদের সময় এটা নয়। আমি উদারভাবে মেনে নিয়ে বললাম,—ওই একই কথা। আসল ব্যাপার হল এই যে, খাদ্য বাড়াতে হবে, যেমন করে পারো, যেখানে পারো।

গৌর দ্বিগুণ উৎসাহিত হয়ে উঠল,—ঠিক বলেছ। Grow more food। পৃথিবীতে খাদ্যাভাব দিন দিন বাড়ছে, দুর্ভিক্ষ রাক্ষসী করাল মুখব্যাদান করে ক্রমশ এগিয়ে আসছে সমস্ত মানবজাতির দিকে। এখন এতটুকু জমি ফেলে রাখলে চলবে না। ছাদ, ছাদই সই।

আর ঘনাদার ঘরের সামনেই যখন বাগান, তখন দেখাশোনা সম্বন্ধে তো ভাবতেই হবে না! শিবু ছাদে তরি-তরকারির বাগানের স্বপক্ষে সব চেয়ে জোরালো যুক্তি দেখাল।

ঘনাদা তবু নীরব। চোখদুটোতেই শুধু একটু বিলিক মেরে দিচ্ছে। এই ঝিলিক এখন না নেভে! গৌরকেই উদ্দেশ্য করে বললাম,—নার্সারীতে বীজ-টিজের অর্ডার দিয়েছিস তো?

তা আর দিইনি!—গৌর কর্তব্য সম্বন্ধে হুঁশিয়ারির প্রমাণ দিলে—শুধু বীজ কেন? সিঙ্গি থেকে ফসফেট, ধাপা থেকে হাড়ের গুঁড়ো—সব আনছি।

ঘনাদা এখনও যদি ফেটে না পড়েন তাহলে তো নাচার।

এইজন্যই বুঝি ব্রহ্মাস্ত্রটি গৌর এতক্ষণ চেপে রেখেছিল। এইবার বাঁধানো খাতাটা ভীতিভরে ঘনাদার সামনে খুলে ধরে বলল,—এখন এইটিতে শুধু একটা সই দিতে হবে ঘনাদা!

কেন?—সেফ্‌টি ভাল্‌ভ প্রায় ফাটিয়ে বয়লারের যেন স্টীম বেরুল।

এই আপনার সইটা সবার আগে থাকলে আবেদনটার দাম বাড়বে কিনা?—গৌর সগর্বে জানালে।

কিসের আবেদন?—ছাদে ধান-ক্ষেত করার?

ঘনাদার বিদ্রূপটা গৌর গায়েই মাখলে না। বিনীত ভাবে বললে,—না, না, ছাদে চাষ তো হচ্ছেই, তার ওপরে আরো কিছু করা তো দরকার এই খাদ্য-সঙ্কটে। তাই আমরা সবাইকে একটা শপথ নেবার আবেদন জানাচ্ছি। এই পড়ুন না। আন্তর্জাতিক আবেদন বলে 'এসপেরান্টো'তে লিখলাম।

বাঁধানো খাতায় প্রথম পাতাটাতেই হিজিবিজি একটা কি লেখা রয়েছে বটে, কিন্তু তার পাঠোদ্ধার করতে লিপিবিশারদ প্রত্নতাত্ত্বিকেরও ক্ষমতায় কুলোবে বলে মনে হয় না।

ঘনাদা একবার সেদিকে চকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেন, তুমিই পড়ো।

এসপেরাণ্টোটা বাংলায় অনুবাদ করেই পড়ো।—আমাদের কাতর অনুরোধ।

গৌর মূল এসপেরাণ্টো পড়তে না পারায় যেন বেশ ক্ষুণ্ণ হয়েই বাংলায় অনুবাদ করে যা শোনালে, তার মর্ম হল এই যে, পৃথিবীর অন্ন-সমস্যার আংশিক সমাধানের জন্যে আমাদের সকলকে এখন থেকেই স্বল্পাহারের শপথ নিতে হবে। আধপেটা যদি না পারি তো অন্তত সিকি ভাগ খাওয়া সকলে যেন ছাড়ে এই আবেদন।

আবেদনটা বুঝিয়ে দিয়েই গৌর সোৎসাহে জানালে, পরীক্ষাটা নিজেদের ওপরই শুরু করছি ঘনাদা। আজ থেকেই মেসের সিকি 'মেনু' ছেঁটে দিয়েছি। কাল সকাল থেকে ভাতে ডাল আর শ্রেফ একটি তরকারি। মাছ হতেও পারে, নাও হতে পারে। মাংসের সব কিছু কম। থালায় বাটিতে যা দেবার দিয়ে এক হাতা করে তুলে রাখা হবে। যাকে বলে বাধ্যতা-মূলক জাতীয় সঞ্চয়।

এই?—ঘনাদা নাসিকাধ্বনি করলেন।

হ্যাঁ, আপাতত তো এই!—গৌর বেশ হতভম্ব। আমরা তো বটেই।

আপনি আরো কিছু ভেবেছেন নিশ্চয়!—শিবুর উস্কানির চেষ্টা।

আরো কিছু নয়, অন্য কিছু!—ঘনাদা সংক্ষিপ্ত।

মানে, গোড়াতেই আপনি অন্য কিছু ব্যবস্থা করে এসেছেন?—আমাদের বিস্ময়।

হ্যাঁ, ভেবেছিলাম, পেটেণ্টটা বুঝি নেওয়ার ব্যবস্থা করে এসেছ! আমার ছুঁচটা সত্যিই বুঝি ফাল হয়ে বেরিয়েছে শেষ পর্যন্ত।

আপনার ছুঁচ!—শিশির তক্তপোশের তলা থেকে ছুঁচসমেত গুঁজে রাখা আমাটা তুলে ধরে ছুঁচটা বার করতে করতে বললে,—ফাল তো হয়নি। এখনও ছুঁচই আছে দেখছি।

ও ছুঁচ নয়। ছুঁচের মতই সরু ছোট কাঁচের পিপেট।—ঘনাদা আমাদের প্রতি করুণা-কটাক্ষ করে বললেন,—একবার রক্তনদী বইয়ে যা সেইসঙ্গে একদিন জলে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল, যা না থাকলে সূর্যদেবকে বধ করার অস্ত্র এ যুগে আর তৈরি করবার আশা মানুষকে ছাড়তে হত।

সূর্যদেব মানে, আমাদের এই সত্যিকার আকাশের সূর্য, আপনার সেই ছুঁচেই কাৎ!

এক রকম তাই বলতে পারো!—ঘনাদার বলার ধরনে, বোঝা গেল, এ-রকম বড়াই তাঁর পছন্দ নয়।

শিশির ছুঁচটা রেখে দিয়ে সিগারেটের টিনটা তখন খুলে ফেলেছে।

ঘনাদা সিগারেট তুলে নিয়ে ধরিয়ে গোটা দুই সুখটান দিয়ে খানিকক্ষণ চোখ দুটি বুজে চুপ করে রইলেন।

আমরা উদ্‌গ্রীব।

আমাদের বেশ কিছুক্ষণ আশা-নিরাশার দোলায় দুলিয়ে রেখে ঘনাদা অবশেষে চোখ মেলে তাকিয়ে ওপরের ছাদটাকেই সম্বোধন করে বললেন—তখন আমি কোথায়?

আমরাও তখন আর নেই।

ঘনাদার এরকম স্মৃতিভ্রংশ আমাদের কল্পনাতীত।

তাঁর স্মরণশক্তির মরা আঁচ যথাসাধ্য চাগিয়ে তোলার আশায় যে যেমন পারি কাঠকুটো এগিয়ে দেবার চেষ্টা করলাম।

কলম্বিয়ায়?—আমার কুটো।

চন্দ্রচিদের দেশে!—শিবুর প্যাঁকাটি।

নোভালা জেমলিয়া-য়—গৌরের ক'ফোঁটা কেরোসিন।

আমাদের এই মেসে! শিশিরের এক আঁজলা জল একেবারে।

আমরা ক্ষেপে উঠে শিশিরকে নিয়ে পড়তে যাচ্ছিলাম। কিন্তু তার দরকার হল না।

ঘনাদার চোখদুটোর সঙ্গে কানদুটোও বোধ হয় ছাদেই ছিল। সেখান থেকে আমাদের দিকে কৃপা করে নামিয়ে বললেন,—হ্যাঁ, ইয়েমেন থেকে লালপানি পার হয়ে ইরিট্রিয়ার ওপর তখন ভাসছি। মার্কিন প্লেন, কিন্তু গাঢ় কমলা আর সবুজে ছোপানো গা, তাতে মান্ধাতার যুগের আমহারিক অক্ষরে সব কিছুর লেখা।

আমার পাশের সীটের ভদ্রলোক নড়েচড়ে বসলেন। মনে হল সেই নড়া-চড়াতেই বুঝি প্লেনটাই টালমাটাল হয়ে গোঁত্তা মেরে পড়ে।

প্লেনের সীটগুলো নেহাৎ ছোটখাটো নয়। কিন্তু ভদ্রলোক একেবারে ব্রাসপুরের বড় ভাই। দুটো সীট ভেঙে এক করে দিলে হয়তো তিনি একটু আরাম করে বসতে পারতেন। কিন্তু তার তো উপায় নেই। ইয়েমেন থেকেই পাশের সীটে এই পাঁচমণি লাশের মৃদুমন্দ ঠেলাঠেলি ধাক্কা খেতে খেতে আসছি। তিনিও স্বস্তিতে বসতে না পেরে উসখুস করছেন, সেই সঙ্গে আমিও।

ভদ্রলোক নীচের দিকে চেয়ে হঠাৎ বললেন,—এই ইরিট্রিয়া নিয়েও ইতিহাসে এত মারামারি। দেশটার চেহারা দেখছেন!

বললাম,—যা দেখেছেন তা ইরিট্রিয়া নয়।

ইরিট্রিয়া নয়!

সামনে পেছনে ও পাশে যাঁরা বসে ছিলেন, তাঁরাও চমকে উঠলেন সে আওয়াজে। চমকাবার মতই আওয়াজ। ভদ্রলোকের গলাখানি তাঁর বপুর সঙ্গেই পাল্লা দেবার মত। সেই গলা তিনি আবার চটে উঠে ছেড়েছেন সপ্তমে।

আশেপাশের যাত্রীরা কেউ একটু মুচকে হেসে, কেউ বিরক্তির ভ্রূকুটি করে মুখ ফেরালেন।

আমি শান্তভাবে বললাম,—না, ইরিট্রিয়া ছাড়িয়ে ফরাসী সোমালিল্যাণ্ডের পাড় ছুঁয়ে আমরা এখন ইথিওপিয়ায় পৌঁছে গেছি।

ভদ্রলোক খানিকক্ষণ আমার মুখের দিকে যেভাবে তাকালেন, তাতে মনে হল, জানালা ভেঙে আমায় টুপ করে বাইরে ফেলে দেবেন, না, প্লেনের ভেতরেই হাড়গোড়-ভাঙা দ বানিয়ে দেবেন ঠিক করে উঠতে পারছেন না।

কোন পর্যন্ত কি ভেবে বলা যায় না নিজেকে সামলে জিজ্ঞাসা করলেন গলাটা সপ্তম থেকে একটু নামিয়ে,—আপনি এসব জায়গা চেনেন?—আগে এসেছেন কখনো?

তা, আসতে-টাসতে হয় মাঝে মাঝে।—একটু হেসে কবুল করলাম।

কখন?—বাক্যখাই গলার প্রশ্নে আবার প্লেনটা বুঝি কাঁপল।

তোজোকে একটু আদর করতে।

তোজোকে আদর করতে! কে সে?

হেসে তাঁর দিকে ফিরে গলা নামিয়ে সাবধান করার সুরে বললাম, যা বলে ফেলেছেন, ফেলেছেন। ইথিওপিয়ার মুরুকের ওপর তাদেরই প্লেনে বসে তোজো কে, এ প্রশ্ন আর করবেন না। আগেকার দিন হলে কোতল করতেও পারত।

কোতল করত? আমাকে!—ভদ্রলোকের ওই চেহারাই আরো ফুলে ফেঁপে জামার বোতামগুলো প্রায় ছেঁড়ে আর কি!

তাঁকে ঘাড় কাত করে আপাদমস্তক একবার দেখে নিয়ে যেন সসম্ভ্রমে বললাম,—না, আপনাকে বোধ হয় সাহস করত না।

ভদ্রলোক এবার একটু খুশি হলেন মনে হল। তাই আবার একটু টিপ্পনি দিয়ে বললাম, তবে নেগুসস্ নাগাস্তির কানে কথাটা না যাওয়াই ভালো।

নেগুসস্ নাগাস্তি! নামটা শুনেই ভদ্রলোকের গলায় আর যেন তেমন ঝাঁজ পাওয়া

গেল না। একটু হতভম্ভ হয়েই জিজ্ঞাসা করলেন—নেগুস্‌ই তো জানি, নেগুস্‌ নাগাস্তি আবার কি? তোজোর সঙ্গে তাঁর কি সম্পর্ক?

নেগুস্‌ বলতে বোঝায় সম্রাট আর নেগুস্‌ নাগাস্তি মানে সম্রাটের সম্রাট, রাজচক্রবর্তী। তোজো হল তাঁরই পোষা চল্লিশটি সিংহের মধ্যে সবচেয়ে যেটি পেয়ারের, তার নাম। নেগুস্‌-এর প্রাসাদে সে ছাড়াই থাকে সারাক্ষণ।

ভদ্রলোক আমার দিকে খানিক চেয়ে থেকে কি ভাবলেন কে জানে। তারপর হঠাৎ পাশেই রাখা আমার হাতটা ধরে ফেলে করমর্দনের ছুতোয় হাড়গোড়গুলো কতখানি পলকা পরীক্ষা করতে করতে খুশিতে ডগমগ হয়ে বললেন,—আপনার সঙ্গে আলাপ করে অত্যন্ত সুখী হলাম। আপনার নামটা জানতে পারি?

হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে যেন প্রায় কঁকিয়ে কঁকিয়ে বললাম—অধীনের নাম দাস। এখন আপনার নামটা জানবার সৌভাগ্য এই গোলামের হবে?

কথাবার্তা আরবীতেই হচ্ছিল। এসব বিনয় সৌজন্য ও ভাষায় জমে ভালো।

ভদ্রলোক বাদশাহী চালেই বললেন,—শেখ ইব্‌ন ফরিদ।

ইব্‌ন ফরিদ!—নামটা শুনে আমি গদগদ হয়ে উঠলাম,—প্রায় সাড়ে সাতশো বছর আগে এক ইব্‌ন ফরিদ আরবকে ধন্য করেছিলেন। তাঁর কথা আর আপনাকে কি বলব। নিশ্চয় জানেন।

তা আর জানি না।—ইব্‌ন ফরিদ তাঁর আকর্ণবিস্তৃত গোঁফে চাঁড়া দিলেন।

আপনিও তো তাঁর মত টইলদার দেখছি। তিনি অবশ্য মস্ত বড় ভৌগোলিক ছিলেন। অপূর্ব ভ্রমণ-কাহিনী লিখে গেছেন। আপনি সেরকম লেখেন-টেখেন নাকি?

আমার দিকে চেয়ে একবার চোখ মটকে হাসতে হাসতে ইব্‌ন ফরিদ বললেন,—এখনও লিখিনি। তবে লিখব। সময় হলেই লিখব। আপনি তো আড্‌ডিস আবাবাতেই থাকবেন?

ইচ্ছে তো সেইরকম।—সবিনয়ে স্বীকার করলাম।

হ্যাঁ, নেগুস্‌-এর পোষা সিংহ নির্ভয়ে আদর করতে হলে ওখানেই থাকতে হয় আর বুনো সিংহ শিকার করতে হলে যেতে হয় অন্য কোথাও।—বলে ইব্‌ন ফরিদ আমার পায়ের ওপর নিরিশি সিনায় একটি আদরের থাপ্পড় দিয়ে প্লেন ফাটিয়ে হাসতে আরম্ভ করলেন।

আড্‌ডিস আবাবা শহরের সবচেয়ে যা আমার ভালো লাগে, তা সেখানকার গন্ধ। পৃথিবীর ছোট বড় আর কোন শহরের অমন অপরূপ গন্ধ আছে বলে জানি না। গন্ধটা পোড়া ইউক্যালিপ্টাস কাঠের। সমস্ত হাবশী জাতিদের যিনি এক রাজছত্রতলে মিলিয়েছিলেন, সেই নেগুস্‌ নাগাস্তি দ্বিতীয় মেনেলিক সর্বত্র ইউক্যালিপ্টাস গাছ পুঁতেছিলেন। সে গাছ এত বেড়েছে যে, লোকেরা ইউক্যালিপ্টাস জ্বালানি কাঠ হিসেবে পোড়ায়। শহরের হাওয়ায় তাই একটা মিষ্টি পরীদের গায়ের মত সুবাস সারাক্ষণ ভাসছে।

রাত্রে সে গন্ধটা আরো মন মাতানো। তাই নেশায় হোটেল থেকে বেরিয়ে শহরের একেবারে প্রান্ত পর্যন্ত চলে গিয়েছিলাম। হোটেলের ম্যানেজার বেরুবার সময় সাবধান করে দিয়েছিল যে, আড্‌ডিস আবাবার পথে-ঘাটে সারারাত হায়নারা চরে বেড়ায়। আশেপাশের পাহাড় থেকে তারা নেমে আসে, আবার ভোর হতে না-হতে ফিরে যায়। জ্যান্ত মানুষকে সাধারণতঃ তারা এড়িয়ে চলে, তবে দুনিয়ায় অমন ছিঁচকে শয়তান জানোয়ার আর দুটি নেই। বেকায়দায় পেলে তারা সব করতে পারে। কোন রকমে জখম অসহায় অবস্থায় পেলে জ্যান্ত মানুষের মাংস তারা খুবলে খেতে পারে।

আড্‌ডিস আবাবার রাস্তাঘাট অত রাত্রে বেশ নির্জন পেয়েছিলাম। দিনের বেলায় গাধা ও ঘোড়ার সে নোংরা ভিড় আর নেই। এখানে সেখানে দু একটা হায়না দূর থেকে চোখে পড়েছে। দেখতে না দেখতে তারা ছায়ার মত মিলিয়ে গেছে কোথায়।

শহরের একদিকের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত এসে যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম, সেখান থেকে একটি

তেপান্তরের রাস্তা সুডানের খার্তুম হয়ে মরুভূমির দেশে ওয়াদি হালফার দিকে গেছে। এই পথেই ইথিওপিয়ার রাজারা একদিন উত্তরের দিকে দিগ্বিজয়ে গিয়েছিলেন।

কিছুদূরে কোথায় একটা হায়নার হাসির শব্দে চমকে ফিরতেই এমন কিছু দেখলাম, যাতে শরীর-মন এক মুহূর্তে সজাগ হয়ে উঠল। একটা মোটা ইউক্যালিপ্টাস গাছের গুঁড়ির পেছনে নিজেকে পাথরের মত নিস্তব্ধ করে দাঁড়িয়ে রইলাম।

হায়না কি জন্তু-জানোয়ার কিছু নয়, মানুষ। আর এই মানুষটিকে অন্ততঃ এত রাত্রে শহরের এই প্রান্তে দেখবার কথা সত্যি বলতে গেলে কল্পনাও করিনি।

মুখ দেখতে পাওয়ার দরকার নেই। আকার দেখেই মানুষটাকে চিনতে দেরি হয় না। আবিসিনিয়ার মানুষরা শক্ত সমর্থ জোয়ান হয় বটে, কিন্তু এমন একটা দৈত্যাকার মাংসের পাহাড় অন্ততঃ এ ক'দিনে আড্ডিস আবাবার রাস্তায় ঘাটে দরবারে কোথাও চোখে পড়েনি।

ইব্‌ন ফরিদই যে পালের গোদা একটা গণ্ডারের মত নির্জন রাস্তা দিয়ে শহরের বাইরে কোথাও হনহন করে' হেঁটে চলেছে, এ বিষয়ে তখন আর সন্দেহ নেই।

কিছুদূরে সে এগিয়ে যাবার পর নিঃশব্দে তার পিছু নিলাম। খুব নিঃশব্দে নেবার দরকার ছিল না। কারণ, সে নিজেই পদভরে মেদিনী কাঁপিয়ে যেভাবে চলেছে, তাতে আর কোন শব্দ তার কানে যাবার কথা নয়।

কিন্তু ইব্‌ন ফরিদ সত্যি চলেছে কোথায়? শহর তো এইখানেই শেষ। তারপর তো প্রায় গাছপালাহীন পাথুরে ঢেউখেলানো তেপান্তর।

হঠাৎ মনে পড়ল দুদিন আগেই আড্ডিস আবাবার বাজারে যে শিকারীর সঙ্গে আলাপ হয়েছে তার কথা। শখের শিকারী সে নয়। দুর্লভ দামী চামড়ার ব্যবসাই খাতিরেই তার শিকার। বিশেষ করে কালোচিতার খোঁজেই সে আবিসিনিয়ার এমন সব দুর্গম দূর জায়গায় দেশী অনুচরদের নিয়ে যায়, যা নেগুসের তহসিলদাররাও জানে কিনা সন্দেহ।

শহরের বাইরেই সম্প্রতি সে তাঁবু গেড়েছে জানি। লোকজন রসদ সংগ্রহ করে নতুন শিকারের 'সফরি'তে বেরুনই তার উদ্দেশ্য।

আমার অনুমানই ঠিক। কিছুদূর যেতেই শিকারীর সাদা তাঁবুটা অন্ধকারেই রাস্তার ধারে ঝাপসা ভাবে দেখা গেল। কাছেপিঠে বাঁধা ঘোড়াগুলোরও পা ঠোকার শব্দ শোনা গেল সেই সঙ্গে সঙ্গে।

ইব্‌ন ফরিদের আসাটা যে অপ্রত্যাশিত নয়, শিকারীকে টর্চ হাতে তাঁবু থেকে কিছু দূরে অপেক্ষা করতে দেখেই তা বোঝা গেল।

শিকারীর হাতের টর্চটা একবার জ্বলে উঠতে ইব্‌ন ফরিদ হাঁক দিয়ে তার উপস্থিতি জানালে। আমি তখন পথের ধারে মাটির উপর শুয়ে পড়েছি।

ইব্‌ন ফরিদের চালচলনে সন্দেহ করবার মত সত্যিই অবশ্য তখনও কিছু নেই। হাঁক দিয়ে সাড়া দেওয়াটা অন্ততঃ লুকোচুরি কোন ব্যাপারের সঙ্গে খাপ খায় না।

কিন্তু গোপনীয় যদি কিছু না হয়, তাহলে এত রাত্রে এই শহরের বাইরে এসে দেখা করার মানে কি?

ইব্‌ন ফরিদের আড্ডিস আবাবায় এতদিন থাকাটাও তো একটু অদ্ভুত। টিট্‌কিরি দিয়েও আমায় যা সে জানিয়েছিল, তাতে এতদিনে তার তো সিংহ-শিকারে বেরিয়ে যাবার কথা। আড্ডিস আবাবায় প্লেন থেকে নামবার পর এ ক'দিনের মধ্যে কোথাও আর না দেখে আমি তার কথাটা সত্যি বলেই ধরে নিয়েছিলাম।

এতদিন সে ছিল কোথায়? লুকিয়েই বা ছিল কেন?

হাতে পাঁজি মঙ্গলবার। রহস্য কিছু থাক বা না-থাক, শেষ পর্যন্ত ভালো করে ব্যাপারটা না বুঝে আমি ফিরব না ঠিক করে ফেলেছি।

ইব্‌নে ফরিদকে নিয়ে শিকারী তার বড় তাঁবুটায় ঢোকবার পরই অত্যন্ত সন্তর্পণে তাঁবুর বাইরে গিয়ে বসলাম।

নিস্তব্ধ রাত। ঘোড়াদের নিশ্বাস আর পা ঠোকার শব্দ ছাড়া মাঝে মাঝে এদিক-ওদিক থেকে হায়নার হাসি শুধু শোনা যাচ্ছে।

ভেতরে কথাবার্তা চলছে বুঝতে পারছি, কিন্তু তাঁবুর কাপড়টা বেশ মোটা। দু একটা শব্দ ছাড়া ভালো করে কোন কথা বোঝা যাচ্ছে না।

কথাবার্তা ফরাসীতেই চলছে সন্দেহ নেই। কিন্তু দুজনের কারুরই যে ফরাসী মাতৃভাষা নয়, যেটুকু শুনতে পাচ্ছিলাম তার উচ্চারণ ও বলার ধরন থেকেই বুঝলাম।

শিকারী লোকটির সঙ্গে আড্ডিস আবাবার বাজারে ইথিওপিয়ার অ্যামহারিকেই আলাপ হয়েছিল। তাতে তাকে হাবসি ভাবিনি, ভাবার কোন কারণও ছিল না। রোদে পোড়া চেহারাটা একেবারে কড়া তামাটে হয়ে এলেও তার নখ-চোখের গড়ন থেকে চুলের রঙে বোঝা যায় মধ্যেপসাগরের উত্তরে ইওরোপের কোনো দেশের সে লোক। এদেশে অনেকদিন থেকে ভাষাটা দেশের লোকের মতই বলতে শিখেছে।

এখন কিন্তু তার অশুদ্ধ ফরাসী উচ্চারণেও কি যেন একটা ইঙ্গিত পাচ্ছিলাম। মরুদেশের অনেকের ইংরাজী উচ্চারণে যেমন জাতীয় বৈশিষ্ট্য ধরা যায়, এও অনেকটা প্রায় তাই।

ফরাসীটা চোস্ত শিখেছিলেন বটে ঘনাদা!—শিবু হঠাৎ ফোড়ন পেড়ে বসল,—ভুল উচ্চারণ শুধু ধরে ফেলেন না, তা থেকেই ভুল যে করে তার জাতের খবর পর্যন্ত বার করে ফেলেন!

ঘনাদার সিগারেটটার ধোঁয়াতে আমরা হঠাৎ বোধহয় কাশতে শুরু করলাম। সে কাশিকে হাসি চাপার চেষ্টা বলে যদি কেউ সন্দেহ করে আমরা নাচার।

ঘনাদা অন্ততঃ করলেন না। শিবুর তারিফটা একটু হেসে অম্লান বদনে হজম করে শুরু করলেন—লোকটা গ্রীক বলে বুঝলাম। শুধু ওইটুকু নয়, বুঝলাম তার চেয়ে আরেকটু বেশী। জন্তু-জানোয়ারের চামড়া শিকারই লোকটার ব্যবসা হতে পারে, কিন্তু সে নেহাৎ সাধারণ শিকারী মাত্র নয়। ইব্‌নে ফরিদ তো নয়ই। একটা দুটো কথা যা স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিলাম, তা শিকারের জগতের নয়।

নিউক্লিয়ার ফিসন্‌ অর্থাৎ পারমাণবিক বিস্ফোরণ কোথায় লাগে কিংবা বিজ্ঞানে সত্যিকার যুগান্তর, এ ধরনের কথা কালোচিতার খোঁজে যে ইথিওপিয়ারও পাণ্ডববর্জিত অঞ্চলে ঘুরে বেড়ায়, অথবা বুনো সিংহ-শিকারে যার নেশা, সেরকম লোকদের আলাপের বিষয় হওয়া একটু আশ্চর্য।

আরো একটু ভালো করে যদি শুনতে পেতাম! সেই চেষ্টাতেই তাঁবুর কাপড়ের গায়ে কানটা ভালো করে লাগাতে গিয়েই কেলেঙ্কারী করে ফেললাম। আর তাতেই শাপে বর হয়ে গেল।

তাঁবুর গায়ে কানটা লেপটে লাগাতে গিয়ে অসাবধানে তাঁবুর বাইরের একটা খুঁটিতে বাঁধা দড়িতে কেমন করে হাত ঠেকে গেছল।

তাঁবুটা একটু তাতে নড়ে উঠতেই চারিদিক কাঁপিয়ে দড়াম দড়াম করে দুটি পিস্তলের গুলি ছুটল।

দুটোই কানের পাশ দিয়ে তো?—শিবুর আবার সরল জিজ্ঞাসা।

না—ঘনাদার গলাটা একটু বেশী ভারী শোনাল।

সন্ত্রস্ত হয়ে আমরা শিবুকে ধমকালাম,—শিবুটার কেমন বুদ্ধি! দুটোই কানের পাশে হয় কখনো? রবার্ট ব্রেকের গল্প পেয়েছিস।

শিবুর দিকে পিস্তলের নলটার মতই অগ্নিদৃষ্টি ফেলে ঘনাদা বললেন,—দুটো গুলিই কাছাকাছি একেবারে মাথার ঠিক ওপর দিয়ে। খানিকটা চুলের ডগা পুড়েই গেল তাতে।

হাসি দূরে থাক, আমরা কাশি পর্যন্ত চেপে রইলাম প্রাণপণে।

ঘনাদা আমাদের তদ্গত চেহারাগুলোর ওপর চোখ বুলিয়ে সন্তুষ্ট হয়ে আবার শুরু করলেন—স্পষ্ট তারপর শুনতে পেলাম গ্রীক শিকারী বলছে,—আপনি কি ক্ষেপে গেলেন নাকি ফরিদ সাহেব? গুলি ছুঁড়লেন কাকে?

কেউ যদি থাকে?—বলে ইবনে ফরিদ হাসল, আপনি বুঝতে পারছেন না মঁসিয়ে সোলোমাস। সাবধানের মার নেই। তাঁবুটা কি রকম নড়ে উঠল দেখলেন? কেউ থাকতেও পারে ওখানে।

থাকতে পারে দুটো-একটা হায়না।—সোলোমাসের গলাটা প্রসন্ন নয়,—রাত্রে মাঝে মাঝে তাঁবুর আশেপাশে খাবারের গন্ধ শুঁকে অমন ঘোরে। দিলেন তো তাঁবুটা ফুটো করে।

আরে, ও ফুটো ক্যাম্বিসের তাঁবুর বদলে রাজপ্রাসাদ পাবেন থাকবার, কাজটা যদি হাসিল হয়। আচ্ছা, তাঁবুর বাইরেটা একবার ঘুরে দেখে এলে হয় না?—ইবনে ফরিদের সন্দেহটা তখনও যায় নি বোঝা গেল।

আমি সবে গা ঢাকা দেবার জন্যেই তৈরী হচ্ছিলাম। কিন্তু সোলোমাসের কথায় আশ্বাস পেলাম।

সোলোমাস তখন বলছেন,—মানুষ হলে না লাগলেও ভয়ে একবার চেঁচাত। জানোয়ার হলেও তাই। মিছিমিছি আপনি জেগে স্বপ্ন দেখছেন। এখন কাজের কথা সেরে ফেলুন তাড়াতাড়ি।

এত স্পষ্ট সব কথা শুনতে পাওয়ার কারণ তখন আমি বুঝে ফেলেছি। তাঁবুর ওই দুটো পিস্তলের গুলির ফুটোই আমার সহায় হয়েছে।

ফুটো দুটো কাছাকাছি হওয়ায় আরো সুবিধে। আলতো ভাবে তাতে কান ঠেকিয়ে কাজের কথাও শুনলাম।

ফরিদ তখন বলছে,—ওই চিমসে কালা ছুঁচোটাই আমাদের ভরসা। হাঁটা পথে এখান থেকে যদি কোথাও যায় তো আপনি আছেন, আর উড়ে কোথাও যেতে চাইলে আমি। আসল ঘাঁটি ওরই শুনছ জানা। সেখানেই চলেছে যতটা পারে এলোমেলো ঘুরেফিরে সকলের চোখে ধুলো দিতে। ওকে খাঁচায় রেখে পিছু নিলেই কাম ফতে। হতভাগা জানেও না যে, যমকে ফাঁকি দিতে পারে, তবু আমাকে নয়। কাজটা শেষ করে যমের চেহারাই ওকে দেখাব।

দস্তারটে অন্য কথা বলে ফরিদ তাঁবু থেকে বেরুল। বেরোবার সময় সোলোমাসের টর্চটা ধার নিয়ে তাঁবুর পেছনটা তদারক করে দেখে যেতেও ভুলল না।

আমি তখন সেখান থেকে সরে গিয়েছি অবশ্য।

ফরিদ চলে যাওয়ার পর ধীরে-সুস্থে গিয়ে সোলোমাসের তাঁবুর পর্দাটা সরালাম।

সরাতে না সরাতে সত্যই অবাক।

আসুন দাস!—বলে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে সোলোমাস আমার দিকেই ফিরে দাঁড়িয়ে হাসছেন,—আপনার অপেক্ষাতেই দাঁড়িয়ে আছি।

আমার অপেক্ষায়?—আমি সন্দিগ্ধ ভাবে সোলোমাসের দিকে তাকালাম।

হ্যাঁ আপনারই। তাঁবুর পেছনে বসে সবই তো শুনেছেন।

আমিই যে তাঁবুর পেছনে ছিলাম, তাও আপনি জানতেন!—আমি সত্যই অবাক।

প্রথমে কি আর ঠিক জানতাম! কিন্তু দুটো গুলির পরও না চিৎকার, না পালাবার শব্দ শুনে বুঝলাম একটি মানুষ ছাড়া দুনিয়ায় আর কারো পক্ষে এ মনের জোর সম্ভব নয়।

সেই একটি মানুষের এত পরিচয় আপনি জানলেন কি করে?

সোলোমাস হাসলেন,—তাহলে আর তাঁবুর পেছনে শুনলেন কি? আপনার পরিচয় জানাই তো আমাদের আসল কাজ। পরিচয় না জেনে কি আপনার পিছু নিয়েছি?

তাহলে আমার পিছু নিয়েছেন সে কথা স্বীকার করছেন!—আমি ভেতরে ভেতরে গোলমালে পড়লেও বাইরের কড়া গলায় তা বুঝতে দিলাম না।

না স্বীকার করে উপায় কি! বিশেষ নিজের কানেই সব যখন শুনে ফেলেছেন।

ক্রমশ আমিই যেন বেকায়দায় পড়ছিলাম কথা-কাটাকাটিতে। তাই একটু রেগেই বললাম,—আমিই তাঁবুর পেছনে ছিলাম বুঝেও ফরিদ সাহেবকে হায়নার কথা বলেছিলেন কেন?

আলাপ-আলোচনাটা দীর্ঘ হবে মনে হচ্ছে,—সোলোমাস হাসলেন,—আপনারও অনেক কিছু জিজ্ঞাসা করবার আছে, আমারও কিছু বলবার। সুতরাং এমন ভাবে দাঁড়িয়ে না থেকে একটু বসলে হত না। এত রাত্রে আপনাকে আর কি দিয়ে আপ্যায়িত করতে পারি। খাটি জংলী মধু থেকে তৈরি আবিসিনিয়ার নামকরা তেজ আছে। বসুন। তাই একটু চাখতে দিই।

না, তার দরকার হবে না। আমি এমনিই বসছি। এখন আমার কথাগুলোর জবাব দিলে বাধিত হব।—বলে আমি চিতার চামড়ায় ঢাকা একটা নীচু কৌচের উপর বসলাম।

সোলোমাসও পাশে একটা মোড়া টেনে বসে বললেন,—কেন ফরিদ সাহেবকে হায়নার কথা বলেছিলাম এই কথা জানতে চাইছেন তো? বলেছিলাম ফরিদ সাহেবকে ধোঁকা দেবার জন্যে। হায়নারা রাত্রে শহরের রাস্তায় ধাওড়ের কাজ করে ঘোরে, আমার তাঁবুর দড়ি নাড়তে তারা কখনো আসে না আমি জানি।

ওঃ, আমায় তাহলে অনুগ্রহ করেছিলেন! এ অনুগ্রহের কারণ—এবারে সত্যি অবাক হওয়ার দরুন বিদ্রূপের সুরটা ঠিক গলায় ফুটল না।

অনুগ্রহ নয়, আত্মরক্ষা যদি বলি!

আত্মরক্ষা! আপনি আমার সঙ্গে রসিকতা করছেন?—আমি জ্বলে উঠলাম,—শত্রুকে বাঁচাবার চেষ্টা আপনার আত্মরক্ষা!

কথাটা একটু গোলমেলে বটে!—সোলোমাস হাড়-জ্বালানো হাসি হেসে বললেন,—আমি অবশ্য বলতে পারি শত্রুকে বাঁচানই এ ক্ষেত্রে আমাদের আত্মরক্ষা। ফরিদ সাহেব আহাম্মুখ, তাই না বুঝে শুনে অমন গুলি ছুঁড়েছিল! আপনি মারা গেলে আমাদের নিজেদেরই তো সর্বনাশ! যা খুঁজছি তার পথ দেখাত তাহলে কে!

এই তাহলে আপনার কৈফিয়ৎ? কিন্তু মারা তো আরেকটু হলে গিয়েছিলাম, টিপটা একটু না দৈবাৎ ফসকালে!

দৈবাৎ যেটা ভাবছেন, তার পিছনে মানুষের হাতও তো থাকতে পারে! এই সোলোমাসেরই হাত।

আমি বিস্ময় সামলে ওঠার আগেই সোলোমাস এবার গম্ভীর হয়ে বললেন,—হ্যাঁ, আমিই গুলি ছোঁড়বার সময় হঠাৎ চমকাবার ভান করে হাতটা তার একটু ওপর দিকে নাড়িয়ে দিয়েছিলাম।

কেন? তখনও তো আপনি জানেন না যে আমিই ওখানে আছি।

ঠিক জানি না, কিন্তু আশা একটু করছিলাম বই কি! আপনার এত খবর আমরা রাখছি, আর আপনি আমাদের এই ডেরার খবর নিতে একবার আসবেন না তদন্তে, এ কি হতে পারে!

মনে মনে লজ্জিত হয়ে অবশ্য স্বীকার করলাম যে ইবনে ফরিদকে ঠিক বুঝেও সোলোমাসকে একেবারেই সন্দেহ করতে পারিনি। মুখে কিন্তু ঝাঁজের সঙ্গে বললাম,—আমি আসব তাও জানতেন, এসেছি কি না এসেছি ঠিক না জেনেই প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টা করেছেন, এখন আবার আমারই অপেক্ষায় দাঁড়িয়েছিলেন! আপনার রহস্যটা কি বলুন তো? সাপ নেউল দুইএর মাথাতেই হাত বুলোতে চান নাকি!

একরকম প্রায় ধরে ফেলেছেন! অন্তত ফরিদ সাহেবের খুব হিতৈষী যে নয়, তা বোঝা উচিত।

হিতৈষী তাহলে কার?—সন্দিগ্ধ ভাবে জিজ্ঞাসা করলাম।

আপনাদের।—সোলোমাসের এবার স্পষ্ট উত্তর।

তাহলে ফরিদ সাহেবের দলে কেন?

চোরের উপর বাটপাড়ি করবার জন্যে!—সোলোমাস হাসলেন।

হাসিতে চটে গিয়ে বললাম,—বিশ্বাস করব কিসে?

প্রমাণ দিলে।—সোলোমাসের জবাবে কোন দ্বিধা নেই।

দিন প্রমাণ তাহলে!—আমি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সোলোমাসের দিকে তাকালাম। ধরুন, যদি বলি রেনে লাভাল?—সোলোমাসের মুখে ঈষৎ হাসি দেখা গেল।

ও নাম শত্রুরা সবাই জানে।—আমিও অবিশ্বাসের হাসি হাসলাম এবারে।

তাহলে এমন কিছু বলি যা শত্রুদের জানবার কথা নয়?

তাই তো শুনতে চাইছি। আমি কড়া গলায় বললাম।

মোট একশো সাইত্রিশ!—বলে সোলোমাস আমার দিকে চেয়ে মুচকে মুচকে হাসতে লাগলেন।

আমি তখন সত্যই চমকে গেছি। কোন রকমে সামলে জিজ্ঞাসা করলাম।—ক'রকম মিলিয়ে?

পাঁচ। চটপট জবাব দিলেন সোলোমাস।

আমি সত্যই তাজ্জব।

আমরাও। গৌর ত' বলেই ফেলল,—ভারী মজার ধাঁধা তো ঘনাদা!

হ্যাঁ, সাঙ্ঘাতিক মজার! সে মজার ধাঁধার উত্তর খুঁজতে বাঘা বাঘা বৈজ্ঞানিকেরা সারা দুনিয়ায় তখন হিমশিম খাচ্ছে, আর শয়তানেরা ছলে বলে কৌশলে তা আদায় করবার জন্যে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।—ঘনাদা সিগারেটটায় কয়েকটা রাম টান দিয়ে ফেলে দিয়ে বলতে শুরু করলেন,—সোলোমাস অন্ততঃ সে শয়তানের দলের ন'ন এটুকু তখনই বুঝলাম। কারণ, যেটুকু তিনি বলেছেন শয়তানের কারুর তা কল্পনারও বাইরে। কিন্তু সত্যি সোলোমাস তাহলে কে? শত্রুর দলে তিনি এমন করে পরিচয় ভাঁড়িয়ে আছেনই বা কেন? চোরের ওপর বাটপাড়ি করাই তাঁর উদ্দেশ্য বলছেন। সত্যিই কি তাই? চোরের ওপর বাটপাড়ি তিনি করছেন কি স্বার্থে? কার হয়ে?

এসব প্রশ্ন মাথার মধ্যে ঘুরছিল বলেই খানিকক্ষণ চুপ করে ছিলাম।

সোলোমাসই হেসে বললেন,—আপনি খুব মুশকিলে পড়েছেন বুঝতে পারছি দাস। আরো একটা প্রমাণ তাই দিচ্ছি। এমন অকাট্য প্রমাণ যা পেলে অবিশ্বাসের আর কোনো কারণ থাকবে না আশাকরি।

একটু থেমে যেন আমার মুখের ভাবটা পরীক্ষা করে সোলোমাস বললেন,—আপনার এখান থেকে নাইরোবী যাবার কথা। কেমন ঠিক না?

এবার আমি একেবারে থ। আমায় গোপন নির্দেশ যে পাঠিয়েছে, সে এবং আমি ছাড়া দুনিয়ায় এ খবর আর কারু জানার কথা নয়। আডুডিস আবাবা থেকে যে নাইরোবী যেতে হবে, এখবর আমি নিজেই ইয়েমেন থেকে রওনা হবার আগে জানতাম না। ঠিক রওনা হবার কিছু আগে সুইজারল্যাণ্ডের এক ব্যাঙ্কের ছাপমারা লেফাফার ভেতর সঙ্কেতলিপিতে এই নির্দেশ এসেছে যে, আডুডিস আবাবার বিশেষ একটি হোটেলে ক'দিন থেকে আমি যেন নাইরোবীতে রওনা হই। সেখান থেকে কোথায় যেতে হবে তার নির্দেশ নাইরোবীর একটি সুইস ব্যাঙ্কের শাখাতেই পাবো।

সোলোমাসকে অবিশ্বাস করার আর কোন মানেই হয় না। কিন্তু তাঁর রহস্যটা কি তা না বুঝলে আর আমার শান্তি নেই।

তাঁর অনুমান যে ঠিক, একথা অকপটেই স্বীকার করে বললাম—আপনার কথাই ঠিক। কিন্তু যে খবর শত্রুপক্ষের তো নয়ই, মিত্রপক্ষেরও কারুর জানা অসম্ভব, তা আপনি জানলেন কি করে? আমি এসব নির্দেশ কার মারফত পাই তা জানেন কি?

জানি বই কি!—সোলোমাস হাসলেন—কোনো সুইস ব্যাঙ্কের মারফত।

যে কোনো সুইস ব্যাঙ্ক মক্কেলদের স্বার্থরক্ষার ব্যাপারে কিরকম বিশ্বাসী তাও নিশ্চয়

জানেন!—অবাক হয়ে আমি বললাম—মরা মানুষের পেট থেকে কথা বার হতে পারে শরদ তাদের পেট থেকে হবে না। তাহলে আপনি এ খবর পেলেন কি করে?

সোজা উত্তরটা বুঝতে পারছেন না কেন? সোলোমাস যেন আমার নির্বুদ্ধিতায় ক্ষুণ্ন হয়ে বললেন,—আমিও সুইস ব্যাঙ্কের মারফতই ওই খবরটা পেয়েছি। শুধু ওই খবর নয়, ওটা বাতিল করার নির্দেশও।

তার মানে?

তার মানে নাইরোবীতে নয়, আপনাকে এখন যেতে হবে সুডানের খার্তুম শহরে। নাইরোবী যাওয়া বাতিল করে এই নির্দেশ এসেছে।

মাথাটা সত্যিই গুলিয়ে যাচ্ছিল। যে আজগুবি টহলে একমাস আগে প্যারিস থেকে রওনা হয়ে ইওরোপের ও এশিয়ার নানা শহরে টক্কর খেতে খেতে ইথিওপিয়ার এই রাজধানীতে এসে পড়েছি, তাতে মাথা স্থির রাখা কঠিন। কিন্তু সোলোমাস সে অস্থির মাথাটি যেন চরকি বাজির মত ঘুরিয়ে দিয়েছেন।

একটু নিজেকে সামলে জিজ্ঞাসা করলাম,—এ নির্দেশ আমার কাছে না এসে আপনার কাছে এসেছে কেন?

বোধহয় আরো নিরাপদ করবার জন্যে।

কিন্তু আপনার সঙ্গে আমার দেখা তো না হতেও পারত? আমি'ত দৈবাৎ আজ এখানে এসে পড়েছি।—এবার মনে হল অকাট্য যুক্তি দিয়েছি।

দৈবাৎ এসেছেন সত্যি। দৈবাৎ যদি না আসতেন তাহলে, বাধ্য হয়ে আমাকেই যেতে হত খবরটা পৌঁছে দেবার জন্যে। তবে আপনার মত লোক ইব্‌ন ফরিদের সূত্র ধরে আমার কাছে পৌঁছতেন-ই আমি জানি। তাই তখন বলেছিলাম, আপনার জন্যেই অপেক্ষা করেছি। শহরের বাজারে সেদিন আমি নিজে যেচে যে আপনার সঙ্গে আলাপ করেছিলাম, সে কথাও আশাকরি মনে আছে?

এত ব্যাখ্যাতেও ব্যাপারটা আমার কাছে সম্পূর্ণ পরিষ্কার হল না। সোলোমাসের নিশ্চিত ধারণা দেখলাম, ইব্‌ন ফরিদের সূত্র ধরে তাঁর কাছে আমি পৌঁছতাম-ই। এই ধারণা কেমন করে এত দৃঢ় হল আমি বুঝতে পারলাম না। ইব্‌ন ফরিদকে যাই সন্দেহ করে থাকি, তোড়জোড় করে অনুসরণ করার মত দাম তার আছে বলে'ত মনে হয়নি।

অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসেই কি ফরিদকে অগ্রাহ্য করেছি! আর এই অগ্রাহ্য করাটা অনুমান না করতে পেরেই সোলোমাস অমন ধারণা করেছেন।

নিজের সন্দেহ-সংশয় আপাতত চাপা দিয়ে এবার অন্য প্রশ্ন করলাম,—ইব্‌ন ফরিদের সঙ্গে আপনার যোগাযোগ হল কি করে? কি করে তার দলে ভিড়লেন?

ভিড়লাম চেষ্টা করে। এ ব্যাপারে আসল শনি যে কারা, তা তো আমাদের অজানা নয়। সুতরাং তাদের ওপর নজর রাখতে তাদেরই দলে ভিড়বার ছল করতে হয়।

সে ছলে তারা ভুলবে কেন?—একটু কড়া হয়েই জিজ্ঞাসা করলাম।

যাতে ভোলে, তার জন্যে পাঁচটা ঝুটোর মধ্যে একটা সাচ্চা খবর দিয়ে তাদের বিশ্বাস জাগাতে হয়।

তার মানে শত্রুদেরও সত্যিকার গোপন খবর আপনি জুগিয়েছেন?—অবাক আর রুষ্ট এবার আমি জ্বলে উঠলাম।

বললাম তো, সোলোমাস নির্বিকার ভাবে বললেন,—তাদের বিশ্বাস করাবার জন্যেই হয়েছে। অবশ্য এমন খবর দিয়েছি যাতে শেষপর্যন্ত কোন ক্ষতি হবার নয়।

যেমন?

যেমন ইয়েমেন থেকে আপনি আড্‌ডিস আবাবা আসছেন।

এই খবর আপনি দিয়েছেন!—আমি একেবারে আগুন হয়ে উঠলাম—ওই ফরিদ

চোরে দিয়েছি, তাতে লোকসান হয়েছে কি?—সোলোমাস হাসলেন।

হাসিন কি বারুদ নিয়ে খেলা করছেন জানেন?

প্রশ্ন, বারুদ নিয়েই আমাদের খেলা।—গম্ভীর হয়েই সোলোমাস বললেন এবার।

খানিকক্ষণ চুপ করে রইলাম নিজের কর্তব্যটা স্থির করবার জন্যে। সোলোমাসকে অবিশ্বাসও যেমন করতে পারা যায় না, তেমনি বিশ্বাসও নয়। কি তাঁর প্যাঁচ, কি তাঁর মতলব কে জানে? হয়তো শত্রুপক্ষের চর হয়ে আমার ওপরও টেক্কা দেবার এটা এক নতুন ফন্দি।

মুখে সে-সব কিছু না জানিয়ে চলে আসার আগে শুধু বললাম,—আপনার কথা মতই আমার রাস্তা বদলাচ্ছি। এর ভেতর চালাকি যদি কিছু থাকে—

তাহলে খার্তুমে গেলেই ধরা পড়বে।—সোলোমাস নিজেই কথাটা পূরণ করে দিলেন।

খার্তুমে গিয়ে সোলোমাসের নির্দেশ যে মিথ্যে নয় তার প্রমাণও যেমন পেলাম, সেই সঙ্গে আরেকটা এমন ব্যাপার দেখলাম, যেটা অত্যন্ত সন্দেহজনক।

ওখানকার সুইস ব্যাঙ্কের শাখায় সই দিয়ে সত্যিই একটা শীলমোহরকরা নতুন নির্দেশের খাম পেলাম। খামটা নিয়ে খার্তুমের সবচেয়ে খানদানী রাস্তা খেদিভ অ্যাভেন্যু ধরে খেদিভ আর ভিক্টোরিয়া অ্যাভেন্যুর মোড়ে যেখানে উটের পিঠে বসা জেনারেল গর্ডনের বিরাট ব্রঞ্জের মূর্তিটা স্থাপিত সেখান পর্যন্ত এসেছি, এমন সময়ে দূরের আব্বাস স্কোয়ারের দিকে চোখ পড়ায় থমকে দাঁড়ালাম। আব্বাস স্কোয়ারের মাঝখানের সোড়া মিনারেয় বিরাট মসজিদের কাছ থেকেই যে-লোকটা আসছে তাকে দূর থেকে দেখেও চিনতে যেমন ভুল হবার কথা নয়, তার খার্তুমে আসাও তেমনি অভাবনীয়।

লোকটা আর কেউ নয়—ইব্‌ন ফরিদ।

সোলোমাস কি তাহলে দু-মুখো সাপের শয়তানিই করেছে?

আমায় খার্তুম আসার নির্দেশ দিয়ে ফরিদকেও কি তা আবার জানিয়েছে!

না, আর ধোঁকার মধ্যে থাকার কোন মানে হয় না। ব্যাপারটার একটা ফয়সালা এখুনি আজই করে ফেলতে হবে।

ফরিদ আমায় দেখতে পায়নি। ভিক্টোরিয়া অ্যাভেন্যু দিয়ে সে খেদিভ অ্যাভেন্যুর দিকেই আসছে। গর্ডনের মূর্তির আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে খানিক অপেক্ষা করে আমি ফরিদের পিছু নিলাম দূর থেকে।

ফরিদ খেদিভ অ্যাভেন্যুর একটা নাম-করা হোটেলে গিয়ে ঢোকবার কিছুক্ষণ বাদে সেখানে গিয়ে হোটেল-ক্লার্ককে জিজ্ঞাসা করে ঘরের নম্বর জেনে নিয়ে একেবারে সটান ইব্‌ন ফরিদের ঘরের দরজায় গিয়ে টোকা দিলাম। ফরিদের কামরার দরজায় কিন্তু 'বিরক্ত কোরো না' বিজ্ঞপ্তি লটকানো।

ভেতর থেকে বাঘের মত গলায় আওয়াজ এল—দূর হও। বাইরের নোটিস পড়তে নিষে ...া না!

নাইরে কি করে পারব।—হিব্রু ভাষায় বললাম,—ইংরেজিটা যে জানি না।

সুই খানিকক্ষণ ভেতরে আর কোন আওয়াজ নেই। তারপর আবার বাজখাঁই গলায় প্রশ্ন —পড়তে পারো না তো আমার কথা বুঝলে কি করে?

বুঝতে ফরিদ সে কথা জিজ্ঞাসা করতে পারে অবশ্য। কারণ সে ইংরেজিতেই প্রথম ধমক ত ছিল।

কিন্তু ? বললাম,—শুনে বুঝতে পারলেই কি পড়তে পারা যায়! তুমি তো আরবী বলো খাসা, কি করে ...ক্ষর চেনো কি?

জানি ... এবার গর্জন শোনা গেল,—কে তুমি?

যে কো ...য়ন মিষ্টি করে বললাম,—ইব্‌ন ফরিদ।

দড়াম করে দরজাটা এবার খুলে গেল। ফরিদের মাংসের পাহাড়ে যেন ভূমিকম্প শুরু হয়েছে।

ও তুই—মানে আপনি!—ফরিদ চটপট সামলে নিয়ে বললে,—আসুন আসুন! তা, এরকম রসিকতার মানে কি?

কামরার ভেতরে ঢোকার পর ফরিদ দরজাটা বন্ধ করে দিচ্ছে দেখে বললাম, যেন অবাক হয়ে—রসিকতা কোথায় দেখলেন?

ফরিদ গর্জন করতে পারলেই বোধ হয় খুশি হত। তার বদলে অতি কষ্টে রাগ চেপে রেখে হাসবার চেষ্টা করে বললে,—ইব্‌ন ফরিদ নামটা নেওয়া যদি রসিকতা না হয় তাহলে মাপ চাইছি।

ইব্‌ন ফরিদ নামটা রসিকতা!—আমি যেন আকাশ থেকে পড়ে বললাম,—আপনি যদি ও নাম নিতে পারেন, তাহলে আমি নিলেই রসিকতা হবে কেন?

ও নাম আমার নয় বলতে চান? ফরিদ আর বুঝি নিজেকে সামলাতে পারে না।

তাই তো বলছি।—মধুর হেসে বললাম,—আপনি ইব্‌ন ফরিদ তো ন'ন-ই, আরবও আপনার দেশ নয়।

কথাটা বলে ফরিদের মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। এবার হয় সে ফাটবে, নয় পাঁচ খেলবে।

শেষেরটাই ঠিক হল। দু এক মুহূর্ত কি ভেবে নিয়ে ফরিদ বললে,—মানলাম আপনার কথাই সত্যি, কিন্তু আপনি জানলেন কার কাছে?

কারুর কাছে জানি-নি, নিজেই বুঝেছি। আপনি আরবী ভাষা যত ভালোই বলুন, সত্যিকারের আরব হলে অন্তত ইব্‌ন ফরিদ নামটার দাম জানতেন!

তার মানে?—ফরিদ সত্যিই এবার একটু হতভম্ব!

মানে, ইব্‌ন ফরিদ যে পর্যটক ভূগোলবিদ্ নয়, আরবী ভাষার অদ্বিতীয় একজন সুফী কবি, এ খবর শিক্ষিত আরব মাত্রেই শুধু নয়, আরবী সাহিত্যের সঙ্গে কিছু পরি[illegible] আছে সে-ও জানে। ভূগোলবিদ্ পর্যটক হিসেবে যাঁর নাম-ডাক ছিল, তিনি ইব্‌ন [illegible] ইব্‌ন জুবের।

ফরিদ হাঁ করে আমার দিকে তখন তাকিয়ে।—বলেই ঘনাদা হঠাৎ ভ্রূকুটি [illegible]

আমাদের সকলেরই তখন কোথা থেকে কাশির ছোঁয়াচ লেগেছে।

শিশির সবার আগে সামলে উঠে লজ্জিত ভাবে বললে,—আপনার ঘরে লবঙ্গ [illegible]

কেন?—ঘনাদার গলা গম্ভীর।

এই সবাই একটা একটা চিবোতাম। গলাটা কেমন খুস খুস করছে কি না।

তা লবঙ্গ কেন? উখো দিয়ে চাঁছো না।—শিবু ঠিক সময়মত সুর পাল্টে দাঁত [illegible] উঠল—না ঘনাদা, আপনি বলে যান। ভারি একটু কাশি তার জন্যে লবঙ্গ চাই, বড় [illegible] বাসক সিরাপ চাই! কডলিভার অয়েল যে চাওনি এই আমাদের ভাগ্যি।

শিশির ও আমরা বকুনি খেয়ে যথাবিহিত কুঁকড়ে গেলাম।

ঘনাদা মানের গোড়ায় জল পেয়ে আবার শুরু করলেন,—ফরিদ খানিক একেবারে বোবা হয়ে থেকে তারপর বললে,—আমি ইব্‌ন ফরিদ হই বা না হই, আরব আমার দেশ হোক বা না হোক, তাতে আপনার কি আসে যায় যে আড্ডিস আবাবা থেকে এই খার্তুম পর্যন্ত পিছু নিয়ে এই হোটেলে এসে ধাওয়া করেছেন?

ফরিদের গলায় রাগের ঝাঁজ কিন্তু নেই। সে যেন অন্য মানুষ। নামই ভাঁড়াক আর যাই করুক, সে যেন কারুর সাতে-পাঁচে নেই। শুধু নিজের খুশিতে একটু দেশ-বিদেশ ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমি কেন মিছিমিছি তার পিছু নিয়ে তাকে বিব্রত করছি এই তার নালিশ।

ফরিদের তালেই তাল দিয়ে তার দিকে চেয়ে মুচকে হেসে বললাম,—শুধু কি আড্ডিস

আবার কোথেকে? পিছু নিয়েছি সেই ইয়েমেন থেকে তা বুঝি জানেন না?

আমি এই সূত্র ধরব ফরিদ ভাবতে পারেনি। তবু যথাসম্ভব নিরীহ ভালো-মানুষের মত জিজ্ঞেস করলে,—কেন নিয়েছেন তাইতো জানতে চাইছি।

তাহলে আমার মুখ থেকেই শুনতে চান! হো হো করে হেসে উঠে তার পিঠে একটা দোস্তির জোরদার চাপড় দিয়ে বললাম,—আসুন তাহলে বসা যাক।

ফরিদ তখন মোক্ষমভাবেই উপুড় হয়ে খাটে পড়েছে। বললে,—

আপনি, ওঠেন নয়। এই আপনার সোফায় বসে হাত বাড়িয়ে তাকে তুলে সোফায় বসিয়ে দিলাম।

বাঁ হাতটা আরেক হাতে টিপতে টিপতে সোফার সে আরাম ঠিক উপভোগ করছে বলে মনে হল না। তাতে তার চোখে ঠিক যেরকমের প্রতিহিংসার আগুন থাকা উচিত তাও যেন নেই।

যেন খানিক কিছু লক্ষ্য না করেই তার পায়ে যে পড়ে কাকুতি-মিনতি করেছিল,—কেন আপনার পেছনে ছিঁচকে চোরের মত লেগে আছি জানেন? একটা লোককে ফ্রান্স থেকে নরওয়ে যাবার পথে তাকে নিঃশেষ করে যায়। এমনি কত লোককেই তো মারে। বিভিন্ন দেশের পুলিস কিছু দিন পরপর খোঁজ-খবর নেয়—চেষ্টা করে, তারপর নামটা খাতায় লিখে নেয়। আর সব দেশের পুলিস তা করলেও ফ্রান্সের পুলিস তা করেনি। এ ব্যাপারটা একটু আশ্চর্য। কারণ লোকটা বৈজ্ঞানিক বটে, কিন্তু কেউকেটা কেউ নয়। পারমাণবিক বোমা কি গ্রহান্তরে যাবার রকেটের ব্যাপারেও তার গবেষণার বিষয় নয়। ফটো কম্পোজ যাদের বলে, তিনি সেই জাতের বৈজ্ঞানিক। তাঁর নামটা বৈজ্ঞানিক মহলে পর্যন্ত খুব বেশী লোক জানে না। তাঁর নাম ধরা যাক রেনে লাভাল।

একটু থেমে ফরিদের দিকে চাইলাম। ফরিদ সোজা লোক নয়। রেনে লাভালের নাম শুনেও চমকে ওঠার কোন লক্ষণ তার দেখা গেল না।

সেবার কাহিনী,—রেনে লাভাল নিরুদ্দেশ হবার কিছুকাল পরে কী একটা মজার ব্যাপার আমাদের এক ফরাসী পুলিস দপ্তরে ছাড়া যার সম্বন্ধে কারুর কোন আগ্রহ নেই, সেই না, আর পিসের আগেকার বাসাবাড়িতে একটি চুরি হল। লাভালের বাসাবাড়ি ফরাসী আজই করে যেন করে রেখেছিল। সেখানে দামী কোন জিনিসপত্রও ছিল না। তবু সে ফরিদ আসর প্রায় নাকের ওপর দিয়ে বেপরোয়া হয়ে কোন চোর কিসের লোভে এল চুরি করতে। গভীর পর পুলিস সব কিছু মিলিয়ে দেখল। জিনিসপত্র কিছুই খোয়া যায়নি। পিছন নিলাম ওর যাবার সময় বই কাগজ-পত্র যা লাভাল যেমন ভাবে রেখে গিয়েছিলেন, আর ফরিদ টেবিলে তালা দেবার সময় শুধু ওপর থেকে ফটো নিয়ে যা ছোঁয়নি, সেসব ঠিক গিয়ে ফোটো আছে। চোর তাহলে কিসের খোঁজে এসেছিল এত বিপদ ঘাড়ে নিয়ে?

ঘরের ফরাসী পুলিসের হাতে চোর শেষ পর্যন্ত ধরা পড়ল। সাধারণ একটা দাগী সিঁধেল লুটেল সে পুলিসের কাছে স্বীকার করলে যে, অচেনা একজন বিদেশী একটা বিশেষ ফরমাশ দিয়ে তাকে লাভালের বাসায় চুরি করতে পাঠিয়েছিল। তার জন্যে টাকাও দিয়েছিল।

প্রচুর বড়লোকের বাড়ির সিন্দুক ভাঙলেও অত টাকা পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। কাজ হাসিল করতে পারলে আরো টাকা দেবে বলেছিল, এবং সে কথা সে বিদেশী রেখেছে।

কাজ তাহলে তুমি হাসিল করেছ?—ওই অঞ্চলের কমিশেয়ার দ্য পুলিস স্বয়ং কড়া ধমক দিয়ে চোরকে জিজ্ঞেস করেছিলেন।

কিন্তু কড়া ধমক খেয়েও চোর হাসতে শুরু করেছিল। পাহারাদার পুলিসকে নারমুখো দেখে তারপর বলেছিল,—আজ্ঞে হাসিল করেছি বই কি! কিন্তু কাজটা কি শুনবেন? শুনলে আপনারাও হাসবেন।

কি কাজ শুনি? আবার ধমক দিয়েছিলেন কমিশেয়ার।

আজ্ঞে, কাগজ-ফেলার ঝুড়ির ছেঁড়া কাগজগুলো নিয়ে গিয়ে সেই বিদেশীকে দেওয়া।

ছেঁড়া কাগজের বদলে নোট পেয়েছিলাম গাদা-গাদা।—চোরটা হাসতে গিয়ে নিজেকে সামলেছিল। কমিশনারের ভেতরে ভেতরে চমকে উঠলেও বাইরে তা বুঝতে দেন নি কাউকে। জিজ্ঞেস করেছিলেন আবার,—আর কিছু নাওনি তুমি? ঠিক করে বলো?

আজ্ঞে, ঠিক বলেছি। মা মেরীর দিব্যি!—চোরটা সত্যি কথাই বলছে মনে হয়েছিল।

কমিশনারের বিশেষ অচেনা লোকটার চেহারার বর্ণনা জেনে নিয়ে চোরটাকে ছেড়ে দিয়েছিলেন।

সবচেয়ে এই একটা ঘটনা নয়, এরকম আরো একটা অদ্ভুত ব্যাপার তখন ঘটে। যে ল্যাবরেটরিতে লাভাল কাজ করতেন, খোঁজ করতে করতে জানা যায় যে, সেখানে তাঁর এক সহকারীকে তাঁর আগে থাকতেই পাওয়া যাচ্ছে না। সহকারী ফরাসী নয়। ইওরোপের ভিন্ন দেশের লোক। নিজের দেশে যাবে বলে ছুটি নিয়ে লাভাল নিরুদ্দেশ হবার মাস ছয়েক আগে সে চলে যায়। কিন্তু তারপর আর সে ফিরে আসেনি। লাভালের ব্যাপারটা নিয়ে টনক না নড়লে পারিস সেই সহকারীর খোঁজ বোধ হয় করতই না। কোঁচো খুঁড়তে গিয়ে সত্যিই শেষ পর্যন্ত গোখরো বেরোল। কমিশনার ফরাসী সরকার জানতে পারল যে, হেনরি লাভালের নিরুদ্দেশ হওয়ার পেছনে গভীর রহস্য আছে কিছু। কিছুকাল থেকে তিনি যেন খুব ভয়ে ভাবনায় দিন কাটাচ্ছেন মনে হয়েছিল। ল্যাবরেটরির সহকর্মীদের তিনি বিশেষ কিছু বলেননি, কিন্তু তিনি খুব যে বিপদের মধ্যে আছেন এই আভাসটুকু দিয়েছিলেন। বন্ধু ও সহকর্মীরা অবশ্য এসব কথার মানে তখন বুঝতে পারেনি। তাঁর নিরুদ্দেশ হওয়ার সঙ্গে এই সব ব্যাপার জড়িয়ে ফরাসী পুলিশের ধারণা হল যে, হয় বেনে লাভালকে তাঁর শত্রুরা কেউ কোথাও পাচার করেছে, কিংবা তিনি নিজেই গা-ঢাকা দিয়ে কোথাও লুকিয়ে আছেন।

ফরিদ কি বলতে যাচ্ছিল, তাকে থামিয়ে বললাম,—কিন্তু ফরাসী সরকারেরও যা অজানা সে কথা জানে মাত্র দু-একটি লোক। আপনি তাদের একজন।

আমি! ফরিদ আকাশ থেকে পড়ল যেন।

হাঁ আপনি। আপনি জানেন যে চেষ্টা করলেও মঁসিয়ে লাভালকে শত্রুরা কেউ ধরে নিয়ে যেতে পারেনি। তিনি নিজেই তাদের ফাঁকি দিয়ে গা ঢাকা দিয়ে লুকিয়ে আছেন। কেন তিনি গা-ঢাকা দিয়ে আছেন তাও আপনি জানেন, আর ধরুন একজন পর্দা বিশ্বাসী বন্ধু হিসেবে তাঁরই গোপন নির্দেশ অনুসারে আপনি তাঁকে সাহায্য করতে তাঁর লুকোনো আস্তানায় চলেছেন।

এই পর্যন্ত বলে একটু থামলাম, তারপর ফরিদের চোখে চোখ রেখে কড়া গলায় আবার বললাম,—এখন মনে করুন আমি শত্রুপক্ষের চর, মনে করুন আপনার মারফত লাভালের গুপ্ত আস্তানা খুঁজে বার করবার জন্যে আমি সাবধানে ছায়ার মত আপনার পিছু নিয়েছি, কিন্তু তা সত্ত্বেও আপনি তা জানতে পেরে গেছেন। তারপর এখন হাতে পেয়ে আমার সম্বন্ধে কি আপনি করবেন?

ফরিদ এতটুকু বিচলিত হল না এ কথাতেও। বরং শান্ত গম্ভীর স্বরে বললে,—বিশেষ কিছু করব না, শুধু আজ সুইস ব্যাঙ্কে গিয়ে যে নির্দেশ-দেওয়া লেফাফাটি এনেছেন, সেটি আপনার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে একটি গোল-কিক করে আপনাকে দরজার বাইরে পাঠিয়ে দেব।

কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে পকেট থেকে একটা ছোট রিভলভার বার করে সে আমার দিকে তখন ধরেছে।

সেদিকে চেয়ে ভয়ে ভয়ে বললাম, সত্যিকার রিভলভার মনে হচ্ছে।

শুধু সত্যিকার রিভলভার নয়,—ফরিদ হিংস্রভাবে হেসে সেফ্‌টি ক্যাচটা সরিয়ে বললে,—ছ'ছটা গুলি ভরা আর সেফ্‌টি ক্যাচটাও সরানো! একটু ট্যা ফুঁ করলেই ওই চিমসে বুকটা ঝাঁঝরা করে দেব।

কিন্তু তাতে বড় বেশী বিশ্রী আওয়াজ হবে না? হোটেলের লোকেরা চমকে উঠতে পারে। এমন কি পুলিস-টুলিস নিয়ে ছুটেও আসতে পারে এঘরে। সুডানি পুলিস বড় বেয়াড়া শুনেছি।

সুডানী পুলিস ঘুণাক্ষরেও কিছু জানবে না, এবিষয়ে নিশ্চিত থাকতে পারেন।—ফরিদ কুটিল হাসির সঙ্গে চিবিয়ে চিবিয়ে বললে,—কারণ, এ হোটেলের মালিক থেকে চাকর পর্যন্ত কেউ সেনর সাবাটিনির ঘরে কি হচ্ছে উঁকি দিয়ে দেখতেও সাহস করবে না।

ও, আপনি তাহলে সেনর সাবাটিনি!—আমি পরিচয় জেনে ধন্য হবার ভাব দেখালাম।

আমি যেই হই,—ফরিদ মানে সাবাটিনি কড়া গলায় বললে,—তোর পকেটের লেফাফাটা এবার বার কর দেখি ছুঁচো! এখন বুঝতে পারছিস বোধ হয়, ও লেফাফা সঙ্গে নিয়ে সিংহের গুহায় ঢুকে কি বোকামি করেছিস! অবশ্য, ও লেফাফা তোর কাছ থেকে কেড়ে নিতামই! সেই জন্যেই আমার খার্তুম আসা। শুধু হ্যাঙ্গামাটা তুই বাঁচিয়ে দিলি এই যা!

আমি যেন প্রায় কাঁদো-কাঁদো হয়ে বললাম,—এ লেফাফা আপনাকে দিতে হবেই? না নিয়ে আপনি ছাড়বেন না?

না ছাড়ব না। ভালোয় ভালোয় দিস তো জ্যান্ত এ ঘর থেকে বেরুতে পারবি। আর না দিলে লেফাফা তো যাবেই, সেই সঙ্গে প্রাণটা।—সাবাটিনির কি সে উল্লাসের হিংস্র হাসি!

কিন্তু এ লেফাফা নিয়ে কি লাভ আপনার হবে!—আমি কাতর ভাবে বোঝাবার চেষ্টা করলাম,—রেনে লাভাল নিরিবিলিতে কোথায় একটু লুকিয়ে আছেন তাকে কেন মিছিমিছি জ্বালাতন করবেন?

জ্বালাতন কেন করব?—সাবাটিনি আবার হেসে উঠল, তাঁকে জ্বালাতন কিছু করব না, শুধু তাঁকে তাঁর বেপাতি কাগজপত্র নটবর সমেত এমন জায়গায় পাঠাব করব, যেখানে তাঁর গবেষণার কোন বিঘ্ন আর হবে না।

কোথায়? আপনার নিজের দেশ ইটালীতে?—আমার যেন দারুণ কৌতূহল।

না।—সাবাটিনি গর্জন করে উঠল কোথায় তাতে তোর কি দরকার!

ও বুঝেছি।—আমি ভালোমানুষের মত বললাম,—নামটি আপনার ইটালীয়ান হলেও আপনার দেশ জাত বলে কিছু নেই। ও সব বলাই ঘুচিয়ে আপনি শুধু নিজের স্বার্থের দাতেই ঘোরেন। রেনে লাভালকে পাবার জন্যে যার সবচেয়ে বেশী দাম দেবে তাদের মাই তাকে বেচবেন।

চুপ কর ছুঁচো।—সাবাটিনি গর্জন করে উঠল,—তোর কাছে বক্তৃতা শোনবার আমার সময় নেই। সুবোধ ছেলের মত লেফাফাটা বার কর। আমি এক থেকে পাঁচ গুনছি। তার মধ্যে লেফাফা না দিলে এই রিভলবারই যা বলবার বলবে। এক...

দোহাই! দোহাই!—আমি কাতর অনুনয় জানালাম,—লেফাফাটা তো দিতেই হবে বুঝতে পারছি, কিন্তু তার আগে পৃথিবী থেকে চিরকালের মত অন্ধভাব ঘোচাবার কল্পনাতীত উপায় যিনি আবিষ্কার করতে চলেছেন, তাঁর গোপন ঠিকানাটা একটু দেখে নিতে দেবেন? সত্যি বলছি, শ্রী মোহরাওয়া খামটা খুলেও দেখিনি এখনো।

তাহলে এ জন্মে আর তা দেখা তোর ভাগ্যে নেই।—সাবাটিনি নির্মমভাবে হেসে উঠে গুনতে আরম্ভ করল,—এক...দুই...

সাবাটিনির পেছনে কামরার দরজাটা খোলার খুট করে একটু আওয়াজ হল।

সাবাটিনি চমকে উঠলেও আমার দিক থেকে চোখ বা পিস্তল কিছুই না ফিরিয়ে বিরক্তির সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলে,—কে?

পেছন থেকে চাপা গলায় আওয়াজ এল—আমি সোলোমাস।

সোলোমাস!—সাবাটিনি হতভম্ব হল বুঝতে পারলাম কিন্তু তার চোখ আর পিস্তল আমার ওপরই নিবদ্ধ রইল। দাঁতে দাঁত চেপে শুধু বললে,—এখানে কেন?

শোনা গেল—তোমায় শেষ করতে।

আমি হাত তুলে সভয়ে চিৎকার করে উঠলাম,—ও কি করছেন, মঁসিয়ে সোলোমাস? পিস্তল ছুঁড়বেন না! আমার গায়ে গুলি লাগবে যে!

সাবাটিনি চমকে একটু পিছনে তাকাতেই তার হাতের রিভলবার এল আমার হাতে, আর সে তখন সোফার ওধারে চিৎপাত।

রিভলভারটার সেফটি ক্যাচ আবার লাগিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে বললাম,—উঠুন সেনর সাবাটিনি। মেঝেয় অমন শুয়ে থাকা কি ভালো!

সাবাটিনির কিন্তু ওঠবার কোন লক্ষণ তখনো নেই। একবার বন্ধ দরজা আর একবার আমার দিকে ভ্যাবাচাকা খেয়ে তাকিয়ে বললে,—সোলোমাস কোথায় গেল?

সোলোমাস আবার যাবে কোথায়? আড্ডিস আবাবাতেই আছে।—হেসে বললাম,—ভেনট্রিলোকুইজমে বিদ্যেটা অনেক সময় খুব কাজে লাগে।

সাবাটিনি সেই বিরাট দেহ নিয়েও এঁবাবে তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বললে,—শয়তান, পাজি, ছুঁচো, শুধু তোর হাতে রিভলভার তাই, নইলে তোর হাড়-মাংস আমি আলাদা করে রাখতাম।

রিভলভারটা দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললাম,—ও আফসোস আপনার তাহলে আর রাখলাম না।

আমার কথা শেষ হতে না হতেই সাবাটিনি লাফ দিয়ে পড়ল। না, আমার ওপরে নয়, রিভলভারটা যেখানে ছুঁড়েছিলাম সেদিকে। কিন্তু সেখান পর্যন্ত তাকে পৌঁছতে হল না। তার শয়তানী বুদ্ধিই সোফাটা তৎক্ষণাৎ ঠেলে দিয়েছিলাম। তার ধাক্কায় হুমড়ি খেয়ে সে দেয়ালের গায়ে গিয়ে ছিটকে পড়ল।

সেখান থেকে তাকে তুলে একটা ধোবি পাট দিয়ে বললাম,—কি ভাগ্যি সেনর সাবাটিনি, আপনার ঘরে এ হোটেলের মালিক থেকে চাকর-বাকর কেউ উঁকি দিতে সাহস করে না, নইলে আপনার কাছে দুটো লড়াইয়ের প্যাঁচ শেখবার এ সৌভাগ্য হয়তো পেতাম না। হয়তো হোটেলের লোকেরা ভূমিকম্প হচ্ছে বলে এ ঘরের দরজা ভেঙে ঢুকতে পারত।

সাবাটিনিকে একটা ধাক্কা পাক দিয়ে মাটিতে ফেলে আবার বললাম,—আপনার মত টনাটনে ন্যায়নীতিবোধ কোথাও আমি দেখিনি। ধর্মযুদ্ধে অন্যের হাতে রিভলভার আপনি পছন্দ করেন না, কিন্তু নিজের হাতে সেটা রাখা ন্যায্য মনে করেন। আপনাকে আবার তাই একটা সেলাম জানাচ্ছি।

সাবাটিনি তার নিজের ধড়টার ওপরেই মুখ থুবড়ে পড়ে তখন কাতরাচ্ছে।

পকেট থেকে শিলমোহর দেওয়া চিঠিটা বার করে বললাম,—এ চিঠি আপনাকে খুলে এখন আমি দেখাতে পারি, কিন্তু দেখিয়ে কোন লাভ হবে কি? কারণ, এ চিঠির ঠিকানাতেই আমি নিজে এখন যাচ্ছি। তার চেয়েও আপনার এই শ্রীমুখ দেখার কোন বাসনা কেন জানি না আমার হচ্ছে না! তা সত্ত্বেও যদি আপনি দেখাতে চান, তাহলে আশা করি উইল-টুইল করেই যাবেন। অবশ্য কার জন্যেই বা করবেন? আপনার জন বলতে স্বয়ং শয়তান ছাড়া আর কেই আপনার থাকতে পারে!

কথাগুলো বলে বেরিয়ে যেতে গিয়েও আমায় ফিরে দাঁড়াতে হল। সাবাটিনি কাতরাতে কাতরাতেই তখন বিষাক্ত গলায় বলছে,—ওই দমদমখো সাপ সোলোমাসই তোকে সব জানিয়েছে আমি বুঝেছি। কিন্তু এই আমি বলে রাখছি, ওই সোলোমাসের ছোবল তোকেও খেতে হবে। তোর নিপাত যাবার আর বেশী দেরি নেই।

সাবাটিনির অভিশাপ কানে নিয়েই ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম।

খার্তুম থেকে বেরুবার আগেই সাবাটিনির অভিশাপ কিছুটা অন্তত ফলল।

যাবার দিনই সইশ ব্যাঙ্কের সেই চিঠিটা কি ভাবে আমার তালা দেওয়া হোটেলের

কামরায় আমার ব্রীফ-কেস থেকে যে চুরি গেল বুঝতে পারলাম না।

কি ভাগ্যি আমি লেফাফাটা খুলে আগেই পড়ে রেখেছিলাম। চিঠিটা পড়েই কেন যে পুড়িয়ে দিইনি এই আমার আফসোস।

কিন্তু আফসোস করে বা চুরির কিনারা করবার চেষ্টায় সময় নষ্ট করে কোনো লাভ নেই।

চুরি যাবার দরুনই যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি সব ব্যবস্থা করে পরের দিন সকালেই একটি প্লেনে রওনা হয়ে পড়লাম। কিন্তু সেখানেও বাধা।

খার্তুম থেকে বেরিয়ে ঝড়ের মধ্যে পড়ে প্লেনটা তখন হয়ে কোনমতে ন্যুবিয়ার মরুভূমির দক্ষিণপ্রান্তে নীলনদী যেখানে হঠাৎ যেন পিছনে ফিরে যাবার জন্য বাঁক নিয়েছে, সেই ছোট শহর আবু হামেদ-এ গিয়ে নামল। সেখান থেকে তোড়জোড় করে অন্য প্লেনে কায়রো যেতে দিন দশেক লাগল। কায়রো থেকে অবশ্য সোজা দক্ষিণ-পশ্চিমে আফ্রিকার আর এক প্রান্তে আতলান্তিক সমুদ্রের ধারে এক গহন জংলী রাজ্যে গেলাম। লেফাফায় সেই নির্দেশই ছিল।

জংলী রাজ্যের নাম গ্যাবোঁ। জায়গাটা একেবারে অচেনা নয়। আফ্রিকার দুষ্প্রাপ্য গ্যালাগো ধরতে অনেক আগে একবার ওখানকার জঙ্গলে গেছলাম।

কি ধরতে গেছলেন?—শিবু হাঁদার মত জিজ্ঞাসা করে বসল।

গ্যালাগো!—ঘনাদা নামটা আবার বলে ধৈর্যের পরিচয় দিলেন।

গ্যালাগো!—গৌর উদগ্রীব হয়ে জিজ্ঞাসা করলে,—গাঁবলার মাসতুতো-পিসতুতো ভাই না ঘনাদা?

না।—ঘনাদা অনেক-পার সঙ্গে বললেন,—লেমুর যাদের বলে, সেইরকম আধা-বাঁদর এক-জাতের ছোট প্রাণী। কোনটা ইঁদুরের চেয়ে বড় হয় না।

মোটে ইঁদুর!—শিশির ফোঁস করে যেভাবে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল, তাতে মনে হল গ্যালাগো জানোয়ারটা তাকে ঠকিয়ে একেবারে পথে বসিয়ে দিয়েছে।

আমাদের ভাগ্য ভাল যে ঘনাদা সে দীর্ঘনিশ্বাস অগ্রাহ্য করে আবার শুরু করলেন,—বিষুবরেখার উত্তরে আতলান্তিকের ধারে এই ছোট রাজ্যটি ফরাসীদের অধিকারে। রাজ্যটি কঙ্গোরই প্রতিবেশী এবং কঙ্গোর সঙ্গে তার মিলও কম নয়। বেশীর ভাগই ঘন জঙ্গলে ঢাকা। এক একটা গাছ একশো থেকে দেড়শো হাত প্রায় লম্বা। বছরের অর্ধেক সময়ে নদী-নাটা ভেসে জল-জঙ্গল একাকার হয়ে থাকে। সিংহের দেখা খুব বেশী না পাওয়া গেলেও আফ্রিকার বিরল জানোয়ার ওকাপি ওই সব জঙ্গলে মেলে তাছাড়া চিতাবাঘ আছে, এক জাতের লাল বুনো মোষ, সোনালী বেড়াল, বিরাট সব কাঠবেড়ালী আর ওই গ্যালাগো।

এই জংলী রাজ্যে ঠিকানা মনে থাকা সত্ত্বেও রেনে লাভালের আস্তানা খুঁজে বার করতে কম বেগ পেতে হল না। প্লেন তো নামিয়ে দিয়ে গেল সমুদ্রের তীরের লিব্রেভিল বন্দরে। সেখান থেকে আঁকা-বাঁকা কুইলা নদীতে যতদূর সম্ভব মোটরলঞ্চ ও তারপর জংলী ডিঙি বেয়ে কোথাও বা হেঁটে বুনো হিংস্র আদিবাসীদের এড়িয়ে লাভালের নির্দেশ দেওয়া অঞ্চলে পৌঁছতে প্রায় দুই হপ্তা লেগে গেল।

এই অঞ্চলটায় দুর্ভেদ্য বনজঙ্গল শেষ হয়ে গিয়ে পাহাড়ী উপত্যকা শুরু হয়েছে। ওকান্দে জাতের যে-সব বাহকেরা এতদূর আমার মালপত্র বয়ে নিয়ে সঙ্গে এসেছিল, তারা আর যেতে চাইলে না। সামনে ফাঙ্গ বলে আরেক জংলীজাতের এলাকা। সেখানে ওকান্দেদের দেখতে পেলে আর রক্ষা নেই। অগত্যা একটা পাহাড়ে ঢিপির পাশে ছোট একটা কুঁড়ে গোছের তৈরি করিয়ে তারই মধ্যে বেশীর ভাগ সঙ্গের জিনিস রাখলাম। তারপর নিতান্ত দরকারী জিনিসপত্র একটা ছোট ব্যাগে ভরে রওনা হলাম রেনে লাভালের ডেরা খুঁজতে। সামনে ছোটখাটো একটা পাহাড় হাজার চারেক ফুট উঁচু। তারই মাঝামাঝি একটা পাহাড়ের খাঁজে লাভালের আস্তানা লুকোনো বলে নির্দেশ পেয়েছি।

অচেনা পাহাড় বেয়ে উঠে সে আস্তানা খুঁজে বার করতে সন্ধ্যে হয়ে গেল। পাহাড়ের

দুটো শাখার মাঝখানে এমন ভাবে আস্তানাটা লুকোনো যে, সহজে চোখে পড়বার কথা নয়।

আস্তানা বলতে তিনটি ছোট বড় জংগলের কাঠের গুঁড়ি দিয়ে তৈরি ঘর। বড়টি ল্যাবরেটরি আর দুটি শোবার ও রান্নার। কিন্তু তিনটি ঘরের কোথাও কেউ নেই। ঘর-দোরের চেহারা দেখলে মনে হয়, অন্তত দু-একদিন আগেও সেখানে কেউ না-কেউ ছিল। রান্নাঘরে একটা স্টোভের ওপর একটা জলভরা কেটলি চাপানো। পাশের টেবিলে একটা ডিশের ওপর একটা বাসি অমলেট ভাজা পড়ে আছে। কেউ যেন অমলেট ভাজা সেরে চায়ের জল কেটলিতে চড়িয়ে হঠাৎ চলে গেছে। কেটলিটা নামিয়ে স্টোভটা নেভে দেখে বুঝলাম তেল ফুরিয়েই সেটা শেষ পর্যন্ত নিভে গেছে। কেটলির জলও ফুটে ফুটে অনেক হয়ে যে অনেকক্ষণ সেভবার পর ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, ভেতরে কেটলির গায়ে পর্যন্ত জলের গেদ মোল স্পষ্টই তা বোঝা গেল।

এটা যে লাভালের আস্তানা, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ল্যাবরেটরির যন্ত্রপাতি সরঞ্জাম দেখেই তা ধরা যায়। কিন্তু লাভাল গেছে কোথায়? হঠাৎ অমন করে গেলেই বা কেন?

কোন শত্রু তাকে, এখানে আক্রমণ করেছিল বলেও মনে হল না। সেরকম কোন চিহ্ন কোথাও নেই। ল্যাবরেটরি থেকে ঘরদোরের জিনিসপত্র সব কেউ ছুঁয়েছে বলেও মনে হল না।

আমার সন্দেহ হয়তো অমূলক। লাভাল হয়তো কাছেই কোথাও গেছে। এখুনি ফিরে আসবে ভেবে অনেক রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম। কিন্তু বৃথাই।

এত রাতে তার খুঁজতে যাওয়ার কোনো মানে হয় না। ওই আস্তানাতেই রাতটা কাটাবার জন্যে তৈরি হচ্ছি, এমন সময় নিস্তব্ধ পাহাড়ে কোথায় যেন একটা পাথর গড়িয়ে পড়বার শব্দ পেলাম। তারপর বুঝতে পারলাম পাহাড়ের খাড়াই পথে এই আস্তানার দিকে কে যেন সন্তর্পণে আসছে। পাহাড়ী রাস্তার আলগা নুড়ি পাথর নড়াচড়ার শব্দ একটু ভাল করে কান পাতলেই শোনা যায়।

কোনো জনোয়ার-টানোয়ার হবে কি? না, তা হওয়া সম্ভব নয়। এখানে সিংহ নেই বললেই হয়। আর সিংহ কি জংলী চিতা মানুষের গন্ধ পেলে কখনো পাতলুপক্ষে আসবে না।

রাতটা খুব অন্ধকার নয়। কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ খানিক আগে পাহাড়ের ওপারে উঠতে শুরু করেছে। তেলের অভাবে আলো-টালো এতক্ষণ জ্বালতে না পারলেও খুব অসুবিধে হয়নি। এখন মনে হল, জ্বেলে না রেখে ভালই হয়েছে। যে আসছে, সে লাভাল নিশ্চয়ই নয়। কারণ, তা হলে নিজের আস্তানায় এত সন্তর্পণে সে আসত না। সে যেই হোক, আস্তানায় আমায় থাকলে দেখতে সে পেতেই দূর থেকে। তাতে হয় পালাতো, নয় আরো সাবধান হয়ে হানা দিত। তার চেয়ে আধা-অন্ধকারে আমি যে তার জন্যে আগে থাকতে প্রস্তুত থাকতে পেরেছি এই ভালো।

এক হাতে পিস্তল আর এক হাতে টর্চটা নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে কাঠের বাড়িটার পিছন দিকে গিয়ে দাঁড়ালাম। কৃষ্ণপক্ষের সপ্তমী কি অষ্টমীর লালচে চাঁদ তখন পাহাড়ের মাথায় আরো খানিকটা উঠে এসেছে। চারিদিকে কেমন একটা থমথমে ভুতুড়ে আবছা অন্ধকার। আমি যেখানটায় দাঁড়িয়েছিলাম সেখানটায় সেই চাঁদের আলোর ছায়াতেই অন্ধকার আরো গাঢ়।

চুপিসাড়ে যে পাহাড়ী পথে উঠে আসছিল একটা পাথরে ঢিপি ঘুরে আসতেই তার মূর্তিটা স্পষ্ট দেখা গেল।

জনোয়ার নয় মানুষই, আর জংলীও যে নয় ওই আবছা আলোতেই দূর থেকে তার পোশাক দেখেই তা বুঝতে দেরি হল না।

কে তাহলে লোকটা?

লাভাল সে নয়, মুখ না দেখে শুধু আকৃতি দেখেই বুঝতে পারলাম। লাভাল গোলগাল ছোটখাটো মানুষ। আর এ লোকটা মোটা তো নয়ই, বরং বেশ রোগা ও লম্বা। সন্তর্পণে

আসছে বটে, কিন্তু একটা পা বেশ খুঁড়িয়ে।

ঠিক সময় বুঝে ধরব বলে নিঃশব্দে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

লোকটা লাভালের আস্তানার সামনে এসে এদিক-ওদিক চেয়ে ভেতরে গিয়ে ঢুকতেই নিঃশব্দে এগিয়ে গিয়ে খোলা দরজার বাইরের দিকে দাঁড়ালাম।

লোকটা তখন একটা দেশলাই জ্বালাবার চেষ্টা করছে। ড্যাম্প ধরা বলেই বোধহয় কাঠিটা ধরছে না।

দেশলাই জ্বালবার সঙ্গে সঙ্গেই তার মুখে টর্চটা ফেললাম।

কে? বলে অতিকে উঠে সে যতখানি চমকালো, আমি তার চেয়ে কম নয়। লাভালের আস্তানায় চোরের মত ঢুকেছে আর কেউ নয়, সোলোমাস। সাবাটিনি নিজে শয়তান হলেও সোলোমাস সম্বন্ধে তাহলে মিথ্যে বলেনি!

প্রথম বিস্ময়ের ধাক্কাটা সামলে তখন আমি কর্তব্য স্থির করে ফেলেছি। টর্চের আলোটা তার মুখের ওপর রেখেই ভেতরে ঢুকে পিস্তলটা তার দিকে উঁচিয়ে বললাম—আপনার সব খেল খতম, মঁসিয়ে সোলোমাস।

সোলোমাস কিন্তু ভয় পাওয়ার বদলে এবার উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল, যেন হাতে চাঁদ পেয়ে,—ওঃ আপনি। আপনি এসেছেন দাস! আপনার আশায় কিভাবে যে দিন গুনছি!

কড়া গলায় বললাম,—ওসব চালাকি রাখুন, সোলোমাস। একবার আমায় আহাম্মক বানিয়েছেন বলে কি বার বার পারবেন ভাবছেন? আপনার সব শয়তানি আমি জানি। বলুন, কেন লুকিয়ে এখানে এসেছেন? কোথায় লাভালকে সরিয়েছেন? সরিয়েছেন, না, শেষ করে দিয়েছেন?

এ সব আপনি কি বলছেন!—সোলোমাসের গলার স্বর সত্যিই যেন কাতর,—একটু ধৈর্য ধরুন। আমায় আলোটা জ্বালতে দিন, তারপর সব কথা শুনুন।

আমি ওসব আর সোলোমাসের অভিনয়ে ভুলতে রাজী নই। কঠোর হয়ে বললাম,—আপনাকে আমি আর বিশ্বাস করি না এতটুকু। তাছাড়া, আলো আপনি জ্বালবেন কিসে? এখানে তো নেই।

তেল আর আলো জ্বলবে।—সোলোমাস গম্ভীর গলায় বলে ঘরের একদিকে যেতেই আমি উঠে তার পেরে রেখে বললাম,—কোনো চালাকির চেষ্টা করেছেন কি গেছেন! আপনার দোস্ত সাবাটিনির পরিণাম তাহলে আপনার হবে।

সাবাটিনির পরিণাম! তার সঙ্গে তাহলে এখানে আপনার দেখা হয়েছে! বলে সোলোমাস অবাক হয়ে ফিরে দাঁড়ালেন। কোথায় কি একটা টেপায় ঘরের ছাদের একটা গুপ্ত আলো তখন জ্বলে উঠেছে।

সেই গুপ্ত আলোর রহস্যে যেটুকু কৌতূহল হয়েছিল, সোলোমাসের পরের কথায় তা ভুলে গিয়ে একেবারে থ হয়ে গেলাম।

সোলোমাস আগের কথার খেই ধরেই উৎসুক হয়ে বললেন,—কখন দেখা হল? আজ? তার কি পরিণামের কথা বলছেন?

এবার আমাকে হতভম্ব হতে হল,—কি বলছেন আপনি? আজ তার সঙ্গে কোথায় দেখা হবে? তাকে শেষ দেখেছি খার্তুমে।

সোলোমাস হতাশভাবে বললেন,—বুঝেছি, তাই আপনি অমন উল্টো-পাল্টা কথা বলছেন। সাবাটিনি যে এখানে, তার জন্যেই যে আমাদের এই সর্বনাশ—এসব আপনি কিছুই জানেন না!

সোলোমাসের গলায় সত্যের সুর যতই থাক, সন্দেহ আমার গেল না। কঠিন হয়ে বললাম,—আবার আমায় ধোঁকা দেবার চেষ্টা করছেন সোলোমাস!

ধোঁকা আপনাকে কোন সময়ই দিই নি দাস!—ক্লান্তভাবে বললেন সোলোমাস,—আপনিই শুধু সাবাটিনির ছোঁয়াচ লেগে সব কিছু বাঁকা দেখছেন। অবিশ্বাস করতে হয় করবেন, কিন্তু

তার আগে ধৈর্য ধরে কথাগুলো একটু শুনবেন?

তাই শুনলাম এবার। শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

সাবাটিনিকে আমি যতখানি চিনেছিলাম, সে তার চেয়ে অনেক পাকা শয়তান। আমার হাতে ওই লাঞ্ছনাতেও তার কোন মতলবের পরিবর্তন হয় নি। আমায় নির্দেশ-দেওয়া চিঠি চুরির মূলে যে সে-ই ছিল, এ বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নেই। সেই নির্দেশ অনুসরণ করে আমার আগেই সে এখানে পৌঁছেছে। সম্ভবতঃ কায়রো যাওয়ার পথে আমার যে দেরিটা হয়েছিল, তাতেই এ সুবিধে সে পেয়েছে। এখানে এসে সে যা চাল চেলেছে, বদমায়েসী বুদ্ধিতে তার তুলনা হয় না। এ অঞ্চলের জংলী অধিবাসী হল ফাঙ্গ বলে এক অসভ্য জাত। সাবাটিনি কূট কৌশলে তাদেরই লাভালের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে দিয়েছে। কাছাকাছি নির্জন একটি পাহাড়-ঘেরা জায়গা ফাঙ্গদের পবিত্র দেবস্থান। সেখানকার একটি বিদঘুটে আকারের পাথর তারা পুজো করে। সাবাটিনি সেই পাথরটা চুরি করে সরিয়ে দিয়ে ফাঙ্গদের ওঝা পুরুতদের ঘুষ দিয়ে বা যেভাবে হোক বুঝিয়েছে যে বিদেশী একটা লোক অন্য দেবতার পূজার মন্দির বানিয়ে তাদের দেশ অপবিত্র করেছে বলেই ফাঙ্গদের নিজেদের দেবতা তাদের ছেড়ে গেছে। লাভালের ল্যাবরেটরিটাই ফাঙ্গদের দুশমন দেবতার মন্দির বলে সাবাটিনি বুঝিয়েছে। ফাঙ্গরাই একদিন এই ল্যাবরেটরির কাঠের বাড়ি তৈরি করতে ও বহুদূর থেকে সেখানকার যন্ত্রপাতি সাজসরঞ্জাম বয়ে আনতে সাহায্য করেছিল। এখন সেই ল্যাবরেটরি আর লাভালের ওপরই তারা খাপ্পা। লাভালকে তারা হঠাৎ চড়াও হয়ে ধরে নিয়ে গিয়ে বন্দী করেছে। আর চার মাস বাদে তাদের নিজেদের দেবতার উৎসবের দিন। সেই দিন এই ল্যাবরেটরিতেই লাভালকে বলি দিয়ে সমস্ত কিছু তারা পুড়িয়ে দেবে নিজেদের দেবতাকে সন্তুষ্ট করে ফিরিয়ে আনতে। এই তাদের সঙ্কল্প। লাভালকে যেদিন জংলীরা ধরে নিয়ে যায়, সোলোমাস তার আগেই এ আস্তানায় পৌঁছলেও জংলীদের হানা দেবার সময় উপস্থিত ছিলেন না। ল্যাবরেটরির জন্যেই কয়েকটা গাছ-গাছড়া সংগ্রহ করতে বেরিয়েছিলেন। ফিরে এসে লাভালের লেখা চিঠি পড়ে তিনি সব বুঝতে পারেন। লাভাল বন্দী হয়ে চলে যাবার আগে ওই চিঠিটুকু লিখে যেতে পেরেছিলেন।

সোলোমাস লাভালের লেখা শেষ চিঠি আমায় দেখালেন। তাতে ক'টি মাত্র কথা তাড়াতাড়িতে পেন্সিল দিয়ে লেখা।

মেলাস, আমি বন্দী। সাবাটিনির ষড়যন্ত্র। ল্যাবরেটরি বাঁচাও।

চিঠি পড়ে আমি জিজ্ঞাসা করলাম,—এ ক'দিন আগের কথা?

পাঁচদিন।—বললেন সোলোমাস—এ পাঁচদিন কি করে যে আমার কেটেছে তা বলতে পারি না। এ আস্তানায় এসে ওই চিঠি পেয়েই আবার পালিয়ে যেতে হয়েছে। কখন জংলীরা আবার আসে কে জানে! ল্যাবরেটরি বাঁচাবার কথা লাভাল লিখে গেছেন। কিন্তু জংলীরা এলে বাঁচাবো কি করে? একলা তাদের বিরুদ্ধে কি করতে পারি? বিশেষ করে সাবাটিনি যখন তাদের মন্ত্রণাদাতা। জংলীরা কিন্তু ল্যাবরেটরি ভাঙতে আসেনি। সেটাও সাবাটিনির পরামর্শে নিশ্চয়। সাবাটিনি তো সত্যিই ল্যাবরেটরি ভাঙতে চায় না। আপাতত জংলীদের সাহায্যে আমাদের জব্দ করে পরে ল্যাবরেটরি শুদ্ধ লাভালকে লোপাট করে নিয়ে যাওয়াই তার মতলব। ফাঙ্গরা চার মাসের পর উৎসবের দিন ল্যাবরেটরির সঙ্গে লাভালকেও শেষ করতে চায় এ খবর তারপর জেনেছি। জেনেছি একটি মাত্র বিশ্বাসী জংলীর কাছে। সে-ই ছিল লাভালের ও আমার একমাত্র সঙ্গী ও অনুচর। আপাতত সে দলের লোকের ভয়ে ল্যাবরেটরিতে আসে না। তবে আমি এখান থেকে দূরে যে পাহাড়ের গুহায় লুকিয়ে আছি, খোঁজ করে সেখানে আমার সঙ্গে দেখা করেছে। তার কাছেই সাবাটিনি ও ফাঙ্গদের সমস্ত খবর পেয়েছি। পেয়ে কি করব কিছুই ঠিক করতে না পেরে শুধু আপনার পথ চেয়ে আছি। আপনার দেরি দেখে তো ভয় হচ্ছিল সাবাটিনি আপনাকেও কোনো ভাবে বন্দী-টন্দি করেছে।

একটু চুপ করে থেকে ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—আপনি যে আলো

জ্বাললেন, তাতে কোনো ভয় নেই?

না।—সোলোমাস আশ্বাস দিলেন—পাহাড়ের খাঁজে এমন ভাবে এ ল্যাবরেটরি লুকানো যে, বাইরে কোথাও থেকে এর আলো দেখা যায় না। তাছাড়া, জংলীরা থাকে এখান থেকে অনেক পশ্চিমে জঙ্গলের মধ্যে 'বোমা'য় ঘেরা গ্রামে। সেখান থেকে রাত্রে তারা রাজত্বের লোভেও বেরুবে না। ভয় শুধু সাবাটিনিকে। কিন্তু সে-ও এখন মতলব হাসিল করে নিশ্চিন্ত মনে পরের চালের ফন্দি আঁটছে। তার রাত্রে এদিকে আসার কোনো দরকারই নেই। আমি যে এখানে এসেছি, তা সে জানে না। আমি তাই প্রতি রাত্রে লুকিয়ে এসে ল্যাবরেটরিটা দেখে শুনে লুকোনো বিদ্যুতের ব্যাটারিগুলো চালু রেখে যাই।

আচ্ছা, লাভাল তো চিঠিটা মেলাস বলে কাকে লিখেছেন।—এবার আমি না বলে পারলাম না।—আপনার নাম অথচ সোলোমাস বলেই জেনেছি!

সোলোমাস একটু দুঃখের হাসি হেসে বললেন—সঙ্গে দেখছি এখানে আপনার সম্পূর্ণ যায়নি। শুনুন, মেলাস আমার পদবী। আমার পুরো নাম হল গোলোমাস মেলাস। পরিচয়টা লুকোবার জন্যেই শুধু সোলোমাস নামটা নিয়েছিলাম। লাভাল চিরকাল আমাকে মেলাস বলেই ডাকেন।

একমুহূর্তে ব্যাপারটা আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। বিস্মিত আনন্দে বললাম,—ও, আপনিই তাহলে লাভালের সেই সহকারী, যিনি লাভালের আগেই দেশে যাবার নাম করে নিরুদ্দেশ হয়ে যান?

হ্যাঁ, লাভাল ও আমি দুজনে পরামর্শ করেই ওই ব্যবস্থা করেছিলাম। ঠিক হয়েছিল, প্রথমে আমি গা ঢাকা দেব। তারপর লাভাল। আমার দেশ যে গ্রীস, তা নাম দেখেই নিশ্চয় [illegible] গ্রীসে যাবার নাম করে দুনিয়ার কেউ কল্পনাও করতে পারে না এমন জায়গা [illegible] করে এখানে ল্যাবরেটরি বসাবার ব্যবস্থা আমিই করি। লাভাল পরে পালিয়ে এসে এখানে ওঠেন। শত্রুদের ধোঁকা দেবার জন্যে আমাকে তারপর বাইরে গিয়ে তাদের সঙ্গে মিথ্যে যোগাযোগ করতে হয়। শত্রুরা, বিশেষ করে সাবাটিনি যাদের হয়ে কাজ করছে তারা কিন্তু ক্রমশই আমাদের চারিধারে জালের বেড়া দুর্ভেদ্য করে আনছে বলে ভয় হয়। বড় বড় রাজা-গজাদের সাহায্য চাইতে আমরা নারাজ। রক্ষকই তাহলে ভক্ষক হয়ে দাঁড়াবে। পরামর্শের জন্যে একান্ত বিশ্বাসী বন্ধু হিসেবে লাভাল তাই আপনাকে স্মরণ করেন। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে আপনাকে ডাকাও বৃথা হয়েছে। লাভালের যুগান্তকারী গবেষণা আর সম্পূর্ণ হবে না।

সোলোমাস দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চুপ করবার পর বললাম,—আমাদের দেশে একটা কথা আছে সোলোমাস, যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ। সুতরাং আশা ছাড়বেন না। শুধু একটা কথা, আগে আমি জানতে চাই। গবেষণা সত্যি কতদূর এগিয়েছে? পুরো সংখ্যা যে একশো সাঁইত্রিশ সে বিষয়ে আর কোনো সন্দেহ নেই তো?

না।

মূলাধার শুধু একটি?

হ্যাঁ।

আর সাজানো কিভাবে?

ওই মাঝের একটি মাগ্‌নেসিয়াম পরমাণুকে ঘিরে পঞ্চাশটি কার্বন, বাহাত্তরটি হাইড্রোজেন, পাঁচটি অক্সিজেন ও চারটি নাইট্রোজেন পরমাণু।—সোলোমাস বলে গেলেন।

এই সমস্ত পরমাণু মিলিয়ে কৃত্রিম উপায়ে মূল জিনিস তৈরিও করতে পেরেছেন ল্যাবরেটরিতে?

হ্যাঁ, তা পেরেছি। শুধু জিনিসটা এখনও অসাড় বলা যায়। আসল কাজ ঠিক করছে না। সেই আসল কাজ করাবার গবেষণাই চলেছে। মানে এতদিন পর্যন্ত চলছিল।—বলে সোলোমাস আবার দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন।

একটু চুপ করে ভেবে নিয়ে এবার বললাম,—আপনাদের বিশ্বাসী জংলীর নাম কি?

উজি।

উজি মানে তো সোয়াহিলি ভাষায় বুড়ো। লোকটা বুড়ো নাকি?—জিজ্ঞেস করলাম।

না, বুড়ো নয়। জোয়ান। ওই তার ডাক-নাম।

শুনুন, উজিকে দিয়েই ফাঙ্গদের কাছে খবর পাঠাবেন যে, তাদের মুঙ্গা, মানে দেবতা, এই ক'দিন বাদেই অমাবস্যার রাত্রে তাদের বোমা, মানে, কাঠের দেওয়ালে ঘেরা গ্রাম থেকে কিছুদূরে যে টিঙ্গা টিঙ্গা অর্থাৎ জলা আছে, তার ওপারে এক ওকুমে, মানে, আবলুশ কাঠের গাছ থেকে তাদের সঙ্গে কথা বলবেন।

সোলোমাস হতভম্ব হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন,—এ খবর পাঠাবার মানে?

মানে, সত্যিই সেদিন তাদের দেবতা ওই ওকুমে গাছ থেকে তাদের জানাবেন যে বিদেশীকে তারা ধরে নিয়ে গেছে, সে দেবতার দস্তুরমত পেয়ারের লোক। তাকে এখনি ছেড়ে দিয়ে তার ঘর-বাড়ি মন্দির মানে ল্যাবরেটরি যদি তারা নিজেরাই পাহারা দেবার ব্যবস্থা এখন থেকে না করে, তাহলে তিনমাস বাদে কলৌ নদীর যে দুটি শাখা তাদের গাঁয়ের দুদিক দিয়ে বয়ে গেছে, তার একটা রক্তে লাল হবে আর একটায় আগুন জ্বলবে।

সোলোমাস আমার দিকে সন্দিগ্ধভাবে চেয়ে বললেন,—এই সব বিপদ দেখেশুনে আপনার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে দাস। ফাঙ্গরা যদি সত্যিই ওই জলার ধারে দেবতার কথা শুনতে যায় তো তারা ওই সব আজগুবি কথা বিশ্বাস করে লাভাবাকে ছেড়ে দেবে না করেন? সাবাটিনি তাদের পেছনে আছে একথা ভুলবেন না। যদি তিন মাস তারা দেবতার কথার প্রমাণ দেখবার জন্যে অপেক্ষা করে?

তাহলে প্রমাণ দেখতে পাবে!—বলে হাসলাম।

সোলোমাস অত্যন্ত ক্ষুণ্ণস্বরে বললেন,—এটা কি ঠাট্টা-ইয়ার্কির সময় দাস!

ঠাট্টা-ইয়ার্কি করছি না সোলোমাস। সত্যিই এক নদীতে জল লাল করে আরেক নদীতে আগুন জ্বালব। আপনাদের ল্যাবরেটরিতে সেণ্টিফিউজ নিশ্চয় আছে?

আছে।—সোলোমাস তখনও হতভম্ব।

ভালো! আর শুধু ক'টা টেস্টটিউব আর জোরালো বিদ্যুতের আলো হলেই চলবে।

কি চলবে?—সোলোমাস অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন।—কি করবেন আপনি?

দুটো নেহাত তুচ্ছ প্রাণীর বংশবৃদ্ধি করাবো।

বংশবৃদ্ধি করাবেন! সোলোমাসের চোখ কপালে উঠল,—কি প্রাণীর?

একটা হল জিম্‌নোডিনিয়াম ব্রিভ, আর একটা নক্টিলুকা মিলাবিস্। নেহাত আণু বীক্ষণিক নগণ্য প্রাণের কণা, দুটো সুতোলি চাবুকের মত শুঁড় বার করা একরকম ডাইনো ফ্ল্যাজেলেট্।—হাতের ব্যাগটা খুলে একটা পিপেট বার করে বললাম,—তার জন্যে এই কাঁচের সূক্ষ্ম ছুঁচই যথেষ্ট।

আমি রসায়নের গবেষণা করি, ও সব প্রাণিতত্ত্ব বুঝি না।—বলে সোলোমাস যে ভাবে হাল ছেড়ে দিয়ে চুপ করে গেলেন, তাতে মনে হল আমার মাথা খারাপ হওয়া সম্বন্ধে কোন সন্দেহ তাঁর আর তখন নেই।

অমাবস্যার আগের দিন পর্যন্ত দিনে সোলোমাসের সঙ্গে তার গোপন গুহায় লুকিয়ে থেকে রাত্রে তাদের ল্যাবরেটরিতে আমি যা করবার করে ফেললাম। তারপর গোপনে উজির হাতে ক'টা দাগদেওয়া টেস্টটিউব দিয়ে নদীর কোন্ শাখায় কোন্ গাছে ফেলতে হবে বলে দিলাম।

অমাবস্যার রাতে টিঙ্গা টিঙ্গার ধারে জংলী ফাঙ্গরা সত্যিই এসে জড় হল মাঝ রাতে। সাবাটিনি তাঁদের আটকাবার অনেক চেষ্টা অবশ্য করেছিল। উজি বিদেশীদের কাছে কাজ করে বিধর্মীদের চর হয়েছে জানিয়ে, এটা শত্রুদের একটা ফাঁদ বলে বোঝাতে চেয়েছিল। জংলীরা

তাতে উজিকে বন্দী করেছিল, কিন্তু কুসংস্কারের কৌতূহলে দল বেঁধে জলার ধারে আসতেও ছাড়েনি।

জলার ওপারে ওকুমে গাছ থেকে দেবতার আদেশ শুনে ভড়কে গেলেও তারা লাভালকে কিন্তু ছেড়ে দিল না। সাবাটিনির উস্কানিতে তারা তিন মাস বাদে প্রমাণের জন্যে অপেক্ষা করে রইল।

সে তিন মাস কি উদ্বেগের মধ্যে যে কাটল, তা বলে বোঝান যাবে না। সোলোমাস তো আমার ওপর তখন ক্ষেপেই গেছেন। ল্যাবরেটরিটা বাঁচাবার যেটুকু আশা ছিল, আমি যেন পাগলামি করে তা জলাঞ্জলি দিয়েছি।

তিনমাস বাদে জংলীরাও যেমন প্রতিদিন নদীর দুই শাখার ওপর নজর রাখে, আমিও না।—পনে গোপনে তাই।

তারপর হঠাৎ একদিন জংলীদের সে কি তাণ্ডব নৃত্য! গ্রামকে গ্রাম জুড়ে ঙগোমা মানে উৎসবের নাচ শুরু হয়ে গেল। একটা নদীর জল সত্যিই রক্তের মত লাল হয়ে উঠেছে, আরেকটা আগুনের মত জ্বলছে।

আপনার ওই ছুঁচ ফুটিয়েই একটা নদী থেকে রক্ত বার করে আরেকটায় আগুন ধরালেন!—শিবু কাশতে কাশতে বলল।

হ্যাঁ, আমার ব্যাগ ছিল সমুদ্রের জ্যান্ত অ্যানিমোনের টুকরো, দুজাতের ডাইনো ফ্ল্যাজেলেটে ভরতি। পুয়ের্তোরিকো থেকে এনেছিলাম নক্টিলিউকা মিলিয়ারিসের জীবাণু, সেখানকার নদী সমুদ্রের মোহানায় যাতে মাঝে মাঝে জল আগুনের মত উজ্জ্বল হয়ে ওঠে আর যাকে জিমনো ব্রিভ বলে জেলেরা, সেই জল-লাল-করা মাছের মড়ক-লাগানো জিমনোডিনিয়াম ব্রিভ-এর জীবাণু এনেছিলাম ফ্লোরিডা থেকে। সেণ্ট্রিফিউজে অ্যানিমোনের টুকরোগুলো পাক খাইয়ে ছেতুরে আলাদা করে তা থেকে অতি সূক্ষ্ম ছুঁচের মত পিপেট দিয়ে এক একটি আলাদা জীবাণু তুলে তাদের আহার মেশানো টেস্টটিউবের ভেতর ছেড়ে উজ্জ্বল ইলেকট্রিক বাতির তলায় রেখে দিয়েছিলাম। সেই ইলেকট্রিক আলোই সূর্যের কাজ করছিল। জীবাণুগুলো লক্ষ লক্ষ গুণ তুলতে বেড়ে উঠেছিল। তারপর সেই টেস্টটিউবের জীবাণু নদীর শাখায় ফেলে তিনমাসে উপযুক্ত পরিবেশ পেয়ে অসম্ভব বেড়ে একদিন জলকে লাল আর আগুন করে তুলেছিল। ফ্লোরিডায় আর পুয়ের্তোরিকোয় এই ব্যাপার প্রায়ই ঘটে। সাধারণতঃ এক পাঁইট জলে যে জীবাণু পঁচিশোর বেশী থাকে না, ঠিক প্রশ্রয় পেলে তা তিন কোটি হয়ে দাঁড়ায়।

লাভালকে তাহলে জংলীরা ছেড়ে দিল!—আমরা জিজ্ঞাসা করলাম।

তা আর দেবে না! ছেড়ে শুধু নয়, সে তো ছোটখাট দেবতা হয়ে উঠল তারপর। তাকে বা তার ল্যাবরেটরিকে ছোঁয় কার সাধ্য!

আর সাবাটিনি?

সাবাটিনিকে দেবতার রাগের প্রমাণ পাবার পর তারা ধরে বেঁধে ফেলেছিল। তাকে প্রাণে মারতে বারণ করেছিলাম। কিন্তু সেই সঙ্গে বলে দিয়েছিলাম টিঙ্গা টিঙ্গার ধারের ওকুমে গাছ থেকে, যে, তাকে পালাতে দিলেই দেবতা আবার ক্ষেপে যাবেন। সাবাটিনি ওই ফাঙ্গদের কাছেই বন্দী হয়ে আছে।

কিন্তু এত কাণ্ড যার জন্যে, লাভালের সেই গবেষণার বস্তুটা কি?

জিজ্ঞেস করে মনে হল আসল কাজ যখন হাসিল হয়েছে, তখন প্রশ্নটা করে ঘনাদাকে ফাঁপরে ফেলার আর দরকার ছিল না।

ঘনাদা কিন্তু মোটেই ভড়কালেন না। আমাদের দিকে করুণাভরে তাকিয়ে বললেন,—তাও এতক্ষণ বুঝতে পারোনি? বস্তুটা হল ক্লোরোফিল। গাছপালা থেকে সমুদ্রের সূক্ষ্ম প্ল্যাংকটন পর্যন্ত যার দৌলতে সূর্যের আলো রাহাজানি করে প্রাণী-জগতের খাদ্যের ভিৎ

তৈরি করে, যা না থাকলে পৃথিবীতে মানুষ তো দূরের কথা, প্রাণের অস্তিত্বই থাকত না, সেই ক্লোরোফিল কৃত্রিম উপায়ে তৈরি করবার চেষ্টা নানা দেশের বৈজ্ঞানিকরা করছেন। কিন্তু সে ক্লোরোফিল আসলের সঙ্গে সব দিক দিয়ে মিললেও এখনো আসল কাজ, মানে সূর্যের আলোর 'কোয়া'টা' ধ'রে কার্বন-ডায়োক্সাইডকে কার্বোহাইড্রেট করে তুলতে পারছে না জলের হাইড্রোজেনটুকু নিয়ে অক্সিজেন মুক্ত করে দিয়ে। লাভাল সেই গবেষণাতেই অন্যদের চেয়ে অনেক দূর এগিয়েছেন। সত্যিকার ক্লোরোফিল একবার কৃত্রিম উপায়ে তৈরি হলে পৃথিবীতে অন্নাভাব বলে আর কিছু থাকবে না, মরুভূমির মাঝখানে থেকেও মানুষ নকল ক্লোরোফিল দিয়ে যত খুশি যা ইচ্ছে খাবারের মশলা তৈরি করতে পারবে।

আমাদের স্বল্পাহার-ব্রতটা তাহলে—শিবু কথাটা শুরু করতেই ঘনাদা শিশিরের সিগারেটের টিনটা তুলে পকেটে ভরে তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন,—তার আর দরকার হবে বলে মনে হচ্ছে না। লাভালের কাছ থেকে খবর এল বলে।

শিশির

[illegible]কে চারি[illegible]—প্রায় কেলেঙ্কারিই করে ফেলেছিলাম বেফাঁস কথাটার সঙ্গে কাশি চাপতে গিয়ে বিষম খেয়ে। তাড়াতাড়ি সামলে বললাম,—এত বড় সাহস!

গম্ভীর ঠাণ্ডা হয়ে সেইসময় হাসি হেসে বললেন,—সাহস নয়, দায়!

ব্যাপারটা যে বাহুল্য বোধ করছিলাম নয়ের সেকথা বলাই বাহুল্য, কিন্তু গোড়া থেকে শুরু করা নিশ্চয় উচিত।

ফন্দিটা মাথায় এসেছিল গৌরের। আমরা সবাই সেটায় সোগান দিয়েছি মাত্র।

কিন্তু শেষে নিজেদের ফাঁদে নিজেরাই পড়ে জব্দ হ'ব কে জানত!

সব দিক বেঁধেছেঁদেই ব্যবস্থা করেছিলাম কিন্তু কোথায় যে ছিদ্রটুকু ছিল আগে ধরতে পারিনি।

শিবু দামী কার্ডটা ছাপিয়ে এনেছে। তার আগে ঘনাদার দিবানিদ্রার সুযোগে অমরা কাগজে মিল চিঠিটার ভাষার খসড়া করেছি অনেক মাথা ঘামিয়ে।

সংবাদে ছিল এই যে সে সময়ে বিজ্ঞান-কংগ্রেস হচ্ছে কলকাতাতেই। দেশ-বিদেশের বড় বড় সব বিজ্ঞানের রথী মহারথীরা এসেছেন এই শহরে। যেন তাঁদেরই একজনের নাম দিয়ে কার্ডটা ছাপান। ভূগোলবিশারদ নামকরা মানচিত্রকার মাঁসিয়ে সন্তেল যেন পৃথিবীর অজ্ঞাত দুর্গমতম স্থানের অদ্বিতীয় আবিষ্কারক ও পর্যটক ঘনশ্যাম দাস এই কলকাতা শহরেই সশরীরে উপস্থিত এই আশাতীত খবর পেয়ে আহ্লাদে গদগদ হয়ে তাঁকে বিজ্ঞান কংগ্রেসের এক বিশেষ ভূগোল-বৈঠকে উপস্থিত দেশ-বিদেশের সুধীমণ্ডলীকে তাঁর ভাষণ শুনিয়ে কৃতার্থ করবার জন্যে বিনীত অনুরোধ জানিয়েছেন। কবে ও কখন তিনি স্বয়ং গাড়ি নিয়ে ঘনশ্যাম দাসকে নিতে আসবেন তাও এ অনুরোধের চিঠিতে জানানো আছে।

আগে থাকতে মহড়া দিয়ে যেমন যেমন ঠিক করে রাখা গিয়েছিল ঠিক সেইমতই প্রথম অভিনয় সবাই করেছি। বসবার ঘরে মাকামারা আরামকেদারায় ঘনাদা এসে পা এলিয়ে বসামাত্র শিশির যথারীতি তার সিগারেটের টিন সামনে খুলে ধরেছে। আমি লাইটার জেলে সিগারেট ধরিয়ে দিয়েছি সসম্ভ্রমে। ঘনাদা প্রথম টান দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে শিশিরের দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করেছেন,—কত হ'ল?

বেশী নয়, এই চার হাজার দু'শ' একুশ মাত্র।—শিশির জানিয়েছে সংকুচিতভাবে।

একুশ কেন হবে, উনিশ না?—ঘনাদার ভ্রূ কুঞ্চিত হতে না হতে শিশির তাড়াতাড়ি পকেট থেকে নোটবই বার করে খুলে দেখে লজ্জায় জিভ কেটেছে।—হ্যাঁ হ্যাঁ উনিশ-ই তো।

ঘনাদা সন্তুষ্ট হয়ে আর একটি টান দিয়ে চোখ দু'টি প্রায় নিমীলিত করার পরই আমি আনন্দে যেন কথাটা চাপতে না পেরে বলেছি,—আমরা কিন্তু সবাই শুনতে যাচ্ছি সেদিন ঘনাদা!

সবাই শুনতে যাচ্ছ!—ঘনাদা চোখ খুলে তাকিয়ে বলে।—কি শুনতে?

বাঃ আপনার বক্তৃতা!—আমি যেন ঘনাদার বিস্ময়তে অবাক হয়েছি।

ঘনাদা দন্তস্ফুট করার আগেই শিশির সোৎসাহে বলে উঠেছে,—একেবারে ভোরবেলা থেকে 'কিউ' দিতে হবে কিন্তু। নইলে জায়গা মিলবে না।

ভোরবেলা থেকে কি!—শিবু শিশিরকে ধমকেছে,—আগের রাত্তির থেকে বল্। মোহন-বাগান ইস্টবেঙ্গলের শীল্ড্ ফাইন্যাল হার মেনে যাবে দেখিস্। সায়েন্স কংগ্রেসে একটা দাঙ্গাহাঙ্গামা না হয়ে যায় না!

ঘন ঘন সিগারেট টানা আর চোখ-মুখের ভাব দেখেই ঘনাদার অবস্থাটা বুঝতে বাকী গেছে তখন। নেহাত মানের দায়েই সোজাসুজি রহস্যটা সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারছেন না।

শেষ পর্যন্ত ধৈর্য ধরতে আর পারেননি। যথাসম্ভব গম্ভীর হয়ে নিজের চাল বজায় একটু ঘুরিয়ে বললেন,—সায়েন্স কংগ্রেসে আমি বক্তৃতা দিচ্ছি, তোমরা জানলে কোথা? নয়

কোথা থেকে জানলাম!—আমরা সমস্বরে নিজেদের বিস্ময় প্রকাশ করেছি।

শিবু বিশদ ব্যাখ্যার ভার নিয়েছে,—শহরে কে না জানে। তবে মঁসিয়ে সরেন্তু তাতে সব আয়োজন করেছেন আর নিজেই যে তিনি আসছেন আপনাকে নিয়ে যেতে বনজঙ্গল সবাই জানে না। কতখানি,

ঘনাদার মুখে আশানুরূপ আশঙ্কার ছায়া দেখে আমরা উৎসাহিত হয়ে উঠেছি।

ঘনাদা অস্বস্তিটা বিরক্তির ছলে প্রকাশ করেছেন,—হুঃ! মঁসিয়ে সরেন্তো বলে তো আমার গরুরঠাকুর নয়। তিনি এসে বললেই আমায় যেতে হবে! সায়েন্স কংগ্রেসে বক্তৃতা দেবার জন্যে আমি হেদিয়ে মরছি না কি?

কি যে বলেন ঘনাদা!—শিশির সমস্ত সায়েন্স কংগ্রেসের হয়ে যেন ঘনাদার রাগ ভাঙাবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠেছে,—আপনি হেদিয়ে মরবেন কি, হেদিয়ে মরছে তো তারা! এ যে কত বড় সৌভাগ্য তা কি তারা জানে না। নইলে মঁসিয়ে সরেন্তো নিজে বাড়ি বয়ে এসে আপনাকে নিমন্ত্রণের চিঠি দিয়ে যান!

নিমন্ত্রণের চিঠি! কি চিঠি?—ঘনাদা সত্যিই আকাশ থেকে পড়েছেন। আমরাও একেবারে যেন অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেছি,—সে কি! নিমন্ত্রণের চিঠি আপনি দেখেননি? আপনি তখন বিকেলে লেক-এ বেড়াতে গেছেন। মঁসিয়ে সরেন্তো কত খোঁজ করে এসে কতক্ষণ বসে রইলেন, তারপর আমাদের কাছে চিঠিটা দিয়ে দেখা না হওয়ার জন্যে কত দুঃখ করে গেলেন। বার বার করে বলে গেলেন যে আপনাকে নিতে তিনি নিজেই পরশু মানে শনিবার বিকেল চারটেতে আসছেন! সে চিঠি—সে চিঠি, হ্যাঁ গৌরই তো চিঠিটা রাখলে আপনাকে দেবার জন্যে!

আমরা যেন রেগে আগুন হয়ে বারান্দায় বেরিয়ে এসে গৌরের নাম ধরে ডাকাডাকি শুরু করেছি তারপর। গৌরও শশব্যস্ত হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বিরক্তির ভান করেছে,—কি ব্যাপার কি! হঠাৎ এত চেঁচামেচি কিসের!

চেঁচামেচি কিসের!—আমরা গৌরকে গালাগাল দিতে আর বাকি রাখিনি—আহাম্মক, অকর্মার ধাড়ি কোথাকার! কলকাতা শহরের মুখে চুনকালি দিয়ে সায়েন্স কংগ্রেসকে তুমি

ডোবাতে বসেছ। মঁসিয়ে সুস্তেলের সে চিঠি তুমি ঘনাদাকে দাওনি!

গৌর লজ্জায় যেন মাটিতে মিশিয়ে গিয়ে হাতে হাতে ধরা পড়া চোরের মত মুখ কা[illegible] মাচু করে ঘর থেকে কার্ডটি এনে ভয়ে ভয়ে ঘনাদার হাতে দিয়ে বলেছে—মাপ করবেন ঘনা[illegible] একেবারে মনে ছিল না।

তাচ্ছিল্যভরে কার্ডটা ধরলেও ঘনাদার চোখ দেখে বোঝা গেছে কি মনোযোগ দিয়ে কার্ডটা তিনি পড়েছেন।

কার্ডে কোন খুঁত যে নেই তা আমাদের জানা, ঘনাদাও নিশ্চয় ধরতে পারেননি।

ভেতরে যাই হোক বাইরে ঠাট বজায় রেখে একটু অবজ্ঞার সুরে বলেছেন—সুস্তেল! দাঁড়াও দাঁড়াও, কোন্ সুস্তেল ঠিক মনে পড়ছে না!

বাঃ—মঁসিয়ে সুস্তেলকে মনে পড়ছে না!—শিশির ঘনাদার স্মৃতিশক্তিকে একটু উস্কে দেবার চেষ্টা করেছে—সেই বিখ্যাত কার্টোগ্রাফার, মানে মানচিত্রের ব্যাপারে দুনিয়ায় যাঁর জুড়ি নেই বললেই হয়।

হুঁ— সংক্ষিপ্ত একটি ধ্বনিতে যা বোঝাবার বুঝিয়ে ঘনাদা ঘর থেকে উঠে গেছেন।

তারপর শনিবার দিন সকাল থেকেই আমরা সজাগ। আধা নয়, সে শনিবার কিসের যেন একটা পুরো ছুটি ছিল। দুপুরের খাওয়াদাওয়া পর্যন্ত কিছু হবে না তা জানতাম। কারণ ছুটির দিন বলে সকালে বাজারটা একটু ভালোরকম করা হয়েছে। মাছের থলের বড় বড় গলদা [illegible] ঘনাদাকে ঝায়দা করে দেখিয়ে রাখতে ভুলিনি।

[illegible]লা একটা নাগাদ ভূরিভোজ শেষ হবার পরই আমাদের সজাগ থাকার সময়।

[illegible] সজাগ থাকা একটু অবশ্য আলাদা ধরনের। ঘনাদা পাছে পালিয়ে যান সেই [illegible] দেওয়া নয়, তিনি কোন্ ফাঁকে কি ভাবে মেস থেকে সরে পড়েন, নিজেরা গা [illegible] লুকিয়ে তাই দেখে মজা করা।

[illegible] খাওয়ার সময়ই জমি তৈরি করে রাখা হয়েছে। ভরপেট খেয়ে আমাদের সকলেরই [illegible] চোখের পাতা জুড়ে আসছে। ছুটির দিন বলে সেদিন আর তাই খেলাধুলো আড্ডা [illegible] বিছানায় পড়ে ঘ[illegible]—এই কথাটাই জানিয়ে রেখেছি।

কিন্তু বিছানায় কতক্ষণ মটকা মেরে শুয়ে থাকা [illegible]! একটার পর দুটো বাজল। দুটোর পর তিনটে! ঘনাদা এখনো [illegible] কি! ঘরের দরজা জানালা বন্ধ। কান খাড়া করে আছি ঘনাদার পায়ের শব্দের জন্যে। গলা করে জানালার খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে তেতলা থেকে নামবার সিঁড়িটার ওপর চোখও রাখছি, কিন্তু ঘনাদার কোন সাড়াশব্দই নেই।

তিনটের পর চারটে বাজল। ঘনাদা কি সত্যিই ছাদ ডিঙিয়ে পালালেন। কিন্তু সেদিকেও তো [illegible] রামভুজকে পাহারায় রেখেছি, ঘনাদার সে রকম কোন চেষ্টা দেখলেই নিচে থেকে 'খামা হো' বলে গান ধরবে। তাহলে? ঘনাদা কি সত্যিই অন্তর্ধানমন্ত্র গোছের কিছু জানেন না কি!

ঘনাদার ঘরের দিকেই একবার খোঁজ করে আসব কিনা ভাবছি, এমন সময়ে সশব্দে তাঁর ঘরের দরজা খোলার শব্দ শোনা গেল। তারপর তেতলার সিঁড়ির ওপর থেকে তাঁর পাড়া-কাঁপানো ডাক—কই হে! সব গেলে কোথায়! দিনের বেলা আর কত ঘুমোবে!

এ ওর মুখের দিকে তাকালাম ফ্যাল ফ্যাল করে। শেষে ঘনাদাই আমাদের খুঁজছেন নিজে থেকে!

ঘনাদার ডাক না শুনে উপায় কি! গুটি গুটি একে একে ভিজে বেড়ালের মত তাঁর তেতলার ঘরে গিয়ে ঢুকলাম!

শিবু ওরই মধ্যে একটু নিজেদের মুখরক্ষার চেষ্টা করে বললে,—আপনি এখনো তৈরী হ'ননি ঘনাদা! চারটের সময়ে না আপনাকে নিয়ে যাবার কথা!

নিজের আধময়লা ফতুয়া আর ধুতিটার দিকে একবার চেয়ে বিছানার মাঝখানটিতে উঠে

বসে ঘনাদা অদ্ভুত মুখভঙ্গি করে বললেন,—আর কি তৈরি হব। কেন, এই সাজে যাওয়া যাবে না?

বাধ্য হয়ে এ বিদ্রূপও হজম করতে হল। শিবু আর একবার ন্যাকা সেজে মান বাঁচাবার চেষ্টা করলে,—মঁসিয়ে সুস্তেল-এর না আসাটা কিন্তু আশ্চর্য!

ঘনাদা একটু হাসলেন এবার। অবজ্ঞাভরে বললেন,—সুস্তেল যে আসবে না আমি জানতাম।

আপনি জানতেন!—বেশ সন্ত্রস্ত হয়েই আমরা ঘনাদার দিকে তাকালাম। কিন্তু যা ভয় করছিলাম ঘনাদা সেদিক দিয়ে গেলেন না। শিশিরের দিকে তর্জনী ও মধ্যম আঙুল ফাঁক করে ডান হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে অনুকম্পার সুরে বললেন,—হ্যাঁ, জানতাম। আমি ছিলাম না জেনেই সেদিন এসেছিল, নইলে আমার সামনে এসে দাঁড়াবার ওর সাহস নেই।

পরম স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে সাগ্রহে এবার উস্কানি দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম,—কেন বলুন তো? অমন পৃথিবীজোড়া নাম, অতবড় কার্টোগ্রাফার!

হুঃ, কার্টোগ্রাফার! ঘনাদা নাসিকাধ্বনি করলেন।

শিশির তৈরী হয়েই এসেছিল। ততক্ষণে ঘনাদার আঙুলের ফাঁকে যথারীতি সিগারেট বসিয়ে দিয়ে দেশলাই-এর কাটি জেবলে ফেলেছে।

ঘনাদা প্রথম টানটি দিয়ে খানিক চুপ করে থেকে ধোঁয়া ছাড়লেন। আমরা চাতকের মত তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে। ঘনাদার শ্রীমুখ থেকে কি শুধু ধোঁয়াই বেরুবে?

ধৈর্য ধরতে না পেরে শিবু একটু ঝাঁকুনি দেবার চেষ্টা করলে,—সত্যি কার্টোগ্রাফার নয় বুঝি? জাল?

জাল হবে কেন!—ঘনাদা মৃদু ধমক দিলেন,—আসল কার্টোগ্রাফারই বটে। কিন্তু তাতে হয়েছে কি? নাম-ই গালভরা, আসলে জরিপদারের জেঠা ছাড়া তো কিছু নয়। বনজঙ্গল পাহাড়-পর্বতেরই খবর রাখে। জানে কি 'সোহ্ম অ্যাবিস্যাল প্লেন' কোথায় আর কতখানি, মেপেছে কখনো 'মুইর' কি 'প্লেটোসিমাউন্ট' কত উঁচু?

অভিভূতের মত বললাম,—মঙ্গলগ্রহের ভূগোলে আছে বুঝি? নামও তো কখনো শুনিনি!

ঘনাদা অনুকম্পার হাসি হাসলেন,—তোমাদের ওই সুস্তেলই কি জানত। ডোবার পুঁটি হয়ে গেছল সমুদ্রের তিমির সঙ্গে ফচকেমি করতে! এই শিশিটা না থাকলেই হ'ত খতম।

তক্তপোশের ওপর থেকেই হাত বাড়িয়ে পেছনের শেল্‌ফ থেকে যে শিশিটি তুলে ঘনাদা আমাদের এবার দেখালেন তাতে আমরা ত থ'।

ওই শিশি! ওটা হোমিওপ্যাথিক ওষুধের না?

শিবুর অসাবধান মুখ এক মুহূর্তের জন্যে ফস্‌কে গিয়ে প্রায় ঘাটে এসে ভরাডুবি হয়েছিল আর কি!

হোমিওপ্যাথিক!—ঘনাদা প্রায় ফেটে পড়ছিলেন, শিবুই তাড়াতাড়ি সামলে নিয়ে বললে,—মানে প্রায় সেইরকম দেখতে কিনা। বোকা লোকেরা তফাত ধরতেই পারবে না।

ঘনাদা ফণা নামালেন, একটু অবজ্ঞাভরে হেসে বললেন,—তোমাদের ওই সুস্তেলও পারেনি। সাত সাগর খুঁজে নারবরো দ্বীপে আমায় চুরি করতে আসবার সময় ও অন্ততঃ জানত না, যে এই শিশির মধ্যে তাদের পরমায়ু লুকোন থাকবে!

আপনাকে চুরি!—হাসি চাপতে গিয়ে বিষম খেয়ে প্রায় যাই আর কি! অতিকষ্টে সেটা সামলে ও কেলেঙ্কারি বাঁচিয়ে বললাম,—এত বড় সাহস!

সাহস নয়, দায়!—ঘনাদার মুখে রহস্যময় হাসি দেখা গেল। আমাদের মুখগুলোর ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে তিনি শুরু করলেন,—নারবরো দ্বীপের নাম নিশ্চয় শোনোনি, গ্যালাপ্যাগোসের নামই হয়ত জানো না। দক্ষিণ আমেরিকার উত্তর-পশ্চিমে ইকোয়েডর থেকে প্রায় ছ'শো পঞ্চাশ মাইল দূরের এই ক'টি-ছোট-বড় অগ্নেয়দ্বীপের জটলায় প্রায় সওয়া এক

শতাব্দী আগে সেকালের একটি পালতোলা জাহাজ টহল না দিতে গেলে বিজ্ঞানের এ যুগের সবচেয়ে একটা দামী মতবাদের জন্মই হ'ত কিনা সন্দেহ। সে পালতোলা জাহাজের নাম এচ. এস. এম. বীগল্, সে জাহাজের বৈজ্ঞানিকের নাম চার্লস ডারউইন, আর সে মতবাদ হ'ল বিবর্তনবাদ।

গ্যালাপ্যাগোস দ্বীপগুলির মধ্যে সবচেয়ে বড় হ'ল অ্যালবেমার্ল বা ইসাবেলা। দেখতে খানিকটা ইংরিজী জে হরফের মত। সেই ইসাবেলার মাথার বাঁ দিকে একটি বড় ফুটকি হ'ল নারবরো দ্বীপ, ফার্নানডিনা-ও বলে কেউ কেউ। পৃথিবীর একমাত্র সামুদ্রিক গিরগিটির জাত সি-ইগুয়ানা-র ভালো করে পরিচয় নিতে সেই দ্বীপে তখন কিছুদিনের জন্যে ডেরা বেঁধেছি। পেরুর লিমা থেকে একটি ছোট স্টিমার আমাকে আর আমার এক অনুচর নিমারাকে সেখানে নামিয়ে দিয়ে গেছে। মাসখানেক বাদে আবার সেই ছোট স্টিমারই আমাদের নিয়ে যাবে।

আমার অনুচরটি ইকোয়েডরের আদিবাসীর জাত। এমনিতে কাজকর্মে চৌকশ কিন্তু একেবারে ভীতুর শেষ। একে এই জনমানবহীন পাথুরে দ্বীপ, তার ওপর চারদিকের বালির চড়ায় বিদঘুটে চেহারার ইগুয়ানারা গিজগিজ করছে সারাক্ষণ। দু'দিন যেতেই নিমারার ভয়ে প্রায় নাড়ি-ছাড়ার অবস্থা! সে ধর্মে খ্রীষ্টান। তার ধারণা কোনো অজানা পাপের শাস্তিতে বেঁচে থাকতেই সে নরকে পৌঁছে গেছে।

আমি যত তাকে বোঝাই যে দেখতে ভয়ংকর হলে কি হয় এ দ্বীপের ওই সব প্রাণী একেবারে নিরীহ, মানুষকে পর্যন্ত তারা ভয় করতে শেখেনি, আর লড়াই-এর পাঁয়তাড়া কষলেও নিজেদের মধ্যেও রক্তারক্তি মারামারি কখনো করে না, কিন্তু ভবী ভোলবার নয়। রাত্রে সে ভালো করে ঘুমোয় না পর্যন্ত। তার বিশ্বাস চোখের দু'পাতা এক করলেই সাক্ষাৎ শয়তানের ওসব দূত চুপি-চুপি হানা দিয়ে তাঁবু সুদ্ধ আমাদের চিবিয়ে শেষ করে দেবে।

নিমারার অবস্থা দেখে বেশ একটু ভাবনাতেই পড়ে গেলাম। খাওয়া নেই ঘুম নেই, লোকটা শেষ পর্যন্ত পাগলই হয়ে যাবে নাকি! সঙ্গে যে ক্ষুদে ওয়্যারলেস ট্র্যান্স্মিটারটি ছিল তাই দিয়ে লিমাতে যেদিন স্টিমারটা তাড়াতাড়ি পাঠাবার জন্যে খবর দিয়েছি সেই রাত্রেই নিমারা একেবারে ক্ষেপে গেছে মনে হ'ল।

সারাদিনের ঘোরাফেরার পর ক্লান্ত শরীরে সবে তখন খাওয়া-দাওয়া সেরে একটু ঘুমিয়েছি হঠাৎ নিমারা হুড়মুড় করে তাঁবুর দড়িদড়া ছিঁড়ে কাঁপতে কাঁপতে আমার একেবারে গায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

বাঁচান, হুজুর বাঁচান!

ধড়মড়িয়ে জেগে উঠে প্রথমটা তো তাকে একটি চড় কষাতেই যাচ্ছিলাম। অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে জিজ্ঞাসা করলাম রেগে,—কি হয়েছে কি!

এবার শয়তান নিজেই এসেছে হুজুর। আর রক্ষে নেই।

রক্ষে যদি নেই জানিস তো আমার ঘুম ভাঙালি কেন হতভাগা!—বিছানা থেকে উঠে পড়ে বললাম,—কই কোথায় তোর শয়তান, দেখাবি চল।

নিমারা সহজে কি যেতে চায়। শয়তানকে একবার সে দেখে এসেছে, আর একবার সামনে গেলেই তার রফা এ বিষয়ে তার কোন সন্দেহ নেই।

কোনরকমে টানা-হেঁচড়া করে তাকে বাইরে নিয়ে গিয়ে তার তীক্ষ্ণ ইশারায় যা দেখলাম তাতে আমারও চক্ষুস্থির।

নারবরো দ্বীপের মাঝখানে মরা আগ্নেয়গিরির প্রায় চূড়ার কাছে আমাদের তাঁবু খাটান হয়েছে।

কৃষ্ণপক্ষের রাত। চারদিকের সমুদ্রে যেন গাঢ় নীল কালি গোলা। সেই গাঢ় নীলকৃষ্ণ সমুদ্রের জলে নারবরো আর ইসাবেলা দ্বীপের মাঝখানের সংকীর্ণ প্রণালীতে বিরাট কি একটা জলজন্তু ভাসছে দেখতে পেলাম। সেটাকে সবচেয়ে বড় জাতের নীল তিমি বা সিবাল্ড'স্ রররকোয়াল ভাবতে পারতাম, কিন্তু নীল তিমিও তো ছেষট্টি সাতষট্টি হাতের বেশী লম্বায়

কখনো হয় না। তা ছাড়া নীল তিমির গা থেকে থেকে-থেকে এরকম আলো ঠিকরে বেরোয় বলে তো কখনো শুনিনি। গ্যালাপ্যাগোসের সবই অদ্ভুত। অতল সমুদ্রের কোনো অজানা বিরাট বিভীষিকাই আমার দেখবার সৌভাগ্য হল নাকি?

দেখতে দেখতে বিরাট জলজন্তুটা সমুদ্রে ডুবে গেল। নিমারা তখন আর দাঁড়াতে না পেরে বসে পড়ে দু'হাতে মুখ ঢেকেছে।

তাকে ধমক দিয়ে বললাম,—অত ভয়ের কি আছে। তোমার শয়তান তো সমুদ্র থেকে ভাঙার ওঠেনি। তাছাড়া নিজেই সে ভয়ে ডুব মেরেছে চেয়ে দেখো।

চোখ না খুলেই নিমারা বললে,—না হুজুর, ও শুধু শয়তানের ছল। এখন ডুব দিয়েছে কিন্তু দেখবেন ঠিক আবার অন্য মূর্তিতে এসে হাজির হবে।

নিমারার কথাই এক দিক দিয়ে অক্ষরে অক্ষরে তার পরদিন ফলল বলা যায়।

রাত্রে-দেখা সেই অজানা বিশাল জলচরের কথা মাথায় থাকলেও, রোজকার মত সকালে বেরিয়ে ক্যামেরায় ক'টি অদ্ভুত প্রাণী ও দৃশ্যের ছবি তখন তুলেছি। নারবরো দ্বীপে হিংস্র প্রাণী একেবারে নেই বলা ঠিক নয়। একধরনের সাপই এই অহিংসার রাজ্যের কলঙ্ক। একটা ফণিমনসা জাতের অদ্ভুত গাছের ঝোপে সেই সাপের একটি বড় গিরগিটি ধরে খাওয়ার ছবি তন্ময় হয়ে তুলছি, এমন সময় পিঠে একটা খোঁচা খেয়ে চমকে উঠলাম।

নিমারার অবস্থা কাহিল। তাকে তাঁবুতেই রেখে এসেছি শুইয়ে। সুতরাং হঠাৎ একেবারে ক্ষেপে গেলেও সে এমন চুপি চুপি এসে আমার পিঠে নিশ্চয় খোঁচা দেবে না। তাহলে এই জনমানবহীন দ্বীপে কে এসে আমার পিছনে দাঁড়িয়ে খোঁচা দিয়েছে।

বলতে এতক্ষণ লাগলেও পলকের মধ্যে এসব ভাবনা বিদ্যুতের মত মাথার মধ্যে খেলে গেল। তারপর পেছন ফিরতে যাচ্ছি পিঠে আরো জোরে একটা খোঁচার সঙ্গে ভারী গম্ভীর গলার শাসানি শুনতে পেলাম—ফেরবার চেষ্টা কোরো না, যেমন আছ সেইভাবে এগিয়ে চলো। তোমার পিঠে দোনালা বন্দুক ঠেকানো তা বোধ হয় বুঝেছ।

শুধু ওইটুকুই নয়, আরো অনেক কিছুই তখন বুঝে ফেলেছি। কথাগুলো ফরাসীতে বলা হলেও তাতে একটু বাঁকা টান। আলজিরিয়া কি মরক্কোতে যারা কয়েক পুরুষ কাটিয়েছে সেই ফরাসীরা যেভাবে কথা বলে সেই রকম কতকটা। আশ্চর্যের বিষয়, এই গলার আওয়াজ আর এই কথার টান কেমন যেন আমার চেনা বলেই মনে হ'ল। কিন্তু তাই বা কি করে সম্ভব?

কয়েক পা হুকুমমত এগিয়ে গিয়েই হঠাৎ হেসে উঠে ফিরে দাঁড়ালাম। 'খবরদার!' হাঁকের সঙ্গে সঙ্গে একটি বন্দুক আর একটি রিভলভার আমার দিকে উঁচিয়ে উঠল।

রিভলভার যার হাতে, তালগাছের মত লম্বা রোগা পাকানো বুড়োটে চেহারার সে লোকটিকে কখনো দেখিনি, কিন্তু দোনালা বন্দুক আমার পিঠে ঠেকিয়ে যে হুকুম করেছিল শুধু গলা শুনলেই তার পরিচয় ঠিকই অনুমান করেছিলাম। যাকে দেখলাম সে তোমাদের এই সুস্তেল।

গৌর হঠাৎ একটা হেঁচকিই যেন তুলল মনে হ'ল।

ঘনাদা কথা থামিয়ে সন্দিগ্ধভাবে তার দিকে চাইতেই আমরা বলে উঠলাম—জল খেয়ে নে না একটু।

জল খাব কি!—গৌরই খেঁকিয়ে উঠল আমাদের—ঘনাদার দিকে দু' দুটো বন্দুক ওঁচানো না? তা বন্দুক আর রিভলভার তারা ছুড়ল তো?

না।—ঘনাদার মুখে রহস্যময় হাসি।

গুলি ছিল না বুঝি? না, খেলার বন্দুক?—শিশিরের বোকার মত প্রশ্ন।

খেলার বন্দুক নয়, গুলিও ছিল। ঘনাদার মুখ আবার গম্ভীর হ'ল।

তবে?—আমরা সবাই বেকুব।

ঘনাদা আবার হাসলেন,—গুলি ছুড়বে কি করে? সেই কথাই হাসতে হাসতে তাদের বললাম। বললাম—কই ছোড়ো গুলি! দেখি। একটু চুপ করে থেকে হতভম্ব মুখগুলোর একটু উপভোগ করে আবার বললাম,—ভড়কিতে আর লাভ কি! সারা দুনিয়া চুঁড়ে এই অখদ্দে দ্বীপে আমায় গুলি করে মারবার জন্যে হানা যে দাওনি তা বুঝেছি। এখন মতলবটা কি খোলাখুলি-ই বলো।

খোলাখুলি-ই বলছি।—বুড়োটে লম্বা লোকটিই বজ্রগম্ভীর স্বরে ভাঙা ভাঙা ইংরিজিতে এবার কথা বললেন, আমাদের সঙ্গে আপনাকে যেতে হবে।

কোথায়? কেন?

জানতে পাবেন না।—বুড়োর মুখ নয় যেন লোহার মুখোশ।

তাহলে কি করে যাই বলুন। ভাঙা ইংরেজির বদলে যদি নিজের ভাষায় কথা বলতেন তবু আপনার জাতটা দেশটা কি বুঝতে পারতাম। সুস্তেলের তো ওসব বালাই নেই। টিউনিশিয়ায় জন্ম, জার্মানীতে শিক্ষা। যুদ্ধের পর রুশেরা কিছুদিন আটকে রেখেছিল বলত। তারপর ইংলণ্ডের হয়ে অজানা জায়গার মানচিত্র আঁকার ছুতোয় আফ্রিকায় আর বলিভিয়ায় ইকোয়েডরে কিছুদিন ঘোরাঘুরি করে হঠাৎ একদিন নিরুদ্দেশ বলে সবাই জানে। আপনাদের মত দুই অজানা আঘাটার মানুষের সঙ্গে কিছু না জেনে যেতে কি মন চায়।

এত কথা যে সুযোগের জন্যে বলছিলাম তা এবার মিলে গেল। সুস্তেল আমার টিটকারিতে এতক্ষণ রাগে ফুলছিল। আমার কথা শেষ হতেই হুংকার দিয়ে উঠল,—তবু তোকে যেতেই হবে শুটকো বাঁদর। ভালোয় ভালোয় না যাস তোর মত পুঁচকে ফড়িংকে দু' আঙুলে টিপে নিয়ে যাবো!

তা চেহারার দিক দিয়ে সুস্তেল সে তম্বি করতে পারে। সুস্তেলকে তো দেখেছ? মাংসের একটা পাহাড়, কিং কং তার কাছে কোন ছার!

কিন্তু আমরা যে রোগা চিমসে দেখলাম!—এমন একটা সুবিধে ছাড়তে না পেরে শিবু ফস্ করে বলে ফেললে।

সে তাহলে ভুগে ভুগে হয়েছে। তিন মাইল সমুদ্রের তলায় তিন দণ্ডক্ষণে ছ'হপ্তা ডুবে থাকা তো চারটিখানি কথা নয়। সেই থেকেই ওর অসুখ!—অম্লান বদনে শিবুর খোঁচা এবার অগ্রাহ্য করে আমাদের সত্যিকার হাঁ করে দিয়ে ঘনাদা আবার শুরু করলেন,—তখন সে একটা দৈত্যবিশেষ। কিন্তু গর্জনের সঙ্গে আচমকা আমার একটি হাইকিক্-এ হাতের বন্দুকটা ছিটকে পড়তেই প্রথমটা একটু ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল। তারপর মনে হল বুনো ক্ষ্যাপা একটা হাতীই ছুটে আসছে আমার দিকে। ডিগবাজি খেয়ে হাত পাঁচেক দূরে ছিটকে পড়েও তার

রাখ কি যায়! গা ঝেড়ে ঝড়ে উঠে, আগুনের ভাঁটার মত দু'চোখ দিয়ে আমায় যেন ভস্ম করতে এবার সন্তর্পণে দু' হাত বাড়িয়ে এগুতে লাগল। ধোবি-পাটে তাকে রাম-পাট্‌কান দেবার জন্যে তৈরী হচ্ছি এমন সময় ঘাড়ে পিঁপড়ের কামড়ের মত কি একটা জ্বালা পেয়ে ফিরে দেখি সেই পাকানো লম্বা বুড়ো শয়তানের মত আমার পিছনে হাতে কি একটা নিয়ে দাঁড়িয়ে।

তারপরে আর জ্ঞান নেই।

জ্ঞান যখন হ'ল তখন প্রথমটা স্বপ্ন দেখছি কিনা বুঝতে পারলাম না। এ কোথায় এলাম! ছোট্ট একটা জানলা-দরজাহীন কোটর বললেই হয়। ছাদটা এত নিচু যে বিছানার ওপর উঠে বসলেই যেন মাথায় ঠেকে যাবে। নাববরো দ্বীপ বিষুবরেখার ওপরে বলে সেখানে ছিল বেশ গরম আর এখানে দিব্যি ঠাণ্ডা। তাছাড়া বাতাসেও কেমন একটা ওষুধ ওষুধ গন্ধ। স্থির হয়ে ব্যাপারটা ভেবে নিচ্ছি এমন সময় খুট্‌ করে একটা আওয়াজ হয়ে সামনের দেওয়ালেরই খানিকটা যেন সরে গেল। একগাল হাসি নিয়ে পাহাড়ের মত শরীরটা কোনরকমে সেই গা-দরজার ফাঁক দিয়ে গলিয়ে সুস্তেল আমার বিছানারই এক ধারে এসে বসে পড়ে বলল,—যাক্‌, ঘুম তাহলে ভাঙল এতদিনে!

এতদিনে! মনে যা হ'ল মুখে তা প্রকাশ করলাম না। বরং তাচ্ছিল্যের সুরে একটু হেসে বললাম,—ভাঙল নয়, তোমরা ভাঙালে বলো! তা, কতদিন ওষুধপত্র দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখলে?

তা মন্দ কি! প্যাসিফিক্‌-এ শুয়েছ আর অ্যাটলাণ্টিকে জাগলে। এখন আইসল্যাণ্ড ছাড়িয়ে চলেছি।

হুঁ—একটু চুপ করে থেকে বললাম,—কিন্তু এ নিউক্লিয়ার সাবমেরিনটি কোথায় পেলে? 'অ্যাটমিক সাব' তো শুধু মার্কিন মুলুকেরই আছে জানতাম।

'অ্যাটমিক সাব!'—সুস্তেল সত্যিই চমকে উঠল,—কে বললে তোমায়!

ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে জেনেছি বোধহয়, যেমন সাত সমুদ্দুর খুঁজে আমায় কি জন্যে চুরি করে এনেছ তাও জানতে পেরেছি।

সুস্তেল প্রথম অবাক হওয়ার ধাক্কাটা খানিকটা সামলে বললে—কি জন্যে এনেছি বলো দেখি?

—যে জন্যে এনেছ অ্যাটলাণ্টিকের তলা দিয়ে লুকিয়ে যাবার সে একটি মাত্র রাস্তার খোঁজ জিজ্ঞাসা করলে তো আমি এমনিই বলে দিতে পারতাম। তার জন্যে ছুঁচ ফুটিয়ে অজ্ঞান করে চুরি করে আনবার দরকার ছিল না।

দরকার ছিল।—বলে সুস্তেল একটু হাসল।—আন্দাজ তুমি অনেকটা করেছ, সবটা পারনি। আতলান্তিকের তলায় রিফ্‌ট্‌ ভ্যালির খাদের খবর তোমার চেয়ে ভালো কেউ জানে না এটা ঠিক, কিন্তু সে খাদ ছকে দেওয়ার চেয়ে বড় কাজ তোমায় দিয়ে করাতে হবে।

ঘনাদা থামলেন। শিবুর কাহিনীটা মাঝে মাঝে এমন বেয়াড়া হয়ে ওঠে!

ফাঁক পেয়ে আর ঘনাদার মেজাজ পুছে বিগড়ে যায় এই ভয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—রিফ্‌ট্‌ ভ্যালিটা কি ব্যাপার ঘনাদা?

ঘনাদা খুশী হয়ে বললেন,—পৃথিবীর ওপরকার নয় অ্যাটলাণ্টিক সমুদ্রের তলার এ একটা আঁকাবাঁকা জোড়া পাহাড়ের মাঝখানকার লম্বা গিরিখাত, আইসল্যাণ্ডের তলা থেকে শুরু হয়ে দক্ষিণ আমেরিকার মাথা ছাড়িয়ে চলে গেছে। এক ধারে মিড্‌অ্যাটলাণ্টিক রিজ্‌ আর এক ধারে রিফ্‌ট্‌ পাহাড়। এ রাস্তায় কোন সাবমেরিন চুপিসারে গেলে আমেরিকা কি ইউরোপ হদিসও পাবে না। সুস্তেলের কথায় জানলাম শুধু এই তোষা গিরিখাত চেনানো নয়, অ্যাটলাণ্টিকের ক'টি ডুবো পাহাড়ের হদিসও আমায় দিয়ে তারা পেতে চায়। তাতার পাহাড়-পর্বতের

তুলনায় এ সব ডুবো পাহাড় যে পেট্রোল থেকে শুরু করে দামী সব ধাতুর কুবেরের ভাণ্ডার এ খবর তারা জানে।

সমস্ত কথা শুনে একটা হেসে বললাম,—আমায় যদি এতই দরকার তাহলে এ সাবমেরিনটা কাজে আমায় বলা উচিত নয় কি?

অস্বস্তিভরে এদিক ওদিক চেয়ে সুস্তেল যেন একটু ভয়ে ভয়েই বললে,—বলতে মানা আছে।

মানা আছে।—তার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে তীব্রস্বরে বললাম,—তাহলে দুনিয়ার ওয়াকিব মহলে যা কানাঘুষো চলেছে তা মিথ্যা নয়! আমেরিকা ও রাশিয়া ছাড়া আর একটি গোপন তৃতীয় শক্তি কে বা কারা সত্যিই গড়ে তুলছে। আমেরিকা কি রাশিয়া যার যে ভুল বা দোষই থাক তারা মানুষের সত্যি কল্যাণ চায়, কিন্তু এই তৃতীয় শক্তির সে-সব কোন দুর্বলতা নেই। আর যা-ই হোক, তোমার গায়ে ফরাসী রক্ত তো কিছু আছে, কি বলে শুধু পয়সার লোভে তুমি এদের কাছে নিজেকে বেচে দিয়েছ? নিজের দেশ বলে কিছু না মানো, মানুষ জাতের ওপরও কি তোমার মমতা নেই?

সুস্তেল কিরকম যেন বিহ্বল হয়ে পড়ল। দু'বার ঢোঁক গিলে বললে,—দেখো দাস, আমার চেহারাটা প্রকাণ্ড হলেও ভেতরে ভেতরে সত্যি আমি দুর্বল। মনের জোর এত কম যে অন্যায় বুঝেও হঠাৎ প্রলোভনের কাছে হার মেনে বসি। বিশ্বাস করো যা আমি করেছি তার জন্যে আমার আফসোসের সীমা নেই। আমি পুরস্কারের লোভে তোমার খবর দিয়ে ওভাবে ধরবার ব্যবস্থা না করলে ওরা তোমার খোঁজও পেত না। কিন্তু এখন উপায় কি?

সুস্তেলের কথাগুলো যে আন্তরিক তা তার মুখ দেখেই বুঝলাম। এ কথার উত্তরে যা বলতে যাচ্ছিলাম তা কিন্তু আর বলা হ'ল না। সেই শয়তানের মত বুড়ো তখন দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে। কামরার ভেতর ঢুকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমায় একবার লক্ষ্য করে সে ভাঙা ইংরিজিতে সুস্তেলকে-ই বললে,—যা বোঝাবার বুঝিয়ে দিয়েছ তো?

হ্যাঁ, এই দিচ্ছি।—বুড়ো হঠাৎ এসে পড়ায় সুস্তেল একটু যেন ভড়কে গেছে।

আচ্ছা, বুঝিয়ে কমিটিরুমে এসো। এখানে বেয়াড়াপনার শাস্তি যে কি তাও জানাতে ভুলো না।—বলে আমায় একটু সম্ভাষণ পর্যন্ত না জানিয়ে বুড়ো চলে গেল।

বুড়ো যেতেই আগ্রহভরে বললাম,—উপায় কি তুমি জিজ্ঞাসা করেছিলে?

সুস্তেল সভয়ে ঠোঁটে আঙুল দিয়ে চাপা গলায় বললে,—সাবধান। বেফাঁস আর কিছু বোলো না। এ ঘরে লুকানো মাইক আছে। তোমার ঘুমের সময় বন্ধ ছিল, এখনি চালু হবে।

তার কথা শেষ হতে না হতে প্রায় অস্পষ্ট খুট্ করে একটা আওয়াজে বুঝলাম মাইক সজাগ।

কি এখন করা যায়! সুস্তেলকে গোটাকতক কথা এখুনি না বললে নয়।

তাকে চোখের ইশারা করে ধীরে ধীরে বললাম—তিন, একশ বাইশ, সাতাত্তর।

সে খানিক হতভম্ব হয়ে থেকে হঠাৎ উৎসাহভরে বললে,—ছয়!

বললাম,—তেইশ, চারশ পাঁচ, এগারো।

সুস্তেল তৎক্ষণাৎ উঠে ওই কামরারই একটি টেবিলের ওপর থেকে কাগজ পেন্সিল নিয়ে এল।

ব্যাপারটা কি হ'ল?—আমরা হাঁ করে ঘনাদার দিকে তাকালাম।

কি আর, সাংকেতিক কথা!—ঘনাদা একটু হাসলেন।

সাংকেতিক কথা তো বুঝলাম!—গৌর বললে,—কিন্তু ও তো শব্দ নয়, সংখ্যা। আর আপনি বলতেই সুস্তেল বুঝল কি করে?

লোগোগ্র্যাফি জানলেই বুঝবে!—ঘনাদা অনুকম্পাভরে আমাদের দিকে চেয়ে বললেন,—

লোগোগ্র্যাফিতে দু' হাজার পর্যন্ত সংখ্যা দিয়ে মোটামুটি সব কিছুই বলা যায়। সকলের অবশ্য অত মুখস্থ থাকে না। সঙ্গে লোগোগ্র্যাফির আলাদা অভিধান রাখতে হয়।

এর পরে আর ট্যাঁ ফোঁ করবার কিছু নেই, তবু চোখ কপালে তুলে বললাম,—আপনার বুঝি সব মুখস্থ?

ঘনাদার মুখে স্বর্গীয় হাসি দেখা দিতেই শিবু জিজ্ঞাসা করলে,—ওই সব হিজিবিজি অঙ্ক যে বলাবলি করলেন তার মানে কি?

মানে?—ঘনাদা বুঝিয়ে দিলেন,—মানে প্রথমে জিজ্ঞাসা করলাম,—তুমি লোগোগ্র্যাফি জানো? সুস্তেল তাতে জানালে, হাঁ। তখন তাকে খাতা পেন্সিল আনতে বললাম।

একটু থেমে আমাদের মুখের চেহারাগুলো দেখে নিয়ে ঘনাদা আবার শুরু করলেন,—খাতা পেন্সিল আনবার পর কাগজে লিখে সব কথাবার্তা সেরে ফেললাম। চুক্তি হয়ে গেল যে দুশমনদের চোখে ধুলো দেবার ফন্দিতে সুস্তেল আমার সহায় হবে গোপনে। কিন্তু সুস্তেলের সব সাধু সংকল্প শেষ পর্যন্ত তার মনের দুর্বলতায় ভণ্ডুল হয়ে গেল। আমার এবং সাবমেরিনের সকলের প্রাণ বাঁচানোর কৃতজ্ঞতাটুকু পর্যন্ত সে দেখাল না। লোগোগ্র্যাফিতে তার কাছে জেনে নিয়েছিলাম যে নাববারো দ্বীপ থেকে আমায় অজ্ঞান করে আনবার সময় নিমারাকে সঙ্গে না নিলেও আমার ক'টি দরকারী বাক্স ব্যাগ তারা সাবমেরিনে তুলে নিয়েছিল। আইসল্যান্ড ছাড়িয়ে বিফ্‌ট্‌ ভ্যালির খাদে সাবমেরিন ঢোকবার পর সেই ব্যাগ আর বাক্স না থাকলে এ গল্প আর এখানে বসে করতে হত না। সেইখানেই সাবমেরিনটির কবর হয়ে যেত।

কেন! অ্যাটমিক সাবমেরিন না?—মুখ থেকে বেরিয়ে গেল আপনা থেকে।

হ্যাঁ, অ্যাটমিক সাবমেরিনও বেগড়ায়। একসঙ্গে তখন ওপরে ভাসিয়ে তোলার আর হাওয়া শোধনের কল গেছে খারাপ হয়ে। সে সব যন্ত্র মেরামত করতে যতক্ষণ লাগবে তার আগেই কার্বন ডায়ক্সাইড গ্যাসে আমাদের কারুর আর জ্ঞান থাকবে না। সুস্তেলের মুখ তো ছাইয়ের মত ফ্যাকাশে। সেই শয়তান বুড়ো পর্যন্ত কেমন একটু দিশাহারা।

আমার ব্যাগ থেকে ওই শিশি তখন বার করলাম।

ওই শিশি—এক সঙ্গে সবাই বলে উঠলাম। ওই শিশিতে সাবমেরিন ভাসল?

সাবমেরিন ভাসবে কেন?—ঘনাদা অধৈর্যের সঙ্গে বললেন, হাওয়ার সমস্যা মিটল।

ওই শিশিতে?—আমরা আবার হাঁ।

—হ্যাঁ ওই শিশিতে। ও শিশিতে কি ছিল জানো? ক্লোরেলা নামে একরকম আণুবীক্ষণিক ফাঙ্গাস্‌—যাকে ছত্রাক বা ছাতা বলে। সিকি আউন্স জলে প্রায় চার কোটি ক্লোরেলা থাকে। কার্বনডায়ক্সাইড থেকে তাড়াতাড়ি অক্সিজেন ছেঁকে বার করতে তার জুড়ি নেই। শিশি থেকে নানান পাত্রে সেই ক্লোরেলার ফোঁটা জলে ফেলে সমস্ত সাবমেরিনের নানা জায়গায় রাখবার ব্যবস্থা করলাম।

দেখতে দেখতে বন্ধ হাওয়ার সব বিষ কেটে গেল।

সময়মত যন্ত্রপাতি মেরামত হ'ল। তারপর প্রায় একমাস ধরে সমুদ্রের তলায় সমস্ত বিফ্‌ট্‌ গিরিখাদ আর মনক্কোর পশ্চিমের মাদিরা আবিস্যাল প্লেন থেকে প্লেটো আর অ্যাটলান্টিস্‌ সি-মাউন্ট হয়ে সার্গাসো সমুদ্রের উত্তরে সোহম্‌ অ্যাবিস্যাল প্লেন পেরিয়ে বার্মুদা পেডেস্টাল পর্যন্ত আতলান্তিকের বিশাল জলের রাজ্যের সন্ধান নিয়ে একদিন নিউ-ফাউন্ডল্যান্ডের এক নির্জন তীরে গিয়ে উঠলাম।

সেই শয়তান বুড়োর মতলব এবার স্পষ্ট বোঝা গেল। একটি নির্জন খাঁড়িতে ঢুকে সাবমেরিন থামবার পর বুড়ো এসে হঠাৎ বাইরে তার সঙ্গে একটু ঘুরে আসার অনুরোধ জানালে।

হেসে বললাম,—না [redacted] দেশ, এখানে টহল দেবার শখ আমার নেই।

তবু একবার বেড়িয়েই আসি চলো না। এখানকার সীল মাছ একটা শিকারও করা যেতে পারে।

প্রতিবাদ নিষ্ফল জেনে ওভারকোট পরে নিয়ে বেরুলাম। দেখলাম শুধু বুড়ো নয়, সুস্তেলও সঙ্গে চলেছে। শিকারের লোভ দেখালেও বন্দুক শুধু বুড়োরই হাতে।

তীর ছাড়িয়ে কিছুদূর যেতেই বুড়ো সোজাসুজি আসল কথা পাড়লে—লুকোনো ম্যাপটা এবার দাও দাস।

উঁচিয়ে ধরা বন্দুকটা অগ্রাহ্য করেই অবাক হয়ে বললাম,—অ্যাটল্যাণ্টিকের তলার ম্যাপ! সে তো সাবমেরিনেই আছে।

না,—বুড়োর গলার স্বরে যেন বাজ ডাকল—সে ম্যাপ ফাঁকি। সুস্তেল সব আমার কাছে স্বীকার করেছে। আসল ম্যাপ তুমি নিজের কাছে লুকিয়ে রেখেছ! দাও।

সুস্তেলের দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকালাম। সে একেবারে অমানুষ নয়। অত্যন্ত অস্বস্তির সঙ্গে থতমত হয়ে চোখ ফিরিয়ে নিলে।

বুড়োর দিকে ফিরে বললাম,—যদি না দিই।

তাহলেও ও ম্যাপ আমি পাব, শুধু এই নির্জন তীরে তোমায় শেষ নিশ্বাস নিতে হবে। কেউ জানতেও পারবে না কিছু।

বুড়ো বন্দুকের সেফ্‌টিক্যাচ্‌টা সরালো।

সুস্তেল হঠাৎ এগিয়ে এসে বললে,—দাঁড়ান, ওই ছুঁচোর জন্যে গুলি খরচ করবার দরকার নেই। একবার আমায় বেকায়দায় কাবু করেছে, তার শোধ আমি নিজে হাতে নিতে চাই।

শোধ সে সত্যিই নিলে। দু'বার আমার প্যাঁচে মাটি নিয়ে তিনবারের বার আমার পিঠের ওপর ঘটোৎকচের মত চেপে বসল ঘাড়টা লোহার মত হাতে আমার পেছনে টেনে ধরে। প্রায় মটকে যায় আর কি!

বুড়ো এবার এগিয়ে এসে সব খুঁজে শেষ পর্যন্ত জুতোর সুকতলার নিচে থেকে ভাঁজ করা ম্যাপটা বার করে নিয়ে বললে,—ছেড়ে দাও কালা ভূতটাকে।

ছেড়ে-ই তারা রেখে গেল। তারপর একা সেই জনমানবহীন খাঁড়ির পাড়ে পড়ে রইলাম।

দিন তিনেক উইলো-গ্রাউসের বাসা খুঁজে খুঁজে শুধু ডিম খেয়ে কাটাবার পর, এক সীল-শিকারী দলের মোটর বোট সেখানে না এলে আর ফিরতে হ'ত না।

ঘনাদা থামলেন। শিশিরের মুখে-ই আমাদের সকলের প্রশ্ন সবিস্ময়ে বার হ'ল।

—বলেন কি ঘনাদা! আপনি সুস্তেলের কাছে হারলেন, আবার যে ম্যাপের জন্যে এত তাও ওরা কেড়ে নিলে!

ঘনাদা রহস্যময় হাসি হেসে বললেন,—সুস্তেলের কাছে না হারলে ওই জাল ম্যাপ ওরা বিশ্বাস করে কেড়ে নিয়ে যায়! সুস্তেলের সঙ্গে সঙ্গে গোপনে ওই বোঝাপড়াই ছিল। সুস্তেলকে ওইটুকুর জন্যেই ক্ষমা করেছি।

অভিভূত হয়ে ঘনাদাকে শেষ একটা সিগারেট ধরিয়ে দিয়ে যাবার সময় শিশির মেঝে থেকে কি যেন একটা কুড়িয়ে নিল মনে হ'ল!

নিচে নেমে জিজ্ঞাসা করলাম,—কি একটা কুড়িয়ে নিলি তখন?

শিশির ছেঁড়া পাকানো কাগজটা আমাদের সামনে খুলে ধরে বললে,—আমাদের সব ফন্দি যাতে ফাঁস সেই আসল জিনিস।

দেখি ক'জনে মিলে সুস্তেলের নামে যে চিঠি বানিয়েছিলাম তারই হাতে লেখা খসড়াটা। ঘনাদা কখন কোথায় যে কুড়িয়ে নিয়েছেন জানতেও পারিনি।

ঘনাদাকে ভোট দিন

অন্য কিছু কেউ যদি শুনে থাকেন তা ভুল।

সেই বাহাত্তর এখনো।

না, বাহাত্তরে কিছু নয়, বাহাত্তর নম্বর সেই বনমালী নস্কর লেন।

সেই ট্রাম, বাস, লরী, মোটর, রিক্সা, ঠেলা আর মানুষের ভিড়ের ধাক্কায় যেন টলতে টলতে ছিটকে-পড়া নোংরা, সরু, আঁকাবাঁকা গলিটা। সেই উপছে-পড়া ডাস্টবিন আর ঘুঁটে-লেপটানো পোড়ো বাড়ির দেয়াল বাঁচিয়ে, একবার ডাইনের খাটালের সন্ধানে আর একবার বাঁয়ের টিনের কারখানার ঝাঁপতাল সঙ্গীতে দিশাহারা হয়ে খাপরা আর টিনের চালের বস্তির মধ্যে যেন থমকে দাঁড়ানো বেঢপ বেমানান পলস্তারা-খসা সেকেলে বাড়িটা।

সেই আমাদের বাহাত্তর নম্বর বনমালী নস্কর লেনের মেস ঠিক যেমনটি ছিল তেমনটিই আছে।

ওর আর অদল বদল হবার কোন আশা নেই।

কিন্তু কী সুবিধেটাই না হয়েছিল! একেবারে আলাদিনের চেরাগ হাতে পাওয়ার মতন। সে চেরাগ হাতে পেয়েও কেন যে সব ভেস্তে গেল, সে কাহিনী বলতে গেলে একেবারে গোড়া থেকে শুরু করতে হয়।

এ বিয়োগান্ত নাটকের প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্য ওই বাহাত্তর নম্বর বনমালী নস্কর লেনের মেস বাড়ির দোতলার আড্ডা ঘর। সময় রবিবারের বিকেল। কুশীলব বলতে শিশির, গৌর এবং আমি ছাড়া তৎকালে আর কেউ নয়। আমরা তেতলার একটি ঘরের দিকে উৎকর্ণ হয়ে থাকার সঙ্গে প্রত্যেকে নিজের নিজের পছন্দসই দৈনিকের ও সাপ্তাহিকের সবচেয়ে দামী পাতায় মাঝে মাঝে মনসংযোগ করে নীরস বিকেলের একঘেয়েমিটা একটু ভুলতে চেষ্টা করছি। তেতলার ঘর থেকে সেদিন কিছু হবার আশা নেই বলেই জানি। শনিবার থেকেই অসহযোগ সুরু হয়েছে, সুরু হয়েছে করপোরেশনের আসছে নির্বাচনের এক প্রার্থী দলবল সমেত এসে খানিক [illegible] করে যাবার পর। কেন ওই সব বস্তিয়ার খিলজিদের নিয়ে মাতামাতি করেছি—এইযে [illegible] রাগ। সে রাগ এখনও পড়বার লক্ষণ নেই।

গৌর নামকরা একটি দৈনিকের পাতা থেকে মুখ তুলে হতাশ ভাবে সেটাকে টেবিল থেকে মেঝেয় গড়িয়ে যেতে দিয়ে বললে, না, এ হপ্তায় আর কিছু হবার নয়।

কেন? কেন?—আমরা যে যার কাগজ নামিয়ে সমস্বরে জিজ্ঞাসা করলাম।

কেন?—গৌর মেঝে থেকে কাগজটা আবার তুলে নিয়ে বললে,—জায়গাটা পড়ে শোনাচ্ছি। তাহলেই বুঝবে কেন! লিখছে, সর্বদিকেই প্রতিকূল ইঙ্গিত লক্ষিত হইতেছে। অত্যন্ত সাবধানে না থাকিলে বিশেষ বিপদের সম্ভাবনা। রাহু মিথুনে ও কেতু ধনুতে অবস্থান করার দরুন সম্পত্তি হস্তান্তরের ব্যাপারে শঠ ও প্রবঞ্চকের ছলনায় ভুলিতে হইবে। বৈদেশিক বাণিজ্যেও তত্রস্থ আকস্মিক শাসন-বিপর্যয়ে প্রচুর সঞ্চিত সম্পদ ধ্বংস হইতে পারে। জামাতা বা শ্বশ্রূ স্থানীয় কাহারও কঠিন পীড়া অবশ্যম্ভাবী

গৌরের পড়ার ফিরিস্তি শুনে আমরাও সবাই প্রথমে যাকে বলে একেবারে মুহ্যমান—থুড়ি, মোহ্যমান।

শিশিরই প্রথমে যেন সাড় ফিরে পেল। একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলে,—কিন্তু বিপদ কি খুব গুরুতর?

গুরুতর নয়?—গৌর রীতিমত ক্ষুণ্ণ।

আমিও এতক্ষণে একটু সন্দিগ্ধ হয়েছি।

বললাম, কিছু তো দেখতে পাচ্ছি না। তোর সম্পত্তিই কোথায় যে হস্তান্তর করলে ঠকবি? বিদেশে কোন্ বাণিজ্যটা তুই করিস? আর বিয়েই যার হয়নি তার আবার শ্বশুর-জামাই-এর ভাবনা কিসের?

এ মোক্ষম যুক্তিতেও গৌরকে টলানো গেল না। গম্ভীর মুখে আমাদের নির্বুদ্ধিতায় যেন হতাশ হয়েই বললে, আসল ব্যাপারটাই তোদের মাথায় ঢুকছে না। ও সব যদি না হয় তাহলে অন্য কিছু অনিষ্ট একটা নির্ঘাৎ হবে। কারণ এ হপ্তায় কর্কটের রাশিফল অত্যন্ত খারাপ।

হুঁ, তোর কর্কট রাশি ঠিক জানিস্! শিশির একেবারে গোড়ায় কোপ দিতে চাইলে।

তা আর জানি না। সারা জীবন ওর দাড়ায় নাজেহাল হচ্ছি। অথচ আর মিনিট খানেক পরে জন্মালেই সিংহ রাশিতে পড়ে একটা কেওকেটা হতাম—গৌর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল।

সিংহরাশিটা মিনিট খানেকের জন্যে ফস্কে যাওয়ায় এ রকম দীর্ঘ নিশ্বাস পড়তেই পারে। সমবেদনা জানাতে যাচ্ছিলাম। শিশির কিন্তু অবিচলিত ভাবে জিজ্ঞাসা করলে, কার গণনা পড়ছিস? সায়নাচার্যের তো! কিন্তু জ্যোতিষার্ণবের মত আলাদা!

আলাদা মানে?—গৌর বেশ অসন্তুষ্ট।

হ্যাঁ, এই ত জ্যোতিষার্ণব লিখছেন এই পত্রিকায়—কর্কট রাশির পক্ষে অত্যন্ত সুসময়। সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত দিক হইতে সৌভাগ্যের উদয় হইতে পারে। অত্যন্ত সুবিধাজনক শর্তে একটি গাড়ি কিংবা বাড়ি পাইবার সম্ভাবনা। সেরূপ সুযোগ আসিলে অবহেলা করিবেন না। স্থানান্তরিত হইলে প্রচুর লাভের আশা।

লিখছে কর্কট রাশি সম্বন্ধে?—গৌরের মুখে অবিশ্বাস ও উল্লাসের দ্বন্দ্ব।

হ্যাঁ, স্পষ্ট লেখা রয়েছে কর্কট। নিজেই দেখনা!—শিশির কাগজটা এগিয়ে দিলে।

গৌর এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেলে কেমন একটু হতভম্ব হয়ে বললে, আশ্চর্য! কিন্তু গাড়ি কি বাড়ি কোথা থেকে আসবে! একটা সেকেণ্ডহ্যাণ্ড সাইকেল অবশ্য কিনব কিনব ভাবছিলাম। কিন্তু বাড়ি...

আমারও কিন্তু বাড়ির কথা লিখছে!—বাধা দিয়ে আমাকে এবার জানাতেই হল।

শিশির ও গৌর দুজনেই একসঙ্গে অবজ্ঞার হাসি হাসল,—তোর আবার বাড়ির কথা লিখছে কে?

এই তো স্বয়ং জ্যোতিষরাজ লিখছেন। আমি আহত অভিমানের [illegible]

লিখেছেন তুলা রাশির পক্ষে এ সপ্তাহ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। চন্দ্রের প্রভাবের দরুন প্রাথমিক বাধা দেখা দিলেও পরিশেষে আকাঙ্ক্ষা পূরণ হইবে। বাসভবন পরিবর্তনের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত। গৃহপ্রাপ্তিযোগ প্রবল।

তার মানে তোরা দুজনেই বাড়ি পেয়ে উঠে যাবি!—শিশিরের গলা বেশ ঈর্ষাকাতর, আর আমি শুধু এই মেসে বসে ভেরেণ্ডা ভাজব!

আহা, অত মন খারাপ করছিস কেন?—আমি শিশিরকে সান্ত্বনা দিলাম, আমরা বাড়ি পেলে কি আর তোকে থাকতে দেব না! তুই তো গৌরের বাড়ি অনায়াসে থাকতে পারিস।

না, না আমার বাড়িতে সুবিধে হবে না!—গৌর সোজাসুজি জানিয়ে দিলে, আমি বাড়িটা বিক্রিই করে দেব ভাবছি।

বিক্রি করে দিবি!—গৌরের আহাম্মকীতে না চটে পারলাম না, ওই ছোট্ট একটা বাড়ি বিক্রি করে কী-ই বা পাবি? তার চেয়ে আমার মতো ভাড়া দে। আজকালকার দিনে যা ভাড়া পাবি তাতে রোজ আমাদের সিনেমা থিয়েটার দেখিয়েও হোটেলে খাইয়ে আনতে পারবি।

এমন সুবুদ্ধিটা গৌরের মনে ধরল না। প্রায় দাঁত খিঁচিয়ে বললে, আমার বাড়ি ছোট দেখলি কোথায় শুনি! দস্তুরমত সায়নাচার্যের গণনা করা বাড়ি সে খেয়াল আছে! তোর তো জ্যোতিষরাজের বাড়ি। খোলার কি খড়ের চাল হয়, তাই আগে দেখ! তারপর ভাড়া দিস!

এ ধরনের হিংসে আমার ভালো লাগে না। না হয় আমার বাড়িটা বেশ বড়ই হচ্ছে! কিন্তু আমি কি তাই বড়াই করছি যে আমার ওপর হিংসে হবে!

সেই কথাই গৌরকে বোঝাতে যাচ্ছিলাম শিশির তার সুযোগ দিলে না। হঠাৎ বিদ্রূপ করে বলে বসল, বাড়ি যে তোরা পেয়েই গেছিস মনে হচ্ছে!

হ্যাঁ পেয়েই গেছি!

আমাদের মুখ থেকে নয়, জবাবটা এল পেছনে থেকে।

চমকে ফিরে তাকিয়ে দেখি শিবু। কখন পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে টের পাইনি।

আমাদের চমকে দিয়ে শিবু যেন যুদ্ধ জয় করে এসেছে এমনি উত্তেজিতভাবে সামনের একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে বললে, সত্যি পেয়ে গেছি বাড়ি!

তুই বাড়ি পেয়ে গেছিস মানে?—আমি আর গৌর দুজনেই অত্যন্ত বিরক্ত,—রাশিফল আমাদের আর বাড়ি পেলি তুই!

আহা, তোদের রাশিফলেই পেয়েছি হয়তো। কিন্তু আমার পাওয়া মানেই তো সকলের পাওয়া!

কী রকম?—এ উদারতায় একটু অপ্রস্তুত হয়েই জিজ্ঞাসা করতে হ'ল।

মানে বাড়ি পেয়েছি মেসের জন্যে। এই এঁদোগলির ঝরঝরে হাড়গোড়ভাঙা বাড়ির বদলে বড় রাস্তায় প্রকাণ্ড ঝকঝকে নতুন বাড়ি। ভাড়াও এই একই।

তা কখন হয়! তোর মাথা খারাপ হয়েছে!—এবার সকলে আমরা একমত।

আহা, আমার মাথা খারাপ হবে কেন? খারাপ হয়েছে তো বিপিনবাবুর!—শিবু আমাদের ভুল সংশোধন করলে।

কে বিপিনবাবু? আর তার মাথা খারাপ হওয়ার সঙ্গে আমাদের বাড়ি পাওয়ার সম্পর্কটা কী?

বাঃ, সম্পর্ক নেই?—শিবু আমাদের মূঢ়তায় বিষণ্ণ,—বিপিনবাবুর সঙ্গেই যে আমার সম্পর্ক। তিনি যে আমার নিকট আত্মীয়, মানে খুব আপনার লোক!

তাতে তোর মাথার দোষের কারণটা না হয় পেলাম, কিন্তু বাড়ি পাচ্ছি কী করে?

বাড়ি পাচ্ছি কতবার বলব, আত্মীয়তার জোরে!—শিবু বোঝাতে গিয়ে বুঝি ক্লান্ত।

কি রকম আত্মীয়তা?—শিশিরের তবু সন্দিগ্ধ প্রশ্ন।

আত্মীয়তা যেমন হয়, আবার কি রকম?—শিবু বিরক্ত হয়ে সম্পর্কটা যা বুঝিয়ে দিলে তাতে আমরা একেবারে চুপ।

কোনরকম ঢোঁক-টোক না গিলে একেবারে গড়গড় করে শিবু বলে গেল, বিপিনবাবু হলেন পিসতুতো ভাই-এর মাসতুতো বোনের খুড়তুতো ভাই-এর পিসশ্বশুর, কিংবা মামাত বোনের পিসশ্বশুরের জ্যেঠিমার বাড়িওয়ালার অফিসের বড়বাবুও হতে পারেন। আসল কথা, তাঁর হঠাৎ মাথা খারাপ না হ'লে কিংবা আগে থাকতেই খারাপ না থাকলে কিছুই হত না।

শিবুর ব্যাখ্যার ধাক্কাটা সামলাতে একটু দেরি হ'ল। তারপর গৌরই প্রথম কৌতূহল প্রকাশ করতে সাহস করলে,—বিপিনবাবু মাথা খারাপ হয়ে তোকে তাহলে বাড়িটা দিয়েছেন?

তিনি দেবেন কোথা থেকে?—শিবু অধৈর্যের সঙ্গে জানালে, তিনি তো এখন অ্যাসাইলম-এ, মানে মাথার রুগীদের আশ্রমে।

তবে?—হতভম্ভ হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, বাড়ি তাহলে কার কাছে কেমন ক'রে পাচ্ছিস?

পাচ্ছি এটর্ণির কাছে। বিপিনবাবু এটর্ণিকে লিখে যা হুকুম দিয়ে রেখেছেন তারই জোরে।

এতক্ষণে যেন কুয়াশাটা একটু কাটল।

বললাম, তাই বল! তোর সেই পরমাত্মীয় বিপিনবাবু এটর্ণিকেই হুকুম দিয়ে গেছলেন তোকে বাড়িটা দিতে।

না।—শিবুর গলা চড়া মেজাজের,—তিনি যা হুকুম দিয়ে গেছলেন তাতে ও বাড়ির ব্যবস্থা করতে এটর্ণিই অকূল পাথারে। অথচ বিপিনবাবুর খরচ মেটাতে বাড়ির একটা ব্যবস্থা না করলেও নয়।

কী হুকুম দিয়েছিলেন?

যা দিয়েছিলেন তাইতেই বাজিমাৎ!—শিবুর মুখে এবার একটু মুচকি হাসি, ওই হুকুমের জোরেই বাড়িটা আদায়ের ব্যবস্থা করে এলাম।

হুকুমটা কি?

হুকুমটা হ'ল ও বাড়িতে কেউ যেন কোনদিন সংসার না পাতে। কারণ সংসারই তাঁর মতে সব গণ্ডগোলের কারণ, এমন কি তাঁর মাথারও।

ওই হুকুম থেকেই তুই কাজ বাগালি?—শিশিরের মুখে আমাদের সকলের সংশয়।

তা বাগাব না!—শিবু যেন এতক্ষণে তুরুপের টেক্কা বার করে দেখালো, সংসার না পাততে দিলে ও বাড়ির কী ব্যবস্থা হতে পারে? অফিস হয় বটে। কিন্তু ও বেপোট জায়গায় অফিস করতে চাইবে কে? তাই এটর্ণিকে বুঝিয়ে দিলাম ও বাড়ির মেস হওয়া ছাড়া আর কোন গতি নেই। মেস তো আর সংসার নয়। তাহলেই বুঝতে পারছিস, বিপিনবাবুর যদি মাথা খারাপ না হত, তাইতে তিনি যদি অমন আজগুবি হুকুম না দিতেন, তাঁর সঙ্গে আমার অমন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা না থাকত, আর সে যেমনই হোক, মামাতো বোনের বাড়ি গিয়ে খবরটা যদি না পেতাম, আর মামাতো বোনের বাড়ির কাছে হঠাৎ যদি আজ গিয়ে না পড়তাম, অর্থাৎ কারেণ্ট বন্ধ হয়ে গিয়ে ট্রামটা যদি ওইখানেই না থামত আর বিরক্ত হয়ে যদি না ওখানে নেমে পড়তুম...

শিবুকে না থামালে সে বোধহয় কার্য-কারণ বোঝাতে বোঝাতে ইডেন উদ্যানে আদমের নিষিদ্ধ ফল খাওয়া পর্যন্ত পেঁছে যেত।

বুঝেছি! বুঝেছি!—বলে সমস্বরে তাই তাকে থামাতেই হ'ল। শিবুর আনা খবরের সঙ্গে রাশিফলের গণনা মিলে গিয়ে আমাদের তখন ধৈর্য ধরবার মতন অবস্থা নেই। পারলে তখনি লরী ডেকে মাল-টাল তুলে ফেলি।

শিশির সোৎসাহে বললে, আচ্ছা বাড়ি ভাড়ার বায়নাটা আজই দিয়ে এলে হয় না?

আর আমাদের বাড়িওয়ালাকে একটা নোটিশ! গৌর স্মরণ করিয়ে দিলে।

গোটা কয়েক লরীও আগে থাকতে বলে রাখতে হয়।—সদ্যুক্তি দিলাম আমি।

কেন, লরী কি হবে?—শিশির আমার সদ্যুক্তির গোড়াতে কোপ দিলে,—এখানকার এইসব রদ্দি ফার্নিচার ওই বাড়িতে নেব নাকি। সব নিলেমে বিক্রী করে যাব।

তারপর সেখানে মেঝেয় কানি পেতে শোব কেমন?—একটু বিদ্রূপ করতেই হ'ল আমার।

কানি পেতে শোয়া যার অভ্যাস, সে শোবে!—শিশির একটু যেন মাত্রা ছাড়িয়ে গেল,—কলকাতা শহরে ফার্নিচারের দোকানের তো ঘাটতি নেই। যেমন বাড়ি, তেমনি ফার্নিচার না হলে মানায়!

ঝগড়াটা এরপর কোন্ দিকে যেত বলা যায় না, কিন্তু শিবুই হঠাৎ বেয়াড়া খোঁচা তুলে সব ঠাণ্ডা করে দিলে।

কানি পেতে, না, ল্যাজারাসের খাটে শোবে সে ঝগড়া রেখে আসল বেড়াটা আগে ডিঙোও দেখি। তেতালার উনি বেঁকে দাঁড়াবেন না তো!—চিন্তিতভাবে বলল শিবু।

ঘনাদা বেঁকে দাঁড়াবেন!—উত্তেজিত হয়ে উঠল শিশির, এমন একটা দাঁও পাওয়ার মর্ম তিনি বুঝবেন না!

আলবৎ বুঝবেন। বোঝাতেই হবে তাঁকে। এখুনি।—গোঁর মূর্তিমান সংকল্পের মতন উঠে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে আমরাও।

তারপর সোৎসাহে সদম্ভে সিঁড়ি কাঁপিয়ে দোতলা থেকে তেতলা।

খানিকবাদেই সেই সিঁড়ি দিয়ে যখন নামলাম, তখন আর সে আওয়াজ নেই। পা দুটোও যেন নড়তেই চায় না।

ঘনাদাকে আমাদের অনুরোধ-উপরোধ, যুক্তি তর্ক, প্রলোভন কিছুতে টলান যায়নি। তাঁর ধনুকভাঙা পণ ওই তেতলার ঘর ছেড়ে পাদমেকম্ ন গচ্ছামি।

খবরের কাগজ হ'লে নিশ্চয় একটা জুৎসই শিরোনামা দিত। সংকটজনক পরিস্থিতি গোছের কিছু।

তবু হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিলে তো চলে না। আমাদের মন্ত্রণা সভা বসল।

আমাদের অবশ্য উভয় সংকট। ঘনাদাকে বাদ দিয়ে নতুন বাড়িতে উঠে যাওয়ার কথা ভাবতে পারি না। আবার ঘনাদার জেদের কাছে হার মানলে এমন একটা দাঁও ফসকে যায়!

সুতরাং যেমন করে হোক ঘনাদাকে এ বাড়ি ছাড়তে রাজি করাতেই হবে।

কিন্তু তা কি করে সম্ভব?

ভূতের ভয় দেখিয়ে!—শিবুর প্রস্তাব।

প্রস্তাবটা মন্দ নয়। কিন্তু ভয় দেখলে হিতে বিপরীত যদি হয়! একটা ছুতো নাতা করে আমাদের রামভুজকেই হয়তো খোলা ছাদে শুতে বাধ্য করবেন। একবার চোরের ভয় হতে যেমন করেছিলেন। রামভুজ বেচারারই প্রাণান্ত। ঘণ্টায় ঘণ্টায় ঘনাদার বন্ধ দরজার ভেতর থেকে ডাক, রামভুজ জেগে আছ তো? তার সঙ্গে নুনের ছিটেটুকু আরো অসহ্য! রামভুজ হাঁ, বড়ো বাবু—বলে সাড়া দেবার পর ঘনাদার উদার আশ্বাস, দেখো ভয় পেও না। আমি তো আছি, তোমার ভয় কি?

না, ভূতের ভয় দেখানোটা বেকার। তাছাড়া সদ্য সদ্য বাড়ি বদলের প্রস্তাবের পরই ভূতের ভয় দেখানোর মানেটা ধরেও ফেলতে পারেন।

শিবুর প্রস্তাব বাতিল হতেই শিশির নিজেরটা পেশ করল, মহামারীর আতঙ্ক!

কিসের আতঙ্ক?—আমাদেরই বিহ্বল প্রশ্ন।

মহামারীর আতঙ্ক!—শিশির নাটকীয় সুরে বুঝিয়ে দিলে, সারাক্ষণ বাড়িতে কী রকম একটা বিশ্রী গন্ধ। শুয়ে বসে কারুর শান্তি নেই। নিশ্চয় গুরুতর কিছু হবে। এই রুগ্ন গন্ধ

পাবার পর কোন মেস বাড়িতে কোথায় নাকি সব কজন বোর্ডারকে ঝোল ভাত খাইয়ে ছেড়েছিল। শেষ পর্যন্ত সে বাড়ি নাকি করপোরেশন থেকে ভেঙে ফেলতে হয়। সকাল বিকেল ঘনাদার কাছে এই সব গল্প।...

কিন্তু ঘনাদার নাকেও তো গন্ধটা যাওয়া চাই!—আমাদের বাধা দিতে হল শিশিরের রাশ ছাড়া কল্পনায়।

নিশ্চয় যাওয়া চাই। শিশির জোরের সঙ্গে সায় দিলে, আমাদের সকলের নাকে যাবে, ঘনাদার যাবে না?

গন্ধটা কিসের?—আমাদের সন্দিগ্ধ প্রশ্ন।

একটা বিতিকিচ্ছি কিছুর!—শিশির সোৎসাহে ব্যাখ্যা শুরু করলে, সালফিউরিক অ্যাসিড খানিকটা কিংবা...

কিংবা তোমার মগজে যে বস্তুটি আছে সেইটির! গৌর খিঁচিয়ে উঠল।

আমাদেরও বক্তব্য তাই। ঘনাদাকে বাড়ি ছাড়া করতে নিজেদের নাড়ি ছাড়তে আমরা রাজী নই। শিশিরের প্রস্তাব সুতরাং সর্বসম্মতিক্রমে বাতিল।

কিন্তু একটা কিছু ফন্দি তো না বার করলে নয়।

ভাবতে ভাবতে চমৎকার একটা মতলব মাথায় এসে গেল।

আচ্ছা, হঠাৎ একজনের মাথা খারাপ হয়ে যাক না!—সগর্বে সকলের মুখের দিকে চাইলাম।

নাঃ, দুনিয়ায় সরেস কোন কিছুরই কদর নেই। অমন একটা চমৎকার প্রস্তাবে সবাই মিলে আমার দিকে অমন অবজ্ঞাভরে চাইবার কী মানে হয়? তার ওপর—হয়ে যাক কেন, হয়েছে তো!—বলে চিপটেন কাটাটা একটু বাড়াবাড়ি নয়?

নেহাত ব্যাপারটা জরুরী বলেই অপমানটা গ্রাহ্য না করে কর্তব্যের খাতিরে বসে রইলাম।

হঠাৎ গৌর বললে, আচ্ছা কাল থেকেই ঘনাদা ক্ষেপে আছেন, কেমন? বাস্! আর ভাবনা নেই।

তার মানে?—আমরা বিমূঢ়।

মানে, অটোস্যাজিন!—গৌর সংক্ষিপ্ত।

অটোস্যাজিন কী রকম?

রোগের বীজ থেকেই তার ওষুধ, আবার কী রকম?—গৌরের মাথাগুলনো ব্যাখ্যা!

ব্যাখ্যা যেমনই হোক মতলবটা যে পাকা মাথার তা আমাদের স্বীকার করতেই হ'ল অভিযান আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে।

অভিযান সেই দিন থেকেই শুরু। ঘনাদা তাঁর নিত্যনৈমিত্তিক সান্ধ্যভ্রমণে বেরুবার জন্যে নামবার আগেই আমরা দল বেঁধে বেরিয়ে পড়লা কাজ সেরে এলাম।

তারপর ঘনাদার লেক-বৈঠক থেকে ফেরার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে বসে থাকা।

ঘনাদা দোতলায় উঠে তেতলায় পা বাড়াবার আগেই তাঁকে যেন সন্ত্রস্ত হয়ে ঘিরে ধরা। মুখের ঘনঘটা দেখে মনে হল ওষুধ ধরেছে। ঘনাদা অবশ্য পাশ কাটিয়ে চলে যাবার উপক্রমই করছিলেন। কিন্তু সে সুযোগ আর তাঁকে দেওয়া হ'ল না।

বড় মুস্কিল হয়ে গেছে ঘনাদা!—আমাদের মুখে উদ্বেগ, আশঙ্কা, উত্তেজনা।

ঘনাদাকে শিশিরের এগিয়ে-ধরা সিগারেটটা নিয়ে আড্ডাঘরে এসে বসতেই হ'ল।

শিশির লাইটার জেলে সিগারেট ধরিয়ে দিলেও ঘনাদার মুখের অন্ধকার যেন কাটল না।

পাড়ার সবাই তো মেতে উঠেছে!—শিবু শুরু করল।

আমরা কত করে বোঝালাম!—আমি চালিয়ে গেলাম,—কিন্তু ওরা নাছোড়বান্দা।

অবশ্য ওদেরই বা দোষ কী!—গৌর সত্যের মর্যাদা না রেখে যেন পারল না,—আপনার মতো লোক পাড়ায় থাকতে আর কার কাছে যাবে?

ঘনাদা সত্যিই একটু কি গললেন নাকি!

ঠিক বোঝা গেল না। উল্টো হাওয়া চালাতে হল তাই তৎক্ষণাৎ।

বললাম, কিন্তু এটা একটু বাড়াবাড়ি নয়? ঘনাদার মত না নিয়েই আগে থাকতে ওঁর নাম দিয়ে কাউন্সিলার হবার জন্যে উনি প্রার্থী বলে দরখাস্ত করে দেওয়া!

শুধু তাই!—শিবুও পোঁ ধরলে,—রাস্তায় এরই মধ্যে ওগুলো সব!

শিশির যেন আকাশ থেকে পড়ল,—রাস্তায় আবার কী হ'ল?

ও, তাও বুঝি জানো না!—শিবু বিজ্ঞ সাজল, ঘনাদার চোখেও কি আর পড়েনি। উনিতো এই মন্ত্র ফিরলেন।

আমরা উৎসুক ভাবে ঘনাদার দিকে তাকালাম। এইবার একটা সাড়া যদি পাওয়া যায়। কিন্তু না লাল, না সবুজ। এখনও শুধু হলদে। কোন্ দিকে যাবে বোঝবার জো নেই।

ঘনাদার সিগারেটের টানটা একটু লম্বা হ'ল।

আবার খোঁচাতেই হল অগত্যা।

শিবুকে যেন ধমকে বললাম,—হেঁয়ালি রেখে আসল কথাটা বলবি! কী হয়েছে রাস্তায়?

এরই মধ্যে রাস্তায় পোস্টার পড়ে গেছে।

পোস্টার!—আমরা যেন হতভম্ব, কিসের পোস্টার?

ঘনাদার জন্যে ভোটের—শিবু রহস্য তরল করলে, আজ শুধু দেয়ালে দেয়ালে খড়ি দিয়ে লিখেছে। কালই শুনলাম ছাপানো পোস্টারে এ তল্লাট ছেয়ে দেবে! তা শ্লোগ্যান কিন্তু দিয়েছে ভালো।

শিবুর গদগদ হওয়াটাকেই যেন সন্দেহ করে জিজ্ঞাসা করলাম, কী শ্লোগ্যান দিয়েছে?

দিয়েছে,—শিবু সুর করে আওড়ালে,

দেশের নাড়ি বড় ক্ষীণ
ঘনাদাকে ভোট দিন।

ঘনাদার দিকে আড়চোখে চেয়ে আমরা ক্ষোভ প্রকাশ করলাম, এ আর কী শ্লোগ্যান হ'ল এমন!

আরো আছে—শিবু আশ্বাস দিলে, যেমন,

সফেদ হবে লাল-চীন।
ঘনাদাকে ভোট দিন।

শিবুর শ্লোগ্যান শুনে গৌরেরও যেন নেশা ধরে গেল। বললে, তার চেয়ে আরো ভালো শ্লোগ্যান দিলেই পারত। যেমন,

ভোট দেবেন কাকে?
বিশ্ব-ঘনাদাকে!
কী করবেন তিনি?
কালো বাজার সাদা করে
সস্তা চাল তেল চিনি!

গৌর যদি এগোতে পারে আমিই বা পিছিয়ে থাকি কেন? বললাম, শ্লোগ্যান আরো জবর হ'তে পারে?

কী রকম?—গৌরের গলাটাই যেন একটু বেশী রুক্ষ।

বেশ কাঁপানো গলায় শোনালাম—

শুন শুন সর্বজন, মন দিয়া মন
ঘনাদাকে ভোট দিতে কহি কী কারণ।
ঘোর কলিকাল এবে পাইতে উদ্ধার—
ঘনাদার স্কন্ধে হও দুঃখসিন্ধু পার।

ক্ষমা করি ভোট দাও যে চাও তরিতে—
বিলম্বে হতাশ হবে ধন্দ নাহি ইথে।

ছোঃ!—গৌরই সবার আগে সশব্দে তার মতামত জানালে। সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গাই।

ওটা একটা শ্লোগ্যান হ'ল?

এঁকি পাঁচালী পেয়েছিস?

ভোটাররা ও শ্লোগ্যান শুনলে হাসতে হাসতে ভোট দিতে ভুলে যাবে।

প্রতিভার আদর যে এ দেশে নেই তা অনেক কাল আগেই বুঝেছি। গুম হয়ে তাই চুপ করে রইলাম। কিন্তু নিজেদের মধ্যে খাওয়া-খাওয়ি করে আসল কাজটা তো ভেস্তে দেওয়া যায় না।

সকলেরই বোধ হয় সে হুঁশ হ'ল। শিশিরই হাওয়াটা ঠাণ্ডা করবার জন্যে প্রথম বললে, যাক গে। ঘনাদা ইলেকশনে নামলে শ্লোগান ঢের জুটবে। বাংলা দেশের বাঘা বাঘা কবিকে সব লাগিয়ে দেব। কিন্তু দেয়ালে দেয়ালে এখনই এই সব লেখা কি উচিত হয়েছে? আবার কাল বলছে, ছাপানো পোস্টার ছাড়বে! ঘনাদার মতটা তো তার আগে নেওয়া উচিত ছিল।

মত নেবে ওরা!—শিবু আসল রাস্তা ধরলে, ওদের তো চেনো না। ঠিক যখন একবার করে ফেলেছে তখন ঘনাদাকে ওরা দাঁড় করাবেই।

ঘনাদা যদি রাজী না হন তবু?—গৌর যেন রেগে কাঁই।

রাজী ঘনাদাকে হতেই হবে। না হয়ে উপায় নেই।—শিবু নিজেই যেন নাচার।

এঁকি জুলুম নাকি!—এতক্ষণে অভিমানটা সামলে আমিও সুর মেলালাম।

জুলুম জবরদস্তি যাই বলো, দেয়ালে যখন খড়ির দাগ কেটেছে, ওরা ঘনাদাকে না দাঁড় করিয়ে ছাড়বে না!—শিবু সার কথা শুনিয়ে দিলে।

ঘনাদা এতক্ষণে একটা সিগারেট শেষ করে আর একটা ধরিয়েছেন শিশিরের এগিয়ে দেওয়া টিন থেকে। কিন্তু কোন সাড়া শব্দ তাঁর দিক থেকে শোনা যায়নি। চোখ দুটো মাঝে মাঝে কোঁচকানো ছাড়া কোনো ভাবান্তরও নয়।

কিন্তু এরকম শালগ্রাম শিলা হ'লে আমাদের তো চলবে না। আশেপাশে ঝোপঝাড় না নেড়ে একেবারে সোজাসুজি তই খোঁচাতে হ'ল।

আপনাকে তো দাঁড়তেই হচ্ছে দেখছি, ঘনাদা।

আমাদের চার জোড়া চোখ যাকে বলে ঘনাদার মুখে নিবদ্ধ।

ঘনাদা সিগারেটের ছাই ঝেড়ে শুধু বললেন, হুঁ।

হুঁ! শুনেই আমরা কিন্তু হাঁ। ঘনাদা বলেন কী! শেষে নিজেদের ফাঁসে নিজেরাই গলা গলিয়ে দিলাম না কি!

তাড়াতাড়ি যা যা প্যাঁচ হাতে ছিল সব ছাড়তে হ'ল।

অবশ্য ঘনাদাকে দাঁড় করাবার গরজ ওদের আলাদা।—শিবু গম্ভীরভাবে জানালে।

কী গরজ?—গৌর যেন অবাক।

ওদের দুজন কণ্ট্রাক্টরকে কাজ পাইয়ে দিতে হবে।—শিবু গোপন রহস্যটা ফাঁস করে দিলে যেন অনিচ্ছায়,—আরবারে চুরির দায়ে তাদের নাম কাটা গেছল কি না।

আর ওই চাঁইদের বাড়ির ট্যাক্স কমানো!—শিশির জোগান দিলে,—দাঁড় করাবার কড়ারই তো তাই।

জন কয়েককে চাকরিও দিতে হবে।—আমি জুড়ে দিলাম, শুনলাম এ সবের মধ্যে বটি ছাতের পাওনাও কিছু মিলবে।

তার মানে ঘুষ। আর ঘনাদা এতে রাজি হবেন!—গৌরের গলায় আগুনের জ্বালা। না হলে যে ছাড়ান ছিড়েন নেই!—শিবুর হতাশ মন্তব্য।

কেন, সাফ্ 'না' বলে দেবেন। কী, করবে কী ওরা!—গৌর রোষ দেখাল।

কী করবে!—শিবুর মুখে যেন আতঙ্কের ছায়া, এ-পাড়ায় তাহলে বাস করতে পারব? রাস্তা দিয়ে হাঁটা যাবে না। চাঁকর পালিয়ে যাবে, ইলেকট্রিকের লাইন কাটা যাবে। দিন নেই রাত নেই মেসে ঢিল পাটকেল পড়বে। তারপর বোমা-ই বা ফেলতে কতক্ষণ।

এ কি মগের মুল্লুক নাকি!—একটু প্রতিবাদ জানাতেই হ'ল—থানা পুলিস নেই?

থানা পুলিস!—শিবু তাচ্ছিল্য ভরে উড়িয়ে দিলে, রাতদিন পুলিস পাহারায় নিজেরাই জেলখানায় থাকব নাকি।

কিন্তু এ তো হেঁজি পেঁজির কথা হচ্ছে না, কে এখানে আছে তা দেশে দশে জানে। বিধান সভা কেঁপে উঠবে না তাহলে? দিল্লীর পর্যন্ত টনক নড়বে না?—গৌরের গর্জন।

তা নড়লেও লাভটা হচ্ছে কী!—শিশিরের বিজ্ঞ বিশ্লেষণ, তখন তারা বলবে 'ও ছাই করপোরেশন কেন, ঘনাদার জন্যে রাজ্য-সভা, লোক-সভাই তো খা-পিত্যেশ করে আছে!' সেখানে চালান করে দিয়ে দিল্লীর সাউথ কি নর্থ অ্যাভেনিউ-এর এম-পি'র কোয়ার্টারে তুলতে চাইবে। ঘনাদা কি তাতে রাজী হবেন? সে সাধ থাকলে ওঁকে আটকাতে পারত কেউ? উনি নির্বিবিলিতে অজ্ঞাতবাসে থাকতে চান বলেই না আমাদের এই অখদ্দে মেসে পড়ে আছেন।

কিন্তু এখানে থাকতে হলেও যে ইলেকশনে দাঁড়াতে হয়?—গৌরের দুর্ভাবনা।

আর না দাঁড়ালেও ওদের জুলুমবাজি সইতে হয়?—আমার দুশ্চিন্তা।

তাহলে উপায়টা কী?—গৌরের ব্যাকুল জিজ্ঞাসা।

উপায় হ'ল—শিবুর সুচিন্তিত বিধান, এ পাড়াই ছেড়ে দেওয়া। এমন পাড়ায় যাওয়া যেখানে এ-সব ঝামেলাই নেই, পাড়াপড়শীও এমন ওঁচা নয়।

এটা তো খুব ভাল বুদ্ধি!—আমরা সকলে একসঙ্গে উৎফুল্লভাবে মাথা নেড়ে ঘনাদার দিকে তাকালাম।

কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা!

যাঁর হুঁয়ে এত তর্কাতর্কি, বিচার-বিশ্লেষণ, তিনি যেন আমাদের মধ্যে থেকেও নেই; বাইরের দরজার দিকে তাকিয়ে দ্বিতীয় সিগারেটও প্রায় শেষ করে এনেছেন তখন নির্লিপ্ত উদাসীনভাবে।

অগত্যা জিজ্ঞেস করতেই হল, নতুন সেই বাড়িটাই কি তাহলে দেখব নাকি ঘনাদা? এখনও চেষ্টা করলে হয়তো পাওয়া যাবে।

ঘনাদা এতক্ষণে মুখ খুললেন। কিন্তু যা বেরিয়ে এল তা দার্শনিক বুজরুকি। মানে, যেমন খুশি বোঝো!

বললেন, হ্যাঁ চেষ্টা করলে তো অনেক কিছুই পাওয়া যায়।

তার পরই হঠাৎ উত্থান ও আমাদের হতভম্ব করে রেখে প্রস্থান—শিশিরের সিগারেটের টিনটা সমেতই অবশ্য।

পরের দিন আরো কড়া দাওয়াই-এর ব্যবস্থা করতেই হল। দলের সব কটি একেবারে বাছা বাছা। নিজেদের পাড়ার নয়। এধার ওধার নানা তল্লাট চষে চারটি যে চেহারা যে ক'ত হয়েছে সিনেমায় পেলে বোধ হয় তাদেরকে লুফে নেয়।

দশরথ শিবুর মামার বাড়ির পাড়ায় কুস্তি করে। ছোটখাট একটি হাতী বিশেষ। কামানো মাথাটা ঘাড়ের মাংসের মধ্যে কখন ডুবে যাবে সন্দেহ হয়। কৎ হয়ে ছাড়া গেরস্ত বাড়ির দরজা দিয়ে যেতে পারে না। আর দশরথের চেলা বিশে তারই কিঞ্চিৎ সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। এদের সঙ্গে পাল্লা ঠিক রাখতে নফর আর হাবুল দুজনে দুটি সিঙ্গেল সুপুরী গাছ।

দশরথ আর বিশের গায়ে মোটা খদ্দর, নফর আর হাবুলবাবুর কোঁচানো শান্তিপুরী ধুতি, কলিদার গিলে করা আদ্দির পাঞ্জাবি। চার জনের স্কন্ধে একটি মিল কানে শুনে যাচাই করে নেওয়া। সবাই এরা শ্যামবাজারের সসীবাবু।

সাত সকালেই তারা আমাদের ফরমাস মতন এসে হাজির। আমরাও হন্ত দন্ত হয়ে একেবারে তেতালার ঘরে।

কী হবে ঘনাদা? ওঁরা যে এসে গেছেন!

ঘনাদা সবে শিশিরের কালকের কোটো থেকে একটা সিগারেট বার করে সামনে বনোয়ারীর-আনা চায়ের পেয়ালাটি নিয়ে মৌজ করতে বসেছেন।

আমাদের আর্তনাদে প্রথমে চমকে প্রায় লাফিয়েই উঠলেন। তারপর অবশ্য সামলে নিয়ে গম্ভীরভাবে জিজ্ঞেস করলেন, কারা?

ওই সেই ইলেকশনের পাণ্ডারা।—আমরা তখনও যেন হাঁপাচ্ছি, একেবারে দল বেঁধেই এসেছেন!

ওঃ—ঘনাদা চায়ের পেয়ালাটা তুলতে গিয়ে আবার নামালেন।

গলাটা যেন একটু ভারীই লাগল বোধ। মুখও যেন আর এক পোঁচ ছায়া।

উৎসাহিত হয়ে বললুম, পরে আসতে বলব, ঘনাদা? বলব যে বেড়াতে বেরিয়ে গেছেন?

তাতে কী লাভ হবে?—গোর আমার প্রস্তাব সংশোধন করলে, ওরা তো তাহলে মাটি কামড়ে বসে থাকবে ঘনাদার ফেরার অপেক্ষায়। চা সিগারেট যোগাতে আমরা কতুর। তার বদলে বরং ঘনাদার কল রাত দেড়টা, কী বলে, খুব বাড়াবাড়ি অসুখ, নস্ট্যালজিয়া কি হাইড্রোফোবিয়া।

তোর যেমন বুদ্ধি!—ঘনাদার ভ্রূকুটটুকু দেখতে না দিতেই শিবু গৌরকে ধমক দিয়ে সামলাল, ঘনাদার হাইড্রোফোবিয়া হতে যাবে কোন দুঃখে। ও রোগ তো কুকুরে কামড়লে হয়। আর নস্ট্যালজিয়া কি বোঝা নয়? ও তো নিজের ব্যাড কি অগেকার দিনের জন্যে মন কেমন করা।

আহা কে অত বুঝবে! শুধু 'য়া' দিয়ে সুরুক একটা হলেই হল।—গৌর ভাঙবে তবু মচকাবে না, ই ইয়া ফোবিয়ার রোগ বলে মনে হয়, ম্যানোফোবিয়া, ফাইলোফোবিয়া, নিউমোনিয়া, অ্যানিমিয়া, এপেন্ডিসাইটিস।

থাম্ থাম্—শিশির ব্যস্ত হয়ে গৌরকে থামাল, একেবারে হাসপাতাল করে তুললি যে। এর পর হয়তো পিলে, রোগের তালিকাও রোগ বলে মনে হবে।

কিন্তু এদিকে এরা নিচে বসিয়ে সে খেয়াল আছে—শিবু স্মরণ করিয়ে দিলে, ওদের যা হোক একটা কিছু বলে বিদায় না করলে তো নয়!

ঘনাদার ঠিক একবার তাকিয়ে নিয়ে শিবু, তার প্রস্তাবটা জানালে বলে দিই ঘনাদাকে কল হঠাৎ ওষুধ আনতে যেতে হয়েছে। কবে ফিরবেন, ঠিক নেই।

গয়া তীর্থে কেন? শিশিরের আপত্তি,—যাবার তার জায়গা নেই?

থাকবে না কেন! শিবু বোঝাবার চেষ্টা করলে,—ঘনাদা তো ইচ্ছে করলে ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানী সুইজারল্যাণ্ড খুশি যেতে পারেন। কিন্তু শুনলে একটু ভড়কে যায় এমন জায়গায় যাওয়াই ভালো নয়?

যদি জানতে চায় গয়াতীর্থে কেন?—শিশির ফ্যাকড়া তুলল।

সেখানে যাকে বলে জাতীয় সংকট।—জবাবটা যেন শিবুর জিভের ডগাতেই ছিল, রাজা টলমল। প্রেসিডেণ্ট জরুরী তার করে প্লেন পাঠিয়ে দিয়েছে। ঘনাদা না গেলে কুরুক্ষেত্র বেধে যাবে।

তা বলা যায় বটে!—আমি প্রস্তাবটার পোকা বাছলুম, কিন্তু ঘনাদা তো আর ঘরবন্দী জন্তু থাকতে পারবেন না। এ পাড়ায় যাওয়া আসা করলেই ওদের চোখে পড়ে যাবে যে।

থাকবেন কেন এ পাড়ায়?—শিবুর সহজ সমাধান, কালই আমরা রাতের অন্ধকারে নতুন পাড়ায় বাসা বদলাতে দিব্যি উঠি। তখন আর আমাদের নাগাল পাবে কে? তাহলে ওই অক্ষরদন্তের অপেক্ষা দেখেন, কী বলেন ঘনাদা?

না!—ঘনাদা আমাদের একেবারে বসিয়ে দিয়ে বললেন, ওঁদের নিচে বসাও, আমি যাচ্ছি।

ওঁদের মানে . আপনি . . ! আমাদের বাক্‌রোধ হবার উপক্রম।

তবু শেষ আশায় ভর করে নিচে নেমে গিয়ে ভাড়াটে দলকে আর একটু তালিম দিয়ে দিলাম ঘনাদা আসবার আগে। তাঁদের বোলচালে যদি কিছু কাজ হয়।

প্রথমটা শুভ লক্ষণই দেখা গেল।

এই যে ঘনশ্যামবাবু! আসুন, আসুন!—দশরথের বাড়াবাড়ি গলার অভ্যর্থনা শুনেই ঘনশ্যামকে একটু যেন কাহিল মনে হল।

তার ওপর বিশেষ মন্তব্যে বেশ যেন ফ্যাকাশে। দশরথেরই কাঁপি ধরা গলায় বিশেষ-মত মেজাজ দেখিয়ে বললে, ঐনেকক্ষণ বসিয়ে রেখেছেন কিন্তু স্যার। কাউন্সিলার আপনাকে বানিয়ে দেব, কিন্তু আমাদের কাছে এসব চলফাল চলবে না। আমরা গুছে তুলতেও জানি আবার মই কেড়ে নিতেও।

আহা ক্ষ্যামা দে না, বিশে!—দশরথই বিশেকে সামলাল, দেখছিস না, কাঁচা ইঁট এইসবে

পোড় খায়নি। আপনি বিশের কথা কিছু ধরবেন না, ঘনশ্যামবাবু। ওর মেজাজটা বড় গরম। মুখ চালাতে কখন হাত চালিয়ে দেবে তাই আমি সামলে সামলে রাখি।

কিন্তু ঘনশ্যামবাবুর কাছে আমাদের আর্জিটা আগে পেশ করা দরকার নয় কি?—বললেন নফরবাবু। যেমন তাঁর হাত জোড় করা বিনয়ের ভঙ্গি, তেমনি সরু-সুতো-কাটা গলা।

আর্জি ফার্জি আবার কীসের?—বিশে গর্জে উঠল, আমরা ঠিক করেছি ঘনশ্যামবাবুকে কাউন্সিলার দাঁড়িয়ে দেব, ব্যাস্, মামলা চুকে গেছে। উনি কি না বলবেন নাকি? ঘাড়ে তো দেখছি মাথা একটাই।

আঃ, ওর বিশে!—দশরথ ধমক দিলে, না আদর জানালে বোঝা গেল না,—তুই বড় ফজুল বকিস্! ঘনশ্যামবাবু আগে 'না' বলুন তবে তো মেজাজ করবি!

তারপর ঘনাদাকে মধুর আশ্বাস, আপনি কিছু ভাববেন না, ঘনশ্যামবাবু। আমরা থাকতে আপনার কোন ভাবনা নেই।

প্যাকাটি মার্কা হাবুলবাবু মিহি সুরে সায় দিলেন, আপনার গায়ে আঁচটি লাগতে দেব না আমরা। সব ঝঞ্ঝাট আমাদের, আপনার শুধু ওই হাজার দশেক যা খসবে!

হাজার দশেক খসবে, মানে?—আমরাই যেন ঘনাদার জন্যে কাৎরে উঠলাম, ঘনাদাকে দশ হাজার টাকা দিতে হবে?

তা নয়তো কি মিনিমাগনা কাউন্সিলার হবেন না কি?—বিশে মুখ বেঁকিয়ে হেঁড়ে গলা ছাড়ল, ছেঁড়া ন্যাকড়ায় শালের জোড়া! দশহাজার তো সস্তা, মশাই!

তা ঠিকই বলেছেন! একটা ভোটের লড়াই-এ দশহাজার তো নস্যি!

নিজেদের কানকেই বিশ্বাস করব কি না বুঝতে না পেরে থ হয়ে গেলাম।

এ যে ঘনাদার গলা! ঘনাদা বলছেন, দশহাজার নস্যি!

না, কানের কি চোখের ডাক্তারের কাছে দৌড়বার দরকার নেই। ঘনাদাই তাঁর মৌরসী আরাম-কেদারাটিতে বসে শিশিরের সিগারেটের টিনটিই অতিথিদের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে সহাস্য বদনে বলে চলেছেন, এত সস্তায় হবে আমি তো ভাবতেই পারি নি। দুচার হাজার উপরি অবশ্য আমি ধরেই রাখছি।

আমাদের শুধু নয়, এবার ভাড়াটে দলেরও সকলের চোখই ছানাবড়া।

গৌর কোনরকমে ঢোক গিলে তোৎলাতে তোৎলাতে বললে, আপনি...কী বলে ...তাহলে ইলেকশনে দাঁড়াতে রাজী?

কী করি বলো! নিজের পাড়ার লোক এত করে ধরেছেন। সামান্য দশ পোনেরো হাজারের জন্যে ওঁদের নিরাশ করতে তো পারি না। কোটি কোটি টাকাই যখন যাচ্ছে, তখন বোঝার ওপর ওই শাকের আঁটিটুকুও সইতে পারব।

কথা বলব কি, আমাদের হাঁ-করা মুখ আর বুজতেই চায় না। চোয়াল যেন আটকে গেছে।

ঘনাদাই ততক্ষণে নিজের একটা সিগারেট ধরিয়ে ফেলে আবার বললেন, শুধু ওই শুশুক-গুলোর কথা ভাবছি।

কাদের কথা? সিঁড়িঙ্গে নফরবাবুর মিহিসুতো-কাটা গলাটাই প্রথম কিচকিচিয়ে উঠল।

ওই শুশুকগুলোর! মানে, ম্যানাটি বললে তো আপনারা বুঝবেন না। তাই শুশুক বলছি। ভিমপাড়া মাছ নয়। ওই শুশুকের মতনই একরকম হাওয়ায় নিঃশ্বাস নেওয়া স্তন্য-পায়ী জলের জানোয়ার। তবে খায় শুধু নিরামিষ, জলের পানাটানা দাম শ্যাওলা এই সব।

তাদের কথা ভাবছেন কেন?—এবার বিশের হেঁড়ে গলা, কিন্তু কেমন যেন একটু ধরা ধরা, ভ্যাবাচাকা খাওয়া।

ভাবছি, ওগুলোকে জংলীরা সব সাবাড় করে দেবে বলতে পেরে।—ঘনাদার একটু দীর্ঘশ্বাস।

জংলীরা শব্দকগুলো সাবাড় করে দেবে!—প্যাকাটি মার্কা হাবলুবাবু একেবারে ঘ! শব্দকগুলো আপনার?

হ্যাঁ, আমারই বলতে পারেন। আর কাপলান-এরও।

কাপলান! কাপলান কে?—পিপের দোসর বিশের হাঁ-করা প্রশ্ন।

করছে আমার হয়ে।

কী কাজ? ও! শব্দক চরানো?—সিরিঙ্গেগ নফরবাবু ধরা গলায় শুধোলেন।

তাও একরকম বলতে পারেন।

তাহলে জংলীরা শব্দকগুলো সাবাড় করবে কেন?—বিশের ব্যাপারটা বুঝবার প্রাণান্ত চেষ্টা।

সাবাড় করবে কাপলান আর ওখানে থাকবে না বলে! আমার এ খবর তার কাণে গেলে সে সোজা উঠবে গিয়ে হাইতিতে!—ঘনাদা অতি সহজ করে বোঝালেন।

কোথায়! মূর্তিমান জালা দশরথের হাবভুবন খাওয়া অবস্থা।

হাইতিতে!—ঘনাদা ধৈর্যের অবতার হয়ে বোঝালেন, হাইতি-র নাম শুনেছেন কিনা জানি না। তবে আজকালকার খবরের কাগজে কিউবা-র খবর নিশ্চয়ই চোখে পড়েছে। হাইতি আর কিউবা হ'ল উত্তর আর দক্ষিণ আমেরিকার কোলের কাছে অতলান্তিক মহাসাগরের দুটো পাশাপাশি দ্বীপ। হাইতি অবশ্য একটা বড় দ্বীপের অংশ। ম্যাপে কিউবাকে গেলবার জন্য একটা কুমীরের মাথা যেন হাঁ করে আছে দেখবেন। ওই মাথাটাই হ'ল হাইতি আর বাকিটা ডোমিনিয়ন রিপাবলিক।

ওই কাপলান না কে বললেন, আপনার সেই অংশীদার? তা তিনি শব্দক চড়ানো ছেড়ে হাইতিতে গিয়ে উঠবেন কেন?—সিড়িঙ্গেগ নফরবাবু গুছিয়ে প্রশ্নটা করে ফেললেন কোনমতে।

উঠবে ওখানে কুরুক্ষেত্র বাধাতে। একবার তাকে ঠেকিয়েছি আর তো সে আমার কথা শুনবে না!—ঘনাদা যেন নিরুপায়, সব লণ্ডভণ্ড করে ওই দুষমন শয়তান ডিরেক্টার দস্তা-লিয়েরটাকে যদি সরায় তাতে অবশ্য আপত্তির কিছু নেই। একটু আফশোষ শুধু এই যে সোনার পালকগুলো যেখান থেকে মাঝে মাঝে এদিকে-ওদিকে ছিটকে এসে দুনিয়াকে চমকে দেয়, বৃটিশ গায়নার অজগর জঙ্গলে লুকোন সেই রহস্যপুরী এলডোরাডোর হদিস আর কেউ কোনদিন পাবে না। একেবারে ন্যাকের ডগা দিয়ে কুবেরের ভাণ্ডার ফস্কে যাবে!

একটু থেমে ঘনাদা যেন তাচ্ছিল্যভরেই সব উড়িয়ে দিয়ে হেসে বললেন, তা যাক! হোক না কোটি কোটি টাকা! টাকাটাই তো আর সব নয়। দেশের কাজ তারও আগে। হ্যাঁ, বলুন কী করতে হবে?

মাথায় চাঁকি বাজি থামাতেই আমরা তখন যে যেখানে পারি বসে পড়েছি।

নেহাৎ কুস্তির-বন্ধ-খাওয়া ঘাড়ে বসানো বলেই জালা-প্রমাণ দশরথ আর পিপের দোসর বিশের মাথা দুটো একটু বোধ হয় বেশী মজবুত আর নিরেট। তারা দুজনেই তখনও পর্যন্ত ততটা কাবু হয়নি।

জালা-প্রমাণ দশরথই ভাঁটার মতন চোখ দুটো প্রায় ঠেলে বার করে বললে, না, না, দাঁড়ান। ওই কুবেরের ভাঁড়ার যা বললেন, আপনার ওই কাপলান শব্দক চরানো ছেড়ে চলে আসবে বলেই আর তার খোঁজ পাওয়া যাবে না? তা কাপলান চলে আসবে কেন?

আসবে আমার খবর পেয়ে। আমি কথার খেলাপ করে', কড়ার ভাঙছি বলে—ঘনাদার মুখের হাসিটা দুঃখের-ই নিশ্চয়। কিন্তু আমরা তাইতেই প্রমাদ গণলাম।

কী কড়ার!—আমাদের ভাড়াটে চার মূর্তির মুখে একই প্রশ্ন সমস্বরে উঠবে আমরা যেন জানতাম।

কী কড়ার?—ঘনাদা আমাদের সকলের মুখের উপরই একবার যেন ক্লান্তভাবে চোখ

বাড়িয়ে নিয়ে অনিচ্ছার সঙ্গে প্রকাশ করলেন, সে কড়ার বোঝাতে গেলে ক্রীস্টোফার কলম্বাসের সাঁটা মেরিয়া জাহাজ ১৪৯২ খ্রীস্টাব্দের ঠিক বড়দিনের সকালে যেখানে চড়ায় আটকে গিয়েছিল আর চল্লিশ জন শ্বেতাঙ্গ নাবিককে যেখানে নামিয়ে রেখে গিয়ে নতুন আবিষ্কৃত মহাদেশে প্রথম ইওরোপের উপনিবেশ তিনি পত্তন করেছিলেন, সেই ক্যাপ হাইতিয়েনে একবার যেতে হবে।

এখন?—জালামূর্তি দশরথের সশঙ্ক প্রশ্ন।

ঘনাদা একবার শুধু দশরথের দিকে তাকালেন। মনে হল দশরথের জালা যেন সে দৃষ্টির সামনে বড়া হয়ে গেল।

সিড়িঙ্গে নফরবাবু তাড়াতাড়ি সামাল দিতে দশরথকে ধমক দিয়ে বললেন, কিছু না বুঝে যা তা বলে বসেন কেন? যেতে হবেটা হল কথার প্যাঁচ। বুঝলেন?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি ঠিক বুঝেছি! পিপের দোসর বিশে নিজের উৎসাহটা আর চেপে রাখতে পারলে না,—আজকাল গল্পেটল্পে ওই রকম সব প্যাঁচ ট্যাচ থাকে। আপনি বলে যান ঘনশ্যাম-বাবু, ওরা না পারে আমি ঠিক সমঝে যাবো।

আমরা চারজনে পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলাম। কখন যে এ আসরে আমরা ফালতু হয়ে গেছি, টেরও পাইনি।

উপযুক্ত সমঝদার পেয়েই বোধ হয় খুশী হয়ে ঘনাদা ধরলেন, তারিখটা বলবার দরকার নেই। তবে একটা ছোট মাছধরা লঞ্চে কিউবার সান্তিয়াগো বন্দর থেকে জেলে সেজে লুকিয়ে হাইতির ক্যাপ হাইতিয়েন বন্দরে যখন গিয়ে নামলাম তখন হাইতি-র হাওয়া গরম হয়ে আছে চাপা বিদ্রোহের আগুনে। হাইতি-র পক্ষে এরকম ব্যাপার অবশ্য নতুন নয়। কলম্বস যেদিন এই দ্বীপটিতে নোঙর ফেলেন সেদিন থেকে শান্তির মুখ এ দেশ দেখেনি বললেই হয়। কলম্বস চল্লিশজন এসপানিওলকে উপনিবেশ গড়বার জন্য সেখানে রেখে যান। তাদের অমানুষিক অত্যাচারে ওদেশের আদিবাসীরা নির্মূল হয়ে গিয়ে এমন অবস্থা দাঁড়ায় যে বিশ বছর বাদেই কাজ করবার লোকের অভাবে ওখানে কাফ্রী ক্রীতদাস আমদানি শুরু হয়ে যায়। ইতিহাসের পাতা উল্টোবার পর দেখা যায় সেই কাফ্রিবংশের লোকেরাই হাইতির প্রধান বাসিন্দা। তারা স্বাধীন হয়েছে দেড়শ বছরের ওপর, কিন্তু সে স্বাধীনতা আগাগোড়া মারামারি কাটা-কাটির রক্তে ছোপানো।

আমি যখন হাইতি-তে গিয়ে পৌঁছলাম তখন দুটি দলের ক্ষমতার লড়াই-এ সমস্ত হাইতি ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়ছে।

দুটি দলের একটি হ'ল দুভালিয়েরের আর একটি বার্বটের। তখনও দুজনের কেউই ডিরেক্টার হয়ে বসতে পারেনি। শুধু তার তোড়জোড় চলছে। তোড়জোড় মানে বাইরে লোক দেখানো সভা-সমিতি-মিছিল, রাজ্যময় পোস্টার আর খবরের কাগজের লেখা। আর তলে তলে বিপক্ষদলের বড় ছোট যাকে পারা যায় গোপনে হয় হাইতি থেকে নয় তো একেবারে পৃথিবী থেকেই সরিয়ে দেওয়া।

দুভালিয়ের কি বার্বট, কারুর দলের সঙ্গেই আমার সম্ভব নেই। দুজনেই যে সমান পাষণ্ড তা আমি ভাল করেই জানি। আমার হাইতি-তে থাকা কোন দলেরই মনঃপূত নয়। যে দলই হোক আমায় একবার ধরতে পারলে যে ছেড়ে কথা কইবে না এ-বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। বিশেষ করে দুভালিয়ের-এর দল তো আমায় পেলে কাঁচা চিবিয়ে খাবে। কারণ তাদের অনেক কীর্তি এর আগে ইওরোপ-আমেরিকার ওপর মহলে আমি ফাঁস করে দিয়েছি।

দুই দলের কারুর কাছেই রেহাই পাব না জেনেও লুকিয়ে যমরাজের আপন দেশে ঢুকে-ছিলাম শুধু একটি মানুষকে খুঁজে বার করতে। যেমন করে হোক তাকে খুঁজে না বার করলেই আমার নয়। নাম, ধাম সব কিছুই সে যে এখানে এসে বদলেছে তা জানতাম। শুধু একটি চাবিকাঠি ছিল আমার ভরসা।

কিছুদিন নানা সাজে গোপনে ক্যাপ হাইতিয়েন থেকে পোর্ট-অ-প্রিন্স হয়ে লেস কেয়েস এমনকি পশ্চিম প্রান্তের ডেম মেরী পর্যন্ত চক্কর দিয়ে বেড়িয়ে কোন হদিস না পেয়ে সেই চাবিকাঠিটাই কাজে লাগালাম।

পোর্ট-অ-প্রিন্সের এক 'ভু-ডু'-র আসরে ওঝা সেজে গিয়ে ঢুকলাম একরাত্রে।

কী..কী..কীসের আসর বললেন?—দশরথ কাঁপা গলায় জিজ্ঞাসা করলে।

ভু-ডু-র।—ঘনাদা চকিতে একবার আমাদের চারজনকে দেখে নিয়ে বুঝিয়ে বললেন, ভু-ডু হল ঝাড়ফুক তন্ত্র-মন্ত্রের একরকম ডাকিনী বিদ্যা। হাইতির লোকেরা নামে খ্রীশ্চান কিন্তু ভেতরে ভেতরে আফ্রিকার পূর্বপুরুষদের ধর্ম-কর্ম-সংস্কার তাদের মধ্যে এখনও প্রবল। প্রতি শনিবার রাত্রে হাইতির নানা জায়গায় গোপনে এই সব ভু-ডুর আসর বসে। সেখানে ভু-ডু-র ওঝারা নানারকম অদ্ভুত ক্রিয়া-কলাপ দেখায়।

গিয়ে দেখি ভু-ডু-র অনুষ্ঠান শুরু হয়ে গেছে।

ঢোলক বাজছে আকাশ ফাটিয়ে আর সেই সঙ্গে ঘোড়ার নালে লোহার সিকের আওয়াজ।

দুটো কালো মুর্গী জবাই করবার পর উদ্দাম নৃত্য শুরু হ'ল। সে নাচ থামবার পর আরম্ভ হ'ল ভু-ডু ওঝার বাহাদুরীর খেল।

কার ক্ষেতে গতবার ভালো আখ হলেনি; এ বছরও অজন্মা যাবে কি না সে জানতে এসেছে ওঝার কাছে।

ওঝা দুটো লম্বা কাঠি মেঝের উপর রেখে খানিক খুব ভড়ং করে হিজিবিজি মন্তর আউড়ে বললে, দেবতারা তো কথা বলেন না। তাঁরা এই কাঠি দুটো দিয়েই তাদের মত জানাবেন। ডান ধারের কাঠিটা যদি নিজে থেকে নড়ে এগিয়ে যায় তাহলে শুভলক্ষণ। আখ হবে বাঁশের মতন মোটা। আর বাঁ ধারের কাঠি যদি এগোয় তাহলে আখের ক্ষেত শুকিয়ে ঝাঁটার কাঠি হয়ে যাবে।

তারপর বিজ বিজ করে ওঝা আবার খানিক মন্তর পড়তেই সত্যি সত্যি কাঠি দুটো নড়ে উঠল। প্রথমে ডান দিকেরটা, তারপর বাঁ দিকের।

ওঝার তখন কী বড়াই! হেঁকে হেঁকে শোনালে সকলকে, দেবতা সাড়া দিয়েছেন। তার ডাকে সাড়া না দিয়ে পারেন! কাঠিগুলো জ্যান্ত হয়ে উঠেছে তার মন্তরে!! এবার যে কাঠি এগিয়ে যাবে আর তাই দিয়েই বোঝা যাবে চাষীর কপাল এ বছরে ভালো না মন্দ!!

ওঝার কথা শেষ হতেই হো হো করে হেসে উঠলাম।

ভু-ডু-র আসরের সবাই প্রথমে একেবারে যেন জমে পাথর।

ওঝার চোখ দিয়ে আগুন ঠিকরে বেরুচ্ছে। ছোবল দিতে ফণা তোলা সাপের মতন হিস্‌হিসিয়ে বললে, কে, হাসল কে? কে করলে দেবতার অপমান?

সকলের চোখ তখন আমার দিকে। এখুনি বুঝি ঝাঁপিয়ে পড়ে আমাকে ছিঁড়ে টুকরো করে ফেলবে।

চোখের একটা পাতাও না ফেলে সোজা এগিয়ে গিয়ে কাঠি দুটোর কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে বললাম, হেসেছি আমি—তোমার বিদ্যের দৌড় দেখে। কিন্তু দেবতার অপমান আমি করিনি, করেছ তুমি।

আমি করেছি দেবতার অপমান!—ওঝা প্রায় আমার গলা টিপে ধরে আর কি?

হ্যাঁ, ভুল মন্তর পড়ে অপমান করেছ!—কাঠিগুলোর ওপর হাত নেড়ে বললাম, দেবতার রাগে কাঠিগুলো তোমার ডাকে আর তাই নড়বে না। কৈ নড়াও দেখি, কতবড় তোমার মুরোদ।

পারলে শুধু চোখের আগুনেই ওঝা আমায় তখন ভস্ম করে দেয়। কিন্তু তখন আসরের সবাই ভু-ডু-র লড়াই-এর লোভে মেতে উঠেছে। ওঝার দলেরই লোক হলেও তারা আমাকে জব্দ করবার জন্যই ওঝার বাহাদুরী দেখতে চায়। সবাই প্রায় এক সঙ্গে চেঁচাতে

লাগল, হ্যাঁ হ্যাঁ, কাঠি নাড়িয়ে দেখিয়ে দাও এ নচ্ছার বেয়াদপটাকে। কাঠি যদি নড়ে তাহলে ওর ওই ঝুঁটো কথার জিভটা আমরা টেনে ছিঁড়ে নেব।

আমার দিকে কটমট করে তাকিয়ে ওঝাকে অগত্যা আবার বিজ বিজ করে মন্তর পড়তেই হল।

কিন্তু কাঠি আর নড়ে না।

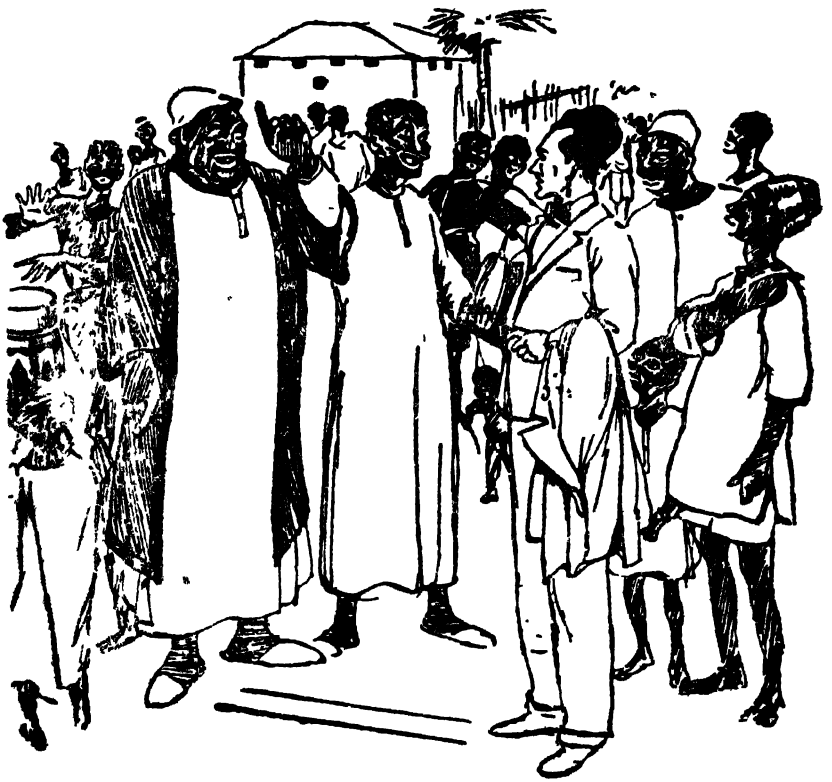

ওঝা হাত পা ছুঁড়ে পাগলের মতন লাফ দিয়ে চিৎকার করে চুল ছিঁড়ে দাঁত খিঁচিয়ে হুলুস্থুল বাধিয়ে ফেলল, তবু কাঠি দুটো যেমন ছিল তেমনি রইল পড়ে।

প্রথমে একটু আধটু গুন্‌গুন্‌ তারপর ভন্‌ ভন্‌ তারপরে একেবারে খোলাখুলি দূর দূর।

হেসে বললাম, দেবতাকে অপমান করেছ কি না বুঝলে এখন? আরো প্রমাণ দেখাচ্ছি। যে কাঠি তোমার অত চেষ্টাতে নড়েনি, আমার কথায় এখুনি তা নড়বে। আর শুধু নড়বেই নয়, দেবতাকে কে অপমান করেছে দেখিয়েও দেবে।

বলতে বলতে কাঠি দুটো যেন লাফ দিয়ে মেঝে থেকে উঠে ওঝারই গায়ে গিয়ে পড়ল।

অ্যাঁ।

না আওয়াজটা কাঠির খোঁচা-খাওয়া ওঝার নয়, ঘনাদার মুখ থেকেও বার হয়নি। নিজের অজান্তে সশব্দ বিস্ময়টা প্রকাশ করে ফেলেছেন সিড়িঙ্গে নফরবাবু। কোনরকমে হাঁ-করা

মুখের দড়টো ঠোঁট আবার মিলিয়ে তিনি বললেন, আপনি সত্যিসত্যি ভূতের ওঝাটাকে হারিয়ে দিলেন!* তার মানে, আপনি ওই ভু-ডু না কি বললেন, তার ওস্তাদ। কোথায় শিখলেন?

হুডিনি-র কাছে!—শিবুর বোধ হয় মুখ ফস্কেই বেরিয়ে গেল।

কী বলছেন মশাই!—পিপের মাসতুতো ভাই বিশে-ই আগে ক্ষেপে উঠল, হুডিনি মানে সেই যাদুকরের কথা বললেন তো। সে ভু-ডু-র জানত কী? ঘনশ্যামবাবু তার কাছে শিখতে যাবেন কোন্ দুঃখে। ভু-ডু আর ভোজবাজি এক নয়, বুঝেছেন।

টিপ্পনি কাটতে যাচ্ছিলাম, হ্যাঁ, ভোজবাজি হলে তো কাঠিতে বাঁধা কালো সুতো দড়টো হাত নাড়বার ছলে হাতিয়েই তাক লাগিয়ে দেওয়া যেত। কিন্তু জনমত যে-রকম চড়া তাতে সুশীল সুবোধ হয়ে পিপের ভাই বিশের কথাই মেনে নিয়ে নীরব হতে হ'ল এর পর।

ঘনাদা আমাদের দুরবস্থাটা যেন দেখতে চান না এই ভাবে চার মূর্তির দিকেই মুখ ফিরিয়ে রেখে আবার ধরলেন,—কাঠি দড়টো ওঝার গায়ে গিয়ে লাগতেই একেবারে হৈ চৈ পড়ে গেল।

হাত তুলে গণ্ডগোল থামিয়ে বললাম, শোনো, হাইতি-র ভাই সব। এ সব পুঁচকে ওঝার সঙ্গে লড়ে সময় নষ্ট করতে আমি আসিনি। আমি এসেছি হাইতির ভু-ডু-র চেয়ে আমার দেশের ভু-ডু-র তেজ যে বেশী তাই চোখের সামনে প্রমাণ করতে। আর শনিবারে সেই ভু-ডু-র লড়াই হোক। তোমাদের সর্দার ওঝা যদি কেউ থাকে ডাকো। তার জারিজুরি যদি আমি না ভেঙে দিতে পারি তো আমার মাথা মুড়িয়ে গাধার পিঠে চড়িয়ে তোমরা আমায় নিজের দেশে পাঠিয়ে দিও।

তাই পাঠাবো। তবে তার আগে ছাল চামড়াটা ছাড়িয়ে নিয়ে। ওঝা দাঁত কিড়মিড়িয়ে বললে,—কিন্তু কোথায় তোর দেশ? কোথাকার ভু-ডু নিয়ে তুই লড়তে এসেছিস?

হেসে বললাম, দেশ আমার অনেক দূরে। কিন্তু যেখানে দুনিয়ার সবচেয়ে বড় অজগর অ্যানাকোণ্ডা নদী-জলার তলায় কুণ্ডলী পাকিয়ে এলডোরাডোর যখের ধন পাহারা দেয়, সেই গায়নার ভু-ডু আমি শিখে এসেছি। আর শনিবারে সেই ভু-ডু-র দাপটই দেখাবো। মর্জি হ'লে এলডোরাডোর সোনার পালক আমদানি করেও তোমাদের চক্ষু সার্থক করতে পারি।

শেষ কথাগুলো শুনতে নেহাৎ অবশ্যি। কিন্তু তাতেই আসল কাজটা হবে আঁচ করে ভুল করিনি।

পরের শনিবার পর্যন্ত ভু-ডু-র লড়াই-এর জন্যে অপেক্ষা করতে হল না। হাইতি দেশটাই ভু-ডু-র নামে পাগল। ছেলে বুড়ো গরীব বড়লোক শিক্ষিত অশিক্ষিত সবাইকারই প্রকাশ্যে বা গোপনে ভু-ডু-র সঙ্গে একটু আধটু সংস্রব আছেই। আমার কথা দু তিন দিনের মধ্যেই লোকের মুখে আর ঢাকের বাদ্যিতে প্রায় সারা হাইতিতেই ছড়িয়ে গেছে।

যেখানে দরকার সেখানেও যে টনক নড়েছে, তা হপ্তা পুরো হবার আগে বৃহস্পতিবারই বুঝতে পারলাম।

পোর্ট-অ-প্রিন্সের রু-ম্যাকাজু নামে একটা রাস্তায় একটা সাধারণ সস্তা গোছের হোটেলে ইচ্ছে করেই তখন আছি।

বৃহস্পতিবার রাত বারটার পর হঠাৎ ঘরের ফোন বেজে উঠল।

নিচে থেকে রাত্রের হোটেল ক্লার্কই ফোন করছে। ইনিয়ে বিনিয়ে এত রাত্রে বিরক্ত করবার জন্যে মাপ চেয়ে সে যা বললে, তার মর্ম হ'ল এই যে আমার সঙ্গে দুজন ভদ্রলোক হঠাৎ দেখা করতে এসেছেন। আমি কি তাঁদের জন্যে নিচের লবীতে নামব, না, তাঁরাই আমার ঘরে যাবেন, জানতে চায় সে। ভদ্রলোকেরা বলছেন বড় জরুরী দরকার, তাই বাধ্য হয়েই আমাকে এ ভাবে বিরক্ত করতে হচ্ছে বলে হোটেল ক্লার্ক দুঃখিত।

গল্পটা ঘুমে যেন জড়িয়ে আসছে এই ভাবে বললাম, আমিও দুঃখিত। ওদেরকে বলে

দিন, এত রাত্রে কোন ভদ্রলোক কারুর সঙ্গে আগে থাকতে কথা না থাকলে দেখা করতে আসে না। সুতরাং, যাঁরা এসেছেন তাঁরা আপাততঃ জাহান্নমে গিয়ে কাল সকালের জন্য অপেক্ষা করতে পারেন।

বলেই ফোনটা সশব্দে নামিয়ে রাখলাম।

মতলব ভেঁজে নিয়েই তারপর বসে ছিলাম। বেশীক্ষণ অপেক্ষাও করতে হল না। কয়েক সেকেণ্ড বাদেই বাইরে সিঁড়িতে চার জোড়া ভারী বুট জুতোর আওয়াজ শুনতে পাওয়া গেল।

দুজনই দেখা করতে এসেছেন ফোনে শুনেছিলাম, বাকি দুজন বুঝলাম ফাউ।

প্রস্তুত হয়েই ছিলাম দরজায় প্রথম ধাক্কাটায় সাড় দিলাম না।

দ্বিতীয়বার ধাক্কা দিতে ঘুমে জড়ানো গলায় বললাম, কে? কে এত রাত্রে বিরক্ত করছে?

ভারী গলায় হুঁইতির বিচিত্র ফরাসী উচ্চারণে হাঁক এল, দরজা খোল।

কে হে তোমরা বাপু রাত দুপুরে জ্বালাতন করতে এসেছ? এটা হোটেল না শুঁড়িখানা? দরজা খুলব না। কালই আমি এখানকার পুলিসকে সব জানাচ্ছি!—বেশ ঝাঁঝিয়ে বললাম।

কাল জানাতে হবে না, এখনই জানাতে পারবে। আমরাই পুলিস।

পুলিস! শুনে যেন আঁৎকে ওঠার ভান করলাম। তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দিয়ে মুখটা কাঁচুমাচু করে বললাম, আমার কাছে পুলিস কেন? আমি কোন অপরাধ তো করিনি।

কী করেছ না করেছ যেখানে নিয়ে যাচ্ছি সেখানে গিয়ে বোলো!—চারজনের মধ্যে সবচেয়ে যার জাঁদরেল চেহারা সেই আমায় ধাক্কা দিয়ে ভেতরে ঠেলে বললে, নাও, তৈরী হয়ে নাও, জল্দি!

কী তৈরী হব? কেন?—আমি যেন দিশাহারা।

চারজন ষণ্ডাই তখন ঘরের ভেতর ঢুকে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়েছে। সবাইকারই চেহারা যমরাজের চেলার মতন। তার মধ্যে আমার সঙ্গে যে কথা বলেছে সেই-ই সর্দার। সে ত একেবারে যমরাজের দোসর বললেই হয়।

সেই সর্দার একেবারে রক্তচক্ষু হয়ে বললে কেন, সে কৈফিয়ত তোমায় দিতে হবে না কি? ভালোয় ভালোয় জামাকাপড় পরে নেবার সময় দিচ্ছি। নইলে ওই শোবার পোশাকেই যেমন আছ সেই হালেই হেঁচড়ে নিয়ে যাবো।

শুনে যেন ঘাবড়ে গেলাম। আমতা আমতা করে বললাম, কিন্তু তোমরা যে পুলিস তার প্রমাণ কী?

চারজনের হাতেই এবার একসঙ্গে রিভলভার উঠে এল খাপ থেকে।

সর্দার বললে, প্রমাণ এই। এখন জ্যান্ত যেতে চাও না, লাশ হয়ে—সেটা ভেবে নাও।

ভয়ে একেবারে যেন কেঁচো হয়ে বললাম, না, না—লাশ হয়ে যাব কেন! এখুনি আমি তৈরী হয়ে নিচ্ছি। দোহাই তোমাদের, ওই রিভলভারগুলো একটু সরিয়ে রাখো।

যাক্ সুবুদ্ধি তাহলে হয়েছে।—বলে সর্দার রিভলভারটার খোঁচা দিয়েই পোশাক ছাড়বার স্ক্রীনের দিকে আমায় ঠেলে দিলে।

খানিকটা বাদেই তৈরী হয়ে ফাঁকাশে মুখে বেরিয়ে এসে করুণ মিনতির সুরে বললাম, আচ্ছা, ওই ড্রয়ারটা খুলে আমার একটা জিনিস সঙ্গে নিতে পারি?

কী?—গর্জন করে উঠল সর্দার।

ছোট্ট একটা পিস্তল। তোমাদের ওই কোল্ট রিভলভারের চেয়ে অনেক ছোট। প্রায় ওর ছানাপোনার মতো। বিপদে আপদে সঙ্গে থাকা ভালো।

জবাবে ঘাড়ে একটা রদ্দা খেয়ে যেন মেঝেতে গড়িয়ে পড়লাম।

সর্দারের ইঙ্গিতে [illegible] পাঞ্জাকোলা করে সিঁড়ি দিয়ে আমায় নামিয়ে নিয়ে গেল। তখন নিচে হোটেল ক্লার্ক সভয়ে তার কাউন্টারের পাশে দাঁড়িয়ে কাঁপছে।

যেতে যেতে করুণ সুরে তাকে বলে গেলাম, তোমাদের হোটেলের বিল কিন্তু বাকি রইল। বকসিসটাও দিয়ে যেতে পারলাম না।

মাথায় একটা গাঁট্টা দিয়ে যমদূতেরা হোটেলের বাইরে আমায় এনে ফেললে।

একটা কালো রঙের ঢাকা গাড়ি সব আলো নিভিয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে। গাড়ির ভেতর আমায় ঢুকিয়ে, সামনে দুজন আর পেছনে দুজন আমার দুপাশে বসে আমার চোখের ওপর একটা কালো রুমাল বেঁধে দিলে।

কাতরস্বরে বললাম, আমি কিন্তু বাবা মস্তফা নই।

কী বকছিস্ হতভাগা?—সর্দার মুখে একটা ধাক্কা দিলে।

ককিয়ে উঠে বললাম, খামোকা মারছ কেন? বাবা মস্তফার নাম শোনোনি। আলিবাবার গল্প তো শুনেছ? না শুনে থাকে তো বলতে পারি খুব মজার।

আর একটা থাবড়া দিয়ে সর্দার বললে, তোর কিসের মজার কথা এখন ভাবা হতভাগা! টুঁ শব্দটি আর করেছিস তো দাঁতগুলো উপড়ে দেব।

অগত্যা ভয়ে ভয়েই যেন চুপ করে রইলাম।

বেশ একটু ঘুরপাক খাওয়ার আধঘণ্টা বাদে এক জায়গায় এসে গাড়ি থামল।

গাড়ি থেকে আমায় টেনে নামিয়ে চোখ বাঁধা অবস্থাতেই একটা বাড়ির ভেতর নিয়ে গেল তারপর।

যেতে যেতে দুবার আমি কাশলাম, হোঁচট খেলাম একবার সিঁড়ি দিয়ে ওঠবার সময়। আর, পায়ে পায়ে জড়িয়ে পড়েই গেলাম একবার প্রায় আছাড় খেয়ে।

হোঁচকা টানে আমায় তুলে প্রায় ঝুলোতে ঝুলোতে একটা বড় ঘরের ভেতর ঢুকিয়ে দিয়ে সর্দার আমার চোখের বাঁধনটা খুলে দিয়ে বললে, নকটাকে জ্যান্তই এনেছি, হুজুর।

বাঁধা চোখ এতক্ষণ বাদে খোলার পর প্রথমটা মিটমিট করে তাকিয়ে সব একটু ঝাপসা লাগল। তাতেও হুজুর বলে কাকে সম্বোধন করা হয়েছে বুঝতে কষ্ট হল না।

আমি যদি নকটা হই তাহলে তিনি গরিলার খুড়তুতো ভাই। সমস্ত দরজা-জানালা বন্ধ করা একটি বেশ বড় ঘরের এক পাশের একটি বিরাট টেবিলের ধারে কায়দার পাহাড়ের মতো বসে আছেন।

তাঁর দিকে তাকিয়ে বেশ সসম্ভ্রমে কাঁদো-কাঁদো গলায় নালিশ করলাম, আপনার পোষা গুণ্ডাগুলো মিছিমিছি আমায় হয়রান করেছে, হুজুর।

ভাঁটার মতো চোখ দুটো কুঁচকে বিদ্রূপের স্বরে হুজুর বললেন, তাই নাকি?, বড় অন্যায় তো!

আজ্ঞে হ্যাঁ, অন্যায় নয়?—আমি গলায় সরলতা মাখিয়ে বললাম, আমি পাশের হোটেলে থাকি, সেখান থেকে এখানে আনবার জন্যে আধঘণ্টা এ-রাস্তা ও-রাস্তা ঘোরাবার কিছু দরকার ছিল?

গরিলা-হুজুরের চোখ দুটো এক মুহূর্তে আগুনের চাটই হয়ে উঠল। গুণ্ডা চারটের দিকে ফিরে ইঞ্জিনের স্টীম ছাড়ার মতো আওয়াজ ছাড়লেন,—কী শুনছি।

খানিক আগে পর্যন্ত কেঁদো বাঘ হয়ে যা হাঁকার ছেড়েছে, সেই সর্দার এক নিমেষে নেংটি ইঁদুর হয়ে চিঁ চিঁ করে যেন কাতরে উঠল,—আমরা হুকুমমতো চোখ বেঁধেই এনেছি হুজুর। আপনার সামনেই তো ওর চোখের বাঁধন খুললাম।

তাহলে ও জানল কী করে?—হুজুর গর্জন করে উঠলেন।

জানি না হুজুর। সর্দারের গলার সঙ্গে সমস্ত শরীরটাই বুঝি তখন কাঁপছে।

নেহাত হাঁদা বেকুফ সেজে বললাম, আপনার হয়ে ওর কানটা মলে দেব, হুজুর?

কী!—হুজুর প্রথমটা রাগেই ফেটে পড়বেন মনে হ'ল; তারপর হঠাৎ ঘর কাঁপিয়ে হেসে উঠে বললেন—কান মলে দিবি! তুই? তাই দে দেখি। অবশ্য যদি নাগাল পাস।

নাগাল ঠিক পাব, হুজুর! কিন্তু গদলি গোলা যদি ছোঁড়ে তাই ভয়!

না না, গদলি ছুঁড়বে না!—হুজুর তখন আমার মতো গাঁইয়া একটা উজবুকের নাকাল দেখবার জন্যে মেতে উঠেছেন। হুকুম করলেন—রিভলভার ফেলে দে, গোবো।

সর্দার, মানে গোবো, রিভলভারটা খাপ থেকে বার করে ফেলে দিয়ে আবার কেঁদে বাঘ হয়েই আমার দিকে ফিরে দাঁড়াল। আক্রোশে অপমানে তার দাঁত কিড়মিড়ের আওয়াজ পর্যন্ত আমি তখন শুনতে পাচ্ছি।

গাছ থেকে যেন ফল পাড়তে যাচ্ছি এমনিভাবে আনমনার মতো একটা হাত তুলে গোবোর দিকে এগিয়ে গেলাম।

সেই হাত মুচড়ে ধরে গোবো যে ঝটকান দিলে তাতে মেঝেয় আছড়ে পড়ে যেন কাতরাতে কাতরাতে উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, আপনার গোবো একটু বেয়াড়া হুজুর! কান মলতে দিতে চায় না!

হুজুরের হাসিতে ছাদটাই বুঝি খসে পড়ে। হাসতে হাসতেই বললেন, তুই কী চাস তাই বল। এখনো কান মলার সাধ আছে?

আছে বই কি হুজুর!—আমি একেবারে সাদাসিধে ভালোমানুষ,—ওর কান না মললে আমার মান থাকবে না যে!

এবার হুজুরের সঙ্গে তাঁর বাহনদের হাসিও থামতে চায় না।

হাসির হাসি থামিয়ে শেষে বললেন, হুঁ, বেজায় মানী লোক তুই বুঝতে পারছি। মানটা যাতে থাকে তাহলে তাই দেখ।

যে আজ্ঞে হুজুর! বলে আবার আগের মতোই একটা হাত তুলে এগিয়ে গেলাম। গোবো মোচড় দিয়ে ধরবার চেষ্টা করল। তারপর হুজুরের টেবিলটাই মড মড করে উঠল দু মণী গুতরটা সশব্দে তার ওপর পড়ায়।

জানি! জানি! ধোবিকা পাট!—বিশে আর নিজেকে সামলাতে পারল না উচ্ছ্বাসের চোটে—ওই একটি প্যাঁচ ঠিক মতো লাগাতে পারলে কুম্ভকর্ণও কাবু!

না না, ধোবি কা পাট নয়—দশরথ মুরুব্বির নতুন বিশেকে শোধরালে,—ও হল বাংলা কাঁচি।

উঁহুঁ, ওটা হাফ নেলসন!—এতক্ষণ ধৈর্য ধরে থেকে গৌর আর ফোড়ন না দিয়ে পারলে না।

দূর! স্রেফ জুডো!—আমিই বা কেন কম যাই।

উঁহুঃ সুমো!—শিশির আমাদের সকলের উপর টেক্কা দিতে চাইল।

ঘনাদা অবজ্ঞাভরে আমাদের দিকে চেয়ে, শেষ পর্যন্ত কী বুঝে দশরথকেই গাছে তুললেন। বললেন,—না, দশরথবাবুই ঠিক বলেছেন। বাংলা কাঁচিই চালিয়েছিলাম। হুজুরকে তখন নিজেকে বাঁচাতে পেছনে হেলতে হয়েছে। ধীরে সুস্থে এগিয়ে গিয়ে টেবিল থেকে আধমরা লাশটাকে তুলে যেন ফাঁপরে পড়ে বললাম,—কিন্তু কোন্ কানটা মলব ঠিক করতে পারছি না যে, হুজুর! আপনি যদি বলে দেন!

হুজুর তখন সামলে উঠে অত্যন্ত সন্দিগ্ধভাবে আমার দিকে চেয়ে আছেন।

তাঁর কাছে জবাব না পেয়ে আবার বললাম, কান মলাটা আজ বরং মুলতুবি থাক, হুজুর। কান টানতে কোন্ মাথা এসে পড়ে, তাই আমার ভাবনা। আজ বরং এদের বিদেয় করে দিন। এত দূর যখন নেমন্তন্ন করে এনেছেন তখন নিরিবিলিতে দুটো প্রাণের কথা বলাবলি করি।

হুজুর কী যেন ভেবে নিয়ে অনুচরদের চলে যাবার ইঙ্গিতই করলেন। তারা গোবোকে জবরদস্তি করে নিয়ে যাবার পর আমার দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করলেন, কে তুই?

সে কি হুজুর!—আমি যেন অবাক।—আপনি এখানকার পুলিশের চাঁই। আমার পরিচয় না জেনে কি আর মিছিমিছি ধরে আনিয়েছেন। কিন্তু হোটেলের পাশের এ বাড়িটা যে পুলিসের আস্তানা তা তো জানা ছিল না।

পাশের বাড়িতেই যে তোমাকে আনা হয়েছে, তা কী করে বুঝলে? তুই থেকে তুমি-তে তুলে খাতির দেখালেও হুজুরের গলা বেশ তীক্ষ্ণ,—চোখের বাঁধন আলগা ছিল?

না, হুজুর!—আমি আশ্বস্ত করলাম, সে বিষয়ে ওদের কোন কসুর নেই। কিন্তু আমি যে এ ঘর পর্যন্ত আসতে দুবার কেশেছি, একবার হোঁচট খেয়েছি, পায়ে পায়ে জড়িয়ে পড়তে পড়তে বেঁচেছি।

তাতে কী হয়েছে!—হুজুর খাপ্পা হয়ে উঠলেন,—আমার সঙ্গে রসিকতা হচ্ছে!

জিভ কেটে বললাম, ছিঃ ছিঃ! বলেন কী হুজুর! আপনার সঙ্গে আপনারই থাবার তলায় থেকে রসিকতা করতে পারি? শুধুহাতে গোবোকেই না হয় একটু শিক্ষা দিয়েছি, কিন্তু এ বাড়িতে অমন কতো গোবো পোষা আছে তা কে জানে। আপনার একটু ইশারা পেলে এবার শুধু-হাতেও আর লড়তে আসবে না। তা ছাড়া, আপনি নিজেই আমার মতো একটা পোকাকে তো বুড়ো আঙুলে টিপে মারতে পারেন।

চুপ!—হুজুর ধমকে উঠলেন, তোমার বাজে বকবকানি শুনতে চাই না। তোমার হোটেলের পাশের বাড়ি কী করে বুঝলে!

ওই তো বললাম হুজুর। দুবার কেশে তার আওয়াজে বুঝলাম, একবার একটা বড় হল ঘর, আরেক বার একটা ঢাকা করিডরের ভেতর দিয়ে যাচ্ছি। ধাপ গুনতে গুনতে সিঁড়ি দিয়ে ওঠবার সময় হোঁচট খেয়ে পড়ে, হাত বুলিয়ে বুঝে নিলাম সিঁড়িগুলো মার্বেল পাথরের। ধাপ গুনেও টের পেলাম দস্তুরমত উঁচু চারতলা বাড়ি ছাড়া এটা হতে পারে না। তারপর, পায়ে পায়ে জড়িয়ে প্রায় আছাড় খেয়ে পড়তে পড়তে, একটা বারান্দার রেলিং ফেলে, তার ওপর যে বাহারে কারুকাজের নমুনা পেলাম তাতে সব সন্দেহ মিলিয়ে আর সন্দেহ রইল না যে, হোটেলের পাশের বাড়িতেই ঘুরপাক খাইয়ে আমায় আনা হয়েছে। হাইতির পোর্ট-অ-প্রিন্স শহরে একমাত্র বন্দর ম্যাকাজর রাস্তাতেই একটিমাত্র এতবড় শৌখিন বাড়ি আছে, এ কথা এখানকার চাষাভুষোও জানে। এ বাড়িটা হাইতি-র বিখ্যাত এক সদাগর নিজের শখ মেটাতে অজস্র খরচ করে তৈরী করেছিলেন, জানি। আপনাদের কোন রাজনৈতিক দলের কোপে পড়ে তিনি নাকি এক বছর নিরুদ্দেশ। তাঁর বাড়িটা যে কবে পুলিসের আস্তানা হয়েছে, এইটুকু শুধু জানতাম না।

হুজুর আমার কথা শুনতে শুনতে ইতিমধ্যে গোবোর ফেলে যাওয়া রিভলভারটা তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন। এবার টেবিলের পেছন থেকে বেরিয়ে এসে আমার সামনে মার্জ করের মতো রিভলভারটা হাতে ঘোরাতে ঘোরাতে বললেন, তুমি হাইতির লোক নও তুমি। কোথা থেকে কেন তুমি হাইতিতে এসেছ? ভুডুর আসরে ওরকম বাহাদুরীর ডাক কবার মানে কী? কী জানো তুমি এলডোরাডোর সোনার পালকের?

প্রশ্নগুলো বড় বেশী হয়ে গেল না, হুজুর?—সবিনয়ে বললাম, তবে একটা কথা বললেই তা থেকে সব কটা প্রশ্নের জবাব বোধহয় পেতে পারেন। আমি বৃটিশ গায়না থেকে হাইতিতে এসেছি এক নরপিশাচের সন্ধান করতে।

কে সে?—হুজুরের চোখ দুটো যেন ছুরির ফলার মতো আমায় চিরে ফেলল।

এখানে নাম ভাঁড়িয়ে কী সে হয়েছে জানি না, তবে তার আসল নাম হল ডেভিল। ডেভিল হলেই অবশ্য মানানসই হত। হুজুর যেন একটু চমকে উঠলেন। চেনেন নাকি?

না।—হুজুরের গলা থেকে চাপা গর্জন শোনা গেল।—কিন্তু তুমিই বা তার কী জানো? তাকে খুঁজছই বা কেন?

চোখে আগে না দেখলেও তার আসল মালিক ঘনদাকে আমি ভালই জানি। আর তাকে খুঁজছি পৃথিবীর সবচেয়ে দামী এক টুকরো ভাঁজ-করা কাগজ তার কাছে থেকে আদায় করব বলে, যে কাগজে কলম্বেরও ঈর্ষা করবার মত কল্পনাতীত ঐশ্বর্যের ভাণ্ডারের হদিস দেওয়া আছে, যে কাগজে তার সত্যিকার মালিক সবল উইল কাপলান নামে এক বৃদ্ধ পর্যটক, যাঁর জীবন অজানা ভয়ংকর জলদস্যুদের পদে পদে মৃত্যুর সঙ্গে লড়ে গোপন মানচিত্র আর নির্দেশ টুকে রেখেছিলেন, যে কাগজে বৃদ্ধ কাপলানের বিশ্বস্তসী সহকর্মী সেজে আমরা অজানা গভীর জঙ্গলে মালপত্র সমেত ছেড়ে সেই কাগজ চুরি করে পালিয়ে এসেছিল।

উইলের তোমার বন্ধু-হাসিমুখে গলায় এবার ঠাট্টার সুর,—কিন্তু সেই সেভিল না ডেভিলকে তুমি পাবে কোথায়? সে যদি হাইতিতেই থাকে তবে তোমার হাতে ধরা দিতে হাত বাড়িয়ে নেই নিশ্চয়।

হাত তাকে বাড়াতেই হবে। ওই সোনার পালকের টানে।—হজুরের দিকে চেয়ে হেসে বললাম, দড়ো কাপলান এলডোরাডোর আসল ঘাঁটির সন্ধানী তখনও না পেলেও কিছু-কিছু সম্পদ উদ্ধার করতে পেরেছিলেন। জঙ্গল-জলদস্যু ঘোরবার সময় তিনি সাংঘাতিক ভাবে একবার অসুস্থ হন। সেই সুযোগে তাঁকে অসহায় ভেবে ওই বিপদের মধ্যে ফেলে সেভিল তাঁর খুঁজে পাওয়া সম্পদ-ভরা ওই কাগজটা চুরি করে পালিয়ে আসে। সে তারপর এসে হাইতিতে রাজনীতির খেলায় মেতেছে, এ বিষয়ে পরে খবর আমি পেয়েছি। গুপ্তঘাতকের দল গড়ে সে হাইতির দরিদ্রদের একটিকে মোটা টাকা যে সাহায্য করছে, তাও জানি। এখানে একটা বড় দাঁও সে মারতে চায়, কিন্তু এলডোরাডোর কথাও সে ভোলে নি। তার মতো শয়তান ভুলতে পারে না। এমনকার গোলা পুলিশ সে অবশ্যই ওই চুরি করা কাগজের সাহায্যে এলডোরাডোর আসল ঘাঁটির সন্ধান না করে পারবে না। পরনের সোনার পালকের খবর টোপের মতো ফেলে তাই তাকে ধরবার চেষ্টা করেছি।

হজুরের মোটা মোটা ঠোঁট দুটো একটু ফাঁক করে বিদ্রূপভাবে হাসলেন,—কিন্তু তাকে টোপ গিলতে দিলেই তো তার জালে জড়িয়ে মরতেও তো পারো!

তা পারি। সে ঝুঁকি না নিয়ে কি নেমেছি!

হুঁ। হজুর চাপা দাঁতে দাঁত চেপে বললেন,—শুকনো বারুদের দড়িতে তেল আছে দেখছি। কিন্তু এসব কথা তুমি জানলে কোথা থেকে?

জোনেফ হজুরের এই প্রিয়তমো মদটিরই দুই শাখা, ফরাসী আর পারাকুয়ার মাঝামাঝি এক অজানা অঞ্চলে। সেখানে নিঃসঙ্গ একখণ্ড মরুতে ঘন এক বড়োর দেখা পাই। তাঁর ছোটখাটো একটা তাঁবুর তলায় মৃত্যুশয্যায় তিনি আমায় সব কথা জানিয়ে যান। তাঁকে সেখানে কবর দেবার সময় প্রতিজ্ঞা করি—পৃথিবীর যেখানেই লুকিয়ে থাক, শয়তান সেভিলকে খুঁজে বার করে তাকে কিছু শিক্ষা দিয়ে ও কাগজ আমি উদ্ধার করবই।

হজুরের চাঁটার মতো চোখ দুটো তখন অবার জ্বলতে শুরু করেছে। রিভলভারটা ঘোরানো বন্ধ করে, একটু শক্ত করেই যেন চেপে ধরে চাপা গর্জনের আওয়াজে তুমি থেকে আবার তুইতোকারীতে নেমে বললেন,—হ্যাঁ, তোর সাধ অপিগিরই পূর্ণ হবে মনে হচ্ছে। কিন্তু ও জঙ্গলে তুই কী করতে গিয়েছিলি তাই আগে বলে যা।

বলব বৈ কি হজুর!—কৃতার্থ হয়ে বললাম,—আপনাকে বলবার এ সুযোগ ছাড়তে পারি! কিন্তু তার আগে আপনার টেবিলের ধারের ওই ইলেকট্রিক বোতামটা যদি একটু টেপেন।

কেন?—হজুর অগ্নিমূর্তি হয়েও যেন একটু হতভম্ব।

না, এক গেলাস জল দরকার ছিল। বোতাম টিপে কষ্ট দিয়ে যদি আনাতেন!

ও। গলা শুকিয়ে গেছে বুঝি!—হজুরের মুখে বিদ্রূপ বিদ্রূপ।

না, হজুর,—সবিনয়ে প্রতিবাদ জানালাম,—এ শুকনো গলা আর শুকোবে কি? তবে জল এক গেলাস কাছে থাকা ভালো। কখন কী দরকার হয় কে জানে?

দরকার হলে তখন পাবি।—হুজুরের আবার শুরু হলেন, এখন যা জিজ্ঞেস করছি তাড়াতাড়ি।

তাড়াতাড়িই বলছি, হুজুর। তবে জলটা আনিয়ে রাখলে পারতেন। অবশ্য ও বেতমে টিপে জল আনানো যায় কিনা ঠিক জানি না। ও অঞ্চলের আপনার সব কটা পোষা নেকড়ে দাঁত বার করে ছুটেও আসতে পারে হয়তো এখনো! বেতমটা সেই জন্যেই, কী বলেন?

হুজুর বুঝি এবার ফেটেই পড়েন। তাঁকে যেন ঠাণ্ডা করতে তাই তাড়াতাড়ি আবার বললাম,—রাগ করবেন না, হুজুর। যা বলবার এখনি বলছি। কী করতে ওই জঙ্গলে গেছলাম, জিজ্ঞেস করছেন তো! একবার গেছলাম ওই ম্যানাটি মানে শুশুকগুলোকে চালাতে, আর একবার গেছলাম তাদেরই খবর নিতে।

কাদের খবর নিতে? হুজুরের গলার মত মনের সবটাই বুঝি এখন ছাই।

ওই ম্যানাটি, মানে একরকমের শুশুকগুলোর। বছরখানেক আগে ওই অঞ্চলের এক জলায় ছেড়ে এসেছিলাম কি না।

ওই জঙ্গলে ম্যানাটি ছেড়ে এসেছিলে! আবার খবর নিতে গেছলে তাদের? কেন?—হুজুরের মাথাটা তখনও বেশ গুলিয়ে হয়ে রেখা গেল।

আর বলেন কেন হুজুর! আমি যেন বিবর,—পাঁচজনের উস্কানিতে।

চালাকী করবার আর জায়গা পাওনি!—হুজুরের গলায় আবার এতক্ষণে গর্জন শোনা গেল, পাঁচজনের উস্কানিতে অজানা জঙ্গলে তুমি শুশুক ছেড়ে এসে আবার খবর নিতে গেছলে? কার উস্কানিতে? বল শিগ্‌গির!

আজ্ঞে, বললাম তো, ওই পাঁচজন।—নির্বিষ পোষমানা সাপের মতো বললাম,—তবে তাদের নাম বললে কি চিনবেন! তাঁরা তো আপনার চেনা লোক নয়, এদেশেরও না।

কে তারা? কোথাকার?

আজ্ঞে, প্রথম সবাই চার শ বছর আগেকার। তবে মূলে ছিলেন একজন ইংরেজের। ক্রিস্টোফর কলম্বাসকে যাঁরা দিয়ে প্রথম নিজ সরকারের উস্কানিতে তাঁর নাম হল মার্টিনেজ। ও অঞ্চলে সবার আগে সবচেয়ে বড় অভিযানে যিনি বেরিয়েছিলেন, সেই ভিনসেন্ট দ্য অর্দাজের লেফ্‌টেন্যান্ট ছিলেন মার্টিনেজ। ১৫৩১ সালে তাঁকে কিভাবে তাঁকে উদ্ধার করে, সোনা যেখানে পাওয়া যায় সেখানে নিয়ে যায় সেখানে দেশ এলডোরাডোর রাজা তাঁর সম্বর্ধনা করেন, মার্টিনেজ তার বিবরণ দিয়ে গেছেন। মার্টিনেজের পর উস্কানিতে পেয়েছি ওরেলানা মানে। তাঁর অভিযান ১৫৪১-৪২। তারপর আছেন ফিলিপ হুটেন, ১৫৪১ থেকে ১৫৩৬ পর্যন্ত তিন তিনবার এলডোরাডোর খোঁজে বেরিয়েছিলেন। এলডোরাডোদের মধ্যে শেষ উস্কানি পেয়েছি পেদ্রোজালা ডিমেনেস দ্য কোয়েসাদার কাছে। তাঁর অভিযান ১৫৬৯ সালের।

এর পর যিনি উস্কানি দিয়েছেন তাঁর নাম হয়তো শুনে থাকতে পারেন, তিনি হলেন স্যার ওয়াল্টার র‍্যালে, র‍্যালে ইংলণ্ডের বিখ্যাত এক্সপ্লোরার বটে, কিন্তু এ ব্যাপারে আরো অনেক বীরের মতো সহযোগী-সৈনিক হলে জলদস্যুতায় তাঁর পেশা। স্পেনের কয়েকটা এমনিভাবে লুট-করা জাহাজের কাগজপত্র, সোনায় মোড়া তাঁর 'গোল্ডেন ফ্লিস' বা 'ওমোয়া'র খবর পেয়ে স্যার ওয়াল্টার র‍্যালে ১৫৯৫ খৃষ্টাব্দে একটি অভিযান করেন। সে অভিযানের পর ১৫৯৬-এ তিনি আবার লরেন্স কেমিস নামে একজনকে এলডোরাডোর সন্ধানে পাঠান। তারপর শেষবার ১৬১৭ সালে মৃত্যুর এক বছর আগে তিনি নিজেই আবার সেই সন্ধানে গিয়েছিলেন। সঙ্গে ছিল তাঁর ছেলে আর আগেকার প্রতিনিধি সেই লরেন্স কেমিস্। এই অভিযান থেকেই স্যার ওয়াল্টারের চরম দুর্ভাগ্য শুরু। জ্বরে পড়ে তাঁকে ত্রিনিদাদে আটকে থাকতে হয়। তাঁর ছেলে আর লরেন্স কেমিস্ পাঁচটি ছোট ছোট জাহাজ

নিয়ে এলডোরাডোর সন্ধানে যাবার পথে এক স্পেনীয় দলের সামনে পড়ে। যুদ্ধে স্যার ওয়াল্টারের ছেলে মারা পড়ে। কেমিস্ সে-দুঃসংবাদ নিয়ে ফিরে আসার পর, স্যার ওয়াল্টারের বকুনি সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করে। আর এ-অভিযান থেকে হতাশ হয়ে ইংলণ্ডে ফেরার পর, বন্দী হয়ে এক বছর পরেই স্যার ওয়াল্টারকে ফাঁসিকাঠে ঝুলতে হয়। তাই বলছিলাম হুজুর, এই পাঁচজনের উস্কানি...

থাক্! হুজুর কথাটা আর আমায় শেষ করতে দিলেন না। এতক্ষণ ধৈর্য ধরে যে চুপ করে ছিলেন সেইটেই আশ্চর্য। এবার গনগনে মেজাজে গর্জে উঠলেন,—এ-সব পালাকীর্তন তোর কাছে শুনতে চেয়েছি?

তাইতো চাইলেন, হুজুর। তাছাড়া শুনতে শুনতে আপনি একটু আনমনা হন কি না, ফালতু কথা বাড়িয়ে তাও পরখ করে দেখছিলাম!

তাই দেখছিলি!—হুজুর চিড়বিড়িয়ে উঠলেন, আমায় আনমনা করে তুই এখান থেকে সট্‌কাতে পারবি ভেবেছিস্। জানিস্ তুই কোথায় আছিস?

জানি বৈ কি হুজুর। এই চারতাল পেল্লায় যমপুরীর দরজায় দরজায়, সিঁড়িতে সিঁড়িতে পাহারা। ঘরে ঘরে আপনার সব সাঙ্গোপাঙ্গ ছোরা পিস্তল নিয়ে তৈরী হয়ে বসে আছে। ই বোতাম টিপলেই সব ছুটে আসবে। তবু ভাবছিলাম, ওদিকের বন্ধ জানালাটা খুললে হয়তো একটা খোলা বারান্দা পাওয়া যাবে। ওখান দিয়ে নিয়ে আসবার সময় বাইরের দমকা হাওয়া একটু গায়ে লাগল কি না, তাই ভাবলাম বারান্দায় একবার পৌঁছোতে পারলে, সেখান থেকে ঝাঁপ দিয়ে পাশের বাজারের ছাদের ওপর পড়া খুব শক্ত নয়। এ পথে যেতে-আসতে বাজারের ছাদটা অনেকবার চোখে পড়েছে। করোগেটের ঢালু চাল হলেও মাথাটা বেশ উঁচু। আর তেতলার বারান্দা থেকেও খুব বেশী লাফাতে হবে না। তারপর একবার বাজারের মধ্যে গিয়ে পড়তে পারলে...

আর তোর ভাবনা নেই, কেমন?—হুজুরের মুখে, বেড়াল যেন ইঁদুর ধরে খেলাচ্ছে এমন হাসি,—আমি তখন শুধু ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকব। কী বলিস?

আজ্ঞে, আশা করতে দোষ কী?—আমি করুণ সুরে বললাম।

চোপ রও! বেয়াদব!—হুজুর আবার বজ্রনাদ ছাড়লেন, সোজাসুজি বলবি কি না ও জঙ্গলে কী করতে গিয়েছিলি? কোন নিশানা কারুর কাছে পেয়েছিলি কিনা!

সোজাসুজিই তো বললাম হুজুর, নিশানা যা পেয়েছি ওই পাঁচজনের কাছেই, আর গিয়েছিলাম সবাই যে জন্যে যাব সেই জন্যেই। আমি তো আর একলা ও অপরাধ করিনি হুজুর, আজ চারশ বছর ধরে হাজার হাজার মানুষ জান প্রাণ তুচ্ছ করে ওই যমের দক্ষিণ দোরের দিকে ছুটেছে, সেই হারানো ওমোয়া-র সন্ধান করতে। পুমা, জাগুয়ার আর অসভ্য জংলীরা কত জনকে শেষ করেছে, নদী-জলায় অ্যানাকোণ্ডা আর ও-দেশের রাক্ষুসে কুমীর কেম্যানের পেটে কতজন গেছে, দুর্দান্ত বিষধর ল্যাবেরিয়া বুসমাস্টার র‍্যাটল সাপের ছোবলে কতজন প্রাণ দিয়েছে তার লেখা-জোখা নেই। তবু মানুষের লোভ, দুঃসাহস আর কৌতূহল কোন বাধা মানেনি। বহুদিন পর্যন্ত মানুষের ধারণা ছিল, গায়নার পারিমা হ্রদের ধারে ওমোয়া শহর পাওয়া যাবে। অভিযাত্রীরা সেই পারিমা হ্রদ খুঁজেছে হন্যে হয়ে। ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ফন হামবোল্ড প্রমাণ করে দেন যে, এতদিন দেশ-বিদেশের ম্যাপে যে পারিমা হ্রদের চিহ্ন দেওয়া থাকত, তার কোন অস্তিত্বই নেই। তবু কি মানুষের অভিযান বন্ধ হয়েছে, হুজুর! কোথাও এলডোরাডোর সোনায় মোড়া রাজধানী ওই অজানা জলা-জংলার দেশে লুপ্ত হয়ে আছেই, এ ধারণা সহজে যাবার নয়। যাবেই বা কী করে? এখনো ওই দেশের অজানা গহন অঞ্চল থেকে ওখানকার আদিবাসীদের হাত-ফেরতা হ'তে হ'তে একটা দুটো যে আশ্চর্য সোনার পালক সভ্যমানুষের জগতে এসে পৌঁছোয়, তার রহস্যের তো কিনারা হয়নি।

কের বকবকানি ধরেছিস!—হুজুর জ্বলে উঠলেন, ওখানে শুশুক ছাড়ার কথা কী বলছিলি?

সত্যি কথাই বলছিলাম, হুজুর!—শুশুক ছাড়ার মতলবটা অবশ্য হঠাৎ মাথায় এসেছিল। দু'বছর আগে এমনি জুন মাসের এক গরমের দিনে ত্রিনিদাদ থেকে বৃটিশ গায়নার জর্জ টাউনে যাবার একটি জাহাজে কাপলানের সঙ্গে আলাপ না হ'লে অবশ্য এ মতলব খাটাবার কথা ভাবতাম না।

দু'বছর আগে, জুন মাসে কাপলানের সঙ্গে তোর জাহাজে দেখা হয়! হুজুর একেবারে মারমুখো। আমার কাছে ধাপ্পা!

আজ্ঞে, ধাপ্পা আপনাকে দিতে পারি! কাপলানের সঙ্গেই সত্যি আমার দেখা হয়। তবে শয়তান সেভিল যে কাপলানের সর্বস্ব চুরি করে জংলীদের মাঝে মৃত্যুর মুখে ঠেলে ফেলে আসে সে কাপলান নয়। কিন্তু সেই বৃদ্ধেরই ছেলে। বহুকাল নিরুদ্দেশ বাপের কোন খবর না পেয়ে ছোট কাপলান তাঁরই সন্ধানে গায়না যাচ্ছিল। আমিও গায়নার অজানা গহন জঙ্গলে যাবার জন্য বেরিয়েছি জেনে সে আমায় সঙ্গী হ'তে বলে। সেবারেই বুড়ো কাপলানের সঙ্গে যদি দেখা হ'ত, আর যে কাগজটা পরে সেভিল তাঁর কাছ থেকে চুরি করে পালায় সেটা যদি তখন পেতাম, তাহলে ওই ম্যানাটি মানে শুশুকগুলোর ভেলকী তখনই দেখিয়ে দিতে পারতাম!

হাইতি-মার্কা একটা কড়া গালাগাল দিয়ে হুজুর গর্জালেন, নিকুচি করেছে তোর শুশুকের। সেবারে গিয়ে বুড়ো কাপলানের দেখা তাহলে পাসনি? কী করেছিলি তাহলে?

পারিমা হ্রদের পাত্তা যদি পাওয়া যায়, সেই আশায় ওই শুশুকগুলোকে ছেড়ে এসেছিলাম।

চুলোয় যাক তোর শুশুক!—আরো কি হুজুর বলতে যাচ্ছিলেন, তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বললাম, অমন কথা বলবেন না, হুজুর! ওই শুশুকের ভরসাতেই আছি।

হ্যাঁ, তোর মতো কুচোচিংড়ির আর কে ভরসা হবে! শুশুকের ল্যাজেই ঝড় কর!—হুজুর খিঁচিয়ে উঠলেন,—এখন আমার কথার চটপট জবাব দে। পারিমা হ্রদ তো গল্প কথা বলে হামবোল্ড প্রমাণ করে গেছেন। তার পাত্তা পাবার আশা তাহলে কোথায়?

হুজুরের যেন একটু নেশা লেগেছে মনে হচ্ছে!—খুশী মুখে বললাম,—শুনুন। আশা এইখানে যে হামবোল্ডের প্রমাণ তো শেষ কথা নয়। হতে পারে না। ১৫৩১-এ মার্টিনেজ ওমোয়া-য় গেছলেন বলে বিবরণ দিয়েছেন, আর হামবোল্ড পারিমা হ্রদ বলে কিছু নেই বলে প্রমাণ করেছেন উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি। মাঝখানে তিন শো বছর কেটে গেছে। তার মধ্যে পৃথিবীর গায়ের ওপর অনেক কিছু ওলট-পালট হয়েছে, বিশেষ করে গায়নায় ওই অঞ্চলে পাহাড় ভাঙা নদী জলা অনেক ওঠা-নামা করেছে বলে অনেক পণ্ডিতের ধারণা। যে পারিমা হ্রদের ধারে ওমোয়া শহর ছিল, তা যে পৃথিবীর নীচের তলার মাথা ঝাঁকুনিতে পাড় ছাপিয়ে ওমোয়া শহর ভাসিয়ে, হ্রদের বদলে অন্য চেহারা নেয়নি তা কে বলতে পারে! সেইরকম কিছুই হয়েছে বলে আমার অন্ততঃ বিশ্বাস, কারণ পারিমা হ্রদ কি তার তীরের ওমোয়া শহর আর সোনায় মোড়া রাজা এলডোরাডো নিছক গাঁজাখুরি গল্প হলে সোনার পালকগুলোও তাই হত। কিন্তু সেগুলো তো চোখে-দেখা হাতে-ছোঁয়া পরখ-করা জিনিস। তাই পারিমা হ্রদকে অন্য চেহারায় খুঁজে পাওয়া যাবে বলে আমি মনে করি। বুড়ো কাপলানও তাই মনে করতেন, আর শেষ পর্যন্ত তিনি এমন কিছু হদিস পেয়ে ওই কাগজে টুকে রেখেছিলেন যার সাহায্যে এলডোরাডোর কুবেরের ভাণ্ডার উদ্ধার করা এখনো অসম্ভব নয়। সেই কাগজখানা সেভিলের কাছ থেকে তাই আমার না নিলেই নয়।

হুঁ!—হুজুরের গলায় আর ঝাঁজ নেই,—শোন্, তোর সব বেয়াদবী আমি মাপই ক'রে দেব ভাবছি!

হুজুরের কি মহানুভবতা!—আমি গদগদ হলাম।

গলাটা আরো একটু মোলায়েম ক'রে হুজুর বললেন, এলডোরাডো সম্বন্ধে তুই বেশ ওয়াকিফহাল মনে হচ্ছে। তোকে তাই একটা কাজ দিতে চাই।

বান্দা তৈয়ার, হুজুর!

আমার ফৌজী সেলামে একটু ভুরু কোঁচকালেও গলাটা তেমনি মোলায়েম রেখে হুজুর বললেন,—সেভিলের কাছ থেকে সে কাগজ আমিই আদায় করব। তারপর তোকে আমার সঙ্গে যেতে হবে সেই গায়নায়। পারিমা হ্রদ খুঁজে বার করে এলডোরাডোর কুবেরের ভাণ্ডার যদি সত্যি উদ্ধার করতে পারিস, তাহলে তোকে এমন বকসিস দেব যা তুই ভাবতে পারিস না।

শুনেই আমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছে, হুজুর! কিন্তু বেচারা কাপলান-এর কী হবে তাহলে?

কাপলান? মানে সেই বুড়োর বেটা?—হুজুর নাক সেঁটকালেন, সে আবার এর মধ্যে আসছে কোথা থেকে?

আসছে তার বাপের কাছ থেকে। বুড়ো কাপলান হদিস্ দিয়ে গেছে বলেই না কুবেরের ভাণ্ডার উদ্ধার করবার আশা করছি। সুতরাং তাকে কী করে বাদ দিই, বলুন। তার চেয়ে আরেক কাজ করুন, হুজুর! সেভিল, ডেভিল যার কাছ থেকে হোক, কাগজটা আমায় ফিরিয়ে দিন। আমি বকসিস আর আপনাকে কী দেব? একটু বরং আপনার পিঠ চাপড়ে যাই।

বোমার মত ফাটতে গিয়েও হুজুর কী যেন ভেবে অতি কষ্টে নিজেকে সামলালেন। তারপর যতখানি সাধ্য গলাটা খাটো রেখেই বললেন,—শেষ সুযোগ তোকে দিচ্ছি, এইটুকু শুধু মনে রাখিস। এক কথায় জবাব দে—আমার কথায় রাজী কি না?

বড় ফাঁপরে ফেললেন যে হুজুর! এখন আমাকে দেখছি টি-ম্যালিস-এরই শরণ নিতে হয়।

টি-ম্যালিস কে?—হুজুর চোখ পাকালেন।

আজ্ঞে, আপনাদের এই হাইতির-ই রূপকথার একজন মানুষ। রাজা টি-ম্যালিস-এর ওপর কী কারণে চটেছেন। টি-ম্যালিসকে তলব করে বললেন—কাল সুয্যি ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আমার পদ্মদীঘির সব কটা রাজহাঁস দুয়ে এক বালতি দুধ আনতে হবে। না আনতে পারলে তোমার গর্দান নেব। পরের দিন রাজা ভোরে উঠে বসে আছেন, টি-ম্যালিস আর আসে না। অনেক বেলায় টি-ম্যালিস আসতে রাজা হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন—দুধ কৈ রাজহাঁসের? ডাকো জল্লাদকে এখুনি। টি-ম্যালিসের ভ্রূক্ষেপ নেই। বললেন—একটু সবুর করুন হুজুর, আগে আমার ঝামেলাটা শুনুন। কী তোমার ঝামেলা?—রাজা রেগে শুধোলেন। আজ্ঞে পিঁপড়ের কামড়ে আণ্ডুল ফুলে গেছে, দুধ দুইব কী করে?—বললে টি-ম্যালিস। তা আণ্ডুল ফোলে কেন? কেন গেছলে পিঁপড়ে ঘাঁটতে?—রাজা ধমকালেন। কী করি বলুন, নইলে যে সুয্যি ওঠে না—বললে টি-ম্যালিস। সুয্যি ওঠে না!—রাজা হতভম্ব। আজ্ঞে হ্যাঁ, মহারাজ!—অম্লানবদনে বললে টি-ম্যালিস—মাঠের শেষে ডেঁয়ো পিঁপড়ের বাসা ছিল সুয্যিঠাকুর জানত না। ভোর-বেলা যেই উঠতে যাবে অমনি লাল মিঠাই মনে করে একেবারে ছেঁকে ধরলে ঝাঁক ঝাঁক পিঁপড়ে। ছুটে গিয়ে তাই ছাড়াতে বসতে হল। পিঁপড়ে না ছাড়লে সুয্যি উঠবে না। আর সুয্যি না উঠলে রাজহাঁসের দুধ আপনাকে দেখাব কী করে। পিঁপড়ের কামড়ে তাই তো আণ্ডুল ফুলল। রাজামশাই এবার তেলে-বেগুনে বললেন—ধাপ্পাবাজির আর জায়গা পাওনি? সুয্যির গায়ে কখনও পিঁপড়ে ধরে? ধরে মহারাজ! ধরে—টি-ম্যালিস এক গাল হেসে বোঝালে—রাজহাঁসের দুধ দোয়াতে হলেই ধরে!

একটু থেমে মুখ কাঁচুমাচু ক'রে বললাম, আপনার কথায় টি-ম্যালিস-এর মতোই তাহলে রাজী হতে হয়। কোন্ সুয্যির গায়ে কী পিঁপড়ে ধরাতে হবে তা না হয় পরে ভাবা যাবে।

এবার সত্যিই বোমা ফাটল। হুজুর হুঙ্কার ছাড়লেন,—তবে রে চিমড়ে চিমসে ছারপোকা! একটু ঢিলে দিয়েছি বলে কোঁৎকাকে কাতুকুতু ভেবেছিস! শমনের ডাক তোর এসে গেছে। নে, ইষ্টনাম কিছু থাকে তো জপ করে নে।

কিন্তু কটা কাজ যে বাকি আছে, হুজুর!—করুণ সুরে নিবেদন করলাম,—কাপলানের কাছে ওই কাগজটা আর নতুন এক পাল ম্যানাটি না পেঁছে দিলে যে কথার খেলাপ হবে।

তা একটু হবে। তবে তুই শুশুক না পেঁছোতে পারিস্, তোর ফুটো লাশটা না হয় হাইতির সেণ্ট মার্ক উপসাগরের জলে শুশুকদের বদলে হাঙরদের কাছেই পেঁছে দেব।—হুজুরের মুখে যেন হাঙরেরই হাসি এবার।

বললাম—ধ্যেৎ!

হুজুর শুনেই ভ্যাবাচাকা। লজ্জা লজ্জা ভাব করে এবার বললাম,—হাঙরের কামড়ে আমার যে সুড়সুড়ি লাগে। তা ছাড়া কথার নড়চড় আমার কিছুতেই হবার নয়। প্রথমবার গায়নায় বাপের খোঁজ না পেয়ে হতাশ হয়ে কাপলান এই হাইতিতে ফিরে এসে রাজনীতির লড়াইতে মাতে। দ্বিতীয়বার শুশুকগুলোর খোঁজ নিতে গায়নায় গিয়ে, সেগুলো জংলীরা মেরে শেষ করেছে দেখলাম বটে কিন্তু ভাগ্যক্রমে বুড়ো কাপলানের দেখা পেলাম। তাঁর শেষ খবর নিয়ে হাইতিতে এসে বহু কষ্টে ছোট কাপলানকে খুঁজে বার করি। তারপর কত বুঝিয়ে শুঝিয়ে তাকে রাজনীতির নেশা ছাড়িয়ে আবার গায়নায় পাঠিয়েছি। কথা দিয়েছি সেভিলের কাছ থেকে কাগজটা আর ওই যে বললাম নতুন একপাল শুশুক নিয়ে তার কাছে দুদিন বাদেই যাচ্ছি। আর দেরি করলে তাই যে আর চলে না, হুজুর!

না, দেরি আর তোকে করতে হবে না।—হুজুর রিভলভারের সেফটি ক্যাচ্‌টা সরালেন,—সেভিল না ডেভিলের কাছ থেকে কী করে কাগজটা নিবি ভেবে রেখেছিস আশা করি!

তা একটু ভেবেছি বৈ কি! আপনার মতো সাদাসিধে হোঁৎকা কেউ হলে ভাবনারও বিশেষ কিছু নেই।

তাই নাকি!—হুজুর রিভলভারটা আমার দিকে উঁচোলেন।

আজ্ঞে হ্যাঁ। যত বড় শয়তানই হোক, আপনার মত হাঁদা হলে বিশ্বাস ক'রে সে-কাগজটা সে বাক্স প্যাঁটরা সিন্দুকে কোথাও রেখে স্বস্তি পাবে না। নিজের কাছে আপনার কোমরের বেল্টের মতোই কোথাও নিশ্চয় রাখবে।

আর, তুই লড়ে সেটা কেড়ে নিবি!—হুজুরের যেন ব্যাঙের লপচপানিতে সাপের ফোঁস!

আজ্ঞে না, হুজুর!—নাক সিঁটকে বললাম,—ও সব ধস্তাধস্তি বড় নোংরা কাজ। টিবিয়া বলে পায়ের হাড়ের নাম শুনেছেন বোধ হয়। এই যে, আপনি আমার মুখের দিকেই চেয়ে আছেন। এখন আচমকা দুপায়ের সেই দুই টিবিয়ায় ঠিক জুৎসই ঠোক্কর দিলে সে আপনার মতোই কাহিল দিশাহারা হয়ে নাচতে শুরু করবে। তারপর দুই কনুয়ের আলনার নার্ভ মানে স্নায়ু যেখান দিয়ে গিয়েছে সেখানে ফানিবোন-এ নির্ভুল জায়গা মাফিক দুটো ঘা দিলেই দুটো হাত ঝিনঝিন ক'রে অবশ হয়ে রিভলভারটা এমনি ক'রে পড়ে যাবে। তারপর সেটা তুলে নিয়ে দু কানের নিচের এই দুটো জায়গায় মোক্ষম একটু টিপুনি দিয়ে কণ্ঠার ডেলাটায় দুর্বর ওস্তাদের হাতের টোকা দিলেই কিছুক্ষণের জন্যে হাত পা শরীর অবশ, জিভ অসাড়। তখন কোমরের বেল্টের ব্যাগ থেকে কাগজটা এমনি করে বার করে নিয়ে, সাবধানের মার নেই বলে পেটের উপর সোলার প্লেক্সাসে একটা কিল দিয়ে, টেবিলের ধারের বোতামটা একবার টিপলেই এ বাড়ির পোষা গুণ্ডাগুলো পড়ি কি মরি করে এই ঘরের দিকেই সবাই ছুটে আসবে। জলের গ্লাসটা আনানো থাকলে আপনার মুখে চোখে জল ছিটিয়ে তারা চাঙ্গা করতে পারত। কিন্তু তা আর হবার নয়। আমি অবশ্য ওধারের জানলাটা তার আগেই খুলে ফেলে খোলা বারান্দায় নেমে সেখান থেকে বাজারের টিনের চালের মটকায় ঝাঁপ দিয়ে এমনি ক'রে হাওয়া!

ঘনাদা থামলেন। সিগারেটটা ক্ষয়ে ক্ষয়ে তখন প্রায় তাঁর আঙুলের ডগাকে এসে পেঁাছেছে। সেটা ফেলে দিয়ে কোটোটা নিয়েই উঠে পড়তে যাচ্ছিলেন। আমাদের আর কিছু করতে হ'ল না, ভাড়াটে চার মূর্তিই ধরাধরি করে তাঁকে বসিয়ে দিল।

আপনি তাহলে সত্যিই অমনি করে কাগজটা কেড়ে নিয়ে পালালেন —সিড়িঙ্গে নফরবাবু যেন এখনি সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করবেন,—ওই গরিলার মতো দুষমনের কাছ থেকে?

ওই গরিলাই হল সেভিল। আমি কিন্তু আগেই বুঝেছি। পিপের দোসর বিশে নিজের বুদ্ধির বাহাদুরীতে নিজেই গদগদ।

আপনি তারপর ওই কাগজ আর শুশুকের পাল সেই কাপলান এর কাছে পেঁাছে দিলেন।—ভক্তিভরে শুধোল দশরথ।

তা দিলাম বৈ কি!—ঘনাদা সবিনয়ে জানালেন, কথা যখন দিয়েছি তখন না রেখে পারি!

আচ্ছা, কাগজটার দাম না হয় বুঝলাম—সিড়িঙ্গে নফরবাবু প্রায় করজোড়ে নিবেদন করলেন,—কিন্তু ওই শুশুকগুলো কেন, ঠিক ধরতে পারছি না তো।

পারছেন না! ঘনাদা এ-রকম অবিশ্বাস্য মূঢ়তায় যেন ক্ষুণ্ণ,—ওরাই যে ভরসা! এলডোরাডোর কুবেরের ভাণ্ডার উদ্ধার হবার হলে ওদের দিয়েই হবে।

ওরাই মানে ওই শুশুকগুলো দিয়ে!—চার মূর্তির সব কটা চোখই তখন কপালে উঠেছে।

হ্যাঁ!—ঘনাদা করুণভাবে ব্যাখ্যা করলেন,—ওই ম্যানাটি মানে শুশুকগুলো হল নদীতে জলায় যা কিছু পানা দাম প্রভৃতি জলজ আগাছা জন্মায় তার যম। পাঁচশো ধাঙড় সাত হপ্তায় যা না পারে, ওদের পাঁচটাতে সাত দিনে তা খেয়েই সাফ করে দেয়। পৃথিবীর থেকে থেকে মাথা চাড়ার দরুন এলডোরাডোর ওমোয়া রাজধানী, যার ধারে ছিল সেই পারিমা হ্রদ, কোন কারণে হয়তো পাড় ছাপিয়ে সে রাজধানী ডুবিয়ে অন্য চেহারা নিয়েছে—এ সন্দেহের কথা আগেই বলেছি। চারশো বছরে সে জলা বাদা কিন্তু জংলা আগাছায় এমন ছেয়ে গেছে যে হদিস পেলেও খুঁজে বার করা অসম্ভব। ওই ম্যানাটির পাল সেই জন্যেই ও অঞ্চলে ছেড়ে দেবার ব্যবস্থা করি। ও দেশের জংলীরা বনের আড়াল থেকে বিষমাখানো তীর ছুঁড়ে পালাতেই জানে। তাদের দিয়ে তো আর ধাঙড়ের কাজ হয় না। আর সে অসম্ভব সম্ভব হলেও ম্যানাটির মতো এমন পরিপাটি সাফ করা আর রাখা মানুষ তো মানুষ, কোন যন্ত্রেরও সাধ্যে কুলোবে না। ম্যানাটিরা জলা সাফ করলে হারানো হ্রদ পারিমার চৌহদ্দি বেরিয়ে পড়বে, এ বিশ্বাস আমার ছিল।

তাহলে ওই কুবেরের ভাঁড়ার আবার খুঁজে পাওয়া যাবে?—পিপের ভাই বিশের চোখ প্রায় ঠেলে বেরোয়।

নাঃ, আর কী করে যাবে!—ঘনাদা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন,—কাপলান তো আর ওখানে থাকবে না। সব ছেড়ে ছুড়ে চলে আসবে।

কেন? কেন?—সমস্বরে আকুল প্রশ্ন।

আর কেন! হাইতির রাজনীতির লড়াই থেকে অনেক বুঝিয়ে শুঝিয়ে যখন তাকে গায়নায় পাঠাই, তখন সেই কড়ার-ই আমায় করিয়ে নিয়েছিল যে। বলেছিল—তোমার কথায় আমি যাচ্ছি দাস, কিন্তু তোমাকেও কথা দিতে হবে কোনদিন কোথাও কোনো ভেটের লড়াই-এ আর নামবে না। সে-রকম কোন খবর পেলেই জানবে আমি সব ছেড়ে হাইতিতে ফিরেছি।

সমস্ত ঘরটার চোখেই যেন সরষে ফুল।

ঘনাদা উদাসভাবে বললেন,—ওই ম্যানাটিগুলোর জন্যেই একটু দুঃখ হয়। এলডোরাডোর যমের ধন আর অবশ্য খুঁজে পাওয়া যাবে না। কিন্তু তার আর কী করা যাবে! আপনারা সবাই যখন দাঁড়াতে বলছেন তখন সে কথা তো আর ঠেলতে পারি না?

খুব পাবেন! আলবৎ পারেন!! একশো বার পারেন!!! আপনাকে দাঁড়াতে দিচ্ছে কে? —চার মূর্তি একসঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে যেন আমাদের ওপরই মারমুখো।

আপনাকে ব্যাগোত্তা করছি, ঘনশ্যামবাবু—চারজনের মুরুব্বি হয়ে জালা-প্রমাণ দশরথই হাত কচলে আর্জি জানালে,—আপনি এ ভোটাভুটির নোংরামিতে নামবেন না। দিন, কথা দিন আমাদের। তারপর দেখি, কে আপনাকে নামাতে চায়।

শেষ কথাগুলো আমাদের দিকেই চোখ রাঙিয়ে।

ঘনাদা যেন নিরুপায় হয়ে বললেন,—বেশ, আপনারাই যখন মানা করছেন তখন নামব না।

হঠাৎ আমাদের দিকে নজর পড়ায় যেন অবাক হয়ে বললেন,—আরে, তোমরা অমন চুপটি ক'রে বসে কেন? ভদ্রলোকেরা এসেছেন, চা জলখাবার আনাও। আর এই নাও হে শিশির, অনেকক্ষণ শুকনো মুখে আছো, একটা সিগারেট খাও।

শিশিরের কৌটো থেকেই ঘনাদা উদারভাবে তাকে একটা সিগারেট দান করলেন।

হ্যাঁ, এখনও সেই বাহাত্তর নম্বর বনমালী নস্কর লেন!

কেঁচো

ঘনাদা এক কথায় রাজী!

আমরা সবাই তো একেবারে যাকে বলে পপাত ধরণীতলে!

যে ঘনাদাকে নেহাত তাঁর নিজের মর্জি ছাড়া মেস থেকে এক পা বার করা যায় না, শনিবার দিনটা অন্ততঃ পুলিসের হুলিয়া দেখিয়েও যাঁকে মেস ছাড়া করা প্রায় অসম্ভব, তিনি বলামাত্র শনিবার ভোরে আমাদের সঙ্গে শিবুর জন্মস্থান এক অজ পাড়াগাঁয়ে যেতে রাজী হয়ে গেলেন!

শিবুর জন্মস্থান যেখানেই হোক, কোনো অজ পাড়াগাঁয়ে নয়। কোথায় যে তার জন্মস্থান তা অবশ্য তার নিজেরও বোধহয় জানা নেই—তবু ঘনাদাকে জব্দ করার ফিকিরেই ভেবে চিন্তে কিচিন্দে বলে একটা গ্রামের নাম উদ্ভাবন করে, আমরা কলকাতা থেকে মাইল ত্রিশেক দূরে আমাদের কাল্পনিক মানচিত্রে বসিয়েছিলাম। গ্রামটি ঘনাদার খাতিরে সুগমও করেছিলাম যথেষ্ট। ট্রেন বা বাস কিছুই সেখানে যায় না। বর্ষাকালে শালতি করে কোনরকমে একটা জনমানবহীন বাদায় গিয়ে নেমে ক্রোশ পাঁচেক হাঁটুভর কাদা ভেঙে সেখানে পেঁাছোতে হয়।

কিচিন্দে গ্রামের এসব বাহার নিজেদের মান বাঁচাতেই জুড়তে হয়েছিল অবশ্য পরে।

নিজেদের ফাঁদেই নিজেরা যে অমন করে পড়ব আগে কি জানি!

শনিবার রাত্রে আমাদের মেসে বেশ জবর গোছের খ্যাঁট হয়। বাপী দত্ত আমাদের মেস ছেড়ে গেছে বটে কিন্তু তার মত মফস্বলী আরো দুচার জন আছে। তাদের খাতিরেই রবিবারের বদলে শনিবার রাত্রেই এই ভুরি-ভোজের ব্যবস্থা।

ঘনাদা শনিবার দিনটায় তাই মেস থেকে নড়বার নাম করেন না। শুধু 'নট নড়ন চড়ন' হয়ে খ্যাঁটের যাকে বলে 'সিংহভাগ' নিলে বলবার কিছু ছিল না, কিন্তু তাঁর আবার উপরি ওয়াবদার বায়নার অন্ত থাকে না সেদিন। সকালে উঠেই হৈচৈ লাগিয়ে তো দেনই—কই হে, বাজারে যাচ্ছ আজ কে! বলি 'মেনুটা' কিছু ঠিক করেছ নাকি! তারপর কোন দিন ফরমাশ হয়, আজ একটু ভেটকি মাছের 'ক্রোকেট' করবে তো হে। দেখো আবার যেখান সেখান থেকে ভেটকি কিনো না! কোনদিন বা অনুযোগ দিয়ে শুরু হয়, ওহে আলুগের বারে

বিরিয়ানিটা তেমন জুত হয়নি। মটনটাও ছিল শুঁটকো। হাতের চর্বি ধুতে একটা বারসোপ না খরচ হয়ে গেলে আবার মটন! মটন একেবারে হগ সাহেবের বাজারে নুরুদ্দিনের দোকানে কিনবে, বুঝেছ। কাবলি ছোলার খোসা না ছাড়িয়ে নুরুদ্দিন ভেড়াকে খাওয়ায় না।

ফি শনিবার ঘনাদার এরকম নতুন নতুন খাবারের চিন্তার ঢেউ খেলে মাথায়।

মনে মনে হাসি বা গজরাই, তাঁর আবদার শেষ পর্যন্ত রাখতেই হয়।

শনিবারের এই ভোজনবিলাস ছেড়ে ঘনাদা এক কথায়—ধাপধাড়া গোবিন্দপুরকেও যার মানানো কিষ্কিন্ধ্যেরও বটতলা সংস্করণ 'কিচিন্দে' যেতে রাজী হবেন, এ আমাদের স্বপ্নাতীত।

ঘনাদাকে একটু জ্বালাবার মতলবেই বুধবার বিকেলে কথাটা তুলেছিলুম।

ঘনাদা তখন তাঁর মৌরসী আরাম-কেদারায় বসে শিশিরের চতুঃসহস্র সপ্তশত সপ্তবিংশতিতম সিগারেটটি ধার নিয়ে সবে ধরাচ্ছেন।

শিবু তখনও ফেরেনি। আমি, গৌর আর শিশির মিলেই ঘনাদাকে সঙ্গ দিচ্ছি। আমাদের ফন্দিমতো শিশিরই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কথাটা পাড়লে,—এ শনিবারের খ্যাঁচটা কিন্তু ফসকাল!

কেন?—ঘনাদা সিগারেটের সুখটানটা মাঝপথেই থামিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন। ঘনাদার গলার স্বরটা বিস্ময়ে আশঙ্কায় উদ্বেগে ঠিক আশানুরূপ তীক্ষ্ণ না শোনালেও, মনে হল ওষুধ ধরেছে।

গৌরই জবাবটা দিলে যেন হতাশভাবে,—আর বলেন কেন? শিবুর সঙ্গে তার গাঁয়ে যেতে হবে। গাঁ যেন আমরা কেউ দেখিনি। আর যেতে হবে কিনা শনিবার এখানকার এই খাওয়া ফেলে! কী অন্যায় আবদার বলুন তো!

ঘনাদার মুখে কথা নেই। সিগারেটটাও না। সেটা আঙুলের ফাঁকে পুড়ছে।

লক্ষণ সব ভালোই বলতে হবে।

আমি মনসায় ধুনোর গন্ধ দিলাম এবার,—আহা অত চটছ কেন? শিবুর যে ওই গাঁয়েই জন্ম। এই শনিবারই আবার ওর জন্মদিন। আমাদের সবাইকে নিজের গাঁয়ে নিয়ে গিয়ে তাই একটু হৈ-হল্লোড় করতে চায়।

একটু থেমে ঘনাদার মুখের ওপর চট্ করে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে ব্রহ্মাস্ত্রটি ছাড়লুম,—ঘনাদাকেও তো নিয়ে যাবে বলেছে!

ডিনামাইটের সলতেয় দূর থেকে আগুন দিয়ে এঞ্জিনিয়াররা যেমন দুরু দুরু বুকে অপেক্ষা করে, আমাদের তখন সেই অবস্থা।

এই বিস্ফোরণ হল বলে? শনিবারের যজ্ঞির খাওয়ায় ফাঁকি দিয়ে ঘনাদাকে কিনা নিয়ে যেতে চায় কোথাকার অখদ্দে পাড়াগাঁয়ে! এত বড় আস্পর্ধায় ঘনাদা কিভাবে ফেটে পড়েন তাই দেখবার জন্যেই আমরা উদ্‌গ্রীব। শিবুর গাঁয়ে কেন তাঁর যাওয়া অসম্ভব তা বোঝাতে গিয়ে, চাই কি ফেটে-পড়া রাগের বারুদ থেকে একটা-আধটা গল্পের ফুলঝুরিও ঝরে পড়তে পারে।

কিন্তু কোথায় বিস্ফোরণ! ফট-ফটাসের বদলে এ-যে একেবারে শুধু ফুস্!

ঘনাদা আমাদের একেবারে বসিয়ে দিয়ে গম্ভীরভাবে বললেন,—বেশ যাব।

অ্যাঁ?

আমাদের চক্ষু সব বিস্ফারিত, মুখের হাঁ আর বোজে না। আপনা থেকে বেরিয়ে আসা অ্যাঁ-র সঙ্গে 'যাবেন তাহলে!'—বলে আনন্দোচ্ছ্বাস জুড়ে দেবার চেষ্টা করলাম বটে, কিন্তু মাঝখানে বেশ খানিকটা ফাঁক থেকে গেল, সুরেও মিলল না।

গ্রামটা কোথায়?—ঘনাদা আমাদের দুরবস্থা লক্ষ্য না করেই বোধ হয় প্রশ্ন করলেন নিজে থেকে।

গ্রামটা?—আমি চাইলাম গৌরের মুখের দিকে।

ওঃ গ্রামটা!—গোর চাইল শিশিরের দিকে।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, গ্রামটা! ওই যে বলো না হে গ্রামটার নাম?—শিশির নিজেকে বাঁচাতে আমাকেই বাঘের মুখে এগিয়ে দিলে।

ওঃ নাম জিজ্ঞেস করছেন?—আমি একটা ঢোঁক গিললাম,—নাম হোলো গিয়ে—আমার দমটা ঢোঁক গেলা হল,—ওই যে....

উচ্চারণ করা শক্ত বুঝি?—ঘনাদার সরল কৌতূহল।

না, না উচ্চারণ শক্ত নয়!—আমি নাম হাতড়াবার জন্যে সময় নেবার ফিকির খুঁজলাম,—বড় বিদঘুটে নাম কিনা! শিবুর জন্মস্থান তো, বিদঘুটে না হয়ে কি মোলায়েম নাম হতে পারে! চট করে তাই মনে আসতে চায় না।

শিবুর মনে আছে নিশ্চয়!—ঘনাদার গলায় যতখানি সম্ভব মধুর সারল্য!

বঃ কি যে বলেন!—আমরা ক্ষুণ্ণ হলাম যেন একটু,—নিজের জন্মস্থানের নাম মনে থাকবে না! আমাদেরও তো মনে ছিল, এই মাত্র ভুলে গেলুম! এই—এই...

মধ্যমগ্রাম! বলে ফেলল শিশির।

মধ্যমগ্রাম?—ঘনাদাও উচ্চারণ করলেন চোখ দুটো কেমন একটু সন্দেহে কুঁচকে।

দূর! মধ্যমগ্রাম কি বলছিস্!—গোর তাড়াতাড়ি সামলাল।

হ্যাঁ, মধ্যমগ্রাম কি? ওটা কি একটা বিদঘুটে নাম হল?—আমিও শিশিরের ওপর খাপ্পা হলাম। তারপর হঠাৎ বলে ফেললাম,—হ্যাঁ হ্যাঁ মনে পড়েছে,—কিচিন্দে!

ভাগ্যিস সামনের টেবিলের খবরের কাগজটার দিকে চোখ পড়েছিল। সেখানে বড় বড় হরফে ইংরাজিতে একটা বিজ্ঞাপন,—কিচেন ইউটেনসিল্‌স্।

তাহলে মধ্যমগ্রাম নয়, কিচিন্দে?—ঘনাদার প্রশ্নটার সুরটা যেন কেমন।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, কিচিন্দে!—আমরা সমস্বরে সায় দিলাম।

তা নামটা বেশ বিদ্‌ঘুটে বটে! আচ্ছা, কিচিন্দেই যাওয়া যাবে। যাওয়া ঠিক তো?—ঘনাদা মনে হল দস্তুরমত উদ্‌গ্রীব।

ঠিক ছাড়া কি? নিশ্চয় ঠিক!—বলে ল্যাজেগোবরে হয়ে সেখান থেকে কোনরকমে বেরিয়ে পড়ে বাঁচলাম।

বাঁচলাম তো তখনকার মতো। তারপর উপায়?

নিজেদের ফাঁদেই পড়েছি স্বীকার করে হার মানতেও মান যায়, অথচ ঘনাদাকে নিয়ে যাবার মত কিচিন্দে গ্রামই বা পাই কোথায়?

শিবু ফিরে আসতেই গোপন মন্ত্রণাসভায় ডেকে তাকে খবরের কাগজের ভাষায় পরিস্থিতিটা জানালাম।

শুনেই তো সে খাপ্পা!—আহাম্মক সব, করেছিস কি! সব মাটি করে দিলি।

মাটি করে দিলাম! কি?—আমরা বিমূঢ়।

আরে সব বুদ্ধির গন্ধমাদন!—শিবু আমাদের মধুর সম্ভাষণ করে বললে,—ঘনাদা কি সাধে,—ওই—তোদের কি বললি, কিচিন্দে যেতে রাজী হয়েছেন! শনিবার যে ওঁকে রামজন্ম করবার ব্যবস্থা করেছিলাম। যা প্যাঁচে ফেলেছিলাম আর বেরুবার রাস্তা ছিল না। শেষে নিজেরাই প্যাঁচ কেটে পালাবার পথ করে দিলি!

আমাদের প্রতি জ্বালা-ধরানো আরও কয়েকটি বাছা বাছা বিশেষণ প্রয়োগ করে শিবু তারপর ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলে। শনিবারের ভোজের ব্যাপারে ঘনাদার মাতব্বরী চালবাজি ফাঁসিয়ে দেবার সে একটা ভালো ফন্দি করেছিল। ঘনাদা যেরকম ভাবগতিক দেখান তাতে মনে হয় গোটা হগ্ সাহেবের বাজারটাই তাঁর জমিদারি। বিশেষ করে খাসি মটনের কারবারী নুরুদ্দিন তো তাঁর কথায় ওঠে বসে। শিবু সেই নুরুদ্দিনের নাম নিয়েই ঘনাদাকে কাত করবার ব্যবস্থা করেছিল। ঘনাদাকে এসে বলেছিল যে নুরুদ্দিন তো ঘনাদার নাম করতে

অজ্ঞান। বাজারে গেলেই তাঁর কথায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠে। প্রায়ই সে বলে,—এসব খাসি মটন কি ছার, দাসবাবু একবার হুকুম দিলে সে একেবারে খাস তুরুক মুলুকের অ্যাঙোরা খাসির মাংস ভেট দিয়ে আসতে পারে। শুনে ঘনাদা, এ আর এমন কি, ভাব দেখিয়ে একটু ফুলে কেঁপে উঠতেই শিবু কোপটি বসিয়েছিল। সামনের শনিবারটাই 'অ্যাঙোরা' খাসির মাংসের জন্যে নুরুদ্দিনকে একটু হুকুম জানাবার জন্যে অনুরোধ জানিয়েছিল সবিনয়ে। বলেছিল, আপনার শুধু একটু 'লে আও' বলবার ওয়াস্তা। বলে পাঠান না ঘনাদা। অ্যাঙোরা খাসির মাংস খেয়ে জীবন ধন্য করি। ঘনাদা আর তখন পিছু হটবার পথ পাননি। বেকায়দায় পড়ে নুরুদ্দিনকে খবর পাঠাতে রাজী হয়েছিলেন।

ব্যাপারটা বুঝিয়ে তিরিক্ষি মেজাজে শিবু বললে,—সেই থেকে ঘনাদা এ শনিবারের ফাঁড়া কাটাবার ফিকির খুঁজছেন। আর সে ফিকির তোরাই জুগিয়ে দিলি নিজে থেকে!

শুধু তাই! ঘনাদার কাটানো ফাঁড়া যে এখন আমাদের ঘাড়ে!—গৌর হতাশভাবে দীর্ঘশ্বাস ফেললে,—নিজেদের প্যাঁচে নিজেরাই পড়ে যে এখন হিমসিম। এ প্যাঁচ কেটে বেরোই কি করে?

প্যাঁচ কেটে বেরুবার জন্যে সবাই মিলে পরামর্শ করে চেষ্টার ত্রুটি কিছু রাখলাম না।

বুধবার বিকেলের আগে যে কিচিংদের অস্তিত্ব ছিল না, বৃহস্পতিবার সকালে তাকে লগি বাওয়া শালতিতে নোংরা খালের রাস্তায় নিয়ে গিয়ে, হাঁটুভর কাদা প্যাচপেচে বাদার ধারে ফেলে যতখানি সম্ভব দুর্গম করে তুলি। কিন্তু—কিছুতেই কিছু হয় না। ঘনাদা নিজে থেকেই যাতে মত বদলান তার জন্যে শিবুর কাল্পনিক জন্মস্থান যত বিশ্রী বিদঘুটে করে তুলি, ঘনাদার উৎসাহ তত যেন বেড়ে যায়।

ক্রোশ পাঁচেক কাদা ভেঙে যেতে হবে শুনে যেন তাঁর আনন্দ আর ধরে না।

বলেন,—বলো কি হে! পাঁচ ক্রোশ কাদার রাস্তা? খুব মজা তো!

মজাটার জন্যে আমরাও যেন উৎসুক, এরকম একটা ভাব দেখাতে হয়। সেই উৎফুল্ল মুখ নিয়েই বলি,—শিবুর বাড়িটাও খুব মজার, জানেন ঘনাদা? আস্ত ঘর নাকি একটাও নেই।

তাই নাকি হে?—ঘনাদা শিবুকেই প্রশ্ন করেন।

একটু আশার ফুলকি দেখে শিবু সজোরে হাওয়া দেয়। এক গাল হেসে বলে,—আজ্ঞে তা সত্যি নেই। যেটার ছাদ আছে তার দেয়াল নেই, আর দেয়াল যেটার খাড়া আছে তার ছাদ একেবারে হাঁ। আর বাড়িময় যা মজার জঙ্গল হয়েছে!

শিবু থামতেই গৌর উদ্বিগ্ন হবার ভান করে বলে, আপনার অসুবিধে হবে না তো ঘনাদা?

অসুবিধে!—ঘনাদা যেন অপমানিত বোধ করেন,—আমার অসুবিধে হবে ও বাড়িতে থাকতে। আরে ওই সব অসুবিধের মজা করতেই তো যাওয়া।

এর পর আর কি করা যায়! অগত্যা যথাসম্ভব দেঁতো হাসি মুখে ফুটিয়ে চলে আসি।

সেদিন বিকেলেই ঘনাদার সংকল্পের গড় ভাঙবার চেষ্টায় নতুন দিক দিয়ে আক্রমণ চালাই।

শিবু কী সব খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করেছে শুনেছেন তো ঘনাদা?

ঘনাদা ঔৎসুক্য দেখান শিবুর দিকে চেয়ে,—কি খাওয়াবে হে?

যত জবর বর্ম-ই এঁটে থাকুন, তার এই একটা জায়গায় ফুটো থাকতে বাধ্য বুঝে, শিবু সেই ফুটো লক্ষ্য করেই মোক্ষম তীর চালায়! যেন খুশীতে ডগমগ হয়ে বলে—সে যা খাওয়াবে দেখবেন! খুব নতুন ধরনের খাওয়া। গাঁয়ে আর কিছু না পাওয়া যাক, চাল ভাজা তো পাওয়া যাবেই, আর তার সঙ্গে ধরুন,—ধরুন, বেগুনপোড়া। বেগুনগুলো আমাদের গাঁয়ে কেমন শুটকো পোকা-ধরা বটে! কিন্তু তাতে কী আর হবে! আর বেগুন যদি না জোটে তো, কি বলে, আঁদাড়পাঁদাড় খুঁজে দুটো কচু কি আর পাব না!

শিবু যতক্ষণ ধনুর্বিদ্যা চালায়, আমরা একেবারে রুদ্ধ নিশ্বাসে ঘনাদার দিকে চেয়ে থাকি। বর্ম ভেদ করে বাণ একেবারে মর্মে পেঁাছে ঘনাদাকে কাবু করে কিনা দেখতে!

কিন্তু বৃথা আশা।

যেন আর তর সইছে না এমনভাবে ঘনাদা বলেন,—বলো কি হে! এখনি যে যেতে ইচ্ছে করছে!

শুক্রবার সকাল অবধি সব রকম চেষ্টা করে বিফল হয়ে শেষ পর্যন্ত মরিয়া হয়ে উঠলাম।

ঘনাদাকে যখন টলানো যাবে না, আর নিজেদের শনিবারের ভোজেরও যখন দফা রফা, তখন কিচিচিন্দতেই যাব ঠিক করলাম ঘনাদাকে নিয়ে। কিচিচিন্দে কোন্ চুলোয় তা না জানি, কিচিচিন্দে নামের সঙ্গে মানানসই অতি বিদঘুটে একটা রাস্তায় বেরিয়ে পড়া তো যাবে ঘনাদাকে নাকাল করতে। নাকাল অবশ্য নিজেরাও হব। কিন্তু নিজের নাক কেটেও পরের যাত্রা ভঙ্গ করতে তখন আমরা প্রস্তুত।

শনিবার সকালে বেরিয়ে পড়ার মত একটা দিক তখন সলাপরামর্শ করে ঠিক করে ফেলেছি। বেরিয়ে তো পড়া যাবে, তারপর যা হয় হোক।

ঘনাদাকে সকালে উঠেই তাড়া দেব ঠিক করেছিলাম, কিন্তু সেখানেও আমাদের হার।

ঘনাদাকে তৈরী হতে বলবার জন্যে ওপরে উঠে দেখি তিনি ধড়াচুড়ো প'রেই ঘর থেকে বেরুচ্ছেন। তাঁর এই এত সকালে তৈরী হওয়ায় যত না আমরা তাজ্জব ধড়াচুড়ো দেখে তার চেয়ে বেশী।

ঘনাদার মাথায় শোলার টুপি, গায়ে খাকি শার্ট-প্যাণ্ট, পায়ে জুতোর ওপর গাম বুট, আর হাতে হুইল ছিপ সমেত মাছ ধরার ঝুলি!

কি ব্যাপার ঘনাদা!—বেশ খানিক হাঁ হয়ে থাকবার পর আমাদের মুখে কথা সরলো।

কি ব্যাপার, ভুলে গেছ নাকি. বেরুতে হবে না? তোমরা এখনও তৈরীই হওনি!—ঘনাদা ক্ষোভ প্রকাশ করলেন।

হ্যাঁ, তৈরী এখুনি হচ্ছি।—আমরা লজ্জিত হয়ে বলি,—কিন্তু এসব কি করেছেন?

কেন?—ঘনাদা অবাক্,—এই পোশাকই তো দরকার কিচিচিন্দের মতো গাঁয়ে যেতে, কাদা ভাঙতে হবে বলে গাম বুটটা নিলাম।

কিন্তু ওই ছিপ-টিপ? আমাদের বিস্মিত প্রশ্ন।

বাঃ! মাছ ধরতে হবে না? পুকুর আছে তো?—ঘনাদার প্রশ্নটা শিবুর উদ্দেশে।

হ্যাঁ, পুকুর থাকবে না কেন?—শিবু একটু থতমত খেয়ে বললে,—কিন্তু সেখানে ও হুইল ছিপ তো বেকার!

কেন?—ঘনাদা বেশ অসন্তুষ্ট।

মানে—শিবু আমতা আমতা করে একটা জুতসই জবাব খাড়া করবার চেষ্টা করলে,—মানে, পুকুর মানে সব ডোবা কি না। সেখানে হাতাছিপে বড় জোর কেঁচো দিয়ে পুঁটি টুঁটি ধরা যায়!

কি বললে?—ঘনাদার এ একেবারে অন্য মূর্তি! যেন দিনের বেলায় ভূত দেখেছেন এমন ভাবখানা!

এক মুহূর্তে কি হয়ে গেল বুঝতে না পেরে শিবুও দিশাহারা হয়ে ভয়ে ভয়ে কবুল করলে—বললাম সেখানকার ডোবায় কেঁচো দিয়ে বড় জোর পুঁটি ধরা যায়!

হুঁ,—গম্ভীরভাবে বলে ঘনাদা সটান ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। আমরাও আশা আশঙ্কায় দুলতে দুলতে তাঁর পিছুপিছু।

কি হল কি ঘনাদা?

ঘনাদা তখন হুইল ছিপটা ঘরের কোণে রাখছেন। আমাদের দিকে না তাকিয়েই বললেন—কিচ্ছু না।

গৌর তাঁকে উসকে দেবার চেষ্টা করলে,—হুইল ছিপ ফেলবার পুকুর নেই বলে রাগ করলেন?

না।—ঘনাদা শোলার টুপি নামালেন।

তবে? কেঁচো দিয়ে মাছ ধরা পছন্দ নয়?—শিবু ফোড়ন কাটল।

না নয়।—ঘনাদা গাম বুট খুলতে খুলতে অগ্নিদৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকালেন।

কেঁচো দেখলে ভয় পান বুঝি?—আমার মুখ থেকে ফস্ করে কথাটা বেরিয়ে গেল। এবং তাতেই বাজিমাত।

হ্যাঁ, ভয় পেয়েছিলাম!—ঘনাদা অন্য জুতো জোড়াও খুলে তক্তপোশের ওপর পা মুড়ে বসলেন। আমরাও যে যেখানে পারলাম।

কিন্তু ওই ভয় পেয়েছিলাম-টুকু বলেই ঘনাদা চুপ। আবার একটু নাড়া দিতে হল সুতরাং,—কেঁচো দেখে ভয়! কেঁচো খুঁড়তে গোখরো বেরিয়েছিল বুঝি?

না গোখরো নয় কিন্তু চেহারায় তারও দুশমন, লম্বায় পাক্কা আড়াই হাত।

আড়াই হাত কেঁচো! আমাদের কণ্ঠে সন্দিগ্ধ বিস্ময়,—কেঁচো না কাছি?

কাছির মতই মোটা তবে কেঁচোই। মেগাস্কোলাইডস্ অস্ট্র্যালিস। দেখেছিলাম অস্ট্রেলিয়ায়। তার জ্ঞাত গোত্র অবশ্য অন্য জায়গাতেও আছে; আফ্রিকায়, দক্ষিণ আমেরিকায়, আমাদের দক্ষিণ ভারতেও। দক্ষিণ আমেরিকার কেঁচো-দৈত্যের নাম হল গ্লসোস্কোলেক্স জাইগ্যানটিয়স্ আর....

থাক থাক!—আমরা সভয়ে বাধা দিলাম।

কিন্তু কিচিন্দের কেঁচো তো ওরকম দৈত্য দানো কিছু নয়।—শিবুই খোঁচা দিলে,—নেহাত নিরীহ পুঁচকে। তাদের আবার ভয় কিসের?

ভয় নয়, ভক্তি।—ঘনাদা যেন মন্ত্র পড়লেন গম্ভীর গলায়।

ভক্তি, কেঁচোতে?—আমরা হতভম্ব।

হ্যাঁ, কেঁচোতে ভক্তি।—কেঁচো না থাকলে পৃথিবী কবে মরুভূমি হয়ে যেত জানো? জানো এক বিঘে ভালো জমিতে প্রায় দু লক্ষ কেঁচো থাকে? জানো মাটির নীচে আট থেকে দশ হাত গর্ত করে গিয়ে নীচের মাটি ওপরে তারা চালাচালি করে বলেই পৃথিবী এমন উর্বর? জানো গায়ের জোরে পঞ্চাশটা ভীমসেন তাদের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে না? একটা কেঁচো তার চেয়ে ষাট গুণ ওজনের পাথর কুচি সরিয়ে ফেলে অনায়াসে তা জানো....

আরও অনেক কিছু পাছে শিখে ফেলতে হয় সেই ভয়ে ঘনাদাকে তাড়াতাড়ি থামিয়ে দিয়ে বললাম,—ভক্তি কি ওই সবের জন্যে।

না, শুধু ওসবের জন্যে নয়। ভক্তি, এ যুগের সপ্তমাশ্চর্য এক আবিষ্কার ও গবেষণা ওরা সাহায্য না করলে চিরকালের মত হারিয়ে যেত বলে। ওরা না থাকলে পৃথিবীর এক অসামান্য বৈজ্ঞানিককে সে গবেষণা সম্পূর্ণ করবার সুযোগ দিতে পারতাম না। পৃথিবীর ঘড়ির কাঁটা উলটে এক বছর পিছনে ফিরে গিয়েও তাহলে কোন লাভ হত না।

মাথাটা আমাদের সকলেরই তখন ঘুরছে। গৌরই তবু প্রথম একটু সুস্থির হয়ে মাথা-গুলোনো ধাঁধার একটা জটকেই ছাড়াবার চেষ্টায় ধরা গলায় জিজ্ঞাসা করলে,—ঘড়ির কাঁটা উলটে এক বছর পিছনে ফিরে যাওয়ার কথা কি বললেন যেন?

ঘনাদা করুণাভরে আমাদের দিকে চেয়ে বললেন,—হ্যাঁ বললাম ১৯৫৩ থেকে ১৯৫২তে ফিরে যাওয়ার কথা।

সশরীরে?—আমাদের চোখ সব ছানাবড়া।

হ্যাঁ সশরীরে।—ঘনদা একটু অনুকম্পার হাসি হেসে শুরু করলেন,—তখন নরফোক-

দ্বীপে কদিনের জন্যে বেড়াতে গেছি। এ দ্বীপটি অস্ট্রেলিয়ার প্রায় ৯০০ মাইল পূবে আর নিউজীল্যাণ্ডের সাতশ' মাইল উত্তরে। ছোট্ট দ্বীপ কিন্তু যেমন সুন্দর তেমনি নির্জন। ট্রাম বাস কি ট্রেনের বালাই নেই। একটা আধটা মোটরের আওয়াজ শুধু মাঝে মাঝে পাওয়া যায়। দ্বীপে মানুষই তো মাত্র হাজার খানেক, তা ওসব ঝামেলা থাকবে কোথা থেকে। ডিসেম্বর মাসের শেষাশেষি হবে। নরফোকের এক পুরানো বাসিন্দার সঙ্গে গল্প করতে করতে আমার হোটেলের দিকে যাচ্ছিলাম। নরফোকে মানুষের বাস খুব বেশী দিনের নয়। বাউণ্টি জাহাজের বিদ্রোহের কথা হয়ত পড়েছ, ছবি অন্ততঃ দেখে থাকবে। সেই বাউণ্টি জাহাজের ন জন বিদ্রোহী ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে পিটকেয়ার্ন নামে একটি দ্বীপে গিয়ে বসবাস করে। তাদেরই বংশধরেরা আবার ১৮৫৬ সালে আসে এই নরফোক দ্বীপে বাস করতে। এই সব পুরানো দিনের গল্প শুনতে শুনতে যাচ্ছি, এমন সময় রাস্তার একটি লোককে দেখে হঠাৎ চমকে উঠলাম। বেঁটে খাটো শুকনো চেহারার এক বৃদ্ধ। আমাদের উলটো দিক থেকে এসে আমায় দেখে একটু থমকে দাঁড়িয়ে পড়েই আবার পাশ কাটিয়ে চলে যাবার চেষ্টা করলে। কিন্তু তা আর যেতে দিলাম না। হঠাৎ হাত বাড়িয়ে বৃদ্ধকে ধরে ফেলে বললাম,—কে? মিস্টার জোয়াকিম না?

বৃদ্ধ কিন্তু আমার সামনে যেন ভয়ে সিটিয়ে গেল। কাতরভাবে মাথা নেড়ে বললে,—না না, আপনার ভুল হয়েছে। আমি জোয়াকিম নয়, আমার নাম হ্যারিস, নর্ম্যান হ্যারিস!

'নর্ম্যান হ্যারিস!—একটু বিমূঢ় হয়েই বৃদ্ধকে ছেড়ে দিলাম। প্রায় পোনেরো ষোলো বছর আগেকার কথা বটে কিন্তু এত বড় ভুল তবু কি হয়!

সেই মুহূর্তে আমার হোটেলের নতুন বন্ধু মিঃ সিডনী এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দেওয়ায় তখনকার মত ব্যাপারটা মনে চাপা পড়েই রইল।

মিঃ সিডনী অবশ্য এসেই জিজ্ঞাসা করেছিলেন হেসে—ও বুড়োকে ধরেছিলেন কেন মশাই?

লজ্জিতভাবে নিজের ভুলের কথাটা তাঁর কাছে স্বীকার করে প্রসঙ্গটা বদলে ফেলেছিলাম।

ব্যাপারটা মনের মধ্যে চাপা দিলেও সন্দেহ আমার যায়নি একেবারে।

সন্দেহ যে ভুল নয় সেইদিন সন্ধ্যার পরই তার কিছু প্রমাণ পাওয়া গেল।

মাউণ্ট পিট বলে নরফোক দ্বীপের উত্তর-পশ্চিমের ছোট-খাট একটা পাহাড় থেকে তখন বেড়িয়ে ফিরছি। বেশ অন্ধকার হয়ে এসেছে ইতিমধ্যেই। দ্বীপের হাসপাতালটি ছাড়িয়ে কিছুদূরে গিয়ে হোটেলের দিকে বাঁক নিয়েছি, এমন সময় চাপা গলায় কে যেন কোথা থেকে 'ডস' বলে ডাকল। অন্ধকারে এদিক ওদিক চেয়ে কাউকেই দেখতে না পেয়ে পথের ধারের পাথুরে ঢিবিগুলোর ওপাশে খোঁজ করব কিনা ভাবছি এমন সময় টর্চ হাতে পাকা সড়ক দিয়ে একজনকে আমার দিকেই আসতে দেখলাম। কাছে আসবার পর দেখা গেল লোকটি মিঃ সিডনী।

হেসে জিজ্ঞেস করলাম,—কি মিঃ সিডনী! টর্চ হাতে বেড়াতে বেরিয়েছেন যে!

সাবধানের মার নেই মশাই!—মিঃ সিডনীও হেসে বললেন,—পাথুরে দ্বীপে কোথায় সাপ খোপ আছে কে জানে।

মিঃ সিডনী টর্চ নিয়ে চলে যাবার পর বেশ চিন্তিত ভাবেই হোটেলে ফিরলাম। আমার নাম ধরে আর কোন ডাক তারপর শুনতে পাইনি। ব্যাপারটা কি আমার মনের ভুল?

না, মনের ভুল কখ্খনো নয়। সেদিন রাত্রে হোটেলের ঘরে আলো নিভিয়ে বসে ভাবতে ভাবতে আমার নিশ্চিত ধারণা হল কোন ব্যাপারেই আমার ভুল হয়নি। পথে আসতে স্পষ্ট আমার নাম ধরে কাউকে ডাকতে আমি শুনেছি। আর নর্ম্যান হ্যারিস বলে নিজের পরিচয় যে দিতে চায় সে বৃদ্ধ মিঃ জোয়াকিম ছাড়া আর কেউ নয়। পোনেরো ষোলো বছর আগের কথা বটে, কিন্তু তার সঙ্গে এক আধ দিন তো নয়, দুটি মাস আমি কাটিয়েছি আর লোকের

ভিড়ের মধ্যে নয়। একেবারে নির্জন এমন এক জায়গায় যেখানে সারাদিন দুজনেই পরস্পরের একমাত্র সংগী। কিন্তু বৃদ্ধ সেই জোয়াকিমই যদি হয় তার এ দশা হবে কেন? আমার কাছেও নাম লুকোবার এখন আর তার কী কারণ থাকতে পারে?

উত্তরটা মাঝ রাতেই পেলাম।

তখনও এই সব কথা ভেবে ঘুম আমার আসেনি। মনে হল দরজায় কে যেন আস্তে আস্তে টোকা দিচ্ছে। প্রথমে মনে হল মিঃ সিডনীর এটা আরেকটা মোটা রসিকতা হয়ত। সিডনীর যেমন দশাসই পাহাড়ের মত চেহারা, প্রাণে ফুর্তিরও তেমনি অজস্র ফোয়ারা। আমুদে মিশুকে লোক, এখানে এসে কদিনের আলাপেই আমার সংগে জমিয়ে ফেলেছে। এই কদিন আগের রাত্রেই জানালার কাছে কি একটা অস্পষ্ট শব্দ শুনে জেগে উঠে দেখি একটা বিরাট ভালুকের মতো কালো মূর্তি পাল্লা দুটো একটু ফাঁক করে ঘরে উঁকি দিচ্ছে। ঘরে আলো নেই তখন, কিন্তু হোটেলের দূরের বারান্দার আলোয় তার আকারটা ফুটেছে জানালার ফ্রেমে। সাড়া না দিয়ে চুপ করে কিছুক্ষণ থাকবার পর দেখলাম মূর্তিটা জানালা টপকে সন্তর্পণে ভেতরে নামল। তারপর ধীরে এগিয়ে এল আমার মশারীর কাছে। মশারীটার একটা কোণ একটু তোলবার চেষ্টা করেই মূর্তিটা কোঁকিয়ে উঠে মেঝের ওপর গিয়ে ছিটকে পড়ল। এক লাফে উঠে আলো জেলে তারপর হেসে আর বাঁচি না। কালো পোশাক পরে মিঃ সিডনীই মেঝেয় কাত হয়ে পড়ে আছে। মিঃ সিডনীও একবার করে হাতের যন্ত্রণায় কোঁকায় আর একবার হাসে। হেসে বলতে লাগল, আমায় ভয় দেখাতে এসে এমন শাস্তি হবে জানলে সে আসত না। জব্দ করতে এসে নিজেই কিনা জব্দ। হাসতে হাসতে যাবার সময় জিজ্ঞাসা করে গেল,—আমার হাতে সাঁড়াশী লুকোন আছে কিনা? নইলে এক মোচড়ে হাতটা ভাঙবার যোগাড় হয়!

আজ আবার সিডনী রসিকতা করতে এসে থাকলে আর একটু কড়া ওষুধ দেব ঠিক করে চুপি চুপি দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। আবার দুটো টোকা পড়ল তারপর। না সিডনী এমন ভয়ে ভয়ে টোকা দেবার মানুষ নয়।

দরজাটা হঠাৎ খুলে দিতেই যে মূর্তিটা ছায়ার মত নিঃশব্দে ঢুকে ঘরে ঢুকল অন্ধকারেই সে কে বুঝতে আমার দেরি হল না।

চাপা গলায় বললাম,—কি? হ্যারিস না জোয়াকিম কি বলে এখন ডাকব আপনাকে?

ফিসফিস করে প্রায় কাঁদো কাঁদো গলায় সে বললে,—মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা দিও না ডক্। আমার দুঃখের কাহিনী আগে শোনো।

—শুনতেই তো চাই।

—তাহলে এখানে নয়। হোটেলের বাইরে কোথাও নির্জনে গিয়ে বসি চলো।

তাই গেলাম আর জোয়াকিমের সমস্ত কাহিনীও শুনলাম।

আমার অনুমানে এতটুকু ভুল হয়নি। এ বৃদ্ধ সেই বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক জোয়াকিম, মহাযুদ্ধের কয়েক বছর আগে নাৎসীদের হাত এড়িয়ে নির্বিঘ্নে নিজের যুগান্তকারী গবেষণা করবার জন্যে প্রশান্ত মহাসাগরের একটি জনমানবহীন ছোট্ট দ্বীপ ইজারা নিয়ে নিজেকে যিনি সমস্ত পৃথিবী থেকে নির্বাসিত করে রাখেন।

সেই দ্বীপেই জোয়াকিমের সংগে আমার তখন পরিচয়। নাৎসী চরেরা তাঁর গবেষণার দাম বুঝে হন্যে হয়ে সন্ধান করতে করতে তাঁর এই গোপন আস্তানারও যে খবর পেয়েছে এবং যে কোনো দিন যে তাঁকে পাকড়াও করতে আসতে পারে এই খবর দিতেই আমি সেখানে গেছলাম। গিয়ে তাঁর গবেষণার মূল্যবান সব কিছু লুকিয়ে রাখবার ব্যবস্থা করে, নাৎসী গুণ্ডারা সত্যিই একদিন হানা দেবার পর একরকম তাদের নাকের ওপর দিয়ে জোয়াকিমকে সরিয়েও দিয়েছিলাম সে দ্বীপ থেকে। যাবার সময় বলে দিয়েছিলাম পরে যে কোন সময়ে যেন ফিরে এসে জোয়াকিম তাঁর গবেষণার কাজ উদ্ধার করেন।

কিন্তু সে তো প্রায় পোনেরো বছর আগেকার কথা। তার মধ্যে অত বড় মহাযুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে, নাৎসী জার্মানীর অস্তিত্ব আর নেই। এতদিনেও জোয়াকিম তাঁর সেই গবেষণার কাজ সে দ্বীপ থেকে উদ্ধার করতে পারেননি!

সেই প্রশ্নই অবাক্ হয়ে করলাম।

জোয়াকিম হতাশ ভাবে বললেন,—কি করব। তুমি তো জানো ডস, ওয়ালিস দ্বীপাবলির যেটি আমি ইজারা নিয়েছিলাম তা নেহাত নগণ্য পাথুরে একটা সমুদ্রের চড়ার মত। ওরকম ন্যাড়া পাথুরে ছোট্ট দ্বীপ ওখানে যে কত আছে তার ঠিক-ঠিকানা নেই। ইজারা নেবার কাগজপত্রও যুদ্ধের সময় হারিয়ে ফেলেছি। এখন সে দ্বীপ আমি চিনব কি করে? বুড়ো হয়েছি, ক'বছর আর বাঁচব! কাছাকাছি সব কটা দ্বীপ খুঁজে বেড়াতে হলে তো আমার পরমায়ুতেই কুলোবে না। তা ছাড়া আমার গভীর সন্দেহ হচ্ছে যে নাৎসীরা শেষ হয়ে গেলেও অন্য কোন দুশমনদের চর আমার পিছু নিয়েছে। তাড়াতাড়ি গোপনে সে দ্বীপ খুঁজে বার করতে না পারলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। আমার গবেষণা যতদূর এগিয়ে রেখেছি তা দুশমনদের কারুর যদি হাতে পড়ে, তাহলে পাষণ্ড কোন বৈজ্ঞানিক—তা থেকেই হয়ত আসল কাজ উদ্ধার করে নেবে।

হেসে বললাম,—দুশমনদের হাতে পড়বে কেন? তারা তো আর সে দ্বীপ চেনে না।

কিন্তু আমিও যে চিনি না!

আপনি না চেনেন আমি তো চিনবো!

তুমি চিনবে!—জোয়াকিমের গলার স্বরে বোঝা গেল কথাটা তিনি বিশ্বাস করতে পারছেন না।

আশ্বাস দিয়ে বললাম,—হ্যাঁ চিনব। পোনেরো বছরে তিন ইঞ্চি, এই হিসেব ধরেই চিনব!

সে আবার কি?—প্রশ্নটা জোয়াকিম করেছিলেন কিনা জানি না, কিন্তু আমাদের মুখ দিয়ে আপনা থেকেই বেরিয়ে গেল।

যথাসময়েই জানবে!—এসব নির্বোধ প্রশ্ন যে পছন্দ করেন না তা বুঝিয়ে ঘনাদা আবার শুরু করলেন,—জোয়াকিমকে সেখান থেকে সাহস দিয়ে বিদায় দেবার সময় হঠাৎ চমকে উঠলাম। অন্ধকারে কাছের একটা টিবির আড়াল থেকে কী যেন সরে গেল মনে হল। সেই দিকে যেতে গিয়েও নিজেকে রুখলাম। এই দ্বীপেও শত্রুর উপস্থিতি যে আমি টের পেয়েছি তা আর তাকে না জানানোই ভালো, কিন্তু আমাদের আর দেরি করা চলবে না। জোয়াকিমের কাছে জানা গেছে যে তাঁর ইজারার মেয়াদ এই ১৯৫২তে শেষ। বছর শেষ হবার আগেই, সুতরাং নতুন ইজারা নিতে হবে। কিন্তু দ্বীপ না খুঁজে পেলে ইজারা নেওয়া হবে কিসের? দ্বীপটা এই বছরেই না খুঁজে পেলেই নয়।

কিন্তু খোঁজবার জন্যে সেখনে যাওয়া তো দরকার। ওয়ালিস দ্বীপাবলিতে এই বছরের মধ্যে যাবো কি করে?

পরের দিন সকালে খোঁজ করতে গিয়ে একেবারে চক্ষুস্থির। নরফোক দ্বীপে চোদ্দ দিন অন্তর একটি করে প্লেন আসে অস্ট্রেলিয়া আর নিউজিল্যাণ্ড থেকে। আসে শুধু শনিবারে। টেলিগ্রাফও নেই যে অস্ট্রেলিয়া থেকে টেলিগ্রাফে তাড়া করে একটা সী-প্লেন আনাবো। আগের দিনই ছিল শনিবার। প্লেন যা আসবার এসে চলে গেছে, সুতরাং আরও তেরোটি দিন অপেক্ষা না করে উপায় নেই। কিন্তু তেরোদিন বাদেই তো একত্রিশে ডিসেম্বর। বছরের শেষ।

কি ভাবে যে সেই তেরোটা দিন কাটালাম তা বলে বোঝানো যায় না। এমন শুভ যোগাযোগের পর শুধু একটু সময়ের অভাবে সব আশায় ছাই পড়বে। সম্ভব হলে বোধ হয় সাঁতরেই চলে যেতাম। তার বদলে শুধু হাত কামড়েই তেরো দিন কাটালাম।

একুত্রিশে ডিসেম্বর প্লেনে জোয়াকিমকে নিয়ে অস্ট্রেলিয়ায় পেঁাছেই একটা সী-প্লেন ভাড়া করতে ছুটলাম। কিন্তু ভাগ্য সেখানেও বিরূপ। সেদিন রাত্রে যাবার মত একটা প্লেনও ভাড়া পেলাম না। রওনা হতে হল বাধ্য হয়েই তার পরদিন সকালে। পাইলটকে বলে দিলাম ওয়ালিস দ্বীপপুঞ্জের ওপর গিয়ে শুধু যেন খানিক চক্কর দিয়ে ফেরে। ভোর না হতে বেরিয়েছিলাম। দুপুর নাগাদ ওয়ালিস দ্বীপপুঞ্জের মাথায় গিয়ে প্লেনটা চক্কর দিতে লাগল। জোয়াকিম ও আমি দুজনেই তখন প্লেনের দুদিকের জানলায় মুখ বাড়িয়ে নীচের দিকে চোখ এঁটে বসে আছি। এক রাশ ছোট ছোট পাথুরে দ্বীপ। সব এক রকম। আলাদা করে চেনে কার সাধ্য। প্লেনটা একটু নীচে নেমে এসে বার কয়েক চক্কর দেবার পরই আমি আনন্দে চীৎকার করে উঠলাম,—পেয়েছি ডাঃ জোয়াকিম! পেয়েছি আপনার সাতরাজার ধন মানিকের দ্বীপ!

পাইলটকে সে দ্বীপের এক ধারে খানিকটা ঘেরা বন্দরের মত সমুদ্রে প্লেন নামাতেও বললাম।

কিন্তু বাধা দিলেন স্বয়ং জোয়াকিম। বেশ একটু সন্দিগ্ধস্বরে বললেন,—করছ কি ডস্? তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে! এ দ্বীপ আমার হতে পারে না।

হেসে জিজ্ঞাসা করলাম,—কেন বলুন তো!

কেন?—জোয়াকিম একটু বিরক্তির সংগেই বললেন,—দেখতে পাচ্ছ না, দ্বীপটা দস্তুরমত সবুজ!

দেখতে পাচ্ছি বলেই ত বলছি এই আপনার দ্বীপ!

জোয়াকিম হতভম্ব হয়ে বললেন,—তার মানে?

মানে—এখুনি বুঝিয়ে দেব। আগে প্লেনটা নামতে দিন।

প্লেন সে দ্বীপের সমুদ্রে নামবার পর মানেটা জোয়াকিমকে বোঝাবার সময় কিন্তু পাওয়া গেল না। এমন আশ্চর্য সৌভাগ্যে এ দ্বীপ খুঁজে পাবার পর তা আবার নতুন করে ইজারা নেবার যেটুকু আশা ছিল আমাদের প্লেনের মিনিট দুয়েক পরেই আর একটি অনেক বড় প্লেন নামার সংগে সংগে তা ধূলিসাৎ হয়ে গেল।

সে প্লেন থেকে আমাদের মতই ছোট রবারের বোটে তীরে এসে নামল আর কেউ নয়, স্বয়ং সিডনী।

আমি তখন সমুদ্রের তীরের ওপরই দাঁড়িয়ে এ দ্বীপ কি করে চিনলাম তাই জোয়াকিমকে বোঝাচ্ছি।

একগাল হেসে আমাদের দিকে এগিয়ে আসতে আসতে সিডনী সমস্ত দ্বীপটাকে যেন শুনিয়ে বললেন,—আরে মিঃ দাস না! পৃথিবীটা বড্ড ছোট মনে হচ্ছে! এখানে আপনাকে দেখব তা তো ভাবিনি!

বললাম,—আমি কিন্তু জানতাম আপনি আসছেন।

বলেন কি!—সিডনী বিরাট শরীরটা কাঁপিয়ে হেসে উঠল। হাসতে হাসতেই জিজ্ঞাসা করলে,—কবে থেকে?

সাপের ভয়ে যেদিন নরফোক দ্বীপে টর্চ নিয়ে বেরিয়েছিলেন সেই দিন থেকেই!

তাই থেকেই বুঝে ফেললেন! একটু বেশী হেঁয়ালি হয়ে যাচ্ছে না?

হেঁয়ালি নয়, ব্যাপারটা অত্যন্ত সোজা! আপনিও জানেন নরফোক দ্বীপে আর যাই থাক, সাপ নেই। ও কৈফিয়তটা দিয়ে সেদিন তাই ভালো করেননি। আমার ঘরে রাত্তির বেলা হানা দিতে এসেও একটু ভুল করেছিলেন বোধ হয়।

কিন্তু এখন বোধহয় ভুল করিনি। সিডনীর গলা কর্কশ হয়ে উঠল—সাপ না থাক, নরফোক দ্বীপে একটা নেংটি ইঁদুর আর ছুঁচো ছিল। সে দুটো আবার এখানে এসে জুটেছে! তাই সে দুটোকে তাড়াবার জন্যেই এখানে এসেছি। [illegible] বোধহয়!

হেসে বললাম,—আপনার উদ্দেশ্য খুব সাধু সন্দেহ নেই। কিন্তু সেদিন রাত্রে টিবির আড়াল থেকে সব শুনে ওই নেংটি ইঁদুর আর ছুঁচোর পিছু নিয়েই তো এ দ্বীপের সন্ধান পেয়েছেন। এ দ্বীপটাও যে নেংটি ইঁদুরের না হোক ওই ছুঁচোর, তাও ভুলে যাচ্ছেন কেন?

সিডনী আবার হো হো করে হেসে উঠে বললে,—ও এ দ্বীপ তোমাদের। মানে ওই ছুঁচো বৈজ্ঞানিক ডাঃ জোয়াকিমের। আজ কত তারিখ তা খেয়াল আছে? ১৯৫৩ সালের ১লা জানুয়ারি, কাল ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত জোয়াকিমের ইজারা ছিল এ দ্বীপের ওপর। কালকের মধ্যে যখন নতুন ইজারা নিতে পারেনি তখন আর ইজারা পাচ্ছে কোথায়? আজকের মধ্যেই অস্ট্রেলিয়ায় ফিরে গিয়ে কাল সকালেই এ দ্বীপের অবস্থান জানিয়ে আমরা নতুন ইজারা নিচ্ছি।

ডাঃ জোয়াকিম এ কথা শুনে কাতরভাবে বলে উঠলেন,—কি হবে তাহলে ডস্? সব যে গেল!

তাঁকে হাত নেড়ে থামিয়ে নিতান্ত নিরীহকণ্ঠে বললাম,—তা ইজারা আপনারা নিতে চান, নিন। ডাঃ জোয়াকিমের এ দ্বীপে লুকিয়ে রাখা গবেষণার জিনিসগুলো আমরা শুধু খুঁজে নিয়ে যাই তাহলে?

খুঁজে নিয়ে যাবি তোরা।—সিডনী হিংস্রভাবে হেসে উঠল,—একবার চেষ্টা করে দেখই না!

সিডনী তখন পিস্তল বার করেছে, তার পেছনেও তার প্লেনের দুজন সংগী এসে দাঁড়িয়েছে পিস্তল উঁচিয়ে।

তাদের দিকে চেয়ে যেন ভয়ে ভয়ে বললাম,—আপনাদের যেন খুঁজতে দেবার ইচ্ছে নেই মনে হচ্ছে?

বুঝতে পেরেছিস কালা সেংটি!—সিডনীর সে কি উল্লাসের হাসি। সে হাসি থামিয়ে দাঁত খিঁচিয়ে বললে—শোন, নাৎসীদের ফাঁকি দিয়ে ওই ছুঁচো বৈজ্ঞানিকটা এখানকার গর্তে সেঁধিয়ে যে গবেষণা করেছে, আর নাৎসীদের ভয়েই যন্ত্রের আগে যা এখানে লুকিয়ে রেখে গেছে, তা আমরাই এবার খুঁজে বার করব।

ভালোমানুষের মত বললাম,—কিন্তু আমরা না থাকলে লুকোন জায়গা খুঁজতে একটু অসুবিধা হবে না? খুঁজে হয় তো পাওয়া যাবে শেষ পর্যন্ত, কিন্তু দেরী হতে পারে তো!

হয় হবে!—সিডনী গর্জন করে উঠল,—যতদিন লাগে খুঁজব। এ দ্বীপ তখন আমাদের।

কিন্তু এ দ্বীপের দখল যদি না পান?—নির্বোধের মত সিডনীর দিকে তাকালাম।

না পাব কি! পেয়ে গেছি।—সিডনী জ্বলে উঠল,—আমাদের লোক অস্ট্রেলিয়ায় বসে আছে তৈরী হয়ে। খবরটা নিয়ে গেলেই রেজেস্ট্রি।

আমরা এখন যদি অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে আমাদের দাবি জানাই?—আমার সরল জিজ্ঞাসা।

সিডনী চিড়বিড়িয়ে উঠল একেবারে,—তোরা গিয়ে দাবি জানাবি? আমাদের প্লেনটা দেখেছিস? তোদের ও রদ্দি প্লেনের ডবল জোরে চলে। তোদের প্লেন মাঝপথে থাকতেই আমরা পেঁাছে যাবো। তাছাড়া অস্ট্রেলিয়ার দিকে তোদের প্লেন একবার চালাবার চেষ্টা করে দেখ না? কতকাল বাদে কে জানে, সমুদ্রে একটা রদ্দি সীপ্লেন-ডুবির খবর শুধু বেরুবে! আমাদের প্লেনে কটা কামান আছে জানিস?

যেন সভয়ে বললাম,—থাক, জানবার দরকার নেই। আমাদের তাহলে এখান থেকে খসে পড়াই সুবুদ্ধির কাজ?

হ্যাঁ এবং এই মুহূর্তে। মনে থাকে যেন অস্ট্রেলিয়ার দিকে প্লেন ফেরালে আর রক্ষে থাকবে না। ভালোয় ভালোয় যে জ্যান্ত ফিরে যেতে দিচ্ছি এই ভাগ্যি মনে কর।

ধন্যবাদ মিঃ সিডনী!—বলে গদগদ হয়ে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে মৃতভস্ম ডাঃ জোয়াকিমকে নিয়ে আমাদের প্লেনের দিকে চললাম। আমাদের পিছনে পিস্তল উঁচিয়ে চলল সিডনী আর তার সংগীরা। আমাদের প্লেনে উঠিয়ে বিদেয় না করে তারা ছাড়বে না বোঝা গেল।

ডাঃ জোয়াকিম যেতে যেতে হতাশভাবে বললেন,—কোথায় যাবে ডস্?

দেখি কোথায় যাই! আমিও করুণ সুরে বললাম,—অস্ট্রেলিয়ার দিকে যাওয়া তো বারণ।

হ্যাঁ অস্ট্রেলিয়া শুধু নয়, নিউজিল্যাণ্ডেও। পশ্চিমে কি দক্ষিণে কোন দিকে প্লেন চালালেই মজা টের পাবে!—সিডনী হুংকার ছাড়ায় বুঝলাম আমার কথাগুলো তার কানে গেছে।

দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললাম,—না মজার লোভ আর নেই। পুবদিকেই তাহলে কোথাও যেতে হবে।

প্লেনে উঠে পুব দিকেই সত্যি সত্যি রওনা হলাম। চালাকি করে লুকিয়ে কোথাও থেকে মুখ ঘুরিয়ে অস্ট্রেলিয়া যাবার চেষ্টা করে এখন লাভও নেই। আমাদের প্রায় সংগে সংগে সিডনীর প্লেনও আকাশে উঠে চক্কর দিচ্ছে। কোন রকমে ফাঁকি দেওয়া সম্ভব হলেও সে প্লেনের আগে অস্ট্রেলিয়ায় পেঁাছোন যাবে না।

কিছুদূর যাবার পর জোয়াকিম বুক-ফাটা যন্ত্রণার সংগে বলে উঠলেন,—কি যে সর্বনাশ হল ডস্! শুধু একটা দিন আগেই রেজেস্ট্রিটা যদি করে ফেলতে পারতাম!

শান্তস্বরে বললাম,—একটা দিন আগেই রেজেস্ট্রি করবেন, চলুন না!

এই দুঃখের ওপর আর ঠাট্টা কোরো না ডস্!—জোয়াকিমের গলায় ক্ষুব্ধ ভর্ৎসনার স্বর।

ঠাট্টা তো করছি না।

ঠাট্টা করছ না!—জোয়াকিম যেভাবে আমার দিকে তাকালেন তাতে বোঝা গেল আমার মাথা খারাপ হয়েছে বলেই তাঁর সন্দেহ। একটু রাগের সঙ্গেই তারপর বললেন,—একটা দিন আগে যাওয়া যায়! হ্যাঁ, টাইম-মেশিন বলে সত্যি কিছু থাকলে যাওয়া যেত।

টাইম-মেশিনের দরকার নেই। এই প্লেনেই যাওয়া যায়। আর যায় শুধু নয়, আমরা আগের দিনেই সত্যি পৌঁছে গেছি।

জোয়াকিম হতভম্ব হয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। বললাম,—আমার মুখ কি দেখছেন? নীচের দিকে তাকান। প্লেন আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা পার হয়ে সামোয়া দ্বীপ-পুঞ্জের ওপর এখন এসেছে। এ তারিখ-রেখার ওপারে এখন ১৯৫৩ এর ১লা জানুয়ারি বটে কিন্তু পুব দিকে এপারে এখন ১৯৫২ সালের ৩১শে ডিসেম্বর। আমরা খানিক বাদেই প্রধানতম শহর ও বন্দর প্যাগো প্যাগোতে নামছি—সেখানে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের কর্তৃত্ব। তাদের মারফত আপনি ও দ্বীপের ইজারা বছরের এই শেষ দিনেও যদি নতুন করে নিয়ে রেজেস্ট্রি করান, আর কেউ তাহলে তারপর ও দ্বীপ ছুঁতেও পারবে না। দুশমনদের সব শয়তানী তাহলে ভণ্ডুল!

ডাঃ জোয়াকিম খানিক বিমূঢ় ভাবে বসে থেকে হঠাৎ আনন্দে চীৎকার করে উঠে প্লেনের মধ্যেই আমায় জড়িয়ে ধরলেন। তারপর সে কি উচ্ছ্বাস!—সত্যি এ কথাটা আমার মাথাতেই আসেনি ডস্! ওয়ালিস্ আর সামোয়া দ্বীপপুঞ্জ যে পাশাপাশি হলেও আন্তর্জাতিক তারিখ-লাইনের দুধারে এ খেয়ালই আমার হয়নি! তোমায় কি বলে যে ধন্যবাদ দেব!

হেসে বললাম,—ধন্যবাদ আমায় নয়, দিন ওই কেঁচোদের।

কেঁচোদের!—জোয়াকিম আবার হতভম্ব।

হ্যাঁ সেই কেঁচোদের, যাদের অনুগ্রহ ছাড়া ও দ্বীপ অমন সবুজ হত না আজ, আর আমরাও চিনতে পারতাম না শত চেষ্টাতেও।

তার মানে?

তার মানে এই যে গত মহাযুদ্ধের আগে নাৎসী গুণ্ডাদের হাত থেকে বাঁচাতে আপনাকে ও দ্বীপ থেকে সরিয়ে দেবার সময়ই, দ্বীপটা পরে খুঁজে পাবার ওই বুদ্ধি আমি করেছিলাম। আপনার মনে আছে কিনা জানি না যে মার্কিন মুলুক থেকেই আমি আপনার ও দ্বীপে যাই। আমেরিকার এক কেঁচো-পালন কেন্দ্র থেকে কেঁচোর ডিমের গুটি আমি সঙ্গে করে এনেছিলাম। সেই ডিমভরা গুটিই আমি ও দ্বীপে ছেড়ে দিয়ে আসি। জানতাম যে কয়েক বছরের মধ্যেই ওই সব গুটির ডিম থেকে বেরিয়ে সারা দ্বীপ কেঁচোয় ছেয়ে যাবে আর তারাই নীচের মাটি ওপরে তুলে সমস্ত দ্বীপ উর্বর করে তুলবে। করেছেও তাই। সেই উর্বর মাটিতেই ঘাস ঘাসড়া গজিয়ে সমস্ত দ্বীপ সবুজ হয়ে গেছে। সেই দেখেই আমি ও দ্বীপ চিনেছি। নরফোক্ দ্বীপে আমি বলেছিলাম,—পোনেরো বছরে তিন ইঞ্চি হিসেব দেখেই আপনার দ্বীপ আমি চিনব। প্রায় পোনেরো বছর বাদে এ দ্বীপে আমরা এলাম। পোনেরো বছরে কেঁচোরা সাধারণতঃ তিন ইঞ্চি উর্বর মাটি নীচে থেকে ওপরে তুলে জমায় বলেই ওকথা বলেছিলাম।

ঘনাদা একটু থামলেন।

জিজ্ঞাসা করলাম,—আপনার ডাঃ জোয়াকিম তাহলে তাঁর দ্বীপের ইজারা আবার পেলেন!

পেলেন বইকি! প্যাগো প্যাগোতে নেমেই নতুন করে রেজেস্ট্রি করিয়ে নিলেন। সেখান থেকে সবার আগে অস্ট্রেলিয়ার সমস্ত রেজেস্ট্রি অফিসেও খবর পাঠিয়ে দেওয়া হল।

মুখের গ্রাস হারিয়ে সেই সিঙ্গাড়া নিশ্চয় তখন খাপ্পা।—গোর ভোজের শেষে পাস মসলাও বাদ দিতে চায় না। জিজ্ঞাসা করলে,—আপনার সঙ্গে আর দেখা হয়নি?

হয়েছিল। প্যাগো প্যাগোতেই এসেছিল আমার দফা নিকেশ করতে।

তারপর?—আমরা উদ্‌গ্রীব।

ঠিক জানি না। হাসপাতাল থেকে এতদিনে বোধহয় বেরিয়েছে।—ঘনাদা হাই তুললেন।

আচ্ছা আপনার ডাঃ জোয়াকিম তাঁর নুকোন গবেষণার জিনিস খুঁজে পেয়েছেন তো।—আমরা এখনও কৌতূহলী।

পেয়েছেন।—ঘনাদা সংক্ষিপ্ত।

অত দামী গবেষণার বস্তুটা কি?—আমরা নাছোড়বান্দা।

বস্তুটা কি?—ঘনদা অবজ্ঞা ভরে আমাদের দিকে তাকালেন,—বস্তুটা কি, জোয়াকিম বুঝবে?

না বুঝি, শুনতে দোষ কী?—আমাদের সবিনয় নিবেদন।

বস্তুটা একটা অঙ্ক।—ঘনাদার মুখে অনুকম্পা মিশ্রিত তাচ্ছিল্যের হাসি।

অঙ্ক!

হ্যাঁ স্রেফ একটা অঙ্ক যার কিছুটা কষা বাকী রেখে জোয়াকিমকে পালাতে হয়েছিল। পুরোন কাগজপত্র উদ্ধার করে এখনও তিনি যা কষছেন।

একটা অঙ্কের জন্যে এত!—আমাদের সন্দেহমিশ্রিত বিস্ময়।

হ্যাঁ, একটা অঙ্কের জন্যে। একটা অঙ্কের কি দাম হতে পারে ভাবতে পারো?—ঘনাদা আবার উত্তেজিত,—ই ইকোয়াল টু এম সি স্কোয়ার অঙ্কটার কথা কখনো শুনেছ?

না শোনাই যুক্তিযুক্ত বুঝে তাঁর দিকে সসম্ভ্রমে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম,—আপনার অঙ্ক বুঝি ঘনাদা!

না,—ঘনাদা ঝাঁঝিয়ে উঠলেন,—আইনস্টাইনের আপেক্ষিকবাদের অঙ্ক, ওই একটা অঙ্কে দুনিয়ার সব মানেই পালটে গিয়েছে। ডাঃ জোয়াকিমের অঙ্ক তার চেয়েও জটিল, সূক্ষ্ম। সে অঙ্ক কষা হয়ে গেলে মানুষের হাতে কি ক্ষমতা যে আসবে তা কেউ ভাবতেও পারে না।

এই মেসে বসেই রাজা উজির যা চাই তাই হতে পারবো!—শিবু হঠাৎ রসভঙ্গ করে বসল,—হ্যাঁ ভালো কথা মনে পড়েছে। আপনার নুরুদ্দিনকে হুকুম পাঠিয়েছেন নিশ্চয় ঘনাদা। কিচিঙ্গে যাওয়া না হয়ে ভালোই হল। অ্যাঙ্গোরা খাসির মাংসটা প্রাণ ভরে খাওয়া যাবে, কি বলেন!

কেমন করে যাবে? নুরুদ্দিন তো খাসি তৈরীই রেখেছিল কিন্তু সবাই কিচিঙ্গে যাচ্ছে জেনে তাকে বারণ করে দিতে হল যে! যা অভিমানী লোক, ওর কাছে আর কিছু কখনো চাওয়াই যাবে না।—অম্লানবদনে বলে ঘনাদা শিশিরের দিকে হাত বাড়ালেন,—গলাটা কেমন শুকনো-শুকনো লাগছে কেন বলো তো হে?

আজ্ঞে বুঝেছি।—বলে শিশির সিগারেটের টিন আনতে ছুটল।

মাছি

ঘনাদা চৌকাঠ পেরিয়েই থমকে দাঁড়ালেন।

আমরা সবাই অবাক্।

ঘনাদা তারপর নাকটা বার দুই কুঁচকোলেন সেই সঙ্গে ভুরু জোড়াও।

আমরা উৎকণ্ঠিত।

ঘনাদা নাসিকাধ্বনি করার সঙ্গে সঙ্গে আমরা দিশেহারা।

আমরা শশব্যস্ত হয়ে তখন যে যার আসন থেকে উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়েছি হন্তদন্ত হয়ে। ঘনাদার এ নাসিকা-কুঞ্চন মোটেই শুভলক্ষণ নয়। এত ভেবে চিন্তে যে ফন্দি করা হয়েছে তা বুঝি শুরুতেই যায় ভেস্তে।

কিন্তু অই বা কি করে হয়? ঘনাদার ঘ্রাণেন্দ্রিয় অতি তীক্ষ্ণ না হয় মানলাম কিন্তু আমাদের যা মতলব তা তো ঘ্রাণে টের পাবার জিনিস নয়। ঘনাদা নাকে শুঁকেই কি তাঁর জন্যে সাজানো ফ্যাসাদটা আঁচ করে ফেললেন!

এ সব চিন্তা নিমেষে আমাদের মনে তখন খেলে গেছে।

ঘনাদাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আমরা রহস্যটা বুঝতে ও তাঁকে আশ্বস্ত করতে ব্যস্ত হয়ে উঠলাম।

—কি হয়েছে ঘনাদা?

—কি হয়েছে!—ঘনাদা যেন আসামীর দিকে সরকারী কৌঁসুলীর মত তাকিয়ে ফেটে পড়লেন,—এখানে দুর্দণ্ড এসে বসতাম। তাও বন্ধ করতে চাও।

বলেন কি ঘনাদা!—আমরা সত্যি আকাশ থেকে পড়ি।

আপনার বসবার জন্যেই ত এত আয়োজন!—বললে শিবু।

বলোয়ারী এখুনি এলো বলে।—গৌরের ইঙ্গিত।

হাত না পুড়লে ফেরত।—আমি সে ইঙ্গিতটি আরো একটু মোটা করে বুঝিয়ে দিলাম।

একেবারে বাদশাহী শিওড়া।—শিশির সোজা বাংলায় ব্যাখ্যা করে দিলে,—হাতের সুখোয় ধরে না।

কিন্তু কোন টোপেই কাজ হল না।

ও ছাইপাঁশ তোমরাই খেয়ো।—বলে ঘনাদা একেবারে রাইট অ্যাবাউট টার্ন করে সোজা তাঁর তেতলার কুঠরির দিকে পা বাড়ালেন।

আমাদের তখন চোখ কপালে উঠেছে।

হরি ময়রার দোকানের বাদশাহী শিঙাড়া ঘনাদার কাছে ছাইপাঁশ! জেগে আছি না ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছি চিমটি কেটে বুঝি দেখতে হয়!

তবু ঘনাদার সঙ্গে খানিকটা যেতে হল শেষ চেষ্টা করতে।

আপনার জন্যে সবাই যে বসে আছি ঘনাদা!—আমার করুণ নিবেদন।

মৌলুবী সাহেব সেই কায়রো থেকে এসেছেন।—শিবুর বেফাঁস বোকামি। কিন্তু সেটা সামলাবার দরকার হল না। তাতেই কাজ হবে বলে একটু যেন আশা পেলাম।

কে এসেছেন!—ঘনাদা সিঁড়ির পয়লা ধাপ থেকে ফিরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলেন।

মৌলুবী জিয়াউদ্দিন খাঁ।—অবস্থা বুঝে শিশির তৎপর হয়ে একটু উসকে দিল।

মিশরের আল আঝার থেকে আসছেন শুধু আপনার সঙ্গে দেখা করতে।—আমি সবিস্তারে জানাতে বিলম্ব করলাম না।

কেন?—ঘনাদার গলার স্বরটা কেমন যেন কম্পিত মনে হল। সেটা ভয়ে না বিরক্তিতে বোঝবার চেষ্টা না করাই ভালো।

আপনি ছাড়া আর গতি নেই যে!—গোঁর ঘনাদাকে টঙে তোলবার ব্যবস্থা করলে,—ইব্‌ন জুবেরের ও পুরোনো পুঁথির নইলে মানে করবে কে?

ঘানদার মুখের ওপর দিয়ে একটু ছায়া সরে গেল কি?

ও, ইব্‌ন জুবের!—বলে যে রকম ব্যস্ত হয়ে সিঁড়ি ভাঙতে শুরু করলেন তাতে বুঝলাম তাঁর ঘুমন্ত স্মরণশক্তিটা একটু খুঁচিয়ে দেওয়া দরকার।

ভাগ্যে ইব্‌ন জুবেরের নামটা আপনার কাছে শুনেছিলাম!—তাঁর পিছু পিছু আছোড়-বান্দা হয়ে উঠতে উঠতে বললাম,—মৌলুবী সাহেবকে সে গল্প বলতেই উনি ত একেবারে আহ্লাদে আটখানা!

ঘনাদা ততক্ষণে নিজের ঘরে ঢুকে পড়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে আমরাও।

রিলে রেসের মত আমার কথার খেই ধরে গোঁর শুরু করে দিলে,—ইব্‌ন জুবেরের নিজের হাতে লেখা একটা দুষ্প্রাপ্য পুঁথি আপনাকে দিয়ে একটু পড়িয়ে নেবার জন্যে মৌলুবী সাহেব অনেক আশা করে এসেছেন।

হুঁ, বলে ঘনাদা তাঁর গড়গড়ার কলকেটা তুলে নিয়ে তাতে টিকে সাজাতে ব্যাপৃত হলেন।

—আপনার সঙ্গে আমরা অমন অভদ্রের মত চলে আসায় কি ভাবছেন কে জানে!

ঘনাদা নীরবে টিনের কৌটো খুলে টিকের ওপর অব্যর্থ তামাক রাখলেন গদীল পাকিয়ে।

—শুধু একবার পুঁথিটা একটু পড়ে দিয়েই যদি চলে আসতেন আমাদের মান থাকত। বড় মুখ করে ডেকে এনেছি।

ঘনাদা দেশলাই জেবলে একটা টিকে ধরাতে তন্ময় হলেন।

—আরবী ত আপনার বলতে গেলে ডালভাত। সেই নকল ইব্‌ন ফরিদের আরবী শুনেই তার বিদ্যের দৌড় আর শয়তানী কি রকম সেবার ধরে ফেলেছিলেন! হতভাগা নাম ভাঁড়িয়ে ইব্‌ন ফরিদের নাম চালাতে গেছল আপনার কাছে। ম্যার কাছে মামার বাড়ির গল্প!

ঘনাদারই পুরোনো গল্পের নজির টেনে তাঁকে তাতাবার চেষ্টা করলাম।

ঘনাদার তাতবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। তাঁর কলকেটাই ধরে উঠল তাঁর ফুঁয়ে।

পুঁথিটা নাকি সুদানের ওয়াদি ঘাজালের এক বৃদ্ধ পুরোনো খদে পিরামিডে মৌলবী সাহেব পেয়েছেন।—আমরাও কোনরকমে ফুঁ দিয়ে চললাম ঘনাদার ছাইচাপা আগুন জাগিয়ে তোলবার আশায়।

ঘনাদা গড়গড়ার ওপর কলকে বসিয়ে নলটা বাগিয়ে ধরে মৃদুমন্দ টান দিতে শুরু করলেন।

—ইব্‌ন জুবের স্পেনের গ্রানাদা থেকে বাগদাদ যাবার পথে এ পুঁথি নাকি হারিয়ে ফেলেছিলেন। এতদিন বাদে সে পুঁথি উদ্ধার হয়েও শেষে পড়বার লোকের অভাবে মাঠে মারা যাবে।

ঘনাদার নয়, তাঁর গড়গড়ার নলের আওয়াজই শুধু শোনা গেল।

—বনোয়ারী এতক্ষণে শিঙাড়াগুলো ভাজিয়ে আনল বোধ হয়।

ঘনাদা একরাশ ধোঁয়া ছাড়লেন।

—মৌলবী সাহেবকে অনেক আশা দিয়ে আমরাই এনেছিলাম।

তাহলে ভালোই হয়েছে চলে এসে। মৌলবী সাহেবকে নিরাশ আর করতে হল না।—ঘনাদা এতক্ষণে মুখ খুললেন।

তার মানে!—আমরা বিমূঢ়,—ঘরের দরজা থেকে একটা কথা না বলে ফিরে এলেন। এর পর আর নিরাশ করা কাকে বলে!

ঘরে ঢুকলে আরো নিরাশ করতে হত!—ঘনাদার উক্তি তাঁর গড়গড়ার ধোঁয়ার মতই।

আমাদের হাঁ-করা মুখগুলোর দিকে চেয়ে ঘনাদার করুণা হল কি না জানি না। দয়া করে একটু সবিস্তারে বললেন,—নিরাশ করতে হত এই জন্যে যে ও পুঁথি জাল। যত তেতোই সত্যি কথাটা ত না বলে পারতাম না।

—পুঁথি জাল!

—আপনি জানলেন কি করে?

—পুঁথি ত চোখেও দেখেননি।

—শোনেননি পর্যন্ত তখন পুঁথির কথা।

—জাল আর আসল পুঁথি কি শুঁকেই বোঝা যায়!

—জাল পুঁথির গন্ধ পেয়েই চলে এলেন নাকি!

আমাদের প্রত্যেকের বিস্ময় নানা ভাবে নানা ভাষায় প্রকাশ পেল। ঘনাদা ততক্ষণ নির্বিকার ভাবে রাম টানে গড়গড়ার জলে তুফান তুলছেন।

আমাদের কথা শেষ হতেই এক রাশ ধোঁয়া ছেড়ে ঘনাদা যা বললেন তাতে আমরাও চতুর্দিকে শুধু ধোঁয়াই দেখলাম।

পুঁথির গন্ধে নয়, চলে এসেছি ঘরের দুর্গন্ধে!—ঘনাদা কড়া গলায় জানালেন।

দুর্গন্ধে!—আমরা তাজ্জব,—ও ঘরে দুর্গন্ধ! রোজ সকালে দস্তুরমত ফিনাইল দিয়ে ও ঘর মোছা হয়। তার ওপর ফ্লিট দিয়েছি আধঘণ্টা আগে!

ওঃ ফ্লিট দিয়েছ!—ঘনাদা প্রায় তাঁর কলকের মতই গরম হয়ে উঠলেন,—তাই বিশ্রী বিদঘুটে প্রাণ-বার-করা দুর্গন্ধ!

—বলেন কি ঘনাদা! ফ্লিট ত মাছি তাড়াবার জন্যে দিতে হয়। আপনি ত আর মাছি ন'ন! হেসের সব ঘরেই ত ফ্লিট দিচ্ছি এখন। বর্ষায় যা মাছি বেড়েছে! আপনার ঘরেও ত আজ দেব।

আমার ঘরে ফ্লিট দেবে!—ঘনাদা যেন তাঁর কলকের জ্বলন্ত টিকেই হয়ে উঠলেন,—তার চেয়ে ঘরে আগুন দেবে বলো না!

ফ্লিট আর আগুন এক!—আমরা একেবারে থ,—ঘরের মাছি তাড়াতে আপনি চান না!

না!—বজ্রগম্ভীর স্বরে বললেন ঘনাদা,—তোমাদের ওই আধা বৈজ্ঞানিক বাতিক আমার নেই। পোকা মাকড় মাছি সব একেবারে দুনিয়া থেকে লোপাট করে দেবে, কেমন। এদিকে পোকা মারবার বিষে মানুষই জরজর হতে চলেছে সে খোঁজ রাখো? জানো খাবারের জলে ছাওয়ার কি পরিমাণ বিষ ক্রমশঃ ছড়িয়ে যাচ্ছে!

লক্ষণ সব শুভ। পালে হাওয়া লেগেছে। এখন শুধু হালটা ঠিকমত ধরতে পারলেই হয়।

জোয়ারের টানেই নৌকোর মুখটা ধরে রেখে বললাম,—কিন্তু মাছি বাড়লে বড় জ্বালাতন করে যে।

করুক,—ঘনাদা নির্বিকার—একটা কৃতজ্ঞতা ত আছে।

মাছির কাছে কৃতজ্ঞতা!—আমাদের চোখ সব কপালে উঠেছে তখন।

হ্যাঁ, জ্যোতিষের একটু হিসাব, আর এই মাছি না হোক এদেরই জ্ঞাত-ভাই-এর সাহায্য না পেলে—

ঘনাদা কথাটা শেষ করবার আগেই শিবু চটপট পূরণ করে দিলে,—পৃথিবীর ইতিহাস উলটে লেখা হত।

হিমালয়টা হঠাৎ কাৎ হয়ে পড়ে যেত!—সংশোধন করলে শিশির।

রুশ-মার্কিন পারমাণবিক চুক্তি যেত বানচাল হয়ে!—গৌর তার সিদ্ধান্ত জানালে।

না।—ঘনাদা গড়গড়ার নলটাকে সরিয়ে রেখে আমাদের দিকে অনুকম্পাভরে চেয়ে বললেন,—ওসব কিছু নয়, ক্যামেরুনস্-এর মান্দারা পাহাড়ের একটা গোপন গুহায় দুটো কঙ্কাল পাওয়া যেত!

—কার ঘনাদা?

—একটা ডাঃ লার্বোর আর একটা ঘনশ্যাম দাসের!

—কি সর্বনাশ! ভুলে ফেলে আসছিলেন বুঝি!

হাসি চেপে শিবুর বেয়াড়া মন্তব্য সামলাতে চটপট যার যা মাথায় আসে বলতে হল।

—গুহার মধ্যে মানুষ-খেকো জন্তু জানোয়ার ছিল বুঝি?—শিশিরের জল্পনা।

কামড় দিতে গিয়ে নাকে মাছি ঢুকে, নিশ্চয় হেঁচে ফেলেছিল!—আমার বিস্তারিত ব্যাখ্যা।

না, না গুহার ভেতর পাথর চাপা পড়েছিলেন। আর এক ঝাঁক মাছি এসে পাথরটা সরিয়ে দেয়।—গৌরের সহজ সরল সমাধান।

—প্রায় তাই!

আমাদের চোখগুলো ছানাবড়া করে তুলে ঘনাদা শুরু করলেন,—তখন সুদানের বহু পুরোনো এক খ্রীষ্টান মঠের ধ্বংসাবশেষ দেখবার জন্যে ওয়াদি হাজালে কিছুদিনের জন্যে আছি। সেখানেই হঠাৎ একদিন ডাঃ লার্বো আর লুইগি ক্যাপেলা দুজনের সঙ্গেই দেখা হয়ে গেল। ক্যাপেলাকে আগে কখনও দেখিনি। ডাঃ লার্বো আমার চেনা। তবু ডাঃ লার্বোকে প্রথম চিনতেই পারিনি। প্রথম মহাযুদ্ধের আগে ফ্রান্সে তার সঙ্গে পরিচয়। তখন লার্বো বয়সে তরুণ। তার বাবার সঙ্গেই আফ্রিকার নৃতত্ত্ব বিষয়ে কাজ করে সবে ডক্টরেট পেয়েছে। তার বাবা মঁসিয়ে আঁদ্রে লার্বোর কোন রকম পদবীটদবী ছিল না। কিন্তু পর্যটক পণ্ডিত হিসেবে তাঁর নাম তখন যথেষ্ট। বাবা আঁদ্রের ব্যাপার নিয়েই তাঁর ছেলে লার্বো আমার কাছে এসেছিল। আঁদ্রে বছর কয়েক আগে আফ্রিকায় পর্যটনে গেছেন। তারপর থেকে তাঁর কোন খবর পাওয়া যায়নি। এরকম নিরুদ্দেশ হওয়া তাঁর স্বভাব। কিন্তু এবার যেন বড় বেশীদিন নিখোঁজ হয়ে আছেন। আমি তখন সদ্য আফ্রিকারই ক্যামেরুনস্ থেকে ফিরেছি। তাই লার্বো আমার কাছেই কোন খবর পাওয়ার আশায় এসেছিল।

বিশেষ কিছু খবর তাকে দিতে অবশ্য পারিনি। ক্যামেরুনস্ তখন জার্মানদের দখলে। সমুদ্রের ধারে দৌয়ালা তাদের রাজধানী। সেখানে আঁদ্রের সঙ্গে একবার দেখা আমার হয়েছিল বটে। ক্যামেরুনস্-এর উত্তরে একটা কি জায়গা যেন তাঁর ইজারা নেওয়া আছে। সেইখানেই তিনি যাচ্ছেন বলেছিলেন। লার্বোর সঙ্গে সেদিন আরো অনেক কথাই হয়েছিল। আফ্রিকার নৃতত্ত্ব শুধু নয়, সেখানকার বহু লুপ্ত শিল্পকলা সম্বন্ধে তার জ্ঞান দেখে খুশীই হয়েছিলাম।

যাকে সুস্থ-সবল জোয়ান দেখেছিলাম ভেঙেপড়া কুঁজো এক আধবুড়ো চেহারায় তাকে

আর চিনব কি করে! লার্বো নিজে থেকে এসে পরিচয় দেবার পর শুধু তার চেহারা দেখে নয়, আরো অনেক কিছুতেই অবাক্ হয়েছিলাম।

তখন সুদানীদেরই একটা আধা হোটেল আধা সরাই-এ আছি। একাধারে হোটেলের খানসামা ও বাবুর্চী, ওসমান এসে খবর দিলে দুজন সাহেব আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।

দুজন এসে ঘরে ঢোকবার পর কাউকেই চিনতে পারলাম না। একজনের হেভিওয়েট বক্সারের মত বিরাট চেহারা। আর একজন শুকনো শীর্ণ বুড়োটে মানুষ।

বুড়োটে মানুষটিই প্রথম সম্ভাষণ করে বললে,—আমায় চিনতে পারছেন না নিশ্চয় মিঃ দাস। আমার সঙ্গে প্যারিসে আপনার দেখা হয়েছিল কয়েকবার। আমার নাম ডাঃ লার্বো।

সত্যিই প্রথমটা যেন নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারলাম না। লার্বোর কাছে তার কাহিনী শোনবার জন্যে উদ্‌গ্রীব হলেও আপাতত তার আমার সঙ্গে দেখা করতে আসার কারণ জানতে চাইলাম।

কারণ আর কিছু নয়, আমায় দিয়ে একটা পুরোনো পুঁথির দাম যাচাই করানো। পুঁথিটা ম্যাডামার্ক ক্যাপেলাই অনেক কষ্টে নাকি সংগ্রহ করেছে। ডাঃ লার্বো টুকিটাকি পুরোনো পাণ্ডুলিপি, হাতের শিল্পকাজ এই সবই এখন সংগ্রহ করে নানান মিউজিয়মে আর খেয়ালী বড়লোকদের কাছে বিক্রি করে। পুঁথিটা ক্যাপেলার কাছে সে কিনতে চায়। আমায় ওয়াদি ঘাজালে দেখে চিনতে পেরে একটু পাকা মতামত নিতে এসেছে।

পুঁথিটা নাড়াচাড়া করে হেসে বললাম,—কেনবার ত অনেক কিছু আছে ডাঃ লার্বো। এ পুঁথি নাই কিনলেন!

কেন এ পুঁথির দাম নেই?—ক্যাপেলা আমার দিকে করুণ চোখে তাকিয়ে জানতে চাইলে। পালোয়ানের মত চেহারা হলেও মানুষটার মুখ-চোখের গড়ন এমন যে সব সময়েই করুণ দেখায়।

দুঃখের সঙ্গে বললাম, যে সস্তা কাগজে লিখে তেঁতুল জলে ভিজিয়ে রেখে পুরোনো করা হয়েছে তার বেশী কিছু দাম ও পুঁথির নেই। এ পুঁথির এরকম আরো দুটো নকল যে আমি দেখেছি তাও জানালাম!

বুন্দিব গোডায় তখন আমাদেরও ধোঁয়া লেগেছে। চট্ করে ধরে ফেলে শিবুই সবার আগে বলে ফেললে,—এই ইব্‌ন জুবেরের নকল পুঁথিরই নাকি সেটা!

হুঁ, এই পুঁথিরই আরেক নকল!—ঘনদা বলতে শুরু করলেন,—দুজনকে নকলের প্রমাণ-গুলো বুঝিয়ে দিয়ে লার্বোকেই জিজ্ঞাসা করলাম,—কিন্তু আপনার আসল কাজ ছেড়ে এসব বাজে মালের কারবারে এসেছেন কেন?

এসেছি মামলায় সর্বস্বান্ত হয়ে।—দুঃখের সঙ্গে বললে লার্বো!

মামলাটা যে কি লার্বো তারপর আমার অনুরোধে বিস্তারিত ভাবে জানালে।

ক্যামেরুন্‌স্ যখন জার্মানদের দখলে তখন ১৯০৩ সালে লার্বোর বাবা আঁদ্রে উত্তরের মান্দারা পাহাড়ের কাছে একটা পাহাড়ী জায়গা একজন জার্মানের কাছে লেখাপড়া করে ইজারা নেন। কেন যে ওই অখদ্দে জায়গা তিনি বেছে নিয়েছিলেন ইজারা নিতে তা কেউ জানে না। শুধু শেষবার চিরকালের মত নিরুদ্দেশ হবার আগে ছেলের কাছে একটি চিঠির চিরকুট তিনি পাঠান। তাতে দু'লাইনে লেখা ছিল—আফ্রিকার শ্রেষ্ঠ সম্পদ্ আমি মান্দারা পাহাড়ে আগলে আছে। যত তাড়াতাড়ি পারো এসো।

কিন্তু তখন প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। ক্যামেরুন্‌স্ নিয়েও লড়াই চলছে ইংরেজ ফরাসীর সঙ্গে জার্মানদের। সেখানে যাওয়া অসম্ভব। যুদ্ধ থামবার পর গোল কমবার বদলে বাড়ল। জার্মানির অধিকার ভাগ করে নিলে ইংরেজ আর ফরাসী। সরকারী কাগজপত্র সব নষ্ট হয়ে গেছে। ইজারার দাবি প্রমাণ করাই শক্ত। তবু লার্বো একবার ইংরেজ একবার ফরাসী সরকারের সঙ্গে মামলা লড়লে। মামলায় কেঁচো খুঁড়তে সাপ বার হল। জানা গেল

লার্বোর বাবার ইজারা নেওয়া জায়গা গোড়াকার মালিক দাবি করছে। লার্বোর বাবা আঁদ্রে নাকি তার কাছেই ইজারা নিয়ে পুরো দাম দেননি। ইজারা বাতিল হলেও তত দুঃখ ছিল না। কি ঐশ্বর্যের কথা আঁদ্রে জানিয়েছিলেন তার একবার খোঁজ করতে পারলেই হত। কিন্তু সে জার্মান মালিক মান্দার পাহাড়ের ও অঞ্চলে লার্বোকে ঢুকতে দিতেই রাজী নয়। এক সঙ্গে ফরাসী সরকার ও সেই দাবিদার গোড়াকার মালিকের সঙ্গে সর্বস্বান্ত হয়ে লড়ে একেবারে না হারলেও ফল যা দাঁড়িয়েছে তা হতাশ হবারই মত।

সেটা কি রকম? অবাক্ হয়ে জানতে চাইলাম।

লার্বো তার উত্তরে যা জানাল তা অদ্ভুত শর্তের এক চুক্তি। ১৯০৩ সালে আঁদ্রে ইজারা নেন জায়গাটা। ঠিক সেই ১৯০৩-এর হিসেবে মাপা একটি বছরের জন্যে লার্বো একবার মাত্র সেখানে গিয়ে যা খোঁজ করবার করে আনতে পারবে। বছরের এক সেকেণ্ড পার হয়ে গেলে সেখানকার কোন কিছু এমন কি একটা নুড়িতেও আর তার অধিকার নেই।

—তাহলে মাপা বছর বলতে কি বোঝাল?—গৌর তার বিদ্যে একটু জাহির করবার সুযোগ ছাড়তে পারলে না,— তিন শ' পঁয়ষট্টি দিন পাঁচ ঘণ্টা আটচল্লিশ মিনিট ছেচল্লিশ সেকেণ্ড!

ঘনাদা গৌরের দিকে এমন ভাবে তাকালেন যে নিজের তথ্য নির্ভুল প্রমাণ করবার জন্যে একটু ক্ষুণ্ণ হয়েই তাকে স্বীকার করতে হল,—আজই সকালে এ বছরের বর্ষপঞ্জীতে পড়লাম যে!

ও আজ পড়েছ!—গৌরের এমন একটা পাণ্ডিত্যকে যেন তাচ্ছিল্য করেই ঘনাদা আবার শুরু করলেন,—সব কথা শুনে একটু অসন্তুষ্টই হলাম। বললাম, তা এই চুক্তির সুযোগই আপনি নিচ্ছেন না কেন। যে কোন সময় থেকে শুরু করে পুরো এক বছর ত! এক বছর নেহাত কম সময় নয়। আপনার বাবা যে ঐশ্বর্যের কথা বলেছেন সত্যি যদি তা থাকে তাহলে এক বছরে খুঁজে আনতে পারবেন না। আপনার বাবা গুপ্ত ঐশ্বর্যের কিছু হদিসও নিশ্চয় আপনাকে দিয়ে গেছেন!

তা দিয়ে গেছেন!—ডাঃ লার্বো হতাশ ভাবে বললেন,—কিন্তু এই ভাঙা শরীর নিয়ে একলা সেই অজানা বিপদের দেশে গুপ্ত ঐশ্বর্য সন্ধান আমার পক্ষে আর সম্ভব নয়। তা ছাড়া বলেছি ত আমি সর্বস্বান্ত। এই সুডানে এসেছি আমেরিকার এক মিউজিয়মের টাকায়। এখান থেকে ক্যামেরুন্‌স্-এ যাবার আর এক বছর ধরে মান্দারা পার্বত্য অঞ্চলে খোঁজ করবার মত সম্বলই আমার নেই।

যা বলতে যাচ্ছিলাম তা আর বলা হল না। আমার আগেই করুণ মুখে ক্যাপেলার বললে,—যদি সহায় সম্বল দুই-ই আপনি পান ডাঃ লার্বো?

সহায় সম্বল দুই-ই!—ডাঃ লার্বো একটু হতভম্ব হয়ে ক্যাপেলার দিকে তাকিয়ে বললেন,—তার মানে...

—তার মানে, আমি আপনার সঙ্গে যেতে প্রস্তুত ডাঃ লার্বো। আপনার যা খরচ লাগে তাও যোগাতে!

আপনি সত্যি আমায় এই সাহায্য করবেন সেনর ক্যাপেলা?—ডাঃ লার্বো উচ্ছ্বসিত হয়ে ক্যাপেলার হাত দুটো জড়িয়ে ধরে আরো কিছু বলতে যাচ্ছিলেন।

তাঁকে বাধা দিয়ে ক্যাপেলাকেই জিজ্ঞাসা করলাম,—আপনি ভালো করে বুঝে সুঝেই ডাঃ লার্বোকে সাহায্য করতে যাচ্ছেন ত সেনর ক্যাপেলা?

বোঝবার এমন কি আছে—ক্যাপেলা করুণ মুখে হেসে বললে,—ডাঃ লার্বোর বাবা আঁদ্রে লার্বোর আমি একজন ভক্ত ছিলাম। ছেলে বয়সে আফ্রিকা সফরে একবার তাঁর সঙ্গী হবার সৌভাগ্যও হয়েছিল। দেখতেই পাচ্ছেন আফ্রিকার পুরোনো জিনিস খুঁজে বার করা আমার

ব্যবসা। বাতিকও বটে। আঁদ্রে লার্বোর সম্মানে সেই বাতিকেই না হয় কিছু সময় আর পয়সা খরচ করলাম।

খুশী মুখে বললাম,—খুব ভালো কথা। আঁদ্রে লার্বোর গুপ্তধন কি তা জানি না, কিন্তু তা পাওয়া গেলে ভাগ চাইবেন না ত?

না ভাগ আমি চাইব না—ষণ্ডামার্ক ক্যাপেলা কাঁদো-কাঁদো গলায় বললে,—ভাগ আমি চাইব না দিব্যি গেলে বলছি।

লার্বোর আর তর সইছিল না। ক্যাপেলাকে সঙ্গী সহায় পেয়ে কয়েকদিনের মধ্যেই আফ্রিকার পুব থেকে একেবারে পশ্চিম প্রান্তে ক্যামেরুন্‌স্‌-এ রওনা হয়ে গেল। যাবার আগে আমার দু একটা পরামর্শ নিয়ে কথা দিয়ে গেল যে ফলাফল যাই হোক এক বছরের মধ্যে খবর একটা দেবেই।

কিন্তু খবর আর আসে না। তাদের সুডান থেকে ক্যামেরুন্‌স্‌ যাবার সময়টা মোটামুটি বাদ দিয়ে এক বছর পূর্ণ হতে যখন হপ্তা দুয়েক মাত্র বাকী, তখন আর ধৈর্য ধরতে না পেরে নিজেই রওনা হয়ে পড়লাম। প্রথমে বাইট্‌ অফ্‌ বিয়াফ্রা, অর্থাৎ বিয়াফ্রা উপসাগরের ধারে দোয়ালা শহরে নামলাম। সেখান থেকে নতুন রাজধানী ইয়াওন্দে-তে। সেখানে একটা ছোট প্লেনের ব্যবস্থা টেলিগ্রামেই করিয়ে রেখেছিলাম। প্লেনটা নিয়ে মান্দারা পাহাড় অঞ্চলেই সোজা যেতে পারতাম। কিন্তু তার বদলে প্রথমে মাঝামাঝি রেই-বোবা শহরে নেমে হের ব্র্যাণ্টের আস্তানায় একবার গেলাম। ব্র্যাণ্ট আমার অনেক কালের চেনা বন্ধু, আফ্রিকায় তার সঙ্গে বিরল অজানা প্রাণীর খোঁজে কয়েকবার ঘুরেছি। আপাতত সে রেই-বোবা শহরকে ঘাঁটি করে আশেপাশে জীববিজ্ঞানের সন্ধান চালাচ্ছে জানতাম। ব্র্যাণ্টের সঙ্গে আলাপ সেরে ল্যামী দুর্গের কাছের হাউসাদের একটি গ্রামে নেমে আমার পুরোনো বন্ধু মোড়লের সঙ্গে একবার দেখা করে এলাম। সেখান থেকে প্লেনে উঠে মান্দারা পাহাড়ের দিকে রওনা হবার আগে ফেন অর্থাৎ মোড়লকে শুধু বলে এলাম,—ইদান মুগুন মুতুম ইয়া শিরকা জানবা, কাই কা স লাওজে কা ইয়াঙ্কে।

—মোড়লকে ওই সব আপনি বললেন! আর শুনেও আপনাকে ছেড়ে দিলে!

বেটপকা শিবুর এই কথায় আমাদের কাশি যদি হঠাৎ সংক্রামক হয়ে ওঠে তাহলে বোধ হয় খুব দোষ দেওয়া যায় না।

ঘনাদার মুখের চেহারা দেখে গৌরই প্রথম সামলে নিয়ে ভালোমানুষ সাজলে,—ওটা ওই হাউসা ভাষা! না ঘনাদা?

হ্যাঁ হাউসাদের একটা প্রবাদ!—ঘনাদা কিছুই যেন তুচ্ছ হয়ে প্রবাদটা ব্যাখ্যা না করেই বললেন,—মান্দারা পাহাড়ের কোলে প্লেন নামাতে তারপর বেশ বেগ পেতে হল। পাহাড়ী জায়গা। সমতল কোথাও নেই বললেই হয়। তার মধ্যে ওপর থেকে একটা জীপ গোছের গাড়ি এক জায়গায় দেখে লার্বো আর ক্যাপেলার আস্তানা কাছাকাছি হতে পারে বলে অনুমান করেছিলাম। নামবার পর দেখলাম আমার অনুমানে ভুল হয়নি। প্লেন থেকে মাটিতে পা দিতে না দিতেই প্রথম অভ্যর্থনা করলে স্বয়ং ক্যাপেলা। প্লেন দেখে জীপটা চালিয়েই সে ছুটে এসেছে। কাছে এসে তার মার্কামারা করুণ স্বরে বললে,—আপনি সত্যিই অন্তর্যামী দাস।

একে লড়াইয়ে ষাঁড়ের মত শরীর, তার ওপর এক মুখ দাড়ি-গোঁফ গজিয়ে আর এই পাহাড়ী মুলুকের রোদে জলে পোড় খেয়ে ক্যাপেলার চেহারা একেবারে দুশমনের মত হয়েছে। কিন্তু চোখ মুখ গলার স্বর সেই করুণ।

হেসে বললাম,—কেন বলুন ত! আপনাদের ডেরা ঠিক চিনে নেমেছি বলে?

—না, বন্দি করে প্লেনটায় এসেছেন বলে। একটা প্লেনই চাইছিলাম।

—হ্যাঁ আপনাদের মেয়াদ ত ফুরিয়ে এল। হাতে আর কত সময় আছে?

—বারো ঘণ্টা আটচল্লিশ মিনিট আটাশ সেকেণ্ড!—কাঁদো-কাঁদো সুরে বললে ক্যাপেলা।

একটু অবাক্ হয়ে বললাম,—সময়টার ঠিক হিসাব রেখেছেন? ১৯০৩ সালের তারিখ মনে আছে?

খুব মনে আছে।—ক্যাপেলা করুণভাবে আশ্বাস দিলে,—সময়ের হিসেব একেবারে কাঁটায় কাঁটায় রেখেছি।

একটা কথা বলতে গিয়েও থেমে ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম,—তাহলে এখনো আপনারা হাত গুটিয়ে বসে আছেন কি বলে? সময় ত মাত্র এই!

—সেইটে আপনার বন্ধু ডাঃ লার্বোকে বোঝাতে পারেন?—ক্যাপেলার গলায় যেন করুণ মিনতি।

সত্যি উদ্বিগ্ন হয়ে উঠে বললাম,—তার মানে লার্বো সময়ের দাম বুঝতে চাইছেন না এখনো! কোথায় তিনি?

—সামনের পাহাড়ে ওই মস্ত বড় গুহাটা দেখছেন। সোজা ওর ভেতর চলে যান। আমি একটু পরে আসছি।

সেই দিকেই যেতে গিয়ে হঠাৎ থমকে ফিরে তাকালাম।

তারপর ঠাণ্ডা গলাতেই বললাম,—আপনি যেন প্লেনটায় উঠতে চান মনে হচ্ছে, সেনর ক্যাপেলা!

সেই রকমই ত বাসনা।—করুণ স্বরে বললে ক্যাপেলা,—জীপে করেই যাচ্ছিলাম, ভাঙ্গা চোরা রাস্তা হলেও শ' আড়াই মাইল সময় মত যাওয়া যেত। কিন্তু প্লেনটা যখন পাওয়া গেল তখন ছাড়া উচিত কি! উড়ে গেলে ত মাত্র শ' দুই মাইল।

হুঁ, গলাটা মধুর করেই বললাম,—রেই-বোবা পাহাড়েই যেতে চান নিশ্চয়। যেখানে এই অঞ্চলের মালিকের সেরেস্তা। লার্বোর নিজের লোক বলে তারা আপনাকে জানে। সুতরাং সময়ের মেয়াদ ফুরোবার আগেই গুপ্তধন দখলের কথা তাদের জানালে আপনার কাজ হাসিল হবে। তারা বিশ্বাসঘাতক বলে আপনাকে সন্দেহ করবে না। কিন্তু প্লেনে যে যাচ্ছেন গুপ্তধন ত দেখছি না। আসল মালই না থাকলে দাবি দিয়ে লাভ কি?

সে ভাবনা আপনাকে ভাবতে হবে না। ক্যাপেলা মিহি সুরে জানালে,—আপনি বোধ হয় খবর রাখেন না যে আগেকার মালিক মারা যাবার পর তার সম্পত্তি এখন ট্রাস্টের জিম্মায়। সেই ট্রাস্টের সঙ্গে এখানে আসবার আগে আমাদের কথা হয়ে গেছে যে শর্ত মত নির্দিষ্ট সময়ের এক সেকেণ্ড আগে দাবি জানাতে পারলেও তা গ্রাহ্য হবে ত বটেই, গুপ্তধন সরিয়ে আনবার জন্যেও একটা উপরি দিন পাওয়া যাবে। আর গুপ্তধন সঙ্গে না নিলেও এইটি আমি নিয়ে যাচ্ছি। আপনার বন্ধু অমন বেয়াড়া বলেই এটি হাত করতে এত দেরি হয়েছে।

ওটা ত দেখছি একটা চাবি!—হেসে বললাম,—গুপ্তধনের সিন্দুক আছে নাকি এখানে?

—সিন্দুক নয় ইস্পাতের তৈরী গুপ্ত এক ঘর। আঁদ্রে লার্বো প্রথম মহাযুদ্ধের কিছু আগে বিপদের দিন আসছে বুঝে গোপনে এই ইস্পাতের দুর্ভেদ্য দরজা দেওয়া লুকানো ঘরটি এই পাহাড়ের এক গোপন গুহায় তৈরি করান। তার ভেতরই তাঁর সমস্ত ঐশ্বর্য লুকোনো। এ ঘরের উদ্দেশ্য আমি জানতাম, কিন্তু আসল হদিস পাইনি বলে কিছু করতে পারিনি। তারপর ভাগ্য কিভাবে ডাঃ লার্বোর সঙ্গে আমার যোগাযোগ করিয়ে দেয়, তা তো আপনিও জানেন।

—বাঃ আপনার মত সহজ সরল শয়তান আমি কখনো দেখিনি! কিন্তু শয়তানদেরও কখনও কখনও কথার ঠিক থাকে। আপনি যেন গুপ্তধনের ভাগ নেবেন না বলেছিলেন মনে পড়ছে।

সে কথার খেলাপ ত করছি না।—করুণ ভাবে হাসল ক্যাপেলা,—ভাগ ত নয়, গুপ্তধনের সবটাই আমি নেব যে!

—হ্যাঁ, তাহলে কথার খেলাপ হয় না বটে। চাবিটা খুশী হয়ে ডাঃ লার্বো আপনাকে দিয়েছেন বলে কিন্তু মনে হচ্ছে না।

না, তা দেননি।—কাঁদোকাঁদো ভাবেই জানালো ক্যাপেলা,—একটু পেড়াপীড়ি করতে হয়েছে। দুর্বল মানুষ একটু জখম হয়েছেন তাইতে। ওই গুহার ভেতর তাড়াতাড়ি গেলে হয়ত শুশ্রূষা করতে পারবেন।

কিন্তু চাবিটা তাঁকে ফেরত দিতে চাই যে!—কাঁধের হ্যাভারস্যাকটা মাটিতে রেখেই বললাম,—ওটা নিজে থেকে দিলেই বাধিত হব। আমার আবার তাড়াতাড়ি করতে গেলে হাতপা-গুলো বশে থাকে না। তখন আপনারই শুশ্রূষা দরকার হবে।

না, তা বোধ হয় হবে না।—মুখখানা যেন কাঁচুমাচু করে জানালে ক্যাপেলা,—আরসোলা টিকটিকি আমি পারতপক্ষে ছুঁই না, কিন্তু ছুঁলে আঙুলের টিপুনিতেই মারা যায়। আমার দুঃখের ইতিহাস আপনি বোধ হয় জানেন না। দুনিয়ার সেরা মুষ্টিযোদ্ধা হয়ত হতে পারতাম কিন্তু রাস্তার ঝগড়া-ঝাঁটিতে দুটো মানুষকে সাবাড় করার দরুন হুলিয়ার ভয়ে নাম ভাঁড়িয়ে এই আফ্রিকায় ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে। এখানে একটা ছুঁচো মারলে অবশ্য হুলিয়ার ভয় নেই।

না ভয় যা কিছু খোঁতা মুখ ভোঁতা হবার।—সবিনয়ে যেন গলবস্ত্র হয়ে বললাম,—আপনার মত খাঁটি নির্ভেজাল শয়তানের সে দুর্দশা আমায় দিয়ে করাবেন না।

চমৎকার! আপনার গলায় যেন মধু ঝরে পড়ছে।—ক্যাপেলা করুণ স্বরে বললে,—আসুন আপনার গলাটা একটু টিপে দিয়ে দেখি অত মধু কোথায় আছে।

ক্যাপেলা যেন আলিঙ্গন করতে এগিয়ে এল।

বার তিনেক একটু কষ্ট করতে হল। শেষবার ঘাড়মুড় গুঁজড়ে পড়ল প্রায় প্লেনটার চাকার তলায়।

হ্যাভারস্যাকটা আবার কুড়িয়ে নিয়ে চাবিটা পকেট থেকে তুলে বললাম,—ঘণ্টা কয়েক এখন খোলা হাওয়ায় বিশ্রাম করতে পারবেন মনে হচ্ছে। কিছু ভাববেন না, হাত-পা খুঁজে নিয়ে আপনি ওঠবার আগেই ফিরে আসছি। দড়ি দড়ায় বেঁধে আপনার সম্মানটা তাই আর বাড়ালাম না।

সেই একটি মাত্র ভুলেই সর্বনাশটা হল।

গুহার ভেতর গিয়ে লার্বোকে পেলাম প্রায় সংজ্ঞাহীন অবস্থায়। অনেক চেষ্টায় সুস্থ করে তোলবার পর তার মুখে যা শুনলাম তা ইতিমধ্যেই কল্পনা করে নিয়েছিলাম। মান্দারা পাহাড়ের এই অঞ্চলে আসবার কিছুদিন বাদেই ক্যাপেলার ভাবগতিক দেখে লার্বোর সন্দেহ হয়। গুপ্তধনের খোঁজ করবার হদিস লার্বো তাই কিছুতেই জানায়নি। এমনকি সে গুপ্ত ধনভাণ্ডার একা একা নানা সুযোগে খুঁজে বার করবার পরও ক্যাপেলার কাছে তা লুকিয়ে রেখেছে। কিন্তু যত দিন গেছে ক্যাপেলা তত অস্থির জবরদস্ত হয়ে উঠেছে। লার্বোকে চোখে চোখে রেখেছে সারাক্ষণ। লার্বো ঠিক করেছিল কোনমতে লুকিয়ে পালিয়ে গিয়ে তার দাবি পাকা করবে। কিন্তু ক্যাপেলা সে সুযোগ দেয়নি। ওই দিনটিতে সে কিন্তু আরো গভীর শয়তানী বুদ্ধি খাটিয়েছিল। ক্যাপেলার পাহারা সেদিন যেন আলগা মনে হয়েছিল লার্বোর। সেই সুযোগে পালাবার চেষ্টা করবার সময়েই লার্বোকে চাবি সমেত সে ধরে ফেলেছিল এই জন্যেই ছিল বলে। তারপর লার্বোর মত একটা ক্ষীণজীবী মানুষের কাছে চাবি কেড়ে নিতে কতক্ষণ! চাবি নিয়ে জীপে করে ক্যাপেলা যখন রওনা হচ্ছে ঠিক সেই সময়েই এসে পড়েছি আমি।

লার্বোকে সুস্থ করে তার সমস্ত কাহিনী শুনতে প্রায় ঘণ্টা চারেক তখন কেটে গেছে। ক্যাপেলার অবস্থা দেখবার জন্যে একবার যাওয়া দরকার মনে করে উঠতে যাচ্ছি এমন সময়ে গুহামুখে একটা ছায়া পড়ল।

অবাক্ হয়ে তাকিয়ে দেখি, ক্যাপেলাই টলতে টলতে গুহার বাঁকটার মুখে ঢুকে দাঁড়াল।

আরে আসুন আসুন সেনর ক্যাপেলা! আপনি এত তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠবেন ভাবতে পারিনি—ভেতরের দুর্ভাবনা যথাসাধ্য চেপে হাসিমুখে বললাম,—কিন্তু সুস্থ হয়েও আবার কষ্ট করে এখানে এলেন কেন?

একটা দরকারী কাজ বাকি ছিল বলে আসতে হল।—ক্যাপেলার করুণ সুরটা একটু বেশী মিহি মনে হল।

—কি কাজ? আমাদের কাছে মাপ চাওয়া?

—না। একটা ছুঁচো আর একটা ইঁদুরকে জ্যান্ত কবর দেওয়া। এগোবার চেষ্টা করিস না, আমার হাতে এই হ্যাণ্ড গ্রেনেড দেখছিস। এটা ছুঁড়ে তোদের এখুনি শেষ করে দিতে পারি। কিন্তু অত সহজে মেরে আমার আশ মিটবে না। যেখানে আমি দাঁড়িয়ে আছি সেখানকার ওপরের পাথর আলগা। এই গ্রেনেড ফাটলেই সে সব পাথর পড়ে এ গুহার মুখ এমন বন্ধ হয়ে যাবে, অন্ততঃ একশ' জোয়ান না হলে সে পাথর সরানো অসম্ভব। একশ' জোয়ান দূরে থাক একটা মাছিও এখানে আসবে না খোঁজ করতে।

—নাই আসুক, মাছি এখান থেকে উড়ে যেতে ত পারবে!

—এই জ্যান্ত কবরে পচে মরতে মরতে ওরকম রসিকতা ভাববার অনেক সময় পাবি। এখনো শুধু শেষ একটা সুযোগ দিচ্ছি প্রাণে বাঁচবার। চাবিটা আর গুপ্ত গুহার হদিস যদি এখুনি পাই ত ছেড়ে দিতে পারি তোদের।

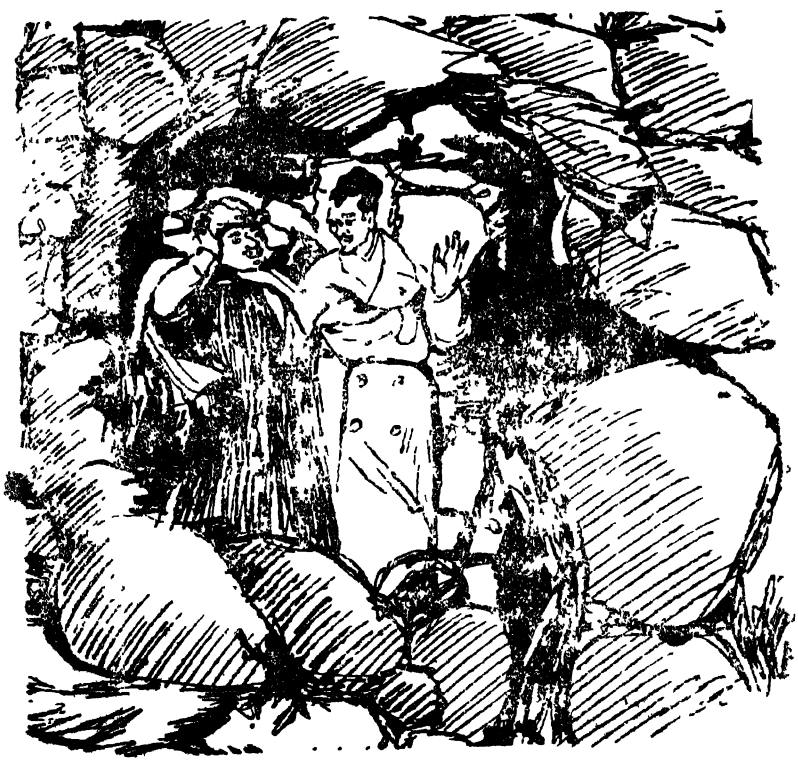

কিন্তু চাবি আর গুপ্ত গুহার হদিস পেলেই কিছু লাভ হবে কি আর?—হেসে বললাম,—সময় ত ক্রমশঃই ফুরিয়ে আসছে।

—সময় যথেষ্ট আছে এখনো। সে ভাবনা তোদের নেই। এখনো আট ঘণ্টা তেইশ মিনিট আটাশ সেকেণ্ড। তোর প্লেনে চড়ে বড় জোর দেড় ঘণ্টার মধ্যেই রেই-বোবায় পেঁাছে যাব। তারপর ট্রাস্টীদের অফিসে পেঁাছোতে বড় জোর আধ ঘণ্টা।—ক্যাপেলা আমাদের যন্ত্রণা দিতেই যেন করুণ স্বরে চিবিয়ে চিবিয়ে শোনালে।

এবার হেসে উঠলাম, বললাম,—হিসেবে আপনার যে একটু ভুল হচ্ছে সেনর ক্যাপেলা। ও প্লেনে একটু কারসাজি না করে কি আর আমি নেমেছি! এরোপ্লেনের কলকব্জার ব্যাপারে ওস্তাদ না হলে সে কারসাজি ধরে প্লেন চালাতে কেউ পারবে না।

এবার ক্যাপেলাই হেসে উঠে বললে,—সেই ওস্তাদই আমি। প্লেনের মিস্ত্রী হয়ে দুবছর তোর ওই ফক্কার প্লেনের কারখানাতেই কাজ করেছি। ও প্লেন খুলে ফেলে আবার জুড়তে পারি।

শুনে ভেতরে ভেতরে অস্থির হয়ে উঠলেও বাইরে হাসিমুখে বললাম,—কিন্তু যত বড় মিস্ত্রীই আপনি হন আপনার এই শরীরে একা একা ও প্লেন পাঁচ ঘণ্টার আগে চালু করতে পারবেন না যে!

—তাতেও যা সময় থাকবে তা যথেষ্ট। কিন্তু সে ভাবনা তোদের নয়। এখন যা চাইছি তা দিবি কি না।

—এত করে চাইছেন আর না দিয়ে পারি! তবে আপনাকে একটু কষ্ট করে কাছে এসে হাতে হাতে নিতে হবে।

হুঁ, ক্যাপেলার মিহি গলা যেন ছুরির ডগা হয়ে উঠল,—জ্যান্ত কবরই তোরা চাস বুঝলাম।

ক্যাপেলা টলতে টলতে চলে গেল। তারপর তার ছুঁড়ে-ফেলা গ্রেনেড ফাটার সঙ্গে গুহার ছাদের বিরাট সব পাথরের চাঁই ধসে পড়ে সত্যিই আমাদের জীবন্ত কবর।

আমরা অবশ্য তখন গুহার পেছন দিকে যতদূর সম্ভব সরে গেছি।

পাথর পড়া বন্ধ হবার পর এগিয়ে এসে পরীক্ষা করে দেখে বুঝলাম বড় বড় পাথরের চাঁই-এর মধ্যে সামান্য যা ফাঁক কোথাও আছে তা মাছি গলবার বেশী সত্যিই নয়। সে সব পাথর আমাদের দুজনের পক্ষে সরানোও অসম্ভব।

হ্যাভারস্যাক্ থেকে মিহি জালের ঢাকনি দেওয়া কৌটাটা এবার বার করলাম।

তারপর পাথরের একটা ফাঁকে কৌটার মুখটা ধরে জালের ঢাকনিটা নিলাম সরিয়ে।

লার্বে আমার কাণ্ড দেখে হতাশ স্বরে বললে,—আপনার মাথা কি এর মধ্যেই খারাপ হয়ে গেল দাস। তিলে তিলে এই কবরে মরতে হবে জেনেও আপনি খেলা করছেন এ সময়ে?

হেসে বললাম,—আর কিছু যখন করবার নেই তখন খেলাই ত ভালো। এই খেলাই ভানুমতীর খেল্ হয়ে উঠতে পারে ত!

কিন্তু ভানুমতীর খেলের কোন লক্ষণই আর দেখা যায় না। এক ঘণ্টা দু ঘণ্টা করে সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা কেটে যাবার পর পাথরের ফাঁকে কান লাগিয়ে যে ক্ষীণ আওয়াজ পেলাম তাতে বুকটা আরও দমে গেল।

ক্যাপেলা সত্যিই আমার প্লেনের কারসাজি ধরে সারিয়ে সেটা চালিয়ে চলে যাচ্ছে।

আরও আধ ঘণ্টাটাক যাবার পর যখন সব আশা প্রায় ছেড়ে দিয়েছি তখন হঠাৎ পাথরের দেয়াল ভেদ করেও বাইরের বন্যার গর্জনের মত একটা প্রচণ্ড আওয়াজ কানে এল। সমুদ্রের বন্যা নয়, মানুষের।

হুইসিলটা হ্যাভারস্যাকেই ছিল। সেটা বার করে পাথরের ফাটলে ঢুকিয়ে সজোরে বাজালাম।

তারপর দশ' জোয়ানের শাবলে আর গাঁইতিতে পাথরের চাঁই সরিয়ে ফেলতে ঘণ্টা দুয়েক লাগল মাত্র।

আমায় হাউসা মোড়ল তাদের প্রবাদের মান রেখেছে। আফ্রিকার আশ্চর্য আদ্যিকালের বেতার-ডাক তাদের টমটম ঢাক বাজিয়ে খবর দিয়ে মান্দার পাহাড়ের কাছের এক গাঁ থেকে দশ' জোয়ান পাঠিয়েছে আমার সাহায্যে।

—ওই হিজিবিজি প্রবাদের এত দাম!—শিবু হঠাৎ বেয়াদবি করে বসল।

ঘনাদার ভুরু কুঁচকোতে গিয়ে করুণাতেই যেন ক্ষান্ত হল।—না, হিজিবিজি নয়, ও প্রবাদের মানে হল দুশমন যদি শয়তানির বীজ বোনে তাহলে কাস্তে লাগাও তার বিষ-ঝাড় কাটতে।—বলে বুঝিয়ে ঘনাদা আবার শুরু করলেন,—জ্যান্ত কবর থেকে বেরিয়ে এসে ডাঃ লার্বো কিন্তু খুশী হওয়ার বদলে একেবারে ভেঙে পড়ল। হতাশ ভাবে বললে,—প্রাণে বাঁচলাম বটে দাস কিন্তু মনে হচ্ছে ওই গুহার মধ্যে মরাই উচিত ছিল। বাবার গুপ্তধন আর উদ্ধার হল না। উড়ে গেলেও আর রেই-বৌবায় পেঁাছে চুক্তির শর্ত রাখতে পারব না।

—এর মধ্যেই অত হতাশ হচ্ছেন কেন? যে উড়ে গেছে সে-ই পেঁাছোতে পারে কিনা দেখুন। আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেই ত জানতে পারবেন।

কি করে?—হতভম্ভ হয়ে জিজ্ঞাসা করলে লার্বো।

—এই আফ্রিকারই বেতার টেলিগ্রামে। সেই ব্যবস্থাই করে এসেছি। আর ত কয়েক মিনিট মাত্র। কানটা শুধু খাড়া করে রাখুন।

ডাঃ লার্বো নিজের হাতের ঘড়িটা দেখে বললেন,—একটা বছর পূর্ণ হতে আর ত মাত্র উনিশ মিনিট আটাশ সেকেণ্ড বাকি।

হেসে বললাম,—সেই হিসেব ধরেই ওইটুকু সময় ধৈর্য ধরে থাকুন না। টমটমের খবর আসতে অবশ্য মিনিট কয়েক দেরি হতে পারে।

দেরি বিশেষ হল না। মিনিট পঁচিশ বাদেই এক টমটম থেকে আর এক টমটমে হাত-ফেরতা হয়ে সংকেত-ধ্বনি আমাদের কাছে পেঁাছে গেল।

ভালো করে কান পেতে শুনে বললাম,—ক্যাপেলা ট্রাস্ট সেরেস্তায় পেঁাছেছে ঠিক তিনশ পঁয়ষট্টি দিন পাঁচ ঘণ্টা আটচল্লিশ মিনিট একুশ সেকেণ্ডের মাথায়।

তাহলে ত সব আশা ভরসা শেষ।—ডাঃ লার্বোর গলা যেন কান্নায় ধরে গেল।

—না, ডাঃ লার্বো। চুক্তির শর্ত রাখতে পারেনি বলে ক্যাপেলার দাবি গ্রাহ্য হয়নি।

তার মানে?—আমরাই এবার উত্তেজিত হয়ে উঠলাম।—বছর পূর্ণ হবার বেশ কয়েক সেকেণ্ড আগেই ত ক্যাপেলা পেঁাছেছে।

আমাদের দিকে চেয়ে ঘনাদা অনুকম্পার হাসি হেসে বললেন,—ডাঃ লার্বোও ওই প্রশ্নই করেছিল অবাক্ হয়ে।

তাকে তখন বলেছিলাম,—চুক্তির আসল শর্তটা ভুলে যাচ্ছেন কেন ডাঃ লার্বো। ১৯০৩ সালের ইজারা। পুরো বছরের হিসাবটা ১৯০৩ সালের মাপ ধরেই হবে।

তাতে হয়েছে কি!—লার্বো তোমাদের মতই বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসা করেছিল।

১৯০৩ আর ১৯৪৫-এর হিসাব এক নয়, হয়েছে শুধু এই।—বলে বোঝাবার চেষ্টা করেছিলাম ব্যাপারটা,—১৯০৩ সালে পুরো বছরের মাপ তিনশ পঁয়ষট্টি দিন পাঁচ ঘণ্টা আটচল্লিশ মিনিট আটাশ সেকেণ্ড ছিল না।

—আটাশ সেকেণ্ড কি বলছেন!—গৌর প্রতিবাদ জানালে,—দিন ঘণ্টা মিনিট সব ঠিক আছে কিন্তু আটাশ নয়, ওটা ছেচল্লিশ সেকেণ্ড।

ঘনাদার চোখে সেই অনুকম্পার দৃষ্টি। হেসে বললেন,—ছেচল্লিশ সেকেণ্ড এই আজ ১৯৬৩ সালে। ১৯৪৫-এ ছিল আটাশ সেকেণ্ডের কিছু কম বেশী, আর ১৯০৩ সালে ছিল তিনশ পঁয়ষট্টি দিন পাঁচ ঘণ্টা আটচল্লিশ মিনিট এগারো সেকেণ্ড মাত্র। পৃথিবীর সূর্য

প্রদক্ষিণের সময় প্রতি বছরই গড়ে এক সেকেণ্ড করে বাড়ছে, কখনো একটু আধটু আবার কমেও যায় কোনো অজানা কারণে। ১৯০৩ সাল থেকে ১৯৬৫-এর মধ্যে সময়টা ৩৫ সেকেণ্ড বেড়ে গেছে।

একটু থেমে আমাদের হাঁ করে মুখগুলোর ওপর একবার চোখ বুলিয়ে ঘনাদা আবার বললেন,—সব শুনেও লার্বো তেমনি হতাশ ভাবে বললেন, ক্যাপেলার দাবি গ্রাহ্য হয়নি ঠিকই কিন্তু তাতে আমাদের কি লাভ! আমাদের দাবি ত তাতে সাব্যস্ত হয়নি।

তাও হয়েছে!—আশ্বাস দিয়ে বললাম,—আমার বন্ধু ডাঃ ব্র্যাণ্ট সে ব্যবস্থাও করেছেন বলে জানাচ্ছেন।

—ডাঃ ব্র্যাণ্ট! জীববিজ্ঞানের সেই পণ্ডিত! কিন্তু তিনি কি করে ব্যবস্থা করবেন! এ খবর তাঁর কাছে ক্যাপেলার প্লেনেরও আগে পেঁাছাবে কি করে?

পেঁাছেছে মাছির পাখায়।

মাছির পাখায়! লার্বো অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন,—এটা কি ঠাট্টার বিষয় দাস!

ঠাট্টা নয় ডাঃ লার্বো! সত্যি কথাই বলছি। আমার ওই জাল-ঢাকা কৌটোয় এক জাতের মাছি ছিল। তার নাম Cephenomva। শব্দের চেয়ে দ্রুত তাদের গতি। ঘণ্টায় ৮১৭ মাইল। সেই মাছি ছাড়া পাওয়ামাত্র দিগ্বিদিকে বিদ্যুৎ বেগে উড়ে গেছে। ডাঃ ব্র্যাণ্টকে আমি সব বুঝিয়ে সজাগ থাকতে বলে এসেছিলাম। এ জাতের কোন মাছি তাঁর এলাকায় নেই। সুতরাং একটা চোখে পড়লেই যেন তিনি আপনার নামে ট্রাস্টের সেক্রেতায় দাবি পেশ করেন। তিনি তাই করেছেন যথাসময়ে।

ঘনাদা তাঁর কথার ওজন বাড়াবার জন্যে একটু চুপ করে থেকে গম্ভীর স্বরে বললেন,—মাছির ঋণ আমি ভুলতে পারি না বলেই ওসব ফ্লিটটিট আমার দুচক্ষের বিষ।

আচ্ছা যার জন্যে এত কুরুক্ষেত্র,—শিবু জিজ্ঞাসা করলে, সেই ইস্পাতের দরজার আড়ালে লুকানো গুপ্তধনটা কি?

আফ্রিকার সব চেয়ে বড় সম্পদ। না হীরে মানিক সোনা দানা নয়, আফ্রিকার সবচেয়ে বড় শিল্পী বেনিনদের বহু আগেকার লুপ্ত এক শাখা জাতির আশ্চর্য শিল্পীদের তুলনাহীন সব ব্রঞ্জের, হাতির দাঁতের আর খোদাই করা কাঠের নানা মূর্তি আর আসবাব। ডাঃ লার্বোর বাবা আঁদ্রে জীবন পাত করে সে-সব সংগ্রহ করেছিলেন। ডাঃ লার্বো এখনো সেগুলো নিয়ে গবেষণা করছেন বলে এখনো বাইরের কেউ সে-সব দেখতে পায়নি।

সবই বুঝলাম—শিশির হঠাৎ বেতালা প্রশ্ন করলে,—কিন্তু আপনার ওই সেফেনোমিয়া না কি জেট্ প্লেনের যমজ মাছি গোটা আফ্রিকা থাকতে ঠিক রেই-বোঁবায় আপনার বন্ধু ডাঃ ব্র্যাণ্টের কাছেই উড়ে গেল! সেখানো মাছি বুঝি?

ঘনাদা হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে বললেন,—ওহে তোমাদের দেবু, খুড়ি মৌলুবী সাহেব যে নীচে একা একা বসে থেকে শেকড় গজিয়ে ফেললেন। এতক্ষণে গোঁফদাড়ি খুলে গেল কি না দেখো গে যাও।

চমকে উঠে একবার ঘনাদার দিকে চেয়েই মাথা আমাদের সব হেঁট।

আর টুঁ শব্দটি না করে সুড়সুড় করে সবাই নীচে নেমে গেলাম।

চালাকিটা যে ঘনাদা আগেই ধরে ফেলেছেন, তা কি জানি!

সত্যিই উর্দু একটা হাতের লেখা পুরানো পুঁথি যোগাড় করে পাড়ার পৌষিন থিয়েটারের দল থেকে দেবুকে দাড়ি গোঁফ আর আচকান পরিয়ে মিশরী মৌলুবী সাজিয়ে এনেছিলাম।

জল

কীসে যে কী হয় কিছুই বলা যায় না।

বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের উপমাই লোকে দেয় কিন্তু শুকনো খটখটে আকাশ থেকেও যে বর্ষণ কখনো কখনো হয় সে কথা মনে রাখে ক'জন।

এ রকম বর্ষণ এই আমাদের ভাগ্যেই সেদিন হয়েছে, একেবারে যাকে বলে অভাবিত।

অভাবিত ছাড়া আর কি বলা যায়। প্রাণান্ত সাধ্য-সাধনা করেও যাঁকে এতটুকু গলাতে পারি নি গত তিনমাস, নিজের তিনতলার টঙে যিনি প্রায় অবাঙ্‌মানসগোচর হয়ে আছেন, উঠতে নামতে ক্বচিৎ কদাচিৎ দেখা হলে যাঁর দৃষ্টিতে হাওয়ার মত আমরা হঠাৎ স্বচ্ছ হয়ে যাই, দোতলার আড্‌ডা ঘর থেকে কখনো পাড়া-কাঁপানো শোরগোল তুলে কখনো বা অনুকূল বাতাসে সদ্যভাজা হিঙের কচুরি কি চিংড়ির কাটলেটের সুবাস ছড়াবার ব্যবস্থা করেও যাঁকে একবার একটু কৌতূহলভরেও ওপরের ছাদ থেকে উঁকি দেওয়াতে পারি নি, সেই ঘনাদার হঠাৎ নিজে থেকে বিনা নিমন্ত্রণেই আড্‌ডাঘরে এসে সহাস্যবদনে নিজের আরাম-কেদারা দখল করে কল্পনা করতে পেরেছিল।

শুধু ঘরে ঢুকে বসা তো নয়, প্রায় ঢুঁ মেরে আমাদের আলোচনায় মাথা গলিয়ে দেওয়া।

অথচ আজ দুপুর বেলাতেই আমরা হার মেনে ফিরে এসেছি মুখ চুন করে। শিশির যেন বৃষ্টিতে নীচের ঘরে জল পড়ার সমস্যা মেটাতে ঘনাদার কুঠুরির সামনের ছাদটা তদারক করতে গেছল। সঙ্গে আমাকেও থাকতে হয়েছিল ব্যাপারটা সরব করবার জন্যে।

ছাদটা তো অনেক জায়গায় দাগরাজি করতে হবে দেখছি।—আমার গলাটা আশা করি রাস্তার ওপারের বাড়িতেও শোনা গেছল।

দাগরাজি।—শিশির তার গলাটা গলি ছাড়িয়ে বড় রাস্তায় পেঁছে দিয়েছিল,—শুধু দাগরাজিতে কী হবে। সমস্ত ছাদ খুঁড়ে নতুন করে পেটাই করতে হবে।

ঘনাদার তাতে বড্‌ড অসুবিধে হবে না?—আমি তারস্বরে জিজ্ঞাসা করেছিলাম।

আকাশে অনেক উঁচুতে একটা চিল নিশ্চিন্ত মনে ভেসে চক্কর দিতে দিতে হঠাৎ ডানা

নেড়ে তীরবেগে সরে পড়েছিল, কিন্তু খোলা দরজা দিয়ে গিয়ে তক্তপোশের ওপর আসীন ও খবরের কাগজে নিমগ্ন ঘনাদার বিন্দুমাত্র চাঞ্চল্য দেখা যায়নি।

ছাদের ফাটল দেখবার ছলে শিশির এবার ঘনাদার দরজার কাছে গিয়ে ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগের জন্যে নতুন সিগারেটের টিনটা খোলবার কসরত করেছিল।

আমাকে ও সেই সঙ্গে পাড়ার পাঁচজনকে শুনিয়ে বলেছিল,—একেবারে তাজা মাল। খুললেই কী রকম শিস দেয় শোনো।

সিগারেটের টিন খোলার শিস্ না হোক, শিশিরের সরব বিজ্ঞাপন সারা বনমালী নস্কর লেনকেই সচকিত করে তুলেছিল, কিন্তু ঘনাদার মুখের সামনের খবরের কাগজটা একটু কাঁপেওনি।

ছাদ মেরামত সম্বন্ধে আরো কিছু আবোল-তাবোল বকে আমাদের নেমেই যেতে হয়েছিল অগত্যা।

ঘনাদার এবারের ধনুকভাঙা পণ আর টলাবার নয় বলেই তখন ধরে নিয়েছি।

ছোট্ট এক বাটি তেল এই তিন মাস ধরে এতদূর গড়াবে ভাবতেও পারিনি আমরা কেউ।

হাঁ, সামান্য এক বাটি তেল থেকেই বাহাত্তর নম্বরের ঠাণ্ডা লড়াই এবার শুরু।

তেলটা যে সরষের তা আর বোধ হয় বলতে হবে না। তখন তার আকাল সবে দেখা দিয়েছে। একেবারে হা তেল! জো তেল! বলে আর্তনাদ না উঠুক, তেল আনতে অনেকের বাড়িরই কড়া পুড়ে যেতে শুরু করেছে, দোকানের কিউ দেওয়া লম্বা লাইনের কৃপায়।

সে মাসটায় মেসের ম্যানেজারি ছিল গৌরের ঘাড়ে। অতি কষ্টে মাসখানেকের মত তেল কোথা থেকে সে যোগাড় করে এনেছে।

তিন হপ্তা না যেতেই ঠাকুর রামভুজের কাছে তেল বাড়ন্ত শুনে একেবারে খাপ্পা।

ধমক খেয়ে রামভুজ আমতা-আমতা করে জানিয়েছে যে তার কোন কসুর নেই। বড়-বাবুকে রোজ এক বাটি করে মাখবার তেল না দিতে হলে সে পুরো মাসটা নিশ্চয়ই চালিয়ে দিতে পারত।

আমরা একটা ফোঁটার জন্যে মাথা খুঁড়ে মরছি, আর বড়বাবু রোজ রোজ বাটি বাটি তেল মাখছেন! বলে দেবে যে মাখবার তেল এখন থেকে নিজেই যেন যোগাড় করেন।

মেজাজ যত গরমই হোক তালে ভুল করবার ছেলে গৌর নয়। দোতালার সিঁড়ির ধারে দাঁড়িয়ে, কথাগুলো চাপা গলাতেই বলেছে।

তেতালার ঘরে সে আওয়াজ পেঁাছোবার কথা নয়। তবু সেদিন সন্ধে থেকেই ঘনাদা আমাদের ত্যাগ করেছেন। তাঁর সে আত্মনির্বাসন পর্বই চলে এসেছে আজ পর্যন্ত।

তারপর হঠাৎ যেন ভেলকিবাজিতে কোথা থেকে কী হয়ে গেল!

কার্য-কারণ সূত্র সন্ধান করতে গেলে গৌরের রেন-কোটটাই মূল বলে ধরতে হয় বোধ হয়। গৌরের একটা রেন-কোট যদি না থাকত...

না, তা যদি বলি তা তাহলে রেন-কোটটাই বা কেন, কার্য-কারণ শৃঙ্খল খুঁজতে আর বহুদূর তো যাওয়া উচিত।

বাঙলাদেশে মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল নামে দুটি অতুলনীয় টীম যদি না থাকত, বছরের পর বছর তাদের রেষারেষির পাল্লায় সারা দেশ যদি উত্তেজনার দোলায় না দুলত, লীগের হাড্ডাহাড্ডি প্রতিযোগিতায় আগুপিছু হতে হতে দুই টীম যদি একই পয়েন্টের কোঠায় এসে না দাঁড়াত, চ্যারিটি ম্যাচের সাতরাজার ধন মানিকের মত দুর্লভ টিকিট শিশির ও গৌর দুজনেই যদি বহুজন্মের পুণ্যফলে না পেয়ে যেত আর বৃষ্টির হুমকি দেওয়া এক বিকেলে দুজনে দুটি রেন-কোট নিয়ে খেলার মাঠে গিয়ে উপস্থিত না হত, তাহলে গৌরের রেন-কোটও হারাত না আর আমরাও ঘনাদার অভাবের দুঃখ ভুলতে রেন-কোট উদ্ধারের উপায় ভেবেই সন্ধেটা জমাবার চেষ্টা করতাম না।

তবু রেন-কোট দিয়েই শুরু করা যাক।

গৌর সেদিন তার রেন-কোটটা হারিয়ে এসেছিল। হারিয়েছিল মোহনবাগান ইস্ট-বেঙ্গলের চ্যারিটি ম্যাচের খেলা দেখতে গিয়ে। মোহনবাগান এক গোল দিতেই উল্লাসে হয়ে সে নৃত্য শুরু করেছিল, শিশিরের দিকে ক্ষণে ক্ষণে বিদ্রূপ-বাণ হানতে হানতে। ইস্টবেঙ্গল কয়েক মিনিট বাদেই সে গোল শোধ করে দিতেই শিশিরের অসভ্যতায় বিরক্ত হয়ে অন্য জায়গায় সরে বসেছিল। শিশিরের সত্যিই বাড়াবাড়ি। ইস্টবেঙ্গল না হয় কেঁদে কেঁকিয়ে একটা গোল শোধ করেই ফেলেছে। তাতে অমন হাত-পা ছোঁড়বার আর গাঁক-গাঁক করে চেঁচাবার কী আছে!

মোহনবাগান তারপর আর একটা গোল দিয়ে ফেলতেই নাচতে নাচতে গৌর শিশিরের কাছেই ফিরে এসেছিল। কিন্তু শিশিরের মনটা এমন ছোট ভাবতে পারেনি। মোহনবাগান জিতছে বলে জায়গা ছেড়েই কি না সরে পড়েছে! খুশী না হয় নাই হলি কিন্তু গৌরের ভালো ভালো শানানো কথাগুলো তো শুনতে পারতিস। সেটুকু খেলোয়াড়ী উদারতা,—যাকে বলে স্পোর্টিং স্পিরিট যদি না থাকে তাহলে খেলা দেখতে আসা কেন?

এর পর শিশির কোথায় গিয়ে লুকিয়ে বসেছে গৌর খুঁজে বার নিশ্চয়ই করত। তাই করবেই ঠিক করেছিল। হাজার হোক বন্ধুত্বের খাতিরে তাকে একটু উপদেশ দেওয়াও তো দরকার। সেই সঙ্গে, 'ইস্টবেঙ্গল যে হারবে এ আর এমন বেশী কথা কি!' বলে একটু সান্ত্বনা।

কিন্তু এর মধ্যে মেঘ নেই জল নেই হঠাৎ বজ্রাঘাত।

ইস্টবেঙ্গল কোথা থেকে ঝপ্ করে আবার একটা গোল দিয়ে বসল।

এ যে অফসাইড গোল সে বিষয়ে অবশ্য সন্দেহ নেই। কিন্তু সে তর্ক করতে গেলে তো শিশিরের জন্য অপেক্ষা করতে হয়। ধেই-নৃত্য করতে করতে সে যে এই দিকেই এখন আসবে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

খেলা শেষ হতে তখনও মিনিট [illegible] বাকি। গৌর তবু আগেই চলে এসেছে মাঠ থেকে।

মাঠ থেকে ট্রামের লাইন পর্যন্ত আসতে আসতেই বৃষ্টি।

রেন-কোটটা সম্বন্ধে খেয়াল হয়েছে সেই তখন। কিন্তু তাতে আর লাভ কী? বেরসিকের মত একেবারে সপসপে হয়ে ভিজে বাহাত্তর নম্বর বনমালী নস্কর লেনের দে ঘরে পা দিয়েই শিশিরকে দেখে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠে বলেছে,—কী রকম আমার ওয়াটারপ্রুফটা নিয়ে চলে এলি! ল উঠলেন,—

তোর ওয়াটারপ্রুফ!—শিশির তাজ্জব,—তোর ওয়াটারপ্রুফ আমি নিতে যাব কেন? নিউগিনীর কি দুটো ওয়াটারপ্রুফ লাগে?

বাঃ তোর পাশেই তো রাখা ছিল!—গৌরের গলাটা আর তেমন কড়া নয়। ই তার

তার পাশে তো তুইও ছিলি!—শিশিরের একটু যেন বাঁকা জবাব,—মোহনবাগান খেতেই গ্যালারির ফাঁকে গলে পড়েছিলি নাকি!

বাহাত্তর নম্বরও খেলার মাঠের মত কাদা হয়ে ওঠবার ভয়ে ওয়াটারপ্রুফ রহস্যের সমাধানে আমাদেরও যোগ দিতে হয়েছে এবার।

ব্যাপারটা কী বুঝে নিয়ে নিজের নিজের মতামত ও পরামর্শ জানিয়েছি।

শিবু দার্শনিক মন্তব্য করেছে,—খেলার মাঠে ওয়াটারপ্রুফ কখনো হারায় না। হারায় আবার পাওয়া যায়।

কী রকম?—গৌরের বদলে আমরাই অবাক্ হয়ে জিজ্ঞাসা করেছি।

কী রকম আবার?—শিবু গম্ভীর ভাবে বুঝিয়ে দিয়েছে,—ওই মাঠেই পাওয়া যায় একটু ধৈর্য ধরে থাকলে। রংটা, মাপটা হয়ত মিলবে না, কিন্তু পাওয়া যাবেই।

তার মানে আর কারুর ফেলে যাওয়া ওয়াটারপ্রুফ! তাই আমি নেব?—গৌর জামা নিংড়াতে নিংড়াতে চোখ পাকিয়ে বলেছে।

ওই সব তুচ্ছ আত্মপর ভেদ খেলার মাঠে নেই।—শিবু যেন বাণী দিয়েছে,—কেউ হারাবে, কেউ পাবে, এই ওখানকার দস্তুর। হারিয়ে এসেও আফসোস করবে না, পেয়ে গেলেও নিতে কোন সংকোচ করবে না। একহিসাবে ওটা ওয়াটারপ্রুফ বদলাবদলিরই বাজার। নিজেরটায় অরুচি ধরলে ইচ্ছে করেই কেউ কেউ ফেলে আসে বলে আমার বিশ্বাস। নিজেরটা হারালে পরেরটা নিতে তো আর বিবেকে বাধবে না!

শিবু আরো হয়ত ব্যাখ্যান করত। কিন্তু গৌর তার ভিজে জামাটা শিবুর মাথাতেই নিংড়ে বলেছে,—থাক থাক আর মাথা খাটিয়ে কাজ নেই। যা ফুলকি ছাড়ছে, এঞ্জিনই না জ্বলে যায়।

শিবুকে তখনকার মত ঠাণ্ডা করে গৌর নিজের ঘরে গেছে জামাকাপড় ছেড়ে আসতে। ইতিমধ্যে বনোয়ারী ঝাল মুড়ির গামলা রেখে গেছে মাঝখানের টেবিলে।

তাই চিবোতে চিবোতে চোখে যত জল ঝরেছে, বুদ্ধি তত যেন খুলে গেছে মাথায়।

গৌর ফিরে আসবারও যেন তখন আর তর সইছে না।

সে ঘরে এসে ঢোকবামাত্র তাই আশ্বাস দিলাম,—কোন ভাবনা নেই। রেন-কোট ফেরতই পেয়ে গেছ মনে করতে পারো!

যে ভাবে, কেউ কপাল কুঁচকে কেউ বা মুখ বাঁকিয়ে হেসে তাকাল, তাতে একটু ক্ষুণ্ণ হবারই কথা।

কিন্তু ভ্রূক্ষেপই করলাম না। আমার মুশকিল-আসানের মোক্ষম দাওয়াই-টা একবার শুনলে মুখের চেহারা যে বদলে যাবে সে বিষয়ে আমার তো সন্দেহ নেই।

শোনবার পর তাই হল! সবাই একেবারে যাকে বলে হতবাক্।

শিবু চোখ দুটো প্রায় ছানাবড়া করে জিজ্ঞাসা করলে,—কী বললে?

প্রস্তাবটা আর একবার শুনিয়ে দিতে হল একটু বিশদ ব্যাখ্যা সমেত।

এমন কিছু কঠিন ব্যাপার নয়। শুধু কিছু হ্যাণ্ডবিল ছাপিয়ে খেলার মাঠে গিয়ে গেটে গেটে বিলি করা। হ্যাণ্ডবিলে লেখা থাকবে।—

সাবধান! সাবধান!

তেতাল ...মোদী জনসাধারণের অবগতির হেতু জ্ঞাপন করা যাইতেছে যে গত আমাদের তা...ল-মোহনবাগান প্রতিযোগিতার দিনে খেলার মাঠে একটি বর্ষা-ত্রাণ তারপ...দ অনবধানতায় ক্রীড়াভূমির কাষ্ঠাসনে পরিত্যক্ত হইয়াছে। উক্ত পরিচ্ছদের কার্য...কারী কঠিন চর্মরোগে আক্রান্ত। সুতরাং ভ্রমক্রমে কেহ যেন সেটি ব্যবহার না হয়। রেন। করিলে রোগ তদ্দেহে সংক্রামিত হওয়া অবধারিত। পরিচ্ছদটি পুরাতন ...ংবাদপত্রে সতর্কভাবে আচ্ছাদিত করিয়া নিম্নলিখিত ঠিকানায় বাহকের দ্বারা বা বহ... ডাকযোগে প্রেরণ করিয়া জনহিতৈষণার পরিচয় দিন।

খানিকক্ষণ ঘরে আর টুঁ শব্দ নেই।

শিবুই প্রথম বিজ্ঞের মত মাথা নেড়ে বললে,—হ্যাঁ, এতেই কাজ হবে, নির্ঘাত কাজ হবে।

শিবুর সমর্থনে সন্তুষ্ট হয়ে তার দিকে চেয়ে একটু প্রসন্ন হাসি হাসলাম।

শিশির আমার দিকে বিস্ময়ভরেই বোধ হয় খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে বললে,—হ্যাঁ, কাজ ঠিক হবে, তবে পুলিস না করপোরেশনের লোক, কারা আসবে তাই ভাবছি।

সুরটা কেমন ভালো লাগল না। একটু সন্দিগ্ধ হয়েই জিজ্ঞাসা করলাম,—পুলিস কি করপোরেশনের লোক আসবে, মানে?

না।—শিবু আমায় আশ্বাস দিলে,—শিশির ভুল করছে। এলে প্রথমে অ্যাম্বুলেন্সই আসবে।

অ্যাম্বুলেন্স!—আমি বিমূঢ় আর সেই সঙ্গে একটু বিরক্তও,—অ্যাম্বুলেন্স এখানে আসছে কোথা থেকে!

কোথা থেকে আর!—শিশির ব্যাখ্যা করলে,—খোদ স্বাস্থ্যদপ্তর থেকে।

শিবু ব্যাখ্যাটা বিশদ করলে,—গৌরকে ধরে নিয়ে গিয়ে ছোঁয়াচে রোগের হাসপাতালে নজরবন্দী করে রাখবার জন্যেই অ্যাম্বুলেন্স আসবে। এরকম একটা সাংঘাতিক রুগীকে তো বাইরে রাখা নিরাপদ নয়।

একটা নয় দুটো অ্যাম্বুলেন্সই তাহলে আসা উচিত।—গৌরই মন্তব্য করলে,—একটা যদি আমার জন্যে হয় তাহলে আরেকটা এ ইস্তাহার যাঁর মাথা থেকে বেরুচ্ছে তাঁর জন্যে। সে অ্যাম্বুলেন্স অবশ্য মেণ্ট্যাল হসপিট্যাল থেকেই আসবে।

এবার যে হাসির রোলটা উঠল তাতে যোগ দিতে পারলাম না। সংসারের ওপর আমি তখন বীতশ্রদ্ধ! সত্যিকার গুণের আদর যেখানে নেই, পরোপকারের নিঃস্বার্থ চেষ্টা যেখানে উপহাসের বিষয়, সে স্থান ত্যাগ করাই উচিত কিনা ভাবছি এমন সময় একটু যেন হন্তদন্ত হয়েই ঘনাদার প্রবেশ।

বিমূঢ়তার ধাক্কায় হাসির রোল থামতে না থামতেই শিশিরের ছেড়ে ওঠা আরাম-কেদারায় গা এলিয়ে দিয়ে নিজে থেকেই সাগ্রহে জিজ্ঞেস করলেন,—কী, হাসি কিসের?

আমার তো বটেই, যারা এতক্ষণ হেসে ঘরের কড়িকাঠ কাঁপাচ্ছিল তাদেরও মুখের হাসি আর বুজতে চায় না।

শিশিরই সবার আগে নিজেকে সামলে বললে,—আজ্ঞে, হাসিটা কিছু নয়। আসলে আমরা একটা সমস্যা নিয়ে ভাবছি।

কী সমস্যা!—ঘনাদা ডান হাতটা বাড়িয়ে দিলেন সমস্যা ধরতে নয়, শিশিরের সিগারেটের জন্যে। যথারীতি তাঁর মধ্যমা ও তর্জনীর মধ্যে সিগারেট স্থাপন করে লাইটার দিয়ে ধরিয়ে দিয়ে শিশির বললে, সমস্যা একটা বর্ষাতির।

ও, বর্ষাতির!—বলে ঘনাদার অবজ্ঞাসূচক নাসিকাধ্বনিই আশা করেছিলাম—তার বদলে বেশ উৎসাহ ভরে তিনি বললেন,—হ্যাঁ, বর্ষাতি একটা সমস্যা বটে। বিশেষ করে যদি ফুটন্ত জলের বৃষ্টি হয়। সেবার সেই হাওয়াই দ্বীপে কিলোইয়া ইকি মানে ছোট কিলোইয়ার আগ্নেয়গিরি হঠাৎ জেগে ওঠায় যা হয়েছিল!

ঘনাদার হল কি! এ যে মেঘ না চাইতেই জল!

ফুটন্ত বৃষ্টি থেকেই গল্পের বন্যা বয়ে যেত বোধহয় কিন্তু গৌর নেহাত বেরসিকের মত বাগড়া দিলে।

সে বৃষ্টির কথা হচ্ছে না। আমার বর্ষাতিটা খেলার মাঠে হারিয়েছে. .

গৌরকে কথাটা আর শেষ করতে হল না। ঘনাদা 'হারিয়ে' পর্যন্ত শুনেই বলে উঠলেন,—তা হারিয়ে যাবার কথা যদি বলো একটা বর্ষাতি হারানো তো কিছু নয়, সেবার নিউগিনীর কাম্বারাম্বা গাঁয়ে পুকপুক মানে কুমির শিকারে বেরিয়েছি ..

রেন-কোট হারিয়ে গৌরের আজ মাথার ঠিক নেই বোধহয়। ঘনাদাকে বাধা দেবারই তার যেন বেয়াড়া জেদ চেপে গেছে।

কুমিরের কথা আসছে কোথা থেকে!—প্রায় যেন ধমকেই সে ঘনাদাকে থামিয়ে দিলে,—শুনছেন বর্ষাতিটা ভুলে খেলার মাঠে ফেলে এসেছি। সেটা উদ্ধার করা যায় কিনা তাই সবাই ভাবছি। খবরের কাগজে একটা বিজ্ঞাপন...

গৌরকে আর এগুতে হল না। ঘনাদার যেন কুটি পেলেই আঁকড়ে ধরবার অবস্থা। 'বিজ্ঞাপনের' ওপরই ঝাঁপিয়ে পড়লেন প্রায় চোখ কান বুজে—

বিজ্ঞাপন বড় গোলমেলে জিনিস হে। খবরের কাগজের একটা বিজ্ঞাপন থেকেই বেচুয়ানা-ল্যাণ্ডে অত বড় একটা চক্রান্ত সেদিন ধরা পড়েছিল।

গৌর এবারও বাদ সাধবার উপক্রম করছিল। দুদিক থেকে দুপায়ে শিবু আর শিশিরের ঝাড়া ঠোক্কর খেয়ে তাকে থামতে হল।

গৌর থামলেও আর এক উপদ্রব আচম্বিতে দেখা দিল আড্ডাঘরের দোরগোড়ায়। আমাদের বনোয়ারী। কাঁচুমাচু মুখে সে তার বার্তাটুকু জানাল—

বড়াবাবুকে একজনা নীচে বোলাইছে।

গৌরকে সামলাবার পর এমন ঘাটের কাছে এসে ভরাডুবি হতে আর আমরা দিই। পাছে ঘনাদা এই ফাঁকে ফসকে যান এই ভয়ে বনোয়ারীকে ধমক দিতে যাচ্ছিলাম কিন্তু তার দরকার হল না।

ঘনাদা একবার বনোয়ারীর দিকে কেমন একটু সন্ত্রস্তভাবে চেয়ে নিজেই গল্পের দড়ি ধরে যেন বেপরোয়া ঝুলে পড়লেন।

কী বলছিলাম, বিজ্ঞাপন? হ্যাঁ, বড় অদ্ভুত বিজ্ঞাপন বেরিয়েছিল জোহান্নেসবার্গের এক কাগজে। জোহান্নেসবার্গ কোথায় জানো তো? দক্ষিণ আফ্রিকায় ট্রান্সভালের সব চেয়ে বড় শহর। শহর গড়ে উঠেছে সোনার খনির কল্যাণে। হীরেও আছে। শহরের দক্ষিণেই যে নীচু পাহাড়ের সার চলে গেছে তা সোনায় ঠাসা বলা যায়। শহরের নামটাও ওই সোনার সন্ধান থেকেই এসেছে। ১৮৮৬তে জোহান্নেস রিস্‌সিক বলে একজন ওলন্দাজ ছিলেন জরিপ বিভাগের কর্তা। তাঁর আমলেই সোনার খোঁজ ওখানে মেলে। তাঁর নামেই তাই শহর বসানো হয়।

মাটিতে যেখানে সোনা সেখানে মানুষের মনে সীসের বিষ। গায়ের চামড়া ধলা না হলে সে দেশের মানুষ জন্তুজানোয়ারেরও অধম বলে গণ্য। ধলাদের রাজত্বে কালা আদমীরা মানুষদের মত মানুষ হয়ে বাঁচবার অধিকার নেই। তারা শুধু আছে ধলাদের ক্ষেত খামারে গরু বলদের মত খাটতে, খনির তলা থেকে ইঁদুর-ছুঁচোর মত ধলাদের জন্যে সোনা হীরে তুলতে। ধলাদের ছায়া মাড়ালেও কালাদের সাজা পেতে হয়। তাদের শহরের বাইরে ছাগলের খোঁয়াড়ের অধম বস্তিতে থাকার ব্যবস্থা। ধলাদের বাসে ট্রামে তারা চড়তে পারে না, ধলাদের দোকানে রেস্তোরাঁয় ঢুকতে তো নয়ই। ধলাদের জন্যে আলাদা করে রাখা পার্কের বেঞ্চিতে শুধু হেলান দেওয়ার জন্যে কালা মানুষকে হাজতে যেতে হয়েছে এমন দৃষ্টান্তেরও অভাব নেই।

দক্ষিণ আফ্রিকায় কালাদের ওপর ধলাদের জুলুমের সঠিক খবর আনবার জন্যে এক মার্কিন কাগজের হয়ে তখন সেখানে গিয়েছি। পোর্ট এলিজাবেথ, ডারবান, কিম্বার্লি, প্রিটোরিয়া হয়ে শেষ পৌঁছেছি জোহান্নেসবার্গে। যা দেখবার শোনবার সবই দেখাশোনা হয়েছে, পাততাড়ি গুটিয়ে ফিরে এলেই হয়। এমন সময় সেখানকার কাগজে ওই বিজ্ঞাপনটি চোখে পড়ল। আফ্রিকানস্ ভাষার কাগজ। এ অঞ্চলের বেশির ভাগ ধলাই মূলে ওলন্দাজ। প্রায় চারশ বছর আগে যারা এসেছিল তাদেরই বংশধর। আফ্রিকানস্ ভাষাও সেই আদি ওলন্দাজী ভাষার অপভ্রংশ।

ছোট্ট বিজ্ঞাপন। খবরের কাগজের লাইন চারেক মাত্র। কিন্তু যেমন অদ্ভুত তার মর্ম তেমনি কালাদের ওপর অবজ্ঞা আর ঘৃণা মেশান তার ভাষা। বিজ্ঞাপনটা কালাদের পড়বার জন্যে অবশ্য লেখা নয়। পড়বে কে? ওখানকার কালাদের কাগজ-কালির সঙ্গে সম্পর্ক তো শুধু টিপসই দেওয়ায়।

কালা কুলিমজুরদের ঠিকাদারদের উদ্দেশেই বিজ্ঞাপনটা দেওয়া। তাতে লেখা:—সাতদিন জল না খেলেও মরে না এমন সুটকো চিমসে গোছের একটা কালা নফর চাই। কোনো ঠিকাদার সে রকম কাউকে ধরে আনলে পুরস্কার পাবে।

এ রকম বিজ্ঞাপন দেখে আর ঠাণ্ডা থাকা যায়!

গেলাম ঠিকানা যা দেওয়া ছিল খাস শহরের সেই এলফ্ স্ট্রীটের অফিসে।

পোশাকটা কুলিমজুরের মতই করেছিলাম। যেতে যেতে এ শহরের যা এক বিশ্রী উপদ্রব

সেই সাদা ধুলোর ঝড়ে পড়ে চেহারা আরো খোলতাই হয়ে গেল। জোহান্নেসবার্গের চারধারে সোনার খনির গুঁড়ো করা পাথর থেকেই এই ধুলোর পাহাড় জমে থাকে। ঝড়ের সময় তারই ধুলোয় সারা শহর অন্ধকার করে দেয়।

জোহান্নেসবার্গ শহরের রাস্তাগুলো যেন জ্যামিতি ধরে পাতা। পুব থেকে পশ্চিম আর উত্তর থেকে দক্ষিণের সোজা সোজা রাস্তাগুলো পরস্পরকে চৌকোণা করে কেটে গিয়েছে।

অফিসটা একটা ছোটখাট তামাকের কোম্পানির। ঠিক এলফ্ স্ট্রীটে নয়, তার গা থেকে বার হওয়া একটা গলির মধ্যে।

আমাদের মত কালা আদমীর অবশ্য আসল অফিসে ঢোকবার হুকুম নেই। অফিসের পেছনের গোডাউনের ভেতর গিয়ে দাঁড়াতে হল।

বিজ্ঞাপন চার লাইনের হলেও উমেদার খুব কম জোটেনি দেখলাম। ভরসার কথা এই যে বিজ্ঞাপনের ফরমাশের সঙ্গে তাদের প্রায় কারুরই মিল নেই। বেশির ভাগই শক্তসমর্থ চেহারা। রোগা পটকা যা আছে সবই বুড়োটে। সঙ্গে ধলা ঠিকাদার। পুরস্কারের লোভেই কপাল ঠুকে যা হাতের কাছে পেয়েছে ঝেঁটিয়ে এনেছে।

আমার অনুমান ভুল নয়। এক এক করে ডাক পড়ে আর ভেতরে গিয়ে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই বাতিল হয়ে বেরিয়ে আসে।

দেখতে দেখতে আমার পালা এসে গেল।

পাহারাদার গোছের যে জোয়ান লোকটা সবাইকে ডাক দিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, আমার দিকে এবার ফিরে ভুরু কুঁচকে ঠোঁট বেঁকিয়ে বললে,—এই কালা ভূত! তোর ঠিকাদার কই? কার সঙ্গে এসেছিস?

আফ্রিকানস্ যেন বুঝি না এই ভাব দেখিয়ে হাঁ করে চেয়ে রইলাম। লোকটা আবার ভাঙা-ভাঙা সোয়াহিলিতে প্রশ্ন করায় যেন ভয়ে ভয়ে বললাম,—আজ্ঞে, একলাই এসেছি।

একলা এসেছিস!—পাহারাদারের গলার আওয়াজে আর মুখের চেহারায় মনে হল আমায় নিয়ে যাবে, না বুটের ঠোক্কর দিয়ে বিদেয় করবে ঠিক করতে পারছে না।

শেষ পর্যন্ত কী ভেবে ব্যাজার মুখে বললে,—আয় তবু! আমার চেয়ে কর্তার গোদা-পায়ের লাথির জোর বেশী।

গোডাউনের একধারে কাঠের পার্টিশন দেওয়া একটা মাঝারি মাপের ঘর। তারই ভেতর হাতের খাটো লাঠিটা দিয়ে পাহারাদার আমায় ঠেলে ঢুকিয়ে দিলে।

ভেতরে ঢুকে যে মূর্তিটিকে মোটা একটা চুরুট মুখে বেশ অস্থিরভাবে পায়চারি করতে দেখলাম তার জুড়ি পাওয়া ভার।

দেখলে সম্ভ্রম হওয়াই উচিত। আমাদের কিস্তুড় সিং পালোয়ানের রঙটা যদি ধবধবে হত আর চুলগুলো হত কোঁকড়া আর প্রায় গনগনে আগুনের মত লাল, তাহলে খানিকটা বোধ হয় মিল পাওয়া যেত।

পাহারাদার আমার পেছনে এসে ঘরে ঢুকেছিল। সসম্মানে এবার সে জানালে,—কেলেটা একলাই এসেছে বলছে হের ফিংক। চেহারাটা চিমসে দেখে নিয়ে এলাম।

মুখে চুরুট রেখেই হের ফিংক মেঘগর্জনের মত আওয়াজে বললেন,—ছুঁচোটাকে ধুলোর গাদা খুঁড়ে এনেছ নাকি? ঘরটা তো নোংরা করে দিলে!

আমার দিকে ফিরে হের ফিংক তারপর সোয়াহিলিতে ধমকের সুরে জিজ্ঞাসা করলে,—সঙ্গে ঠিকাদার নেই কেন?

ঠিকাদার কোথায় পাব বোম্মানা!—মাটিতে যেন মিশিয়ে বললাম,—সবে তো কাল কালা-হারি পেরিয়ে কাজের খোঁজে শহরে এসেছি।

কালাহারি পেরিয়ে এসেছিস!—ফিংক মুখ থেকে চুরুটটা নামিয়ে এবার একটু আগ্রহ-ভরেই আমায় লক্ষ্য করে বললে,—আসছিস কোথা থেকে?

তা কি জানি বোয়ানা! সেখান থেকে আসতে অনেকগুলো সূর্য আর অনেকগুলো চাঁদ আকাশে ঘুরে যায়। পাহাড় জঙ্গল ফুরিয়ে গিয়ে চারদিকে লাল কাঁকর আর বালি ধুধু করে....

থাম! বলে ধমকে আমার ঠিকানা জানবার চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে ফিংক এবার জিজ্ঞাসা করলে,—সবে তো কাল এসেছিস, ঠিকাদারও কাউকে জানিস না। তবে এখানকার কাজের খবর পেলি কেমন করে? তুই পড়তে জানিস?

ইচ্ছে করেই বললাম,—হাঁ বোয়ানা।

জবাব শুনে ফিংকের মুখখানাই প্রথমে হাঁ। তারপর যেন নিজের অজান্তেই তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল,—পড়তে জানিস তুই?

খুব জানি বোয়ানা!—যেন সবিনয়ে জানালাম,—মাটিতে থাবার দাগ পড়ে বলে দিতে পারি সিংহটা মদ্দা না মাদী, বুড়ো না জোয়ান, পেট ভরে খেয়েছে না খাবার খুঁজছে...

চুপ! চুপ!—ফিংক বিরক্ত হয়ে কাছের টেবিলে রাখা খবরের কাগজটা দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, —ওই রকম কাগজ পড়তে পারিস?

কাগজ!—আমি যেন হতভম্ব,—কাগজ পেলে তো আমরা পোড়াই বোয়ানা!

আচ্ছা! আচ্ছা বুঝেছি!—ফিংক এবার তার আসল প্রশ্নে ফিরে এল,—এ কাজের খবর পেলি তাহলে কোথায়?

ওই হেরেরা-দের বস্তিতে বোয়ানো!—সরল মুখ করে বললাম,—এই ঠিকাদার কজনকে ডেকে খোঁজ নিচ্ছিল তাই শুনেই চলে এলাম।

হুঁ!—ফিংক চুরুটে টান দিয়ে কী যেন ভেবে নিলে। তারপর আমার দিকে চোখ পাকিয়ে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলে,—কালাহারির মরুভূমি পার হয়ে এসেছিস বলছিস?

হাঁ বোয়ানা! কালাহারি পার না হলে এখানে আসব কী করে?

কদিন লেগেছে পার হতে?

তা তো বলতে পারব না বোয়ানা! তবে কালাহারিতে পা দেবার আগে গোঁফদাড়ি কামিয়ে এসেছিলাম, এখানে পৌঁছে মুখে চার আঙুল জঙ্গল হয়ে গেছল। এখানকার নাপিতরা সে জঙ্গল....

আচ্ছা! আচ্ছা বুঝেছি!—বলে তাড়াতাড়ি আমায় থামিয়ে ফিংক বললে,—কালাহারি যে পার হলি, তো জল পেয়েছিলি কোথায়?

জল!—আমি যেন অবাক্!

হ্যাঁ, জল! খাবার জল! তার কী করেছিলি?

কী আবার করব বোয়ানা! খাইনি।

জল খাসনি!—ফিংক আমায় বিশ্বাস করবে, না মিথ্যুক বলে বুটের ঠোক্কর দেবে, যেন ঠিক করতে পারছে না।

বললাম,—জল তো আমার তেমন লাগে না বোয়ানা। চাঁদ ক্ষইতে ক্ষইতে যখন একেবারে মুছে যায় তখন একবার খাই আর বাড়তে বাড়তে যখন পুরো থালা হয়ে ওঠে তখন এক[illegible]

ভুরু কুঁচকে আমার দিকে খানিক তাকিয়ে থেকে ফিংক বললে,—ঠিক আছে। তোর কথা সত্যি কি মিথ্যে হাতেনাতেই প্রমাণ হবে! শোন্, আমার সঙ্গে ওই কালাহারিতেই তোকে যেতে হবে। প্রথমে আমার সঙ্গে যাবি মোটরে, তারপর এক জায়গায় তোকে ছেড়ে দেব। তোকে একলা গিয়ে কাজ হাসিল করতে হবে। কতদিন যে জল পাবি না খাবার পাবি না তার কিছু ঠিক নেই। তা তুই তো জল খাস একবার পূর্ণিমায় একবার অমাবস্যায়। তোর আর ভাবনা কি!

না, সে ভাবনা নেই বোয়ানা। কিন্তু কাজটা কি যদি বলতেন!

এদিক ওদিক চেয়ে পাহারাদারকে পর্যন্ত চোখের ইঙ্গিতে ঘর থেকে বার করে দিয়ে

ফিংক কাজটার কথা বলতে গিয়েও কী ভেবে আর বললে না। শুধু বললে, কী কাজ তা এখন শুনে কী হবে! কালাহারিতে গিয়েই বলব।

তা কী করে হয় বোয়ানা!—ভয়ে ভয়ে যেন নিবেদন করলাম, কাজটা না জেনে কী করে আপনার সঙ্গে যাই! সে পারব না।

পারবি না মানে!—ফিংকের আসল মূর্তি এবারই পুরোপুরি দেখা গেল। একটি বিরাশি সিক্কার চড় আমার গালে কসিয়ে হাতটা আবার রুমাল বার করে মুছতে মুছতে বললে,—নচ্ছার কালা নেংটি! আমার মুখের ওপর বলিস কিনা পারব না। ঘাড় যদি আর বাঁকিয়েছিস তো দুমড়ে শুধু সিধে করব না, সোজা গারদে চালান করে দেব ট্যাক্স রসিদ নেই বলে। আছে তোর ট্যাক্স রসিদ? আছে পাস?

চড় খেয়ে একটা ডিগবাজি মেরে যেখানে পড়েছিলাম সেখান থেকে যেন কাঁদোকাঁদো মুখে গালে হাত বোলাতে বোলাতে বললাম,—না বোয়ানা!

তবে!—হাত মোছা রুমালটা ঘরের কোণে ফেলে দিয়ে দাঁত খিঁচিয়ে ফিংক বললে, ট্যাক্স রসিদ আর পাস ছাড়া এ শহরের রাস্তায় তোর মত কালা ছুঁচোর হাঁটবার পর্যন্ত হুকুম নেই তা জানিস না!

কথাটা সত্যি। দক্ষিণ আফ্রিকায় বলাদের শয়তানী রাজত্বে আঠারো বছর বয়স হলেই কালাদের ওপর ট্যাক্স ধরা হয়। সে ট্যাক্স দেবার রসিদ আর পাস না নিয়ে শহরে ঘুরলে ধরা পড়লেই কয়েদ।

ফিংক এবার পাহারাদারকে ডেকে বললে,—আর যে কটা আছে, সব বিদেয় করে দাও। আর এ হতভাগাকে বেঁধে রেখে দাও এই ঘরে তালা দিয়ে। কিছুতে যেন পালাতে না পারে। আজ রাত্রেই ওকে নিয়ে রওনা হব।

আমার দিকে ফিরে তারপর সোয়াহিলিতে বললে,—কী রে! আর ট্যাঁফু করবি?

ভয়ে যেন সিঁটিয়ে গিয়ে বললাম,—না বোয়ানা। এখন থেকে আমি আপনার জুতোর সুকতলা!

জুতোর সুকতলা হয়েই সে রাত্রে ফিংকের সঙ্গে রওনা হলাম তার জীপ গাড়িতে।

ফিংকের আসল মতলব যে শয়তানী গোছের কিছু তা তার রওনা হবার ব্যাপারের গোপনীয়তা থেকেই বোঝা গেল। আমায় ছাড়া আর একটা লোককেও সে সঙ্গে নেয় নি। নিজে সামনে বসে জীপ চালাচ্ছে, পেছনে একরাশ খাবারদাবারের বাক্স আর জলভরা ব্যাগের মাঝখানে আমি কোনরকমে বসে আছি। খাবার আর জলের জায়গা ছাড়া একটা জাল দেওয়া সিন্দুক গোছের বাক্সও আছে সেখানে। সেটা সম্পূর্ণ খালি বলেই রহস্যজনক।

জোহান্নেসবার্গ ছাড়িয়ে দুদিন দুরাত কালাহারির মরুর ভেতর দিয়ে যাবার পর সে বাক্সের রহস্যটা পরিষ্কার হল। সেই সঙ্গে আমায় কী কাজের জন্যে আনা তাও।

এতক্ষণ পর্যন্ত কালাহারির কুরুমান নদী ধরেই আমরা এসেছি। কালাহারির নদী মানে শুকনো খাত মাত্র। তাতে জলের বাষ্পও নেই। কালাহারির আকাশে কখনো কখনো অবশ্য মেঘের ঘটা দেখা যায়, বৃষ্টি যে পড়ে না কখনো তাও নয়, কিন্তু সে ছিটেফোঁটা পড়তে না পড়তেই যায় মিলিয়ে। তবে সত্তর বছর আগে একবার এই কুরুমান নদীতে নাকি অবিশ্বাস্য রকমের বৃষ্টিতে বান ডেকেছিল বলে গল্প আছে।

কুরুমানের এখনকার চেহারা দেখে সে গল্পে বিশ্বাস করা শক্ত। পৃথিবীর পুরোন ঘায়ের দাগের মত শুকনো মরা খাত যেন সৃষ্টির আদিকাল থেকে পড়ে আছে। এখানে সেখানে একটা দুটো উটকাঁটার নীচু ঝোপ ছাড়া কোথাও প্রাণের লক্ষণ নেই।

তবু কালাহারির মত মরুতে এই ধরনের মরা নদী দিয়ে যতদূর পারা যায় যাওয়াই সুবিধের।

এখানে তবু একটা চেনবার মত রাস্তা পাওয়া যায়। এর বাইরে মরুভূমি তো দিক্‌চিহ্‌নহীন অসীমতা। যেদিকে চাও শুধু ছোট বড় বালিপাড়। মাঝে মাঝে দু একটা বেঁটে বাবলা জাতের শক্ত কাঁটাগাছ। কোথায় যে আছি তা জানবার উপায় নেই। সব দিকই এক রকম।

যতদূর পারা যায় কুরুমান নদীর শুকনো খাত দিয়ে এসে উইতদ্রায়াই বলে একটা জায়গায় আমরা আবার আসল মরুতে উঠলাম। ফিংক অবশ্য জায়গাটার পরিচয় কিছু জানত না।

এ পর্যন্ত এটা ওটা হুকুম করা আর যখন তখন গালাগাল দেওয়া ছাড়া ফিংক আমার সঙ্গে কথাই বলে নি। খাবার যা সঙ্গে এনেছি তা থেকে দুবেলা গাণ্ডেপিণ্ডে খেয়েছে আর আমায় প্রায় ছোবড়া চুষতেই দিয়েছে বলা যায় হেলাফেলায়।

জুতোর সুকতলা হয়ে তবু সবই সহ্য করেছি শুধু তার গোপন শয়তানী মতলবটুকু জানবার জন্যে।

কুরুমান নদীর খাত ছেড়ে ওঠবার পর তাকে বেশ একটু ভাবিত হয়ে এদিক-ওদিক দূরবীন চোখে দিয়ে চাইতে দেখে বুঝলাম জায়গাটা সে ঠিক ঠাহর করতে পারছে না।

যেন অত্যন্ত কাঁচুমাচু হয়ে বললাম,—যদি ভরসা দেন তো একটা কথা বলি বোয়ানা।

কী কথা?—চোখ থেকে দূরবীনটা নামিয়ে ফিংক খিঁচিয়ে উঠল।

এ জায়গাটা আমি চিনি বোয়ানা। এটার নাম ছিল উইতদ্রায়াই।

তুই কেমন করে জানলি?—ফিংক বেশ সন্দিগ্ধ।

আমার ঠাকুরদাদার কাছে শোনা বোয়ানা। এখানে অনেক অনেক আগে একটা উটের কাফিলার সরাই ছিল। মরুভূমি পার হবার পথে জিরিয়ে নিতে এখানে থামত।

বটে! তোর ঠাকুরদা কি উট ছিল নাকি, সে কাফিলায়? তাই জন্যেই বুঝি জল না খেলে জোর চলে?

নিজের নীচ রসিকতায় ফিংকের সে কি বিশ্রী হাসি!

অম্লান বদনে সব হজম করে চুপ করে রইলাম। ফিংক দূরবীনটা আবার চোখে দিয়ে এদিক-ওদিক দেখে বললে,—হ্যাঁ, উটের চোখে তুই ঠিকই চিনেছিস। এখন এখান থেকে তোকে একলা কাজ হাসিল করতে যেতে হবে। ভাল করে মন দিয়ে শুনে নে।

মনে মনে বললাম, তোমার এই কাজটা কী জানবার জন্যেই জুতোর সুকতলা হয়ে এতদূর এসেছি, আর মন দিয়ে শুনব না!

মুখে বললাম,—বলুন বোয়ানা!

শোন্, এখান থেকে পাঁচ দিনের হাঁটাপথে কীট্‌মানসফ-এ পেঁাছোবি। কীট্‌মানসফ-এ কী আছে জানিস্?

কীট্‌মানসফ নামটা শুনেই ফিংকের শয়তানী মতলবটা আঁচ করে মনে মনে চমকে উঠেছিলাম। বাইরে সেটা প্রকাশ না করে বললাম,—কী আর থাকবে বোয়ান্য! ও অঞ্চলে সোনাদানা কি হীরে নেই বলেই শুনেছি।

ফিংক দাঁত বার করে হেসে বললে,—ঠিকই শুনেছিস। সোনাদানা কি হীরের জন্যে তোকে পাঠাচ্ছি না। তোকে ওখান থেকে আনতে হবে...

এক শিশি ডিউটেরিয়ম, মানে ভারী জল!—ঘনাদার আগেই ফোড়ন কেটে বসল শিবু!

না না, ইউরেনিয়ম যাতে থাকে সেই পিচব্লেণ্ড খানিকটা!—আমিই বা কম যাই কেন!

উঁহুঃ!—শিশির টেক্কা দিতে চাইলে,—সেই যে নিরুদ্দেশ বৈজ্ঞানিক ওখানে লুকিয়ে থেকে ক্লোরোফিল তৈরি করছে, তার যন্ত্রপাতিরকারী ফরমুলা!

রেন-কোট হারাবার বদমেজাজ গৌরের এখনো পুরো ঠাণ্ডা হয় নি। প্রায় ঘুসি নষ্ট করে সে হঠাৎ বলে বসল,—ঘোড়ার ডিম!

এর পর ঘনাদার মুখ আর সাঁড়াশি দিয়েও খোলা যাবে! সভয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে আমরা সামলাবার হতাশ চেষ্টা করতে গিয়ে হতভম্ব হয়ে গেলাম!

কথাটা যেন কানেই যায় নি এমন ভাবে একবার শুধু বাইরের দরজার দিকে তাকিয়ে ঘনাদা নিজে থেকেই বললেন,—না, ফিংক বললে, আনতে হবে দুটো ভেড়ার ছানা।

ভেড়ার ছানা!—আমরা সবাই একেবারে পপাত ধরণীতলে! এত পেল্লয় পাহাড় পর্বত গোছের তনিতার পর নেংটি ইঁদুর।

হ্যাঁ, স্রেফ দুটো ভেড়ার ছানা!—ঘনাদা আমাদের মুখগুলোর ওপর চকিতে একবার চোখ বুলিয়ে বলে চললেন,—ওই হল ফিংকের ফরমাশ! হাবাবোকা সেজে বললাম,—কিন্তু ভেড়ার ছানা যদি ওরা না দেয়! শুনেছি ওখানে নাকি বড্ড কড়াকড়ি। ভেড়া তো ভেড়া, তার দুটো লোম ছিঁড়েও কারুর নিয়ে যাবার উপায় নেই। বাইরের কাউকে ভেড়ার পালের ত্রিসীমানায় যেতে দেয় না।

তা নয় তো কি তোকে আদর করে ডেকে নিয়ে গিয়ে কারাকুল ভেড়া ভেট দেবে হতভাগা!—ফিংক খিঁচিয়ে উঠল,—তোকে দুটো কারাকুল ভেড়ার ছানা যেমন করে হোক চুরি করে আনতে হবে এখানে। কালাহারি মরুভূমির ভেতর দিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে যাবি আর তক্কে তক্কে থেকে ভেড়ার পাল যেখানে চরায় সেখান থেকে দুটো বেশ তাগড়া ছানা চুরি করে এই মরুভূমির ভেতর দিয়ে পালিয়ে আসবি।

কাঁদোকাঁদো মুখ করে যেন মিনতি করে বললাম,—কিন্তু টের পেলে যে ওদের নেকড়ের মত সব কুকুর লেলিয়ে দেবে বোয়ানা, নয়ত গুলি করে মারবে। না বোয়ানা, আমায় বরং অন্য কাজ দিন। **আমি আপনাকে এক আজব পাহাড়ে নিয়ে যেতে পারি বোয়ানা!** নাম তার ব্রাকোরোট্‌জ্‌। এককালে তার মুখ থেকে আগুন ঠিকরে বেরুত। এখন নিবে গেছে।

ফিংক বেশ একটু অবাক্‌ হয়ে সন্দিগ্ধভাবে আমার দিকে চেয়ে বললে,—ব্রাকোরোট্‌জ্‌ আগ্নেয়গিরির নাম তুই জানলি কি করে!

ওই আমার সেই ঠাকুরদাদার কাছে, বোয়ানা। তিনিই আমায় হদিস দিয়ে গেছেন। সে পাহাড় যেখানে হাঁ করে আছে তার কাছে এমন জায়গা আপনাকে দেখাতে পারি যা খুঁড়তে না খুঁড়তে লাল নীল সবুজ ঝিলিক দেওয়া সব নুড়ি আপনাকে চমকে দেবে!

তার মানে চুনি পান্না নীলা!—শিবুই চোখ বড় বড় করে জিজ্ঞাসা করলে,—সত্যি সত্যি ওসব পাওয়া যায় এমন জায়গা আপনি জানেন?

তা জানি বই কি!—ঘনাদা মূর্তিমান বিনয় হয়ে বললেন,—ইংরেজীতে যাদের নাম অ্যামেথিস্ট, ওপ্যাল, গার্নেট, টোপাজ্‌ বলে, সে-সব পাথরেরও সেখানে ছড়াছড়ি। সে যাই হোক, আমার কথায় একবার একটু দোনামোনা হলেও ফিংক টলল না। ধমক দিয়ে বললে,—থাম কালা ছুঁচো, তোকে আর লোভ দেখাতে হবে না! তোর ঠাকুরদার ভরসায় বুনো হাঁসের পেছনে আমি ছুটে মরি আর কি! আর তোর কথা যদি সত্যিই হয় তবু চুনি পান্না তো একবার বেচলেই ফুরিয়ে গেল। তার তো আর ছানাপোনা হয় না। আর এই কারাকুল ভেড়ার জোড়া পাওয়া মানে অফুরন্ত টাকার গাছ পোঁতা। যত দিন যাবে তত হবে তার বাড় আর ফলন।

তা বলে চুনি পান্নার খনির কাছে ভেড়া!—ঘনাদার কথার মাঝখানে শিবুর মুখ ফসকেই বুঝি বেরিয়ে গেল।

হ্যাঁ, খনিও যার কাছে লাগে না এমন ভেড়া—ঘনাদা ব্যাখ্যা করলেন,—পৃথিবীতে সবচেয়ে দুর্লভ আর দামী ভেড়া হল পারস্যের। কারাকুল ভেড়া তার চেয়ে কম যায় না। একটা ভেড়ার দামই অন্ততঃ পনরো হাজার টাকা। কিন্তু সে ভেড়া বিক্রি হয় না। একজোড়া ভেড়ার একপাল হয়ে উঠতে কটা বছর আর লাগে! কারাকুল ভেড়ার ছানার পশমী ছাল কিনতে দুনিয়ার শৌখিন ধনকুবেররা পয়সার পরোয়া করে না। একশ বছরেরও আগে পারস্য থেকেই সবচেয়ে সরেস ক' জোড়া ভেড়া কালাহারি মরুর সীমান্তে আমদানি করা হয়। পালকদের যত্নে আর চেষ্টায় সেই ভেড়ার বংশ আজ পারস্যের সঙ্গেই পাল্লা দিচ্ছে। এ ভেড়ার জাতের ওপর লোভ

অনেকের। কিন্তু আইন করে কারাকুল ভেড়া চালান নিষিদ্ধ করা হয়েছে। মালিকরা মূর্তিমান যম হয়ে তাদের ভেড়ার পাল পাহারা দেয়। দেবে না-ই বা কেন? দুটো ভেড়া সেখান থেকে সরাতে পারলেই কাম ফতে। ফিংক সেই শয়তানী মতলব নিয়েই এই কালাহারি মরুর বিপদ অগ্রাহ্য করে এখানে এসেছে। আসল কাজটা অবশ্য আমার মত কাউকে দিয়েই হাসিল না করালে তার নয়। ছায়ার মত নিঃশব্দে লুকিয়ে সে মরূদ্যানের মজবুত তারের বেড়া দিয়ে গলে যাবার জন্যে পাতলা ছিপছিপে হওয়া চাই। মরুভূমির দিকটাতেই তেমন ভয়ের কিছু নেই বলে পাহারা একটু আলগা। কিন্তু সেখান দিয়ে ঢোকা তো যার তার কর্ম নয়। জল আর খাবার দুইএর কিছুই অন্ততঃ পাঁচদিনের পথে মিলবে না। সে-সব লটবহর সঙ্গে বয়ে নিয়ে যাওয়াও সম্ভব নয়। এমন কাউকে তাই চাই উটের মত অন্ততঃ জল ছাড়াই বেশ কিছু দিন যে টিকে থাকতে পারে। ফিংক এই সব ভেবেই ওরকম বিজ্ঞাপন দিয়েছিল।

আমায় এবার সে সোজা হুকুম দিলে, যেমন করে হোক কীটমানসুফ-এ গিয়ে ভেড়ার ছানার জোড়া চুরি করে আনতে।

যেন নিরুপায় হয়ে বললাম,—কিছু খাবার জল তাহলে সঙ্গে দিন।

শুনেই ফিংক খাপ্পা—আরও কিছু চাই না? এই জীপ গাড়ীটাও! সেই জন্যেই সব নিয়ে এসেছি যে! হতভাগা কালা ছুঁচো! যেমন আছিস ঠিক তেমনিভাবে এখুখুনি রওনা হবি। তোর না একবার পূর্ণিমা আর একবার অমাবস্যায় জল খেলেই চলে! আমায় ধাপ্পা দিয়েছিলি তাহলে?

ধাপ্পা কেন দেব বোঝানো।—কাকুতি করে বললাম,—কিন্তু এ কাজ হাসিল করতে পুরো চাঁদ থেকে পুরো আঁধারের বেশীও তো লাগতে পারে। আপনার ত অনেক আছে, শুধু একটা জলের বোতল যদি দিতেন।

একটি ফোঁটাও না!—ফিংক গর্জে উঠল,—তোর যদি বেশী দিন লাগে তো আমি এখানে আঙুল চুষব নাকি! তুই ওখানে গুলি খেয়ে মরলে আমায় ফিরে যেতে হবে না! তবে ওদিক দিয়ে পালাবার মতলব যদি করে থাকিস তাহলে মরেছিস জানবি। এখানে আসার আগে আশে-পাশে সব রাজ্যে তোর ওই সুটকো চেহারার বর্ণনা দিয়ে খবর পাঠিয়ে দিয়েছি। খবর পাঠিয়েছি আমার টাকা চুরি করে পালিয়েছিস বলে। পালালে ধরা তুই পড়বিই। আর পড়লেই অন্ততঃ সাতটি বছর জেলের ঘানি টানবি। বেঁচে থাকলে তাই তোকে ফিরতেই হবে এখানে।

ফিংক যে কতবড় শয়তান আগে বুঝিনি এমন নয়। তার আসল চেহারাটা এবার আরো একটু স্পষ্ট হল মাত্র।

ঘনাদা দম নেবার জন্যে একটু থামতেই আবার আমাদের মূর্তিমান বনোয়ারী দরজায় এসে খাড়া। ভয়ে ভয়ে জানালে,—

নীচে উ বাবু বড়া গোলমাল লাগাইসে।

বনোয়ারীকে কিছু বলব কি, ঘনাদা তার আগেই শুরু করে দিয়েছেন:

যেমন ছিলাম তেমনিই অগত্যা রওনা হয়ে পড়লাম। ফিরেও এলাম দিন দশেকের ভেতরই এক রাত্রে। সঙ্গে দুটো কারাকুল ভেড়ার ছানা।

ফিংক তো মহা খুশী। জাল দেওয়া যে সিন্দুকের মত বাক্সটা এনেছিল তার ভেতর ভেড়ার ছানা দুটোকে আমায় যত্ন করে ভরে রাখতে বলে কাজ হাসিল হওয়ার দরুন নিজেই ফুর্তি করতে বসে গেল।

কাজ সেরে তার কাছে যখন গেলাম তখন বাইরে বালির ওপরই শতরঞ্জি পেতে কাছেই উট-কাঁটা ঝোপ গাছের আগুন জেলে সে নবাবী মেজাজে চর্ব্যচোষ্য খাবার সাজিয়ে বসেছে। কতদিন এ কাজে লাগবে না জানায়, ফুরিয়ে যাবার ভয়ে এতদিন জল আর খাবার যথাসম্ভব মা বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছে আজ তার সদ্ব্যবহার করছে নির্ভাবনায়।

কালাহারিতে অন্য মরুভূমির মতই দিনের বেলা যেমন গরম, রাত্রে তেমনি কনকনে ঠাণ্ডা। দিনের বেলা থেকেই আকাশ মেঘে ঢাকা ছিল বলে সে রাত্রে ঠাণ্ডা একটু বেশী।

আগুনের কাছাকাছি গিয়ে বসে বললাম,—আমার কাজ তো শেষ বোয়ানা। এবার আমার বকশিশ।

হুঁ, তোর বকশিশটাই শুধু বাকি;—খাবার চিবোতে চিবোতে পাশে রাখা রিভলটারটা হাতে করে নিয়ে ফিংক বললে,—তোর জন্যে খুব ভালো বকশিশই ভেবে রেখেছি।

যেন ধৈর্য ধরতে পারছি না এমনভাবে জিজ্ঞাসা করলাম,—কী বোয়ানা?

তোর জন্যে এখানে বালির তলায় যদি একটা ছোট্ট ঘর বানিয়ে দিই, কেমন হয়? অনেক ঘোরাফেরা করেছিস, খুব ধকল হয়েছে তোর। একটু বিশ্রাম দরকার। সে ঘরে থাকলে আর তোকে নড়তে চড়তে হবে না। চিরকাল শুয়ে থাকতে পারবি। আমারও একটু সুবিধে হবে। তুই-ই এ ব্যাপারের একমাত্র সাক্ষী। তোর মুখ থেকে কথা বার হবার ভাবনা আর থাকবে না।

একেবারে গদগদ হয়ে বললাম,—সে তো খুব ভাল কথা বোয়ানা। শুনেই আমার আড়-মোড়া ভাঙতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু সুবিধের সঙ্গে একটু অসুবিধে যে আপনার হবে।

আমার অসুবিধে!—রিভলভারটা তুলে আমার দিকে তাক করে ফিংক বিশ্রীভাবে হেসে বললে, আমার অসুবিধে তো শুধু মরুভূমিটা একলা পার হওয়া। সঙ্গে আমার কম্পাস আছে। তাই দেখে জীপের মুখও আমি ঘুরিয়ে রেখেছি। এখন শুধু নাক বরাবর চালিয়ে গেলেই দক্ষিণ রোডেশিয়ায় দিন দশেকের মধ্যে গিয়ে পৌঁছোব। সেখানে একবার পৌঁছোলে আর আমায় পায় কে!

কিন্তু সেখানে পৌঁছোনো তো দরকার!—আমি যেন ফিংকের জন্যেই ভাবিত,—কম সময় তো নয়, দিন দশেক। দিন দশেক জল না খেয়ে কি আপনার চলবে?

জল না খাব কেন?—ফিংক হায়নার মত হেসে উঠল,—এখনো কমসে কম এক মাসের জল আমার গাড়িতে মজুদ।

না, বোয়ানা!—অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানালাম,—ভেড়ার ছানা ভরতে গিয়ে দেখি সব জলের জায়গাগুলোই খালি। হয় ফুটো হয়ে পড়ে গেছে, নয় কেউ ফেলে দিয়েছে!

তুই! তুই জল যদি ফেলে থাকিস্,—ফিংক রিভলভার হাতে লাফিয়ে উঠল খ্যাপার মতই,—তাহলে এখুনি তোকে আমি...

গুলি করবেন!—আমি ফিংকের কথাটাই পূরণ করে দিলাম,—কিন্তু তাহলে বিপদ তো আরো বাড়বে বোয়ানা। এই কালাহারিতে জলের সন্ধান যদি কেউ দিতে পারে তো আমি। জলের লুকোনো ঝরনা যদি না-ও মেলে তাহলেও এ মরুভূমিতে যা দিয়ে তেষ্টা মেটানো যায় সেই বুনো তরমুজ তুসোমা কোথায় পাওয়া যায় আমিই আপনাকে দেখাতে পারি। আমায় গুলি করলে আপনার ফেরবার কোন আশাই তো নেই।

রাগে দাঁত কিড়মিড় করলেও অবস্থাটা বুঝে নিজেকে সামলে ফিংক বললে,—বেশ গুলি তোকে করব না, তাহলে কী তুই চাস?

আর কি চাইব বোয়ানা, একটু বকশিশ চাই।

কী বকশিশ?—ফিংক উদার হয়ে উঠল,—আমায় রোডেশিয়ায় ভালোয় ভালোয় পৌঁছে দিতে পারলে তোকে এত টাকা দেব যে সারাজীবন আর তোকে খেটে খেতে হবে না। নিজের মুলুকে গিয়ে মোড়ল হয়ে বসবি।

আপনি মহানুভব!—যেন কৃতার্থ হয়ে বললাম,—কিন্তু আপনার বড় ভুলো মন বোয়ানা। ওখানে পৌঁছে হয়ত হাত চুলকে উঠে গুলি করে বসবেন। আমি তাই বকশিশটা চাই নগদ।

কী বকশিশ, বল্!—ফিংক একেবারে কৃপণতর।

এমন কিছু নয়,—আমি একটু যেন লজ্জা-লজ্জা ভাব করে নিবেদন করলাম,—জোহানেস-বার্গে আমাকে যা দিয়ে ধন্য করেছিলেন, তাই শুধু আপনাকে ফেরত দেবার হুকুম।

কী দিয়েছিলাম তোকে সেখানে?—ফিংক বেশ একটু ভ্যাবাচাকা।

শুধু গালে একটা চড়, বোয়ানা!—আমার গলা মিছরির মত।

ফিংক যেরকম তিড়বিড়িয়ে উঠল তাতে রিভলভারটা বেকায়দাতেই ছুটে যেতে পারত। উট-কাঁটা গাছের একটা জ্বলন্ত ডাল তার দিকে ছুঁড়ে আগেই তাই আমি একটু সরে গেছি। সেখান থেকে শোয়া-ঝাঁপ দিয়ে তার পা দুটো ধরে মাটিতে তাকে আছড়ে ফেলে রিভলভারটা কেড়ে নিলাম। তারপর বাঁ হাতে জামার কলার ধরে তাকে উঠিয়ে বসিয়ে যেন লজ্জিত হয়ে বললাম,—একটা বড় ভুল হয়ে গেছে বোয়ানা, একটা নয় দুটো চড়ই দু'গালে আপনার দিতে হবে।

উট-কাঁটার আগুন তখন ফিংকের চোখেই যেন জ্বলছে। শুধু আমার হাতের রিভলভার-টার দিকে চেয়ে সে নাক দিয়ে এঞ্জিনের স্টীম ছাড়তে ছাড়তে চুপ করে রইল।

বললাম,—একটা চড় দিতে হবে বোয়ানা, যারা আপনার কাছে জন্তু-জানোয়ারের অধম ঐ দেশের সেই কালো মানুষের হয়ে, আর একটা আমার নিজের জন্যে।

তুই! তুই এ দেশের লোক নয়!—ফিংক সাপের মত হিসহিসিয়ে উঠল।

না বোয়ানা। আমার দেশের নাম মানুষের দুনিয়া। আপনার দক্ষিণ আফ্রিকা তার মধ্যে নেই।

চাবুকটা নিরুপায় হয়ে হজম করে ফিংক বললে,—তাহলে তুই এ কাজে এসেছিলি কেন?

ওই আপনার অদ্ভুত বিজ্ঞাপনের টানে বোয়ানা। একটা কিছু শয়তানী প্যাঁচ এর মধ্যে আছে সন্দেহ করে।

কিন্তু কালাহারি মরু তুই চিনলি কী করে? বিনা জলে দশ দিনের পথ গেলি এলি কী করে? ভেড়ার ছানাও কেমন করে আনলি?—ভয় ভাবনা রাগের চেয়ে ফিংকের কৌতূহল তখন বেশী।

বকশিশ নেওয়া যখন পালিয়ে যাচ্ছে না, আর তা নেবার পর কানে শোনবার অবস্থা আপনার যখন নাও থাকতে পারে, তখন প্রশ্নগুলোর জবাবই আগে আপনাকে দিয়ে নিই। এই কালাহারি মরু আমার কাছে নতুন নয় বোয়ানা। এখানকার আদিবাসী হোটেনটটদের খোঁজ নেবার জন্যে আগেও কবার এসেছি .

হঠাৎ গোঁরের কাশিটা বড় বেয়াড়া হয়ে উঠলেও ঘনাদা আজ আর ভ্রূক্ষেপ না করে বলে চললেন—জল সঙ্গে না থাকলেও এ অঞ্চলের গোপন সব ঝরনা আমার জানা, আর তাও যেখানে নেই সেখানে যার কথা আগে বলেছি সেই তুসোমা অর্থাৎ বুনো তরমুজ খুঁজে বার করেই কাজ চালিয়েছি। ভেড়ার ছানা অবশ্য আমাকে চুরি করতে হয় নি। দক্ষিণ আফ্রিকার সব ধলাই আপনার মত নয়। মানুষের রক্ত যাদের শরীরে বয় এমন দু'চারজনও আছে। কীট্‌মানসফ-এ এরকম একজনের সঙ্গে আমার একটু দোস্তি আছে। টাঙ্গানাইকায় একবার শিকারে গিয়ে আলাপ। তার ধারণা, এক খ্যাপা হাতির আক্রমণ থেকে তাকে আমি বাঁচিয়েছি। সেই বন্ধুর কাছেই আপনার কথা বলে ক'দিনের জন্যে দুটো ভেড়ার ছানা ধার করে এনেছি। ইচ্ছে আছে কালই আপনার জীপ নিয়ে সেখানে রওনা হব ফিরিয়ে দেবার জন্য।

ফিরিয়ে দেবে আগেই ঠিক করে রেখেছিলে!—ফিংকের উন্নতি শুধু তুই থেকে তুমিতে। গলায় নইলে বিস্ময়ের সঙ্গে তেমনি 'পারলে ছিঁড়ে ফেলা' আক্রোশের জ্বালা।

হ্যাঁ বোয়ানা, আগেই ঠিক করেছিলাম। নইলে সত্যিই চুরি করে আনতে তো পারি না। কিন্তু আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। মেঘলা রাত। ঠাণ্ডা বাড়ছে। বকশিশটা নেওয়া এবার সেরে ফেলি।

নিজের হাতের দিকে চেয়ে একটু থেমে আবার বললাম,—হাতে রিভলভারটা থাকলে আবার গুলি করতে হয় না।

রিভলভারটা ছুঁড়ে ফেলার সঙ্গে সঙ্গেই ফিংক বুনো মোষের মত আমার ওপর লাফিয়ে পড়ল। তারপর প্রায় উট-কাঁটার আগুনের ওপর পড়ল সচাপ্টে।

ডান গালের চড়টা একটু জোরেই হয়েছিল। তাড়াতাড়ি সেখান থেকে তাকে তুলে বাঁ গালে একটু আস্তেই মারলাম। শতরঞ্জির ওপর খাবার প্লেটগুলোর কয়েকটা ভাঙল।

সেইখানেই তাকে ফেলে রেখে জীপে গিয়ে একটা দড়ি নিয়ে এলাম। হাত আর পা দুটো তাই দিয়ে বাঁধতে বাঁধতে বললাম,—এটা বকশিশের ফাউ। জোহান্নেসবার্গে যা দিয়েছিলেন কড়ায় গণ্ডায় শোধ না করলে চিরকাল ঋণী থাকব যে। রাত্তিরটা এখানেই কাটান। কম্বল ঢাকা দিয়ে যাচ্ছি। সকালে উঠেই কীট্‌মানসফ রওনা হয়ে যাবেন। কী বলেন?

জবাবে ফিংক তার আফ্রিকানস্‌ ভাষায় কুৎসিত একটা গালাগাল দিলে শুনলাম।

জীপ থেকে আর একটা কম্বল নিয়ে বেশ একটু দূরে একটা লুকোন জায়গায় গিয়ে শুলাম। কিছুক্ষণ অন্ততঃ জেগে থাকবার ইচ্ছে থাকলেও ক'দিনের ধকলে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না।

সকালে উঠে যা ভেবে রেখেছিলাম তাই হয়েছে দেখলাম। ফিংক রাত্রেই জীপ নিয়ে পালিয়েছে।

ফিংক পালাবে বলেই ভেবে রেখেছিলেন?—শিশিরের হতভম্ব প্রশ্ন।

হ্যাঁ, সেই জন্যেই বাঁধন এমন দিয়েছিলাম যাতে নিজেই ছিঁড়তে পারে।

ফিংককে তাহলে সেই ভেড়ার ছানা দুটো নিয়েই পালাতে দিলেন?—আক্ষার গলায় যেন আওয়াজই বার হতে চায় না।

হ্যাঁ তাই দিলাম, কিন্তু পালাবে আর কোথায়। তার কম্পাস আগেই বিগড়ে জীপটা একটু ঘুরিয়ে রেখে দিয়েছি। মেঘলা রাতে আকাশের তারাও দেখতে পাবে না দিক ঠিক করতে। জীপ নিয়ে নাক বরাবর সোজা গিয়ে উঠবে ওই কাঁটামানসুফ-এই। সেখানে তার জন্যে অভ্যর্থনা-সভা তৈরী। বমাল সমেত গ্রেপ্তার আর হাজত। নিজে নিয়ে গিয়ে ধরিয়ে দেবার ঝামেলাটা বাঁচালাম তাকে পালাবার সুযোগ দিয়ে।

হামি কী বলবে বড়াবাবু!—নিরুপায় বনোয়ারীর কাকুতি এবার শোনা গেল।

দেখ তো হে, কে এবার এসেছে জ্বালাতন করতে!—ঘনাদা তাচ্ছিল্যভরে হুকুম করলেন আমাদের মুখের চেহারাগুলো পড়ে নিয়ে।

শিশির তাই দেখতেই গেল।

মিনিট পনরো বাদে যখন ফিরে এল তখন ঘনাদা তার সিগারেটের টিনটা তুলে পকেটে করে তাঁর টঙের ঘরে উঠে গেছেন।

ব্যাপার কি শিশির?—আমরা কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম।

বিশেষ কিছু নয়।—শিশির নাকটা একটু উঁচুতে তুলে বাতাসটা শুঁকতে শুঁকতে বললে,—ওই।

ওপর থেকে তখন পয়লা নম্বরের অম্বরী তামাকের গন্ধ ভেসে আসছে।

ওই মানে?—আমরা অবাক্ হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম,—ওই তামাকের গন্ধ?

হ্যাঁ। বড় রাস্তার তামাকের দোকান থেকে ঘনাদা সবচেয়ে সরেস অম্বরী তামাক কবে বুঝি কিনে এনেছিলেন দামটা বাকী রেখে। তারপর ওধার আর মাড়ান নি। আজ দূর থেকে তাঁকে দেখতে পেয়ে দোকানের মালিক পিছু পিছু এসেছে তাগাদা করতে। নীচে সে-ই গোলমাল করছিল।

তা তুমি কি করলে কী? আমাদের ব্যাকুল প্রশ্ন।

কী আর করব! তাকে খুশী করেই বিদেয় করতে হল। এসব তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে ঘনাদার শান্তিভঙ্গ তো আর করা যায় না। গৌরের রেন-কোট যখন গেছে তখনই জানি ওর হিংসেছে একটা কিছু লোকসানের ফাঁড়া আমার আছেই।

গৌরের মুখে এতক্ষণে সত্যিই হাসি ফুটল।

চোখ

হিজিবিজি আবোল তাবোল নয়।

ওপরে যা দেখা যাচ্ছে ওই আঁকিড়ি বিকিড়ি ধাঁধাটিই কষ্ট করে খাড়া করেছিলাম, সকলে মিলে মাথা খাটিয়ে।

ঘামের ভিতর ভরতে ভরতে ভেবেছিলাম আচমকা এই বিদঘুটে প্যাঁচেই ঘনাদাকে কাবু করা যাবে।

কিন্তু আমাদের এমন সাজানো ফন্দিটা ঘনাদা এক মোক্ষম চালে ভেস্তে দেবেন ভাবতে পারি নি।

শিবু শুম্ভদূতের মত এসে চাঞ্চল্যকর সংবাদটি দিলে।

—না, পাওয়া যাচ্ছে না।

প্রথমটা আমরা সবাই সামান্য একটু বিমূঢ় হলেও উদাসীন।

কী পাওয়া যাচ্ছে না?—জিজ্ঞাসা করলে শিশির।

পাওয়া যাচ্ছে না কাকে? ঘনাদাকে?—গৌরের প্রশ্নে একটু কৌতুকের আভাস।

না, ঘনাদা বহাল তবিয়তেই আছেন তাঁর টঙের ঘরে, কিন্তু,—শিবু একটু থেমে, আমাদের বেশ কয়েক মুহূর্ত উদ্বিগ্ন অনিশ্চয়তার মধ্যে ঝুলিয়ে রেখে তারপর বললে,—পাওয়া যাচ্ছে না তাঁর চশমা।

অ্যাঁ—আমাদের সবাইকার কণ্ঠেই এক আর্তনাদ।

চশমা পাওয়া যাচ্ছে না কী রকম।—আমি সন্দিগ্ধ বিস্ময়ে বললাম তারপর,—চিঠিটা দিয়ে আসবার সময়ই ত চোখে চশমা দেখলাম।

চোখে ত চশমা দেখেছ, কিন্তু চোখে চশমা দিয়ে করছিলেন কি?—গৌরের জেরা,—তোমার দেওয়া চিঠিটা পড়েছেন তোমার সামনে?

না।—আমায় স্বীকার করতে হল চিন্তিতভাবে,—তখন শনিবারের বাজারের ফর্দটা দেখছিলেন। আমায় চিঠিটা রেখে দিয়ে যেতে বললেন।

তারপর থেকেই চশমা উধাও!—শিবু করুণ স্বরে জানাল।—আমি সেই অবিশ্বাস্য কাহিনীই শুনে আসছি।

কিন্তু চশমা যাবে কোথায়?—আমি উত্তেজিত হয়ে উঠলাম,—ঘনাদা তো ঘর থেকে বাইরে আসেন নি। চশমা ঘরেই আছে নিশ্চয়। ঘনাদা খুঁজেছেন?

তন্ন তন্ন করে।—শিবু মুখের একটা অদ্ভুত ভঙ্গী করে জানাল,—অন্তত ঘনাদার উক্তি তাই।

বেশ, আমরা গিয়ে খুঁজছি চলো।—গৌর উৎসাহভবে উঠে দাঁড়াল।

তিষ্ঠ বন্ধু!—শিবু বাধা দিলে,—কোন লাভ নেই। আমি কি ঘনাদাকে ওইটুকু সাহায্যও করতে চাই নি মনে করেছ! কিন্তু ঘনাদা তাতে নারাজ। যা গেছে তার জন্যে ঘরদোর তছনছ করা উনি পছন্দ করেন না।

পছন্দ করেন না!—শিশিরের মুখে অবিশ্বাসের বিস্ময়,—ওঁর ঘরে আছে কী, যে তছনছ হবে! দুটো তোবড়ানো চটাওঠা টিনের তোরঙ্গ, একটা আলনা আর শেল্‌ফের তাকে টিকে তামাক ছাড়া কটা আমাদেরই দেওয়া টুকিটাকি! এ ছাড়া ত শুধু তক্তপোশের বিছানা, কটা টুল আর গড়গড়াটা। তছনছ হবেটা কী?

জানি না।—শিবু দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে,—কিন্তু খুঁজে দেখবার নাম করতেই প্রায় খাপ্পা হয়ে উঠলেন। বললেন,—খুঁজবেটা কী? আমার চশমা আমি নিজে খুঁজতে কিছু বাকী রেখেছি! ও পাবার নয়।

তার মানে ও চশমা এখন আর ঘনাদা খুঁজে পাবেন না!—গৌর হতাশ স্বরে বললে,—চশমা না পেলে আর ও চিঠি পড়া হবে না। আর যদি চিঠি না পড়া হয় তাহলে...

তাহলে এত তোড়জোড় ফন্দিফিকির খাটুনি হয়রানি সবই মাটি!—শিশির গৌরের অসমাপ্ত আক্ষেপটা পূরণ করে দিলে।

কিন্তু চশমা হারালে খুঁজে না হয় নাই পাওয়া গেল, নতুন চশমা আর হতে পারে না?—অন্ধকারে আমি একটু আশার আলো দেখবার চেষ্টা করলাম।

হ্যাঁ, আমরা নতুন চশমা কিনে দেব ঘনাদাকে!—শিশির উৎসাহ প্রকাশ করলে আমার প্রস্তাবে।

আজই নিয়ে যাচ্ছি চশমার দোকানে!—গৌরের মধ্যেও উৎসাহটা সংক্রমিত।

তাতেও ভরসা কিছু আছে বলে মনে হচ্ছে না।—শিবুই শুধু মাথা নাড়লে,—চশমা যাঁর এমন সময় বুঝে হারায় তাঁকে নতুন চশমা গছানো কি যাবে!

তবু হাল ছাড়ব কেন!—গৌর হার মানতে প্রস্তুত নয় দেখা গেল। শিশির ও আমি তারই দলে।

কিন্তু যাবার ছুতো ত একটা চাই।—শিবু আবার বাগড়া দিলে,—গিয়েই চশমার কথা তুললে পত্রপাঠ বিদায়।

তাহলে...তাহলে...ওই শনিবারের বাজারের ফর্দ!—গৌরই সমস্যাটার সমাধান করে ফেললে,—আমরা যেন ফর্দটা সংশোধন করাতেই যাচ্ছি।

ঘনাদার তেতালার ঘরে এ বিবরণটা টেনে তোলবার আগে ঘনাদার চশমা ছায়ানোতে কেন আমরা এতখানি বিচলিত একটু বুঝিয়ে দেওয়া যেতে পারে।

এবারে ঘনাদাকে তাতাবার যে ফন্দিটা সবাই মিলে বার করেছিলাম তা প্রায় নিখুঁত। সেই ফন্দিরই প্রথম ধাপ স্বরূপ একটি চিঠি সকাল সাতটা বাজতে না বাজতেই ঘনাদার টঙের ঘর থেকে গড়গড়ার আওয়াজ পাওয়া মাত্রই দিয়ে এসেছি।

চিঠিটি তৈরি করতে বেশ কিছু কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে।

খামে বন্ধ চিঠি। ওপরে ইংরেজীতে পরিষ্কার ভাবে টাইপ করা নাম ঠিকানা, মিঃ ঘনশ্যাম দাস, ৭২নং বনমালী নস্কর লেন, কলিকাতা। কিন্তু খামটা ছিঁড়ে ভেতরের চিঠিটা বার করে পড়লেই চক্ষুস্থির যাতে হয় তারই ব্যবস্থা। চিঠিটির নমুনা একেবারে প্রথমেই দেওয়া আছে।

এ চিঠির মসলা সংগ্রহ করতে গৌর আর আমাকে তিন দিন ন্যাশন্যাল লাইব্রেরিতে গিয়ে ঘণ্টা তিনেক করে ভারী ভারী সব কেতাব ঘাঁটতেও হয়েছে। তারপর রাত্রে খাওয়াদাওয়ার পর আমার ঘরের দরজা বন্ধ করে শিবু ও শিশিরকে নিয়ে চারজনে মিলে চাইনিজ ইঙ্ক দিয়ে বাজার চষে কিনে আনা পাতলা লম্বা পার্চমেণ্ট কাগজে মুনশীয়ানা করেছি। মুনশীয়ানা অদ্ভুত আজগুবি সব হরফ নিয়ে। কিছু হরফ প্রাচীন মিশরীয় লিপি থেকে নেওয়া, কিছু প্রাচীন হাবসী, কিছু আমাদের ভারতবর্ষেরই ব্রাহ্মী ও খরোষ্ঠী থেকে। এরই মধ্যে অন্য অজানা হরফও বাদ যায়নি। এই হরেক রকম অক্ষর এলোপাথাড়ি মিলিয়ে যে খিচুড়িটি তারপর কাগজে তোলা হয়েছে তা যে-কোনো প্রাচীন লিপিবিশারদ পণ্ডিতচূড়ামণির মাথা ঘুরিয়ে দেবার পক্ষে যথেষ্ট।

চিঠিটি ডাকে নয়, যেন হাতেই কেউ দিয়ে গেছে বিকেলে জবাব নিয়ে যাবার জন্যে। ঘনাদাকে সরলভাবে কিছুই যেন না জেনে চিঠিটা দিয়ে এসেছি ওই কথা বলে।

তারপর ঘনাদা কখন কৌতূহলভরে চিঠিটি খোলেন তারই অপেক্ষায় তাঁর ওপর নজর রাখা চলছে। আধঘণ্টা অন্তর অন্তর কেউ-না-কেউ কোন-না-কোন ছুতোয় একবার ওপরে গিয়ে নাটকটা শুরু হল কিনা দেখে আসছে।

প্রথমে গেছে গৌর যেন গতকালের খবরের কাগজটা ঘনাদার ঘরেই আছে কিনা খোঁজ করতে। একটা কর্মখালির বিজ্ঞাপন নাকি তার না দেখলেই নয়।

তখনও পর্যন্ত যাকে বলে অল কোয়ায়েট অন দ্যা ওয়েস্টার্ন ফ্রন্ট। সব ঠাণ্ডা চুপচাপ। ঘনাদা কলকেতে টিকে সাজাচ্ছেন তন্ময় হয়ে।

গৌরকে দেখে একটু ভুরু কুঁচকেছেন অবশ্য। এমন অসময়ে গৌরের আবির্ভাবটা ত ঠিক স্বাভাবিক নয়।

গৌরকে তাড়াতাড়ি তাই কৈফিয়তটা দাখিল করতে হয়েছে,—কালকের কাগজটা আপনার ঘরে নাকি? কোথাও খুঁজে পাচ্ছি না।

আমার ঘরটা কি 'লস্ট প্রপার্টি স্টোর'? কোথাও যা খুঁজে পাওয়া যায় না তা এখানেই পাওয়া যাবে!—ঘনাদা একটু যেন বাঁকা মন্তব্য করছেন। কিন্তু সেটা এমন কি গ্রাহ্য করবার মত মনে হয়নি গৌরের।

না না, একটা বিজ্ঞাপন দেখবার ছিল কর্মখালির!—বলে অজুহাত দেখিয়ে একটু যেন লজ্জিত হয়ে চলে এসেছে গৌর।

তারপর গেছে শিশির ঘণ্টাখানেক বাদে। তাকে অবশ্য একটু ঘুস নিয়েই যেতে হয়েছে। একেবারে নতুন একটা সিগারেটের টিন। দুষ্প্রাপ্য বিদেশী ব্র্যাণ্ড।

এই ব্র্যাণ্ডটা হঠাৎ পেয়ে গেলাম ঘনাদা!—শিশির যেন খুশীতে ডগমগ হয়ে বলছে,—প্রসাদ না করে ত খেতে পারি না। আপনার সামনেই তাই খুলতে নিয়ে এলাম।

ঘনাদার মুখের উজ্জ্বলতাটা আশানুরূপ দেখা যায়নি। কয়েক ওয়াট্ যেন কম। সেটা অবশ্য এমন কিছু ধর্তব্য নয়।

শিশির ঢাকনির পাক দিয়ে এয়ারটাইট টিনের পর্দাটা কাটতে কাটতে আড়চোখে ঘনাদার দিকে লক্ষ্য রেখেছে। না, ভাবান্তর বিশেষ নেই। চিঠির প্রতিক্রিয়া কিছু বোঝা যায়নি। এখনো সেটা খামেই বন্দী আছে বোধ হয়। সিগারেট একটা মুখে ও বাকি কয়েকটা হাতে ধরিয়ে দিয়ে, দেবার মত কোন সংবাদ না নিয়েই শিশিরকে ফিরতে হয়েছে।

আমরা তখনও উতলা কিন্তু হইনি। মেওয়া ফলাতে গেলে সবুর করতে হয় এ আর কে না জানে! একটু শুধু ধৈর্য চাই।

দুপুরে খাওয়াদাওয়া সেরে যে যার কাজকর্মে বেরিয়েছি। ফিরে এসে আমাদের আড্ডা-ঘরে জমায়েত হয়েছি এই বিকেলে। এইবার একটা কিছু যে হবে এ বিষয়ে আমাদের সন্দেহ নেই তখন। ঘনাদার ঘরে যা ছেড়ে দিয়ে আসা হয়েছে তা একেবারে ব্রহ্মাস্ত্র। ও আর বিফল হবার নয়। বাদলার দিন, তাই সলতেটা ধরতে একটু বোধ হয় দেরি হচ্ছে। কিন্তু একবার ধরলে আর দেখতে হবে না। এক সঙ্গে তুবড়ি পটকা ফাটবে।

সলতেটা ধরতে দেরি হওয়ার কারণটা মনে মনে এঁচে নিয়েছি। ঘনাদার তিন কুলে কোথাও কেউ আছে বলে ত এতদিনে জানতে পারিনি। সত্যিকার চিঠিপত্র তাঁর নামে আর আসে কবে?

দুপুরের খাওয়াদাওয়ার পর মৌজ করে গড়গড়ায় টান দিতে দিতে রসিয়ে রসিয়ে পড়বার জন্যেই বোধ হয় চিঠিটা তিনি মজুদ রেখেছেন ধরে নিয়েছি।

বিকেলে এসে জমায়েত হবার পরই তাই শিবু গেছে সরজমিনে তদারক করে একেবারে হালের অবস্থাটা জেনে আসতে, যাতে আমরা গিয়ে নাটকটা জমিয়ে তুলতে পারি।

কে কোন্ ভূমিকা নেবে তাও ঠিক করা হয়ে গেছে। সেই সঙ্গে নিজের নিজের সংলাপ।

যেমন শিশির গিয়ে বিরক্তির সঙ্গে বলবে,—বড় জ্বালাতন করে যত আজেবাজে লোক। নিচে কে একটি চীনেম্যান গোছের চেহারার লোক এসে দাস সাহেবকে চাই বলে ঝামেলা লাগিয়েছিল। দিয়েছি দূর করে তাড়িয়ে।

আমরা তার আগেই জমায়েত হয়ে বসব ঘনাদার তক্তপোশে, মেস সংক্রান্ত একটা গুরুতর বিষয়ে যেন পরামর্শ নেওয়ার জন্যে।

আমি হাঁ হাঁ করে উঠব শিশিরের কথায়,—আরে করেছ কি! না জেনে শুনে তাড়িয়ে দিলে কী বলে!

তা তাড়াব না! শিশির আমার উপরই খাপ্পা হবে,—ঘনাদা এখানে শিরিবিলিতে অজ্ঞাত-বাসে আছেন। যাকে তাকে ওঁর ঠিকানা জানতে দিলে আর রক্ষে আছে। দিনরাত ওঁকে অতিষ্ঠ করে ছাড়বে না? আজ চীনেম্যান কাল জাপানী পরশু ভিয়েটনামী, তারপর দিন মাওরি, তারপর পেরুভিয়ান...

শিশির গোটা প্রশান্ত মহাসাগরটাই পার হয়ে যাচ্ছে দেখে তাকে থামিয়ে আমায় বলতে হবে,—আরে থামো থামো। তোমায় আর ভূগোলের বিদ্যে জাহির করতে হবে না। কিন্তু যাকে তাড়ালে সে যে ঘনাদার জানা লোক। দরকারী কি ব্যাপারে সকালে চিঠি দিয়ে গেছে বিকেলে উত্তর নিতে আসবে বলে। আমিই ত চিঠিটা ঘনাদাকে দিয়ে গেছি সকালে।

তা এত কথা শিশির জানবে কী করে?—গৌর এবার শিশিরের পক্ষ নেবে—আমাদের কাউকে কিছু বলেছ তুমি ঘুণাক্ষরে?

এবার আমায় ক্ষুণ্ন হতে হবে—জানাব আবার কী? শিশিরের অতটা মাতব্বরি করবার ত দরকার ছিল না। লোকটাকে দাঁড় করিয়ে ওপরে এসে খবর নিয়ে গেলেই ত পারত। উনি

একেবারে ঘনাদার এত বড় পাহারাদার হয়ে উঠতে গেলেন কেন? এখন কী কেলেঙ্কারি হল দেখো দিকি?

কেলেঙ্কারি বলে কেলেঙ্কারি!—শিবু আমার কথাতেই সায় দেবে,—জরুরী কোন চিঠি নিশ্চয়! চীনেম্যানের মত চেহারা বলছে শিশির। সত্যিই ভিয়েটনাম কি ভিয়েটকঙ্-এর কেউ প্রাণের দায়ে ঘনাদার পরামর্শ নিতে এসেছিল কিনা কে জানে।

শিশির এবার কাঁচুমাচু মুখ করে ঘনাদাকে জিজ্ঞাসা করবে,—সত্যি জরুরী নাকি ঘনাদা?

আমরাও উদ্বিগ্ন হয়ে চাইব ঘনাদার দিকে।

কী চিঠি ঘনাদা! কার চিঠি! কই চিঠিটা গেল কোথায়?—ইত্যাদি ব্যাকুল প্রশ্ন বর্ষিত হবে ঘনাদার উদ্দেশে।

ঘনাদা সে-সব প্রশ্নবাণ কী অস্ত্রে কাটাবেন, চিঠিটা বেমালুম উড়িয়ে দেবেন, না তার সৃষ্টিছাড়া ব্যাখ্যা খাড়া করবেন তাই দেখবার জন্যেই এত কাঠখড় পোড়ানো।

আর ঘনাদা কিনা এক চশমা হারাবার প্যাঁচেই আমাদের সব চাল ভণ্ডুল করে দিচ্ছেন!

না, সেটি হতে দেওয়া চলবে না। গাঁটের পয়সা গচ্চা দিয়ে ঘনাদার চশমা কিনে দিতে হয় তাতেও রাজী, কিন্তু ঘনাদাকে ওই প্যাঁচে বাজিমাত করতে দেওয়া হবে না।

সিঁড়ি থেকেই ঝগড়াটা তুমুল করে নিয়ে ছাদে উঠলাম।

লাঠালাঠিটা শিশির আর গৌরের মধ্যেই জমে ভালো। তারা দুজনেই তাই এবারের মহড়া নিয়েছে।

কেন এ শনিবার নয় কেন!—সিঁড়ি থেকেই ঘনাদার কানে পৌঁছোবার মত গৌরের চড়া গলা শোনা গেল,—তোমার ইস্টবেঙ্গল লীগ পায়নি বলে আমাদের সবাইকে কি হবিষ্যি করতে হবে!

হবিষ্যি করবে কেন!—শিশিরও হেঁড়ে গলা ছাড়ল,—না খেলা পয়েণ্ট নিয়ে লীগ পেয়ে মোচ্ছব করো। কিন্তু এ শনিবারে আর ওই পায়রার মাংস নয়। বুনো বাপী দত্ত হাঁসে অরুচি ধরিয়েছিল, এবার আকাশে পায়রা উড়তে দেখলেও গা বমি করিয়ে ছাড়বে তোমরা।

গলাবাজিটা ছাদে তুলে একেবারে ঘনাদাব ঘরের ভেতর পৌঁছে দিলে দুজনে।

বলুন ত ঘনাদা!—গৌরই প্রথম ঘনাদাকে সালিসি মানলে,—পায়রার মাংস কিছু খারাপ জিনিস! বলে কিনা এ শনিবাবে অন্য কিছু করো। আরে, অন্য কিছু পাচ্ছি কোথায়? বাজারে তেল নেই মাছ নেই দুধ নেই সন্দেশ পর্যন্ত বাতিল, তা নতুন কিছু জোটাব কোথা থেকে!

যাঁর উদ্দেশে এই অভিনয় সেই ঘনাদা তখন ইহজগতে নেই। মুখে তাঁর শিশিরের, সকালে দেওয়া একটি সিগারেট জ্বলছে, মনটা যেন তারই ধোঁয়ার সঙ্গে ঊর্ধ্বে আকাশে গেছে ছড়িয়ে।

কিন্তু এমন নির্লিপ্ত নির্বিকার তাঁকে থাকতে দিলে ত চলবে না। শিশির শনিবারের বাজারের ফর্দটা তাঁর নাকের সামনে বাড়িয়ে ধরে বললে,—তা বলে ভদ্রলোকের এক কথার মত মেনুর যেন আর নড়চড় নেই। আর শনিবারে যা এবারেও তাই। ফর্দটা একবার দেখুন না।

নাকের কাছে ওরকম একটা লম্বা কাগজ ঝুলিয়ে রাখলে যোগী ঋষিরও ধ্যান ভঙ্গ হয়। ঘনাদাকে তুরীয়লোক থেকে একটু নামতে হল। কাগজটা বাঁ হাতে একটু সরিয়ে উদাসীনভাবে বললেন,—ফর্দ আমি দেখেছি।

আপনার দেখা ত!—শিশির ঘনাদার কথাটায় কোন গরুত্বই না দিয়ে যা একখানি ছাড়ল আমরা তাতে হাসি চাপতে কেশে অস্থির।

বললে,—খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে আপনি ত বিবাগী মানুষ। চোখ বুলিয়েই মঞ্জুর করে দিয়েছেন। এখন একবার ভালো করে দেখুন দেখি। এর নাম শনিবারের খাটি?

আমাদের সংক্রামক কাশির হিড়িকেই বোধহয় ভুরু কুঁচকে ঘনাদাকে ফর্দটা আবার নাকের কাছ থেকে সরিয়ে বলতে হল,—ও ফর্দ আমায় দেখানো মিছে।

—কেন? কেন?—গৌর শিশির এবং আমি একসঙ্গে উৎকণ্ঠিত।

কেন আর।—শিবুই ঘনাদার হয়ে কৈফিয়ত দিলে যেন আমাদের ওপর বিরক্ত হয়ে,—ঘনাদার চশমা হারিয়ে গেছে।

চশমা হারিয়ে গেছে!—আমরা সহানুভূতিতে কাতর হয়ে উঠলাম,—কখন, কোথায় হারাল?

হারিয়েছে এই ঘরেই।—শিবুই যেন ঘনাদার মুখপাত্র,—কিন্তু সে আর পাবার নয়।

বললেই হল পাবার নয়!—আমরা বিরক্ত শিবুর ওপর,—আমরা এখুনি খুঁজে বার করছি।

উঁহুঃ!—শিবুই রুখে দাঁড়াল যেন,—খোঁজাখুঁজির ঘনাদা কি কিছু বাকী রেখেছেন। মিছিমিছি ঘরদোর হাঁটকে আর জ্বালিও না!

তাহলে?—শিবুর নিষেধ চট্ করে শিরোধার্য করে নিলাম আমরা,—ঘনাদার চশমার ব্যবস্থা ত করতে হয় এখুনি।

আই-ক্লিনিকে চলুন ঘনাদা!—শিশিরের অনুরোধ।

আই-ক্লিনিকে কেন?—গৌরের প্রতিবাদ—এখানেই চোখের ডাক্তার ডাকছি।

গৌর বেরিয়ে যায় যেন তখুনি।

দাঁড়াও।—ঘনাদাই থামালেন তাকে,—চোখের ডাক্তার ডাকিয়ে লাভ নেই।

কেন?—আমরা বিমূঢ়,—চোখের ডাক্তার একটা চশমার ব্যবস্থা করতে পারবে না আপনার। আপনার ত রীডিং গ্লাস, যাকে বলে পড়ার চশমার দরকার।

না।—ঘনাদা গম্ভীরভাবে জানালেন।

তাহলে বাইফোক্যাল?—শিবুর জিজ্ঞাসা।

না।—ঘনাদার সংক্ষিপ্ত জবাব।

তাহলে অ্যাস্‌টিগম্যাটিক লেন্‌স?—চক্ষুবিদ্যা সম্বন্ধে চূড়ান্ত জ্ঞান জাহির করলাম।

না।—ঘনাদা তাও নাকচ করে দিয়ে বললেন,—প্রেসবাইওপিয়ার সঙ্গে আমার চোখ ডাইক্রোম্যাটিক্। ফোটেরিথ্রস্ নয়, স্কোটেরিথ্রস্।

অ্যাঁ!!—ঘনাদার চোখের দিকে তাকিয়ে আমাদের সকলের চোখই তখন ছানাবড়া।

কিন্তু দেখলে অমন ভয়ংকর ত মনে হয় না!—শিবু যেন ভয়ে ভয়ে বললে।

একটু শুধু বাঁকা-বাঁকা লাগে!—শিশির বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা করলে।

হ্যাঁ, দেখে অতটা বিদঘুটে বলে বোঝা যায় না—গৌরের যেন ঘনাদাকে সান্ত্বনা।

দেখে তোমরা কী বুঝবে!—ঘনাদার গলায় ঝাঁজ,—লণ্ডন প্যারিস্ বেরলিন ভিয়েনাই হার মেনেছে নিদান দিতে। শেষে টাইওয়ানের এক হাতুড়ে ডাক্তার চিং সুন রোগ ধরে ওই আজব চশমা নিজেই বানিয়ে দেন।

সেই চশমা আপনি হারালেন!—আমাদের সম্মিলিত হাহাকার।

হ্যাঁ হারিয়েছি। তবে আগেই হারানো উচিত ছিল।—ঘনাদা যেন অনুশোচনায় দগ্ধ।

আমরা সবাই এবার হাঁ। তক্তপোশের ওপর ভাল জায়গাটা আগেই দখল করে শিবুই কোন রকমে ঢোঁক গিলে বলে ফেললে,—কেন, চশমাটা অপয়া বুঝি?

অপয়া!—ঘনাদাকে যেন অনেকদূর পর্যন্ত অতীতে দৃষ্টি চালাতে হল,—তা অপয়াও বলতে পারো। ও চশমা আগে হারালে, একশ বছরের ওপর যা লুপ্ত বলেই জানা ছিল দুনিয়ার সবচেয়ে দামী সেই একটা বিরল প্রাণীর জাতকে প্রথম খুঁজে বার করে তার ধ্বংসের সহায় হবার মনস্তাপে নিজেকে ধিক্কার দিতে হত না।

তক্তপোশের ওপরেই বসে থাকলেও আমাদের সকলের মাথাই তখন ঘুরতে শুরু করছে।

দাঁড়ান। দাঁড়ান।—শিশির প্রথম নিজেকে একটু সামলে আবেদন জানালে,—ব্যাপারটা একটু

গুছিয়ে নিই মাথায়। একশ বছরের ওপর লুপ্ত বলে জানা? তার মানে অন্তত একশ বছরের সে প্রাণীর খোঁজ কেউ কোথাও পায় নি?

হ্যাঁ, শেষ সে প্রাণী দেখা যায় ১৮৩০-এ।—ঘনাদা ব্যাখ্যা করলেন,—তারপর পৃথিবী থেকে যেন একেবারে লোপাট।

সে বিরল প্রাণী আবার পৃথিবীর সবচেয়ে দামী।—গৌর চক্ষু বিস্ফারিত করে আমাদের মনে করিয়ে দিলে।

দামী কি রকম শুনবে?—ঘনাদা অনুকম্পাভরে বোঝালেন,—সেই প্রায় দেড়শ বছর আগেই সে প্রাণীর একটি 'ফার' অর্থাৎ লোমওয়ালা চামড়ার দাম ছিল নিদেন পক্ষে আট থেকে ন' হাজার টাকা।

বলেন কি!—শিবু হাঁ হয়ে বললে,—উত্তর মেরুর রুপোলী খেঁকশেয়াল কি রাশিয়ার দুর্ধে আরমিন্ মানে ভাম নাকি?

বোধহয় কারাকুল ভেড়া!—গৌর ঘনাদার কাছে শোনা গল্প থেকেই বিদ্যে জাহির করলে।

না, ভ্যাল্পেস্ ইয়াগোপস্ অর্থাৎ মেরুর শেয়াল, কি ম্যসটেলা আরমেনিকা মানে রুশ খটাস নয়। ওভিস স্টিয়াটোপিনা মানে যাকে কারাকুল ভেড়া বলে তাও না।—ঘনাদা আমাদের কৃপোকাত করে বললেন—এ সব প্রাণী ত লুপ্ত বলে মনে করার কারণ হয় নি কখনো, তা ছাড়া ওদের ফার-এর দামও অত নয়।

তাহলে প্রাণীটা কী?—ধরা গলায় জিজ্ঞাসা করতে হল এবার।

ল্যাট্যাক্স লুট্রিস।—ঘনাদা মোলায়েম গলায় বললেন,—মানে সমুদ্রের ভোঁদড়।

সমুদ্রের ভোঁদড়! কয়েকটা ঢোঁক গিলে জিজ্ঞেস করতে হল,—তার অত দাম? এ ভোঁদড় আবার লুপ্তও হয়ে গিয়েছিল?

হ্যাঁ—ঘনাদা আমাদের দিকে করুণাভরে চেয়ে বললেন,—সমুদ্রের এই ভোঁদড়ের লোমওয়ালা চামড়ার লোভে মানুষ নির্মম পিশাচের মত তা শিকার করেছে একদিন। হাজার হাজার 'পেল্ট' মানে ওই লোমওয়ালা চামড়া শুধু চীনদেশেই চালান গেছে সেখানকার মন্দারিনদের জন্যে। রাশিয়া সেদিন আলাস্কা আর ক্যালিফোর্নিয়ার উত্তরে যে উপনিবেশ বসিয়েছে এই সামুদ্রিক ভোঁদড়ের প্রলোভনই তার জন্যে অনেকটা দায়ী। স্পেনের নাবিকেরাও ওই অঞ্চলটা চষে বেড়িয়েছে তাদের পালতোলা সুলুপে এই ভোঁদড়ের খোঁজে। এ ভোঁদড়ের 'পেল্ট'-এর মত এমন উজ্জ্বল ঘন আর টেঁকসই এ জাতের জিনিস আর হয় না। তার সবচেয়ে কদর ছিল চীন সাম্রাজ্যের মান্দারিনদের কাছে। মানুষ তাই এমন লুব্ধ নৃশংসভাবে এ প্রাণীটি শিকার করেছে যে তার অস্তিত্বই মুছে গেছে পৃথিবী থেকে। অন্তত: ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের পর এ প্রাণীর সন্ধান আর কেউ পায় নি।

এই ভোঁদড় আপনি খুঁজে বার করেছেন আবার?

খুঁজে বার করেছেন বলে আপনার আফসোস?

তখন চশমা হারালে এ ভোঁদড় আর খুঁজে পেতেন না?

আমাদের প্রশ্নবাণ শেষ হবার পর ঘনাদার কিন্তু আর সাড়াশব্দ নেই। হাতের সিগারেটের শেষটুকু দরজা দিয়ে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আবার যেন তিনি উদাস হয়ে গেলেন কোন শূন্যতার ধ্যানে।

গলতিটা ধরে ফেলে শিশিরই তা শোধরালে চটপট।

সকালের খোলা টিনটা পুরোই ঘনাদার সামনে ধরে দিয়ে বললে,—আর একটা খেয়ে দেখবেন নাকি!

বলছ?—ঘনাদা অতিকষ্টে যেন নিজেকে মর্ত্যভূমিতে নামালেন।

শিশির ততক্ষণে একটা সিগারেট তাঁর আঙুলে ধরিয়ে দিয়ে লাইটারটাও বার করে ফেলেছে। ঘনাদার সিগারেট ধরানো পর্ব শেষ হবার পরও খানিক অপেক্ষা করতে হল আমাদের। পর পর আসন সেখানে নেই। থাকলেও বিশেষ চেয়ার ছাড়া তাঁর ভার সইতে পারত কিনা সন্দেহ।

তিনটি সুখটান দিয়ে আমাদের দিকে একটু যেন প্রসন্নভাবে চেয়ে তিনি বললেন,—হ্যাঁ, কী যেন বলছিলাম! ও, ডক্টর চিং সুনের কথা।

না, বলছিলেন ওই চশমা আর ভোঁদড়ের কথা।—আমাদের সবিনয়ে একটু শোধরাবার চেষ্টা করতে হল।

ও সবই এক। চিং সুন আর চশমা আর ভোঁদড় সব একসঙ্গে জড়ানো। ঘনাদা শিশিরের রাখা সিগারেটের টিনটা একেবারে কোলের কাছে টেনে নিয়ে শুরু করলেন,—এখন টাইওয়ান বলেই সকলে যা জানে, তখন আমাদের মত বাইরের লোকের কাছে তার নাম ছিল ফরমোজা দ্বীপ। ফরমোজা তখন জাপানের দখলে। তারা দ্বীপটির চীনে নাম টাইওয়ান সরকারীভাবে নিলেও চালু করতে পারে নি। এই ফরমোজা দ্বীপের এখনকার টাইপে তখনকার টাইহোকু শহরেই চিং সুনের সঙ্গে আমার আলাপ। চীনের লিপির কিছু অতি প্রাচীন নিদর্শন পেয়ে ওই টাইহোকু-তেই তখন ও হরফের আদি উৎপত্তি নিয়ে কাজ করবার চেষ্টা-করছি।

ঘনাদা একটু থেমে চকিতে আমাদের ওপর যেরকম ভাবে চোখ বুলিয়ে নিলেন, তাতে কেমন একটা অস্বস্তিতেই বোধ হয় চাপা হাসিটা খুকখুকে কাশি হয়ে আর বেরুতে পারল না। ঘনাদা আবার ধরলেন,—ও সব নিদর্শন হাড়ের ওপর খোদাই করা এক অতি প্রাচীন অজানা লিপি। ১৯০৩ সালে চীনের উত্তরের এক জায়গা খুঁড়ে ওই সব খোদাই করা হাড়ের টুকরো কিছু পাওয়া যায়। তাতে প্রায় দু হাজার পাঁচশ রকমের হরফ দেখা গেছল। কিন্তু পণ্ডিতেরা ছ'শর বেশী অক্ষর তখনও চিনে উঠতে পারেন নি। এইটুকু শুধু জানা গেছে যে খ্রীষ্টপূর্ব ১৭৬৬ থেকে ১১২২ পর্যন্ত চীনের শাং বা য়িন বংশের রাজত্বকালেই সেগুলো খোদাই হয়। হাড়ের লেখাগুলো সাধারণ মানুষের ভাগ্য নিয়ে প্রশ্নের উত্তরে তখনকার গণক-দের মাথা গুলোনো জবাব বলেই একদল পণ্ডিতের ধারণা। এই অদ্ভুত হরফগুলো নিয়ে মতভেদ থাকলেও সেগুলো চীনের যে চুয়ান লিপি পরে প্রবর্তিত হয় তার চেয়ে পুরোনো বলেই সকলে তখন মেনে নিয়েছেন।

লি পো বলে আমার এক পণ্ডিত বন্ধুর বাড়িতে তখন আমি থাকি। বাড়িটা টাইপে শহরের এক প্রান্তে কীলাং নদীর ধারে। বাড়ির বাগানটা কীলাং নদীর পাড় পর্যন্ত নেমে গেছে। সেদিন সকালে সেই বাগানে একটা ক্যাম্ফর লরেল মানে কর্পূর গাছের তলায় বসে একটা আতস কাঁচ নিয়ে ওই খোদাই করা হাড় পরীক্ষা করছি, এমন সময় ফোল্ডিং টেবিলটার ওপর একটা ছায়া পড়তে দেখে একটু অবাক্ হলাম। ফিরে তাকিয়ে প্রথমে যেন পাথুরে প্রকাণ্ড একটা ঢিবিই দেখলাম মনে হল। তারপর বুঝলাম পাথুরে ঢিবি নয়, মানুষ।

আমায় পিছু ফিরতে দেখে মানুষটা একটু হেসে সামনে এগিয়ে এসে চীনে ধরনে কুর্ণিশ করেও পরিষ্কার ইংরেজীতে বললে,—মাপ করবেন মিঃ দাস। একটু বেয়াদবি করেই আপনার সঙ্গে আলাপ করতে এলাম।

আমি তখন লোকটার দিকে বেশ অবাক্ হয়ে তাকিয়ে আছি। এক উত্তর অঞ্চলের বাসিন্দা ছাড়া সাধারণতঃ চীনেরা খুব লম্বা চওড়া হয় না। উত্তরের মাঞ্চুরিয়ার লোকদের হিসাবেও এ মানুষটা কিন্তু অদ্ভুত ব্যতিক্রম। চীনে রং চেহারা নিয়ে এ যেন এক কাফ্রী দৈত্যবিশেষ।

তার চেহারাটাই আমি লক্ষ্য করছি বুঝে লোকটি আবার হেসে বললে,—আমার চেহারাটা দেখে ভুল বিচার করবেন না। প্রকৃতির খেয়ালে আমার এই চেহারাটাই আমার অভিশাপ। দেখতে গুণ্ডা বদমাশ হলেও আমি নেহাত সামান্য চোখের ডাক্তার। তবে নিজের বেয়াড়া খেয়ালে পল্লবগ্রাহীর মত বিজ্ঞানের এটা সেটা নিয়ে একটু-আধটু চর্চা করি। নাম আমার চিং সুন।

ডক্টর চিং সুন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কথা বলছিলেন। তাঁকে বসতে দেবার মত অন্য

ডক্টর চিং সুনের পরিচয় পেয়ে এবার আমিও দাঁড়িয়ে উঠে ভদ্রতা করে বললাম,—আপনার সঙ্গে আলাপ করে খুশী হলাম। কিন্তু আমার এ সৌভাগ্যের কারণটা জানতে পারি?

নিশ্চয়। নিশ্চয়।—চিং সুন তাঁর ঢোলা জোব্বা ধরনের চীনে জামার ভেতর থেকে একটা জন্তুর হাড়ের গোছের জিনিস আমার টেবিলের ওপর রেখে বললেন,—আপনি চীনের আদি লিপি নিয়ে খোঁজ খবর করছেন শুনে তখনকার কটা খোদাই করা হাড় আপনাকে দেখাতে নিয়ে এলাম। এগুলো আমাদের পরিবারেরই জিনিস। আমি পেপিং থেকে টাই-ওয়ানে চলে আসবার সময় এরকম কিছু পুরানো জিনিস সঙ্গে নিয়ে আসি।

চিং সুন এবার পিচবোর্ডের বাক্সটা খুলে যা বার করলেন তা আমি যা নিয়ে কাজ করছি সেই পুরানো খোদাই করা কটা হাড়।

আগ্রহভরে হাড়গুলো একটু ওপর ওপর পরীক্ষা করে বললাম,—এগুলো আপনি কি আপনি দু-একদিনের জন্য রেখে যেতে পারবেন?

তা না হলে এনেছি কেন?—চিং সুন সবিনয়ে বললেন,—আমি দিন পাঁচেক বাদে এগুলোতে কী পেলেন জানতে আসব। ওই হাড়গুলোর তলায় একটা ব্রঞ্জের পাতও পাবেন। সেটা হাড়গুলোর চেয়েও প্রাচীন বলে জানি। তার হরফগুলো যদি পড়ে দিতে পারেন

তাহলে চিরকাল আপনার কেনা হয়ে থাকব। না শুধু তাই কেন, আপনার চোখের দোষ সারিয়ে দেব কৃতজ্ঞতায়।

এবার একটু না হেসে পারলাম না। বললাম,—আমার চোখের দোষ সারাবেন? লণ্ডন বের্লিন নয়, ভিয়েনা পর্যন্ত হার মেনেছে জানেন কি।

জানলাম।—চিং সুনও হেসে বললেন,—তবু ওস্তাদরা যেখানে হার মানে সেখানে হাতুড়েও কখনো কখনো বাজিমাত ত করে। আমায় সেইরকম হাতুড়ে মনে করুন না।

তাই করব।—আমার হাসি চেপেই বলতে হল,—কিন্তু আমার চোখের দোষ আছে বুঝলেন কী করে? এই আতস কাঁচ ব্যবহার করছি দেখে?

না, চোখের দিকে চেয়েই বোঝবার ক্ষমতা আমার আছে। আচ্ছা আজকের মত চলি।—বলে ডক্টর চিং সুন চলে গেলেন।

আবার এলেন ঠিক পাঁচ দিন বাদেই অমনি সকালবেলা।

আমি ইতিমধ্যে বন্ধু লি পো-র কাছে চিং সুন সম্বন্ধে যা জানবার জেনেছি। মানুষটা সত্যিই নাকি বেশ অদ্ভুত অসাধারণ। উত্তর চীনের বেশ বড় বংশের ছেলে। পুরুষানুক্রমে চীন সাম্রাজ্যে তাঁদের বংশের লোকেরা মান্দারিন অর্থাৎ রাজদরবারের বড় বড় কর্মচারীর কাজ করেছেন। চীনে কুয়োমিনটাং-এর আধিপত্যের পরই চিং সুন দেশ থেকে পালিয়ে জাপানের অধীন এই টাইওয়ানে আশ্রয় নেন। চোখের ডাক্তার হিসেবে তাঁর নাম আছে কিন্তু চোখের ডাক্তারির বাইরে আরো অনেক কিছু তিনি করেন যা নাকি বেশ রহস্যময়। চিং সুনের ডাক্তারি ছাড়া আরো অনেক বিদ্যায় দখল আছে। যৌবনে ইওরোপে তিনি অনেক কাল নানা জায়গায় এই বিদ্যা-চর্চায় কাটিয়েছেন। ধরন-ধারণ চালচলন একটু সন্দেহজনক হলেও চিং সুনের নানা বিষয়ে পাণ্ডিত্যের খ্যাতি টাইওয়ানের বাইরেও পৌঁছেছে। তাঁর সম্বন্ধে আরো কয়েকটা মজার গল্পও টাইওয়ানের অনেকে জানে।

পাণ্ডিত্য যে তাঁর আছে চিং সুনের রেখে-যাওয়া খোদাই-করা হাড়গুলো আর ব্রঞ্জের পাতটা দেখেই বুঝেছিলাম।

দেখা করতে আসার পর চিং সুনকে সেই কথাই বললাম।

সেদিন সকালেও ওই বাইরের বাগানেই টেবিল পেতে বসে ছিলাম। বন্ধু লি পোকে রেখেছিলাম সঙ্গে। চিং সুনের বসবার উপযুক্ত একটা বাড়তি মজবুত আসন শুধু পাতিয়ে রেখেছিলাম আগে থাকতে।

চিং সুন এসে যথারীতি চীনে কায়দায় অভিবাদন জানিয়ে সে আসনে বসবার আগেই জিজ্ঞাসা করলেন,—কী বুঝলেন আমার জিনিসগুলো দেখে মিঃ দাস?

কাগজের বাক্স থেকে বার করে হাড়গুলো আর ব্রঞ্জের পাতটা সামনের টেবিলের ওপরই সাজিয়ে রেখে দিয়েছিলাম। চিং সুন বসবার পর তারই একটা খোদাই-করা হাড় তুলে নিয়ে বললাম গম্ভীর মুখে,—বুঝলাম আপনি সত্যি পণ্ডিত লোক।

তার মানে?—বড় চালকুমড়োর মত চিং সুনের গোল ভাবলেশহীন মুখেও যেন একটু বিদ্রূপের ঝিলিক খেলে গেল,—প্রায় চার হাজার বছর আগেকার খোদাই-করা হাড় আর ব্রঞ্জের পাতে আমার পাণ্ডিত্যের কী প্রমাণ পেলেন! আমি ওগুলো ত সংগ্রহ করেছি মাত্র।

না, ডক্টর চিং সুন,—তাঁর হাঁড়ি-মুখের দিকে সোজা তাকিয়ে বললাম,—ওগুলো আপনি জাল করেছেন। তবে সত্যিকার পাণ্ডিত্য না থাকলে যার তার পক্ষে এরকম জাল করা সম্ভব নয়।

আমি জাল করেছি ওগুলো!—চিং সুন যেন এখুনি ফেটে পড়বেন মনে হল,—আপনাকে আমি...

আহাম্মক গাড়োল ভেবেছিলেন!—চিং সুনকে থামিয়ে দিয়ে মাখনের মত গলায় বললাম,—শুনলাম একবার এক জারমান না পোলিশ নৃতত্ত্ববিদ্ এই টাইওয়ানের জংলী আদিবাসী চিন হোয়েনদের সম্বন্ধে গবেষণা করতে এলে তাঁকে বাঁদর নাচ নাচিয়েছিলেন এমনি বোকা বানিয়ে! আমাকেও তাই নাচাতে চেয়েছিলেন। আপনাকে সেই আনন্দটুকু দিতে পারলাম না বলে দুঃখিত। তবে আপনার জ্ঞান বিদ্যার সত্যিই তারিফ করছি। হাড় খোদাইগুলো জাল করা এমন কিছু অবশ্য শক্ত নয়, কিন্তু ব্রঞ্জের পাতে যা খোদাই করেছেন তাতে সত্যিই বাহাদুরি আছে! ব্রঞ্জের পাতে খোদাই-করা শব্দ হল তিনটে আর তার অক্ষর হল আঠারোটা। আঠারোটা হরফের তিনটে নিয়েছেন মিশরের প্রাচীন লিপি থেকে, ব্রাহ্মী থেকেও নিয়েছেন তিনটে, খরোষ্ঠী থেকে নিয়েছেন চারটে, প্রাচীন সিন্দজিরলি, ইথিওপিয় আর টেমা থেকে দুটো করে—আর একটা করে ফিনিশীয় আর সেবিয়ান থেকে। আপনার খোদাই-করা অক্ষরগুলো এবার পর পর সাজিয়ে দেখা যাক। সব হরফগুলোই এক একটা ইংরেজী অক্ষরের প্রতিরূপ। প্রাচীন লিপির প্রতিরূপের বদলে ইংরেজী অক্ষর বসিয়ে সাজালে সবসুদ্ধ লেখাটা দাঁড়ায়,— GHANASHAM DAS HOAXED এ লেখার প্রথম শব্দ ঘনশ্যামের 'জি'টা নিয়েছেন মিশরী থেকে, 'এচ্'টা ব্রাহ্মী, 'এ'টা খরোষ্ঠী, 'এন'টা মিশরী, এবার 'এ'টা সিন্দজিরলি, 'এস'টা টেমা, এবার 'এচ্'টা প্রাচীন ইথিওপিয়ান, 'এ'টা ব্রাহ্মী, 'এম'টা মিশরী। দ্বিতীয় শব্দ দাস-এর 'ডি'টা টেমা, 'এ'টা ফিনিশীয়, 'এস'টা খরোষ্ঠী। তৃতীয় শব্দ হোক্স্ড্-এর 'এচ'টা খরোষ্ঠী, 'ও'টাও তাই। 'এ'টা প্রাচীন ইথিওপিয়ান, 'এক্স্'টা ব্রাহ্মী, 'ই'টা সিন্দজিরলি আর 'ডি'টা সেবিয়ান। তা এত কষ্টই যদি করলেন ঘনশ্যামের 'ওয়াই'টা বাদ দিলেন কেন? এ সব লিপিতে না থাকলেও সিরিলিক্-এই 'ওয়াই' পেতেন।

আমার কথা শুনতে শুনতে চিং সুনের মুখখানা আষাঢ়ের মেঘের মত থমথমে হয়ে এসেছিল। ঝড় উঠে বাজের কড়াক্কড় শুরু হয় বুঝি। কিন্তু তার বদলে সেই চালকুমড়ো মুখে সে হঠাৎ গলা ছেড়ে হেসে উঠল।

ঘনাদা থেমে এতক্ষণের ছাই-জমা সিগারেটে একটা রামটান দিলেন।

আমরা কিন্তু টাইওয়ানের চিং সুনের মত গলা ছেড়ে হাসতে পারলাম না। ঘনাদা প্রাচীন লিপির খিচুড়ির ব্যাখ্যান আরম্ভ করার পরই আমরা জিভ কেটে পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করেছি কয়েকবার। এখন কেউ লাল কেউ বেগনী হয়ে সবাই আমরা অধোবদন। আমাদের অত ফন্দি খাটিয়ে লেখা চিঠির জারিজুরি সব অমন করে ভণ্ডুল যদি জানতাম!

ধরা পড়ার লজ্জাটা আর একটু রগড়ে বুঝিয়ে দিলেন ঘনাদা। রামটানের ধোঁয়ায় ঘরের

হাওয়া ঘোলাটে করে বলতে শুরু করলেন,—হাসি শেষ করে ডক্টর চিং সুন একেবারে যেন লজ্জায় মরে গিয়ে বললেন,—আমার এখন নাক খত দেওয়াই উচিত মিঃ দাস।

দোহাই ও চেষ্টা আর করবেন না।—আমার হয়ে বন্ধু লি পো-ই তাঁকে ঠাট্টা করলেন,—একে আমাদের খাঁদা চীনে নাক। মাটিতে ঘষলে ওর আর চিহ্ন থাকবে না।

চিং সুন এ ঠাট্টায় আর একবার দাঁত বার করে হেসে বললেন,—তাহলে প্রায়শ্চিত্তটা অন্য-ভাবেই করি। করি, আপনার চোখের দোষ সারাবার এক জোড়া চশমা বানিয়ে দিয়ে।

সে চশমায় চোখের দোষ যদি না সারে?—চিং সুনের মিথ্যে বড়াই থামাবার জন্যেই বললাম।

চিং সুন কিন্তু ভড়কালেন না। একটু যেন ভেবে নিয়ে বললেন,—না যদি সারে তাহলে দু-দুটো সাগর-ভোঁদড়ের লোমওয়ালা চামড়া জরিমানা দেব। আপনার বন্ধু লি পো আমার সে চামড়া দেখেছে। সে দুটো লি পোর কাছে আজই জমিন রেখে যাচ্ছি।

সাগর-ভোঁদড়ের চামড়া!—মুখে কিছু বুঝতে না দিলেও মনে মনে তখন রীতিমত অবাক্ হয়েছি। তবু বাইরে তাচ্ছিল্য দেখিয়ে বললাম,—চামড়া আসল না নকল?

আসল কি নকল ও জিনিসের জহুরী হলেই বুঝবেন।—চিং সুন চটপট জবাব দিলেন,—আজই ত সে দুটো এনে জামিন রাখছি।

সেদিন বিকেলে সত্যিই চিং সুন যে দুটি সাগর-ভোঁদড়ের ফার নিয়ে এলেন তা দেখে চোখের পলক আর যেন পড়তে চায় না। আসল সাগর-ভোঁদড়ের লোমওয়ালা চামড়া—মখমল আর সাটিন তার কাছে কোমলতা আর উজ্জ্বলতায় লজ্জা পায়।

এ ফার আপনি পেলেন কোথায়?—না জিজ্ঞেস করে পারলাম না।

এ আমাদের পরিবারেরই পুরানো সম্পদ।—বললেন চিং সুন,—চোদ্দ পুরুষ ধরে আমরা চীনের মান্দারিন ছিলাম। মান্দারিনদের নেশা আর বড়াই ছিল এই সাগর-ভোঁদড়ের ফার সংগ্রহ করা। দুনিয়ার সবচেয়ে চড়া দাম তাঁরাই দিতেন এ জিনিসের। আমাদের পরিবারে এ জিনিস আরো অনেক ছিল। আমি শুধু দুটি মাত্র নিয়ে আসতে পেরেছি। এখন বলুন এই জামিনই যথেষ্ট কি?

হ্যাঁ যথেষ্টর নয়, আশাতীত।—এবার হেসে বলতেই হল,—কিন্তু নেহাত নিঃস্বার্থভাবে আমার চশমা তৈরীর এতখানি ঝুঁকি নিচ্ছেন বলে মনে হচ্ছে না!

না, স্বার্থ একটু আছে বইকি!—চিং সুন স্বীকার করলেন হেসে,—আমার চশমায় যদি আপনার চোখের দোষ সত্যি সারে তাহলে আপনাকেও একটা কথা রাখতে হবে আমার।

কী কথা?—সন্দিগ্ধ হয়েই জিজ্ঞাসা করলাম।

—এমন কিছু নয়, আমাকে জ্যান্ত সাগর-ভোঁদড় দেখাতে হবে আপনাকে।

জ্যান্ত সাগর-ভোঁদড় দেখাব আমি!—আমি চোখ কপালে তুলে বললাম,—এরকম আজগুবী আবদারের কোন মানে হয়? আঠারো শ' ত্রিশ সালের পর জ্যান্ত সাগর-ভোঁদড় পৃথিবীর কেউ দেখে নি।

কেউ দেখে নি বলেই ত আপনার কাছে এসেছি।—চিং সুন খোলাখুলিভাবে বলে ফেললেন,—ধাপ্পা দেবার ছলে আপনার সঙ্গে গায়ে পড়ে আলাপ করেছি কি মিছিমিছি? আপনার অনেক খবরই জেনেছি মিঃ দাস। আর বছরে ক্যালিফোর্নিয়ার সান পাবলো উপ-সাগরে আপনি মাঝারি তিমি শিকারের নামে ছোট একটা সুলুপ নিয়ে কয়েক মাস ঘুরেছেন, অথচ একটাও তিমি ধরেন নি। সমুদ্রের ও অঞ্চলে আপনি শখ করে হাওয়া খেতে গেছলেন বলে ত মনে হয় না!

হাওয়া খেতে যাইনি বলেই সাগর-ভোঁদড়ের সন্ধান পেয়েছি এ কথা প্রমাণ হয় কি?—মনের মধ্যে এতবড় একটা আফসোসও পুষে রাখতে হত না।

বিদ্রূপের সুরেই বললাম,—আমি ওখানে রত্নদ্বীপের মূল চেহারা দেখতে গেছলাম।

রত্নদ্বীপের মূল চেহারা।—চিং সুন একটু ভ্যাবাচাকা,—সে আবার কী? ওখানে রত্নদ্বীপ আবার কোথায়?

সত্যিকার নয়, কল্পনার রত্নদ্বীপ।—চিং সুনকে এবার বোঝালাম,—আপনি ত ডাক্তারি ছাড়া অনেক কিছু নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করেন মনে হচ্ছে। আর. এল. স্টিভেন্‌সনের নাম শুনেছেন আশা করি?

হ্যাঁ শুনেছি।—চিং সুন তখনো বেশ ধাঁধার মধ্যে,—সেই বিখ্যাত লেখক ত যিনি 'ট্রেজার আইল্যাণ্ড' লিখেছিলেন?

তাঁর সেই ট্রেজার আইল্যাণ্ড মানে কল্পনার রত্নদ্বীপের কথাই বলছি।—চিং সুনকে গম্ভীর হয়ে বললাম,—স্টিভেন্‌সন্ আঠারো শ উনআশি খ্রীষ্টাব্দে ক্যালিফোর্নিয়ার উপকূলে একটি জায়গায় কিছুদিন কাটান। স্পেনের নাবিকরা সে উপকূলের নাম দিয়েছিলেন প্যণ্টা দে লস লোবোস ম্যারিনোজ অর্থাৎ সাগর-নেকড়ের স্থল-বিন্দু। ট্রেজার আইল্যাণ্ডে যে দ্বীপের বর্ণনা তিনি করেছেন, তার আদল ওইখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য থেকেই নেওয়া। আমি সেই জায়গাই দেখতে গেছলাম। কিন্তু সেখানে ত দু-জাতের সীল শুধু পাওয়া যায়, স্প্যানিয়ার্ডরা যার নাম দিয়েছিল সাগর-নেকড়ে।

কথা বাড়িয়ে লাভ নেই মিঃ দাস।—এবার চিং সুন সোজাসুজি জিজ্ঞেস করলেন,—আপনি আমার শর্তে চশমা নিতে রাজী কিনা তাই শুধু বলুন? চশমা ঠিক হলে সাগর-ভোঁদড় আমায় দেখাবেন কি না?

চশমা ঠিক না হলে সাগর-ভোঁদড় ত দেখতেই পাব না।—এবার হেসে বললাম,—আর দেখতে যদি পাই তাহলে আপনাকেই বা সে দৃশ্যে বঞ্চিত করব কেন? কিন্তু একটা কথা বলে রাখছি। সাগর-ভোঁদড়ের সন্ধান যদি পাই ত শুধু চোখেই দেখবেন, ধরবার নামও করবেন না। এই বিরল প্রাণীর শেষ যে কটি প্রতিনিধি এখনো মানুষের চোখের আড়ালে লুকিয়ে টিকে আছে, তাদের মানুষের লোভের কাছে বলি দেওয়ার পাপের ভাগী আমি হব না কিছুতেই।

আমিই কি তা হতে চাই!—চিং সুন প্রায় শিউরে উঠে বললেন,—আমার শুধু একবার চোখে দেখার সাধ। ছেলেবেলা থেকে এই প্রাণীটি দেখবার জন্যে আমি লালায়িত। আপনার কাছে এবার তাহলে স্বীকার করি সত্য কথাটা। এই সাগর-ভোঁদড় খোঁজবার জন্যে আমি নিজে একটা সুলুপ পর্যন্ত কিনে ফেলেছি। সেই সুলুপ নিয়ে গত কয়েক বছর চষেও বেড়িয়েছি ক্যালিফোর্নিয়া থেকে আলাস্কা পর্যন্ত ওই উপকূলের সমুদ্র। লাভ কিছু অবশ্য হয় নি, তবে আপনার খোঁজ খবরাখবর ওই সুলুপ নিয়ে ঘোরাঘুরির সময়েই পাই। আপনাকে কথা দিচ্ছি সাগর-ভোঁদড় যদি দেখান ত ক্যামেরায় ছাড়া আর কিছুতে ধরব না।

চিং সুন যে কত বড় কপট শয়তান তা যখন ধরতে পারলাম তখন আমি নিরুপায়ভাবে তারই হাতের মুঠোয়। তার আগে হাতুড়ে হোক বা না-হোক, তার দেওয়া চশমায় সত্যি আমি টাইওয়ানেই নতুন চোখ পেয়েছি। নিজের কড়ার রাখতে তারই সঙ্গে তারপর এসেছি সানফ্রান্সিসকোয়। সেখানে তার সুলুপে উঠে ভোঁদড়ের খোঁজে রওনা হবার সময়েই মনে অবশ্য একটু খটকা লেগেছিল। সুলুপের মাঝি-মাল্লা সব চীনে। চেহারাগুলো কেমন দুশমনের মত। সে খটকাকে তবু আমল দিই নি। মাঝি-মাল্লার চেহারা নিরীহ ভালোমানুষের মত হবে কেন এই কথাই নিজেকে বুঝিয়েছি। চিং সুনও অবশ্য তাঁর অমায়িক ব্যবহারে সব ভুলিয়ে দিয়েছেন। আমি যেন তাঁর গুরুঠাকুর এমনি তদ্বির করেছেন আমার। কদিন উত্তরমুখো পাড়ি দিয়ে তারপর এক জায়গায় এসে সুলুপের নোঙর ফেলতে নির্দেশ দিয়েছি সন্ধ্যাবেলা। সেটা মণ্টেরয় উপদ্বীপের কূল। সেখানেই কদিন কাছাকাছি সুলুপ নিয়ে ঘোরাঘুরির পর একদিন সকালে সাগর-ভোঁদড়ের দেখা পেলাম। সেদিন ভোরে ঘুম থেকে উঠে চশমাটা প্রথমে খুঁজে পাই নি। সত্যিই চশমাটা তখন হারালে সাগর-ভোঁদড়ও খুঁজে পেতাম না, আর চিরকাল

ঘনশ্যাম যেন সেই পুরনো আক্ষেপেই একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চুপ করলেন।

সাগর-ভোঁদড়ের দেখা পেয়েও আফসোস কেন ঘনাদা?—আমাদের একটু উসকে দিতে হল, —চিং সুন বেইমানি করলে বুঝি?

বেইমানি শুধু নয়, শয়তানি!—ঘনাদা সে কথা স্মরণ করেই যেন উত্তেজিত,—চশমা খানিক বাদে বাক্সের তলাতেই খুঁজে পেলাম। সে চশমা পরে ডেকে গিয়ে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গেই সেই আশাতীত দৃশ্য দেখতে পেলাম। গোটা কুড়ি সাগর-ভোঁদড়ের ছোট একটা পাল। তীর থেকে কয়েক শ গজ দূরে সমুদ্রের জলের ওপর একটা ডুবো পাহাড় খানিকটা মাথা তুলে জেগে আছে, তার চারধারে কেল্প মানে বাদামী রঙের বড় বড় সামুদ্রিক আগাছার আধডোবা জঙ্গলে ভোঁদড়ের পাল রঙে রং মিলিয়ে প্রায় অদৃশ্য হয়েই চরে বেড়াচ্ছে।

আনন্দে উত্তেজনায় প্রায় চিৎকার করেই ডাকলাম,—চিং সুন!

চিং সুন কাছেই ছিলেন। ছুটে এসে অস্থির ভাবে বললেন,—কী! কোথায়?

দেখতে পাচ্ছেন না?—নিজেকে সামলে শান্ত গলাতেই বললাম।

কী দেখতে পাব! সাগর-ভোঁদড়? কোথায়?—চিং সুনের গলায় সন্দেহ ও বিরক্তি।

চিং সুনকে অবশ্য দোষ দেওয়া যায় না। সমুদ্রের নোনা জলের ঢেউয়ে শ্যাওলা-ধরা পাহাড়ের গা আর বাদামী কেল্পের জঙ্গলের মধ্যে মিশে-থাকা সাগর-ভোঁদড় চিনে নেওয়া অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ও বহু সাধনায় তৈরি করা পাকা চোখ না হলে অসম্ভব। চশমাটা না থাকলে পাকা চোখ নিয়েও আমি পারতাম না।

ধৈর্য ধরে চিং সুনকে এবার জায়গাটার আরো স্পষ্ট নির্দেশ দিয়ে সাগর-ভোঁদড়গুলোকে দেখিয়ে দিলাম।

চিং সুনের নাচানাচি তখন দেখবার মত। তাঁর সে ছেলেমানুষী সত্যি ভালোই লাগল।

ক্যামেরা! ক্যামেরা!—বলে তিনি তখন হাঁকাহাঁকি করছেন।

হেসে বললাম,—আপনি ক্যামেরা নিয়ে যত খুশি ছবি তুলুন আজ, কিন্তু মনে রাখবেন কাল আমাদের ফিরতেই হবে। আপনার সারা জীবনের সাধ যখন মিটেছে তখন আর দেরি করবার কারণও নেই।

নিশ্চয়, নিশ্চয়!—চিং সুন হাসিমুখে আশ্বাস দেবার পর নিজের মূর্তি ক্যামেরাটাও আনতে কেবিনে গেলাম। ক্যামেরাটা বার করতে যাচ্ছি বাক্স থেকে, হঠাৎ ঘরটা একটু অন্ধকার হওয়ায় চমকে তাকিয়ে দেখি সুলুপের দুশমন চেহারার চীনে মাল্লাদের একজন কেবিনের দরজায় দাঁড়িয়ে।

কেমন একটু সন্দেহ হওয়ায় উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছিলাম। তার আগেই দরজাটা সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল। বাইরে থেকে তাতে চাবি লাগাবার শব্দও পেলাম।

ব্যাপারটা বুঝতে আর দেরি হল না। চিং সুনের এরকম শয়তানির সম্ভাবনা যে একেবারে মাথায় আসেনি তার জন্যে নিজেকে তখন ধিক্কার দিয়ে আর লাভ কি।

ব্যাকুলভাবে কেবিন ট্রাঙ্কটা হাতড়ে পিস্তলটা খুঁজলাম। পিস্তল সেখানে নেই। তা যে পাব না আগেই বোঝা উচিত ছিল। চিং সুন আটঘাট না বেঁধে তার এ শয়তানী ফন্দি আটেনি। খাঁচায় বন্দী বাঘের মত নিষ্ফল আক্রোশে গজরানো ছাড়া আর কিছু করবার নেই। তবু ট্রাঙ্কটা হাতড়ে একটা কাজের জিনিস যে পেলাম এই ভাগ্য।

দুপুর পর্যন্ত সেইভাবেই কাটল। বাইরে থেকে সুলুপের ওপরকার যে সব আওয়াজ কানে আসছিল তার মানে বুঝে শরীরের রক্ত তখন ফুটছে। স্বয়ং চিং সুন-ই এসে বেলা বারোটা নাগাদ আমার দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলেন। সঙ্গে অবশ্য চকচকে ছুরি হাতে একজন চীনে মাল্লা।

চিং সুনের হাঁড়ি-মুখের দু-পাটি দাঁতই তখন অমায়িক হাসিতে আকর্ণবিস্তৃত হয়ে বেরিয়ে আছে।

যেন লজ্জায় সংকোচে এতটুকু হয়ে তিনি বললেন,—ছি। ছি। কী অন্যায় বলুন ত। কে হতভাগা এক মাল্লা আমার হুকুম না বুঝে আপনাকে এতক্ষণ কেবিনে বন্ধ করে রেখেছে। আমি কোথায় ক্যামেরার কাজ দেখতে আপনাকে ডেকে আনতে বললাম, আর গাড়োলটা কিনা আপনার দরজা বন্ধ করে দিয়ে গেল।

তাতে আর কী হয়েছে।—আমিও তাঁর বিনয়ে যেন গলে গিয়ে বললাম,—কেবিনে খানিকক্ষণ চুপচাপ নিশ্চিন্তে বিশ্রাম করা গেল। আপনার ক্যামেরার কাজ নির্বিঘ্নে সারা হয়েছে নিশ্চয়?

তা কতকটা হয়েছে আপনার আশীর্বাদে।—চিং সুন সকৃতজ্ঞভাবে হেসে বললেন,—আপনাকে তাই দেখাবার জন্যেই ত ডাকতে এসেছি। আসুন আসুন।

সামনে চিং সুন আর পেছনে ছুরি হাতে সেই মাল্লার মাঝখানে ডেক পর্যন্ত যেতে হল।

ডেকে গিয়ে পেঁাছোবার পরই রক্তটা মাথায় উঠে গেল এক মুহূর্তে। গোটা আষ্টেক সাগর-ভোঁদড় সেখানে ডেকের প্যাটাতনের ওপর পড়ে আছে। প্রায় সব কটাই মরা একটা-দুটোর উজ্জ্বল মোলায়েম গা শুধু তখনো মাঝে মাঝে কেঁপে কেঁপে উঠছে। সুলুপের ধারে আমায় যেখানে দাঁড় করিয়েছে তার পেছনেই বিরাট জালটা জল থেকে তোলা হলেও তখনও ফ্রেমে টাঙানো।

চোখে যে তখন চারিদিক লাল দেখছি তা বুঝতে না দিয়ে মুখে হাসি টেনে গদগদ হয়ে বললাম,—বাঃ চমৎকার ক্যামেরার কাজ ত! চীনে ভাষাটা কিছু জানি বলে অহংকার ছিল। এখন দেখছি অনেক কিছুই আমার শিখতে বাকী। আপনার চীনে ভাষায় অন্তত ক্যামেরা মানে ভোঁদড়-ধরা জাল, কেমন?

ঠিক ধরেছেন!—চিং সুন আমার বাহাদুরিতে যেন অবাক্।

—আর কৃতজ্ঞতা মানে বেইমানি, সামনে হাত বাড়িয়ে বন্ধুত্ব মানে পিঠে চোরা গোপ্তা, আর মানুষের চেহারা মানে শয়তানের মুখোশ!

চিং সুনের চালকুমড়ো মুখের টেরা চোখদুটো তখন তার মাল্লার হাতের ছুরির মতই চকচক করছে।

মুখে কিন্তু মোলায়েম হাসিটি বজায় রেখে তিনি বললেন,—আমাদের ভাষাটা এত তাড়াতাড়ি রপ্ত করেছেন দেখে আপনার মাথাটাই যে বাঁধিয়ে রাখতে ইচ্ছে হচ্ছে। কিন্তু হাতে আমার সময় বড় কম। সাগর-ভোঁদড়ের খবর জানাজানি হয়ে যাবার আগেই এ তল্লাটের যত-দূর সম্ভব সব ভোঁদড় সাবাড় করে দেশে ফিরে যেতে হবে। তাই অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে লোহার শেকলে হাত-পা বেঁধে আপনাকে এইখানেই সমুদ্রের জলে ফেলে দিয়ে যেতে হচ্ছে। একটা ভরসা আপনাকে দিচ্ছি। এখানে হাঙর-টাঙরের উৎপাত নেই বললেই হয়। সুতরাং সমুদ্রের তলায় শুধু মাছেরাই আপনার হাড়মাস খুবলে খাবে।

ভরসাটুকুর জন্যে ধন্যবাদ, চিং সুন!—যেন কৃতার্থ হয়ে বললাম,—কিন্তু এখনকার সাগর-ভোঁদড় সাবাড় করে নিয়ে যাওয়া বোধ হয় আপনার ভাগ্যে নেই। আপনার শয়তানিটা আঁচ করতে পারিনি সত্যি, কিন্তু সাগর-ভোঁদড় যে এখনো টিকে আছে আর এতদিন মানুষের চোখ এড়িয়ে থাকার দরুন কিছু বংশ বৃদ্ধি যে করতে পেরেছে এ খবর আর বেশীদিন চাপা থাকবে না বুঝে সানফ্রানসিসকোতে নেমেই আমার বন্ধু সামুদ্রিক প্রাণীতত্ত্ববিদ্ ডক্টর ক্যামেরনের সঙ্গে দেখা করে এসেছি। কী তাঁকে করতে হবে তাও বলে এসেছি সব। এখান থেকে কিছু দূরে বিক্সবি ক্রীকের মুখে তিনি তাঁর লোকজন নিয়ে তখন থেকেই পাহারায় আছেন। ইতিমধ্যে সাগর-ভোঁদড়ের একটা-দুটো পাল দেখেও ফেলেছেন বলে বিশ্বাস করি। এ পাল দেখবার পরেই ক্যালিফোর্নিয়া ও আমেরিকার ফেডারেল সরকারকে জানিয়ে এ প্রাণীটিকে রক্ষা করবার ব্যবস্থা যা করবার তিনি হয়ত করেই ফেলেছেন ইতিমধ্যে। সুতরাং আপনার শয়তানী মতলব সিদ্ধ হবার কোন আশাই ত দেখছি না।

চিং সুনের মাংসের পাহাড় আমার এই কথার মধ্যেই প্রায় আগ্নেয়গিরি হয়ে উঠল। মুখ থেকে যেন আগুনের হলকা বার করে চিং সুন বললেন,—হতভাগা কেলে আরশোলা! তুই লুকিয়ে লুকিয়ে এই চালাকি করেছিস! তোকে আমি নিজের হাতেই আরশোলার মত আজ টিপে মারব।

আমার ওপর ধস-নামা পাহাড়ের চূড়োর মত ঝাঁপিয়ে পড়ে চিং সুন আমার গলাটা টিপে ধরলেন।

ছুরি হাতে মাল্লাটা আচমকা সেই দশমনি লাশের ভার সইতে পারবে কেন? চিং সুন সচাপ্টে তার ওপর গিয়ে পড়বার পর দুজনে জড়াজড়ি করে ডেকের ওপর পড়ল লুটিয়ে। ছোরাটা তখন ঝনঝনিয়ে ছিটকে চলে গেছে ডেকের রেলিং-এর ধারে।

সেটা কুড়িয়ে নিয়ে লাফ দিয়ে, টাঙানো জালটার ফ্রেমের মাথাতেই উঠতে হল। ছোরাটা জালের মধ্যে গলিয়ে তারই বাঁট ধরে ঝুলে পড়লাম এবার। ধারালো ছোরায় জালটা ফর্দা ফাঁই করে কেটে একেবারে সমুদ্রের জলেই গিয়ে পড়লাম ঝাঁপিয়ে। সেখান থেকে ডুব সাঁতারে সুলুপের হালের কাছে।

ওপরে ভ্যাবাচাকা খাওয়া মাঝি-মাল্লারা তখন সামলে উঠে হৈ চৈ শুরু করছে। সুলুপের দু-ধারের রেলিং থেকে ঝুঁকে চেষ্টাও করছে আমায় খোঁজবার।

ছোরাটা সত্যিই যেমন ধারালো তেমনি মজবুত। কখনো স্ক্রু-ড্রাইভার কখনো বাটালির মত সেটা কাজে লাগিয়ে কয়েকটা ইস্ক্রুপ নাট বল্টু খুলে হালটাকে অকেজো করে দিতে বেশীক্ষণ লাগল না। এবার অন্য কাজটাও সারলাম। আবার ডুব-সাঁতার দিয়ে তারপর সাগর-ভোঁদড়দের আস্তানা সেই ডুবো পাহাড়ের জাগা চূড়োর ধারেই গিয়ে উঠলাম। তার একটা খাঁজের আড়াল থেকে সুলুপটার ওপর নজর রাখা সোজা।

খুব বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। আমায় খুঁজতে সুলুপ ঘোরাতে যেতেই হালের অবস্থাটা ধরা পড়ল। তা নিয়ে চেঁচামেচি হাঁকাহাঁকি খানিক হতে না হতেই সুলুপের ওপরে একেবারে হুলুস্থুল কাণ্ড। সুলুপের গ্যাসটপ পালে আগুন লেগে গেছে। তার সব ঝুলোনো দড়ি-দড়া থেকে ধোঁয়ার রাশ উঠছে কুণ্ডলী পাকিয়ে।

হাল বিকল করবার পর তাই বেয়ে একটু উঠে এই কাজই সেরেছিলাম। পালের ঝোলানো ফটা দড়ি-দড়ায় লাইটার থেকে একটু করে পেট্রোল লাগিয়ে ধরিয়ে দিয়েছিলাম আগুন। কেবিনে বন্দী অবস্থায় পিস্তলটা না পেলেও এই লাইটারটিই কেবিন ট্রাঙ্কের মধ্যে পাই। বিশেষ কিছু না ভেবেই সেটা পকেটে রেখেছিলাম। সেটা যে এমন কাজে লাগবে তখনও ভাবতে পারিনি।

চিং সুন আর তার দুশমন মাঝি-মাল্লারা তাদের বেহাল জ্বলন্ত সুলুপ নিয়ে কী তারপর করেছে ঠিক জানি না। যাই করুক তাদের ভোঁদড় শিকারের আশায় যে চিরকালের মত ছাই পড়েছে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। আমার তখন আসল জরুরী খবরের জন্যই বেশী আগ্রহ। সুলুপের ওই অবস্থা দেখেই আমি তাই সাঁতরে তীরে গিয়ে উঠি। সেখান থেকে সোজা সানফ্রানসিস্কোতে ডক্টর ক্যামেরনের কাছে।

ডক্টর ক্যামেরনের সঙ্গে দেখা হওয়ার আগেই অবশ্য সেদিনের খবরের কাগজে বড় বড় হরফে সংবাদটা পেলাম। একেবারে প্রথম পাতাতেই দু-কলম শিরোনামা দিয়ে খবরটা ছাপানো।—এক শ বছর বাদে বিলুপ্ত সাগর-ভোঁদড়ের খোঁজ। বিরল প্রাণীটির বংশরক্ষায় সরকারী সংরক্ষণ আইন প্রয়োগ।

নিজের অজান্তে যে অন্যায়ের সহায় হয়েছি তার জন্যে মনে মনে আফসোস থাকলেও ওইটুকু সান্ত্বনা মনের মধ্যে নিয়ে ফিরেছি যে পৃথিবীর এই একটি অমূল্য প্রাণী অন্তত মানুষের নির্মমতায় আর লোপ পাবে না।

ঘনাদা চুপ করলেন। মুখে যেটা ফোটাবার চেষ্টা করলেন সেটা নিঃস্বার্থ কর্মবীরের অনাসক্তিই বোধ হয়। শিশিরের সিগারেটের টিনটা কিন্তু তখন তাঁর কোলের কাছ থেকে ফতুয়ার পকেটে ঢুকেছে।

সেই পকেট থেকেই যেন হঠাৎ হাতে ঠেকায় আমাদের সেই খামটি বার করে তিনি খানিকক্ষণ সেটা উলটে-পালটে দেখে বেশ অবাক্।

এই বোধ হয় তোমাদের সেই চিঠি।—ঘনাদা বেশ মনমরা ভাবেই বললেন সেটা শিশিরের হাতেই এগিয়ে দিয়ে,—চশমা ছাড়া ত আর পড়তে পারব না। ওটা নিয়েই যাও তোমরা।

চিঠি নিয়ে আর আমাদের মাথা তোলবার অবস্থা নেই। সুড়সুড় করে বিনা বাক্যব্যয়ে সবাই নীচে নেমে এলাম।

নেমে এসেই আমাদের আহাম্মকির প্রমাণস্বরূপ চিঠিটা যখন কুচি কুচি করে ছিঁড়ছি তখন গৌরকে ডিক্শনারি পেড়ে নিয়ে বসতে দেখে আমরা অবাক্।

কী ব্যাপার কি?—জিজ্ঞাসা করলাম,—লিপিতত্ত্বে হার মেনে আবার শব্দতত্ত্ব কেন?

এই যে বলছি।—গৌর অভিধানের পাতা উলটে বললে,—ঘনাদার চোখের রোগগুলো মনে আছে? প্রেসবাইওপিয়া আর ডাইক্রোম্যাটিক ভিসন। ওগুলোর মানে শুনবে? প্রেস-বাইওপিয়া হল চালশে আর ডাইক্রোম্যাটিক দৃষ্টি বলে রং-কানাদের।

আমাদের হাঁ-করা মুখের ওপর গৌর ডিক্শনারিটা বন্ধ করল।

ছুতা

বাহাত্তর নম্বর বনমালী নস্কর লেনের এমন দুর্দিন বুঝি আগে কখনও আসেনি।

কি হয়েছে? কারুর অসুখ-বিসুখ?

বালাই ষাট! বাহাত্তর নম্বরে ও সব জ্বালা নেই! শত্তুরেরও ও সব যেন না হয়।

তাহলে কি অবস্থা খারাপ? চাকরি-বাকরি সব গেছে? মেস চলছে না?

উঁহুঃ, সে সব কিছু নয়। ভালোমন্দ পাঁচজনের শুভেচ্ছায় হিংসেয় মেসের লক্ষ্মী আমাদের অচলা।

তবে হয়েছেটা কি, যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে তাহলে বলতে হয়, হয়েছে আমাদের আহাম্মকীর সাজা।

তাতেও না বুঝলে, আর একটু ব্যাখ্যা করে হিতোপদেশের গল্প বলতে হয়।

সেই যে, কে যেন, কোথায়, কাকে যেন কখন, কিভাবে কেমন করে...

যাক্ গে। সে গল্প ত সকলেই জানে। সুতরাং দুবার করে বলার মানে হয় না।

আমাদের দুঃখের কথাই বলি।

সাত নম্বর সীট ভর্তি হওয়া থেকেই আমাদের দুঃসময় শুরুর। কি কুক্ষণে যে ওই সীটে নতুন বোর্ডার নেবার কুমতি হয়েছিল!

সাত নম্বর সীট ছিল সেই বিখ্যাত বাপী দত্তের; আমাদের মাস কয়েক যে বিস্‌ড়ি হাঁসে অরুচি ধরিয়ে শেষে নিজেই বিগড়ে জন্মের মত মেস ছেড়ে গেছে। বাপী দত্ত আমাদের বাংলা ভাষায় অনেকগুলো নতুন নতুন গালমন্দ শাপমন্যির শব্দ শিখিয়ে চলে যাবার পর ও সীটটা খালিই পড়ে ছিল অনেকদিন। ভেবেছিলাম যেমন আছে থাক। বাইরের কাউকে আর আমাদের মধ্যে ঢোকাবো না।

কিন্তু নিজেদের কপাল দোষে হঠাৎ সেই আহাম্মকীই করে ফেললাম।

যাকে-তাকে হট্ করে ঢুকতে দিইনি। বলতে গেলে বেশ দেখেশুনে বাজিয়েই বোর্ডার নিয়েছিলাম। বাপী দত্তের মত গোঁয়ার-গোবিন্দ নয়। চেহারায় কথাবার্তায় বেশ নিরীহ ভালোমানুষই মনে হয়েছিল। নামেও যেমন ব্যবহারেও তেমনি সুশীল ভেবেছিলাম।

কিন্তু সেই কোঁচোই যে কেউটে হয়ে দাঁড়াবে কে জানত।

প্রথম কয়েকটা দিন সুশীলের স্বরূপ বুঝতেই পারিনি। রোগাপটকা ছোট্টখাট্ট মানুষ, চোখে ঠুলির মত মোটা কালো ফ্রেমের চশমাটাই যা নজরে পড়ে। সারাক্ষণ মুখ বুজেই থাকে। বিশেষ কারুর সঙ্গে আলাপ-টালাপের চেষ্টা করে না। আমরা সুশীল চাকীকে গ্রাহ্যের মধ্যেই ধরিনি তাই।

ক'দিন বাদে প্রথম কুটুস্-কামড়টিতেই তাই হকচকিয়ে গেলাম।

সেদিনও শনিবারের সকাল। ঘনাদা আমাদের সঙ্গেই কৃপা করে খাবারঘরে খেতে বসেছেন। আমাদের ঠাকুর রামভুজ যথারীতি রুই মাছের কালিয়ার জামবাটিটা তাঁর পাতের কাছেই নামিয়ে দিচ্ছে এমন সময় খুক খুক হাসির শব্দে চমকে উঠলাম।

হাসে কে?

হপ্তার আর পাঁচদিন যাই করি শনি-রবিবারে ঘনাদার কোন ব্যাপারে হাসা ত কুণ্ঠিতে লেখেনি। হাসির বদলে নেহাত নিরুপায় হলে কাশি একটু-আধটু শোনা যায় বটে।

সন্ত্রস্ত হয়ে এ ওর মুখের দিকে তাকালাম। এমন বেয়াক্কিলে বেয়াদবী কার পক্ষে করা সম্ভব?

ঘনাদার কালিয়ার বাটিও তখন একটুখানি কাৎ হয়ে থমকে গিয়েছে। আমাদের মুখগুলোর ওপর তাঁর চোখের দৃষ্টি যেন সার্চলাইট বুলিয়ে গেল।

সে সার্চলাইট যেখানে গিয়ে থামলো আমাদের সকলের চোখ সেখানে পৌঁছে একসঙ্গে ছানাবড়া। শ্রীমান সুশীল থালার উপর মাথা নীচু করে নিবিষ্ট মনে খেয়ে যাচ্ছে, কিন্তু তার এঁটো ঠোঁটের কোণে একটুখানি হাসির ঝিলিক তখনও মেলায়নি।

যাকে বলা যায় সংকটজনক মুহূর্ত। আমরা সবাই রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছি কি হয় কি হয় ভেবে।

ফাঁড়াটা সে যাত্রা অবশ্য কেটে গেল। ঘনাদা একটা নাসিকাধ্বনি করে তাঁর জামবাটিতে মনোযোগ দিলেন। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

ব্যাপারটা ওইখানেই চুকে গেলে ভাবনার কিছু ছিল না কিন্তু সুশীল চাকীকে তখনও আমাদের চিনতে বাকি।

খাওয়া-দাওয়া শেষ করে সবাই উঠতে যাচ্ছি এমন সময় ছাদের কড়িকাঠগুলোকেই যেন উদ্দেশ করে সে বলে,—আমার কাছে ভালো চুরণ আছে। একেবারে লকড়ি হজম পত্থর হজম। কারুর দরকার হলে দিতে পারি।

দরকার কারুর অবশ্য হল না, কিন্তু তাঁর তেতালাব ঘরে উঠবার সিঁড়িতে ঘনাদার বিদ্যাসাগরী চটির যেরকম আওয়াজ শুনলাম, তাতেই বোঝা গেল আমাদের শনি-রবির আসরের দফা রফা।

শুধু সেই শনি-রবিই নয়, সেই থেকে সব কটা ছুটির দিনই আমাদের মাঠে মারা যাচ্ছে।

তোড়জোড় করে ঘনাদাকে তাঁর মৌরসী আরাম-কেদারায় যদি বা কোন দিন এনে বসাই, শিশিরের সাগ্রহে ধরিয়ে দেওয়া সিগারেটে দুটো টান দিয়েই তিনি উঠে পড়েন।

কারণটা পিছন ফিরেই দেখতে পাই। শ্রীমান সুশীল চাকী ঠোঁটের সেই বাঁকা হাসিটি নিয়ে আমাদের আড্ডা-ঘরে ঢুকছে।

উঠছেন কেন ঘনাদা?—আমাদের কারুর না কারুর গলা থেকে আর্তনাদ বেরোয়।

ঘনাদার হয়ে সুশীল চাকীই মিছরির ছুরির মত গলায় জবাব দেয়,—আলজিরিয়া কি আইসল্যাণ্ড যেতে হবে বোধ হয়।

আমরা বোবা হয়ে যাই রাগে দুঃখে মনের জ্বালায়।

ঘনাদা সুশীলের দিকে একবার অগ্নিদৃষ্টি হেনে সোজা তাঁর তেতালার ঘরে গিয়ে ওঠেন।

এরপর তাঁর ধারে কাছে ঘেঁসে কার এত বড় বুকের পাটা।

এমনি করেই দিন যাচ্ছে। সুশীল চাকী যেন সত্যিকার শনি হয়েই বাহাত্তর নম্বরে ঢুকেছে। সে এ মেসে থাকতে ঘনাদাকে নিয়ে জমিয়ে বসবার আর কোন আশা নেই।

শনিই হোক আর যাই হোক নিজে থেকে মেস না ছাড়লে মেরে ধরে' ত আর তাড়ানো যায় না। আমরা তাই হাল ছেড়ে দিয়ে মেস তুলে দেব কিনা তাই ভাবতে শুরু করেছি।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা এই রকম মনমরা হয়েই আড্ডা-ঘরে নেহাত আর কিছু করবার নেই বলে লুডো খেলতে বসেছিলাম। লুডো অবশ্য নামে। কার পাকা ঘুঁটি কে কেটে দিল তাতে ভ্রূক্ষেপও নেই।

আসলে আমাদের মন পড়ে আছে তেতালার সিঁড়িতে। হতভাগা সুশীল চাকী এখনো মূর্তিমান অভিশাপের মত দেখা দেয় নি। ঘনাদাও নামেন নি তাঁর তেতালার টঙ থেকে।

সারাদিন কখনো ঝিরঝির কখনো মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। এমন একটা অপরূপ বাদলার সন্ধ্যায় সুশীল চাকী যদি বাইরে কোথাও ট্রাম-বাস বন্ধ হয়ে আটকে পড়ে আর ঘনাদা যদি দৈবাৎ নেমে আসেন এই ক্ষীণ দুরাশায় এক ধামা মশলা-মুড়ি টেবিলের ওপর ধরে রেখেও আমরা লোভ সামলে আছি।

মনে মনে সবারই এক চিন্তা।

গৌরই মুখ ফুটে সেটা প্রকাশ করে ফেললে,—বৃষ্টিটা খুব জোরে পড়ছে কি বলিস? নির্ঘাৎ রাস্তাঘাটে জল দাঁড়িয়েছে!

হ্যাঁ, ট্রাম-বাস কিছুই চলছে না।—শিশির দু ছক্কা পঞ্জা ফেলেও আমার দু-দুটো কাটবার ঘুঁটিকে অকাতরে রেহাই দিয়ে বললে,—একবার বাইরে বেরুলে এখন আর ফেরা অসম্ভব।

শিব নিজের দান ফেলে গৌরেরই একটা ঘুঁটি চেলে দিয়ে বললে,—সুশীল চাকী তখন বেরিয়ে গেল না ছাতা নিয়ে?

এ-কথার উত্তর না দিয়ে সবাই তখন আমরা কান খাড়া করে ফেলেছি। ঘনাদার চটির আওয়াজই পাওয়া যাচ্ছে না সিঁড়িতে?

হ্যাঁ, ঘনাদাই ত নামছেন!

চট্ করে মশলা-মুড়ি এক এক মুঠো মুখে দিয়ে আমরা লুডোয় যেন তন্ময় হয়ে গেলাম। গেলাম।

কিন্তু ঘনাদার পায়ের আওয়াজ নিচে পর্যন্ত নামবার আগেই মশলা-মুড়ির গ্রাস আমাদের গলায় যেন আটকে গেল। ঘনাদার আগেই ভিজে ছাতাটা বারান্দায় শুকোতে দিয়ে ঘরে ঢুকল স্বয়ং সুশীল চাকী।

সেই বাঁকা হাসি নিয়ে টেবিলের কাছে এসে দাঁড়িয়ে পরমানন্দে মুড়ির ধামায় হাত ডুবিয়ে বললে,—আরে ছোঃ! লুডো খেলছেন আপনারা! এ ত নাবালকের খেলা! গোঁফ কামাবার পর কেউ এ খেলা খেলে!

ভিজে বেড়ালের মত যে এ মেসে ঢুকেছিল সেই মুখচোরা সুশীল চাকী যে এক মাসেই মুখফোড় মাতব্বর হয়ে উঠেছে তা বোধ হয় আর বলে বোঝাতে হবে না।

খেলায় যেন তন্ময় হয়ে আমরা তার কথাটা গায়েই মাখলাম না। লুডোর ছকের ওপর ঝুঁকে পড়েও আমরা তখন কান রেখেছি সেই বাইরে। ঘনাদা নামতে নামতে থামলেন টের পেলাম। তারপর আমাদের সব আশা চুরমার করে তাঁর পায়ের শব্দ নিচে নেমে মিলিয়ে গেল।

সুশীল চাকীকে এরপর যদি আমরা চাঁদা করে চাঁটি লাগাতাম খুব অন্যায় হত কি?

কিন্তু তা আর পারলাম কই? তার বদলে মুড়ির ধামাতেই হাত লাগাতে হল। সুশীল যে রেটে হাত আর মুখ চালাচ্ছে তাতে আমাদের সাহায্য ছাড়াই ধামা খালি হয়ে এল বলে।

তুচ্ছ মুড়ি-মশলার প্রতি আমাদের হঠাৎ এই উৎসাহে সুশীল কিন্তু বেশ একটু ক্ষুণ্ন। বললে,—খেলা ছেড়ে দিলেন যে!

আপনি বসে থাকবেন আর আমরা খেলতে পারি!—হাতে এক মগ্‌ঠো আর গালে এক গ্রাস নিয়ে কোনরকমে জানালাম।

শূন্যপ্রায় ধামাটা আমাদের চারজনের হাতের নাগাল থেকে চট্‌ করে সরিয়ে নিয়ে সুশীল বললে,—কেন পারেন না! আমি ত খেলি না। শুধু দেখি!

ওঃ, দেখেন! খেলা শুধু দেখেন আর মশলা-মুড়ি সামনে থাকলে খান!—শিশিরের কথা-গুলো দাঁতে দাঁতে চিপ্‌সটে যেন চাবুক হয়ে বেরুল।

সুশীল চাকীর তাতে ভ্রূক্ষেপ নেই।

খাওয়া আর হল কই! ধামাটা উবুড় করে তবু অম্লানবদনে বললে,—দাঁতে একটু সুড়-সুড়ি না লাগাতেই ত ফুরিয়ে গেল! আর এক ধামা আনান!

আনাচ্ছি!—শিবু হাত বাড়িয়ে দিলে,—একটা আধুলি ছাড়ুন দেখি?

আধুলি!—সুশীল চাকী প্রথমে হেসেই খুন। তারপর বললে,—আমার মস্তর কি জানেন? আজ ধার কাল নগদ। ট্রাম-ভাড়ার বেশী একটি ফুটো পয়সা নিয়ে কখনো বেরোই না। আর আমি বার করব আধুলি আপনাদের ভূত ভোজন করাবার জন্যে! আপনাদের ওই ঘনাদা যাতে এসে ভাগ বসাতে পারেন!

চাপা রাগে তোতলা হয়ে যাবার ভয়ে যখন এ-কথার জবাব দিতে দ্বিধা করছি ঠিক সেই মুহূর্তে নিচের সিঁড়িতে ওস্কার পায়ের আওয়াজ? ...নে না,

হ্যাঁ ঘনাদারই! ঘনাদার পায়ের আওয়াজ নিচে থেকে বারান্দায় এসে থামল। বশ একটু

তারপর? সে আওয়াজ কি আবার তেতালার দিকেই উঠবে? ছুনে ওরাং

না, ঘনাদা সশরীরে ঘরের ভেতরেই ঢুকলেন! কিন্তু এবার? শ্রীমান সুশীল চ অভিমানে

মস্তব পড়ে যদি অদৃশ্য করে দিতে পারতাম! ঁঠি লিখে-

কিন্তু তার দরকার হল না। এ আরেক ঘনাদা যেন! সুশীল চাকীর মত তুচ্ছ এ

কি নাহি যাঁর নজরেই পড়ে না। ...ড়ী

ঘরে ঢুকে তাঁর আরাম-কেদারাটিতে নিজে থেকে বিনা অনুরোধে গা এলিয়ে দিয়ে বললেন,—একটু ভিজে গেলাম হে!

ঘনাদার জামাকাপড়ে জলের ছিটেফোঁটা থাক বা না-থাক, আমরা শশব্যস্ত হয়ে উঠলাম।

অ্যাঁ! ভিজে গেলেন!

ঠাকুর, শীগ্‌গির গরম গরম চা এক কেটলী।

একটা অ্যাসপিরিন খেয়ে নেবেন?

শিশিরের বাড়িয়ে-ধরা টিন থেকে সিগারেট তুলে নিতে নিতে ঘনাদা আমাদের আপ্যায়নে খুশি হয়ে কী বলতে যাচ্ছেন এমন সময়ে আবার সুশীলের সেই ভিমরুলের হুল!

একটা অ্যাম্বুলেন্স ডাকালে হত না?

আপনার জন্যেই ডাকাতে বোধ হয় হবে!—বলতে পারলে খুশি হতাম। তার বদলে অতি-কষ্টে নিজেকে সামলে বললাম,—অ্যাম্বুলেন্স? কেন?

বাঃ, বৃষ্টিতে এরকম ভিজলে হাসপাতাল ছাড়া গতি আছে!—হাড়-জ্বালানো সেই বাঁকা হাসির সঙ্গে সুশীল চাকী সহানুভূতি জানালে,—কি গেরো এখন দেখুন ত! শুধু একটা ছাতা যদি নিতেন!

নিয়েছিলাম। একজনকে দান করতে হল।

আমরা সবিস্ময়ে ঘনাদার দিকে তাকালাম। না, স্বপ্ন নয় সত্যি! ঘনাদা ক্ষেপে উঠে তেতালায় রওনা হন নি। নির্বিকার ভাবে সুশীল চাকীর কথার জবাব দিয়ে ধোঁয়ার কুণ্ডলী ছাড়ছেন।

ছাতা আপনি দান করে এলেন!—সুশীলের দাঁতে তখনও বিষ—আহা কি দয়ার শরীর! নিজের ছাতা পরকে দিয়ে ভিজে আসা...

নিজের ছাতা নয়।—ঘনাদার সংক্ষিপ্ত প্রতিবাদে সুশীলের সঙ্গে আমরাও হতভম্ব!

নিজের ছাতা নয়, মানে?—এবার সুশীলের গলায় বিষের চেয়ে বিস্ময়ই বেশী, সেই সঙ্গে কেমন একটু সন্দিগ্ধ ভাব।

মানে নিজের ছাতা আমার নেই। বুকিত বরিসানের সিংগালান টাণ্ডিকাট থেকে বিশ বছর আগে একটা লিম্যাক্স ফ্ল্যাভাস বেঁধে ফেলে দেবার পর আর ছাতা কিনি নি।

সুশীল ভ্যাবাচাকা খেয়ে যতক্ষণে মুখের হাঁ বন্ধ করেছে তার আগেই আমরা ঘনাদাকে ঘিরে বসে গেছি।

ছাতাটা তাহলে ফেলে দিতেই হল?—গৌর উস্কে দেবার ত্রুটি করলে না।

সিগ্‌ন্যাল ডাউন না কি বললেন!—শিশির বোকা সাজল ঘনাদার উৎসাহ বাড়াতে,—তাই রেলের লাইনেই ফেলতে হল বুঝি ছাতাটা?

রেলের লাইন নয়, সিংগালান টাণ্ডিকাট।—ঘনাদা করুণাভরে সকলের দিকে চেয়ে বললেন,—সুমাত্রার একপেশে শিরদাঁড়ার মত যে পর্বতমালার নাম বুকিত বরিসান তারই এক বিশাল আগ্নেয়গিরির চুড়ো।

ওঃ, আগ্নেয়গিরি!—শিবু এতক্ষণে বুঝদারের ভঙ্গিতে বললে,—ওই ছাতা ফেলেই আগ্নেয়গিরির আগুন নিভিয়ে ফেললেন বুঝি?

অন্য দিন হলে এরকম বেয়াদবীতে সব ভেস্তে যেত। কিন্তু ঘনাদা তখন একেবারে মাটির

গৌরহ হাসি হেসে বললেন,—না, আগুন নেভাবার দরকার ছিল না। সেটা মরা
নির্ঘাৎ রাস্ত। ছাতা ফেলেছিলাম...

হ্যাঁ, ট্রা জিভের সাড় ফিরে পেয়ে শ্রীমান চাকী কড়া গলায় জানতে চাইলে,—তার আগে
ঘুঁটিকে অকা বলুন দিকি...

শিবু ন কি যেন একটা বেঁধেছিলেন বললেন?—সুশীল চাকীর কথাটাকে তাড়াতাড়ি চাপা
বেরিয়ে

লিম্যাক্স ফ্ল্যাভাস!—ঘনাদা যেন চাকীকেই উদ্দেশ করে ওই বিদঘুটে শব্দের পট্‌কাটি ছাড়লেন।

প্রথমে চমকে উঠে চাকী তারপর মুখ চোখ লাল করে বললে,—আমায় যদি কিছু বলবার থাকে ত বাংলায় বলবেন।

ওর বাংলা হয় না। ঘনাদার নির্বিকার জবাব,—খোলসহীন এক জাতের শামুক দেখেছো কখনো? ভিজে স্যাঁতসেঁতে জায়গায় বড় পাথর কি কাটা গাছের গুঁড়ির তলায় থাকে? ও হল সেই বস্তু।

যে বস্তুই হোক ওসব প্রাণিতত্ত্বের বিদ্যে আপনার কাছে শিখতে আসি নি। আমি জানতে চাই...

চাকীর কথাটাকে আবার চট্‌পট্‌ সাইড লাইনে শানটিং করে দিতে হল। ব্যস্ত হয়ে উজবুকের মত জিজ্ঞাসা করলাম,—ওখানে ওইরকম ছাতায় শামুক বেঁধে ফেলতেই বুঝি গেছলেন?

না, গেছলাম ওরাং পেণ্ডেক খুঁজতে।

চাকী কি বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু ঘনাদা তাকে আর সে সুযোগ দিলেন না। আমাদের প্রশ্নটা নিজেই অনুমান করে নিয়ে বলে চললেন,—ওরাং-ওটাং-এর নাম শুনেছ, চিড়িয়াখানাতে দেখেও থাকবে। ওরাং-ওটাং ওই সুমাত্রা আর বোর্নিও ছাড়া কোথাও পাওয়া যায় না। পৃথিবীতে এখনো যে চার জাতের এপ্‌ বা নরবানর আছে, তার দুটির বাস আফ্রিকায় আর দুটির যাকে ইন্দোনেসিয়া বলে সেই সুদূর দক্ষিণ-পূর্ব প্রাচ্যে। আফ্রিকায় পাওয়া যায় সিম্পাঞ্জি আর গরিলা, আর এই ইন্দোনেসিয়ায় ওরাং-ওটাং আর গীবন বা উকু। এ চারটি ছাড়া আর কোন জীবন্ত 'এপ্‌' পৃথিবীতে এখনো পাওয়া যায় নি। কিন্তু অনেক বৈজ্ঞানিকের

ধারণা মানুষের 'এপ্'-জাতীয় অন্য সুদূর জ্ঞাতি এখনো পৃথিবীর কোথাও না কোথাও লুকিয়ে আছে। যেমন,—আমাদের হিমালয়ের দুর্গম তুষার রাজ্যে ইয়েতি আর সুমাত্রার গহন পাহাড়ী জংগলে ওরাং*পেণ্ডেক।

ইয়েতির মত ওরাং পেণ্ডেকও প্রাণী হিসেবে প্রায় লুপ্ত হয়ে এসেছে। জ্যান্ত বা মরা একটা নমুনা কেউ এখনো পায় নি, কিন্তু তারা যে এখনও আছে তার প্রমাণ অজস্র। সুমাত্রার গায়ো লামুপঙ্ জাম্বী প্রভৃতি জংলী জাতিদের কাছে ওরাং পেণ্ডেকের বর্ণনা এখনো শোনা যায়। একশ বছর আগেও সুমাত্রার তখনকার প্রভু ওলন্দাজেরা অনেকে এ প্রাণী চাক্ষুষ দেখেছেন বলেছেন।

ওরাং পেণ্ডেক জীবিত কি মৃত একটা পেলে বিজ্ঞানের জগতে হুলুস্থুল পড়ে যাবে বটে, কিন্তু যে অঞ্চলে ও প্রাণীটিকে পাওয়া সম্ভব সেখানে প্রাণ হাতে নিয়ে ছাড়া তখন যাওয়া যেত না। বিশ-বাইশ বছর আগের কথা। ওলন্দাজেরা তখনো সুমাত্রার রাজা। বন্দুকিত বরিসান, অর্থাৎ সুমাত্রার পর্বতমালার কাছাকাছি অধিকাংশ জায়গাই তখন দুর্গম বিপদসংকুল। বাঘ হাতি গণ্ডার সাপ ত আছেই। তারপর দুর্দান্ত সব জংলী জাত, যাদের হাতে বিদেশী কারুর নিস্তার নেই।

আমার ও অঞ্চলে যাবার বছরখানেক আগেই বিখ্যাত নৃতাত্ত্বিক ডাঃ সাপিরো ওই অঞ্চলেই নিরুদ্দেশ হয়ে যান। তিনি ওরাং পেণ্ডেক খুঁজতে ওখানে গেছলেন কিনা কেউ জানে না, তবে সেই মহাযুদ্ধের সময়েও ইওরোপের বৈজ্ঞানিক মহলে তাঁর এই অন্তর্ধান নিয়ে বেশ একটু সাড়া পড়েছিল। রথ দেখার সংগে কলা বেচার মত আমার সুমাত্রায় যাওয়ার পেছনে ওরাং পেণ্ডেক খোঁজার সংগে ডাঃ সাপিরোর সন্ধান করার তাগিদও ছিল। তার কারণ এই অভিযানে যাবার আগে ডাঃ সাপিরো আমায় গোপনে একটি পার্শেল পাঠিয়ে এমন একটি চিঠি লিখে-ছিলেন যা অগ্রাহ্য করা আমার পক্ষে অসম্ভব।

নানা জায়গায় খোঁজ করতে করতে তখন রাকান নদী যেখান থেকে বেরিয়েছে সেই পাহাড়ী জংগলে কদিনের জন্যে ডেরা বেঁধে আছি। সংগে শুধু তাঁবু বইবার দুজন গায়ো অনুচর। শ্রাবণ মাসের প্রায় মাঝামাঝি। সুমাত্রায় সর্বত্রই সারা বছর যেমন বৃষ্টি আর তেমনি গরম। এই অঞ্চলে শুধু এই সময় মাস দুয়েক গরম থাকলেও বৃষ্টি থাকে না।

রাত তখন বেশী নয়। আলো নিভিয়ে তাঁবুর বাইরে বসে জোনাকীর বাহার দেখছি। সুমাত্রার এই জোনাকীর তুলনা নেই। রাত্রের আকাশে ঝাঁক বেঁধে তারা যেন রাশি রাশি উড়ন্ত ফুলঝুরি ছড়িয়ে ছড়িয়ে যায়।

হঠাৎ পেছনে দড়ি-দড়া ছিঁড়ে তাঁবুর ওপর কি একটা পড়ে যাবার শব্দ পেলাম।

চমকে উঠে দাঁড়ালাম। সুমাত্রার দু-শিঙওয়ালা গণ্ডারই তাঁবুর ওপর পড়ল নাকি!

টর্চটা জেলে দেখলাম, গণ্ডার নয়, তবে প্রায় সেইরকমই বিশাল ষণ্ডা চেহারার একটি মানুষ! এদেশী কেউ নয়। সাদা চামড়ার সাহেব।

আমার টর্চের আলোয় অত্যন্ত অপরাধীর মত কুণ্ঠিতভাবে ছেঁড়া তাঁবুর ওপর থেকে দাঁড়িয়ে উঠে তিনি বললেন,—মাপ করবেন। আপনার তাঁবুটা বোধহয় ছিঁড়ে ফেলেছি।

তা বেশ করেছেন! কিন্তু আপনি কে, আর এখানে আমার তাঁবুর ওপর কি করে ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন জানতে পারি?

আমার নাম বোথা—ভদ্রলোক আমতা-আমতা করে জানালেন,—আমি ডাঃ সাপিরোর খোঁজে...

ডাঃ সাপিরোর খোঁজে! দাঁড়ান! দাঁড়ান!—বলে তাঁকে থামিয়ে আমি অনুচরদের ডেকে তাঁবুটা আবার খাটিয়ে আলো জ্বালার হুকুম দিলাম।

তাঁবু আবার খাড়া করে আলো জেলে বোথার সমস্ত বিবরণই তারপর শুনলাম। বোথা আমার মতই ডাঃ সাপিরোর খোঁজ করতে এই অঞ্চলের বনে জংগলে ঘুরে বেড়াচ্ছেন বললেন।

মজার কথা এই যে, ডাঃ সাপিরোর সঙ্গে তাঁর সহকারী হিসেবেই এ অঞ্চলে তিনি এসেছিলেন। তারপর এক জায়গা থেকে চলে আসবার সময় দুজনের ছাড়াছাড়ি হয়। সেই থেকে ডাঃ সাপিরোকে বোথা আর দেখেন নি। ডাঃ সাপিরোও হয়ত বোথাকে খুঁজে না পেয়ে একাএকাই ইওরোপে ফিরে গেছেন মনে করে বোথা তাঁর দেশে ফিরে যান। কিন্তু সেখানে অনেকদিন অপেক্ষা করেও ডাঃ সাপিরোকে ফিরতে না দেখে আবার সুমাত্রায় এসেছেন খোঁজ করতে।

কিন্তু ডাঃ সাপিরোর সঙ্গে যেখানে আপনার ছাড়াছাড়ি হয় সে জায়গা খুঁজে দেখেছেন ত?—আমি একটু অধৈর্যের সঙ্গেই জিজ্ঞাসা করলাম।

সে জায়গাটা পেলে তো খুঁজে দেখব?—বোথা অসহায় ভাবে জানালেন।

তার মানে?

তার মানে সেটা সাধারণ কোন জায়গা নয়, একটা মরা আগ্নেয়গিরির এমন একটা বিরাট গভীর গহ্বর ভেতর থেকে যার চারদিকের খাড়া পাহাড়ে ওঠা মানুষের অসাধ্য। বাইরে থেকে মাথা পর্যন্ত ওঠ গেলেও সেখান থেকে খাড়া ন' হাজার ফুট নামা অসম্ভব। বছরের মাত্র কটি দিন একটা সঙ্কীর্ণ আঁকাবাঁকা সুড়ঙ্গপথে সেখানে যাওয়া-আসা যায়।

বছরের মাত্র কটা দিন কেন?

কারণ সেটা একটা পাহাড়ী ঝরনার উৎসমুখ। সারা বছর সেখান দিয়ে প্রচণ্ড বেগে জলের ধারা বেরিয়ে আসে। আগস্ট মাসের প্রথম কটি দিন মাত্র সে সুড়ঙ্গপথ শুকনো থাকে।

আগস্টের ত অনেক দেরি নেই। এখনো সে সুড়ঙ্গপথ আপনি খুঁজে পান নি?

সে পাহাড়টা না পেলে সুড়ঙ্গপথ খুঁজব কি করে! বোথা হতাশ ভাবে বললেন,—এখানে সমস্ত 'বর্ণিত বিবরণ'-এই ওরকম বহু মরা আগ্নেয়গিরি আছে বাইরে থেকে যা দেখতে একরকম। কোথায় কোন্‌টা দিয়ে বেরিয়েছি তখন তাড়াহুড়োতে কি অত খেয়াল করেছি! ডাঃ সাপিরো যে তার ভেতর আটকে থাকতে পারেন তাও ভাবি নি। অবশ্য ডাঃ সাপিরো সেখানেই আছেন কিনা এখনো জানি না।

একটু হেসে বললাম,—আপনার ভাবনা নেই। তিনি সেখানেই আটকে আছেন। আজই খবর পেয়েছি।

খবর পেয়েছেন!—বোথা হতভম্ব হয়ে বললেন,—কিন্তু তাঁর সঙ্গে রেডিও-টেডিও কিছু ত নেই!

রেডিওর চেয়ে নিশ্চিত খবরই তিনি পাঠিয়েছেন। ওই তাঁর খবর এল আবার।

বাতিটার কাছেই রাখা একটা ছোট কাঁচের বাটির ওপরে দুটো 'মথ' পোকা ঘুর ঘুর করে পাখা নাড়ছিল। তারই একটা ধরে বোথাকে দেখালাম।

একবার 'মথ'-টার আর একবার আমার মুখের দিকে যেভাবে বোথা তাকালেন, তাতে বুঝলাম আমার মাথা কতখানি খারাপ তিনি আন্দাজ করবার চেষ্টা করছেন।

হেসে তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বললাম,—এটা কি 'মথ' জানেন? রেশম যারা তৈরী করে সেই 'বম্বিক্স মোরি'-র চীনে শাখা। সুমাত্রার এই জঙ্গলে ও 'মথ' কোথাও নেই। সুতরাং নিশ্চিন্ত থাকুন। ডাঃ সাপিরো যেখানে বন্দী সে পাহাড় কাছেই আছে নিশ্চয়। কালই তা খুঁজে বার করব।

কিন্তু চাকীরে মুখিয়ে থাকতে দেখেও গৌর আমাদের সকলের হয়ে প্রশ্নটা করেই ফেলল,—ওই বোম্বে মেরী না কি বললেন ওই মথ ডাঃ সাপিরোর পোষা বুঝি?

বোম্বে মেরী নয় বম্বিক্স মোরি। আর পোষা-টোষা কেন হবে! ঘনাদা ধৈর্য ধরেই বোঝালেন,—মেয়ে-মথের-গায়ে এমন একটা গন্ধ থাকে পুরুষ-মথ সাত মাইল দূর থেকেও যা পেয়ে ছুটে আসে। ওই কাঁচের বাটিতে মেয়ে-মথের সেই গন্ধ জমানো ছিল। ও গন্ধ এমন যে তার একটি অণু-ই ঠিক বিশেষ জাতের পুরুষ-মথকে টেনে আনবে। ডাঃ সাপিরো আমায় তাঁর শেষ পার্শেলে এই রেশমী মথের গন্ধ-জমানো আঁটা শিশি পাঠিয়ে চিঠিতে তার ব্যবহার লিখে

জানিয়েছিলেন। সন্মাত্রায় জংলীদের হাতে কোথাও বন্দী হবার ভয়ই তাঁর ছিল। তাই কোথায় আছেন জানাবার এমন ফন্দি তিনি করেছিলেন যা জংলীরা ধরতে পারবে না। বছরখানেক তাঁর খবর না পেলে ওই গন্ধসার নিয়ে সন্মাত্রায় তিনি আমায় খুঁজে দেখতে অনুরোধ করে-

ছিলেন। তাঁর নিজের সঙ্গে সেই জন্যে শুধু রেশমী পোকার গদটি নিয়েছিলেন বেশী করে, যা কেটে ওই 'বাস্বিত্র মোরি' বার হবে।

বোম্বাই বাহাদুরী ত খুব শুনলাম, এখন আমার—ঘনাদা একটু থামতেই চোখ মুখ পাকিয়ে চাকী তাঁকে চেপে ধরবার চেষ্টা করলে।

কিন্তু তার কথা আর শেষ করতে হল না।

তারপর সেই পাহাড়ও পেলাম সেই সুড়ঙ্গপথও—ঘনাদা গলার জোরেই চাকীকে চেপে দিয়ে শুরু করলেন—জলের শুধু একটু ঝিরঝিরে ধারা তলায় থাকলেও সে আঁকাবাঁকা সুড়ঙ্গপথ যেমন অন্ধকার তেমনি পেছল। কোন রকমে পা টিপে টিপে দেওয়াল হাতড়াতে হাতড়াতে সে সুড়ঙ্গ পার হতেই এক দিন এক রাত লেগে গেল। অন্ধকারে ওইরকম সুড়ঙ্গে বেশীক্ষণ থাকলে মানুষের মেজাজ বোধ হয় বিগড়ে যাওয়া স্বাভাবিক। বোথার সঙ্গে অন্ধকারে একবার ঠোকাঠুকি হওয়ার পর তিনি ত খিঁচিয়েই উঠলেন,—একটা টর্চ সঙ্গে নিতে পারলেন না! তাঁর বদলে কি সব ছাতা পুঁটলি আজে-বাজে জিনিস নিয়ে চলেছেন।

টর্চ ত আপনিও নিতে পারতেন।—অন্ধকারে অদৃশ্য বোথার উদ্দেশেই ঝাঁঝিয়ে বললাম,—পথ হারিয়ে ত সেদিন আমার তাঁবুতে হুমড়ি খেয়ে পড়েছিলেন। বলেছিলেন, সঙ্গের মাল-পত্র সব খোয়া গেছে। কিন্তু ওই কি সব সস্‌প্যান ঝাঁঝরি হাতা গোছের সরঞ্জাম ত ঠিক সঙ্গে আছে দেখছি। ওখানে যজ্ঞির রান্না রাঁধবেন নাকি!

সুড়ঙ্গপথে বোথার একটু মেজাজই শুধু দেখেছিলাম। সেখান থেকে ভেতরে গিয়ে পৌঁছোবার পর তার একেবারে মারমূর্তি।

অপরাধের মধ্যে আমি শুধু বলেছিলাম,—আপনি ত এখন ডাঃ সাপিরোর খোঁজেই ঘুরবেন, আমি তাহলে সোনাদানা যা পাই ততদিনে বাগিয়ে ফেলি।

সোনাদানা!—বোথা প্রথম চমকে উঠে কেমন হতভম্ব হয়ে গেলেন।

বললাম,—হ্যাঁ, কুবেরের গুপ্ত ভাঁড়ারের মত এখানে যে সোনার ছড়াছড়ি মনে হচ্ছে। বালি কাঁকর চালাচালি করে যা বার করবার জন্যে ওই সব প্যানট্যান অত কষ্ট করে বয়ে এনেছেন। ওগুলো আমাকেই দিয়ে যান।

তোকে দিয়ে যাব!—মরা আগ্নেয়গিরি যেন বোথার ভেতর দিয়েই জ্বলে উঠল,—কালা গুবরে পোকা! তোকে দেবার জন্যেই এগুলো বয়ে এনেছি!

বাঃ, আমায় দেবেন না!—আমি যেন কাঁদো-কাঁদো,—আমি তাহলে কি করতে এখানে এলাম?

শোন তাহলে আরশোলা, তোকে সঙ্গে এনেছি অন্তত বছরভোর এখানে কয়েদ রাখতে। কালই এখান থেকে পালাবার শেষ দিন। আজই না পারি সোনা যোগাড় করে কাল আমি তোকে ফেলে চলে যাবো। বছরভোর যদি টিকে থাকিস্ আর দিন গুনতে ভুল না করিস্ তাহলে আর-বছরে আবার এখান থেকে বেরুতে পারবি। ততদিনে এ জায়গায় সোনা তোলবার দখল আমি সম্রাজ্ঞীর সরকারের কাছে পাকা করে ফেলেছি। তোর জন্যেই এ পাহাড়টা চিনতে পেরেছি বলে তোকে এই প্রাণে বাঁচবার সুবিধেটুকু দিলাম নইলে তোর মত ছারপোকাকে এখানে টিপে মেরে যাওয়াই আমার উচিত ছিল।

খুব মন দিয়ে কথাগুলো শুনে কাতর ভাবে বললাম,—কিন্তু আমি যে আপনাকেই এখানে এক বছর বন্দী করে রাখবার ফন্দি এঁটে এলাম। তারিখ-দেওয়া আপনার ডায়েরীটা সরিয়ে ফেললাম যাতে দিনের হিসেব রাখতে আপনার অসুবিধে হয়...

তুই! তুই আমার ডায়েরী চুরি করেছিস্!—বোথার মুখ দিয়ে তখন ফেনা উঠছে।

নিজের ঝোলাটা পাগলের মত খুঁজতে খুঁজতে সে বললে,—ডায়েরী যদি না পাই তাহলে তোর হাত-পা আমি একটা একটা করে ছিঁড়ব, তোকে পা বেঁধে উপর থেকে ঝুলিয়ে আগুনে ঝলসাবো। কালা কেন্নো তোকে...

আহা সামলে সামলে!—বোথাকে ঠাণ্ডা করবার চেষ্টা করলাম,—এক বছর এখানে থেকে আরো সব ভালো ভালো শাস্তি কল্পনা করবার অঢেল সময় পাবেন, তারপর বেরিয়ে এসে

আমায় খবর দেবেন। তখন আপনার সঙ্গে না হয় আপনার দেশ দক্ষিণ আফ্রিকার কেপটাউন কি জোহানেসবার্গে যাবো, অন্য কোথাও কালা আদমীর ওপর এমন সুবিচার করবার সুবিধে ত আর পাবেন না। আপনি যে আসল ওলন্দাজ নন, দক্ষিণ আফ্রিকার—

বোথার ঝোলা ঝোঁজা তখন শেষ হয়েছে।

আমার ডায়েরী তুই—তুই—বলে রাগে তোললাতে তোতলাতে সে ক্ষ্যাপা হাতির মতই আমার দিকে তেড়ে এল।

আরে! আরে মারবেন নাকি!—বলে ছুটে খানিকটা নিচে নেমে গেলাম।

তারপর চলল শিকার আর শিকারীর খেলা। সে আমাকে ধরবার জন্যে তেড়ে আসে, আমি একটু ছুটে পালাই বা চট করে সরে গিয়ে তাকে পাশ কাটাই।

হাতের কাছে পেয়েও ধরতে না পেরে বোথা তখন রাগে উন্মাদ হয়ে গেছে। কিন্তু উন্মাদেরও দম আর কতক্ষণ থাকে! বিশাল শরীর নিয়ে আমার পেছনে ছুটে ছুটে ঘণ্টা-খানেক বাদে হাপরের মত হাঁফাতে হাঁফাতে সে ক্লান্তিতেই লুটিয়ে পড়ল।

কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে তার মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দিয়ে বললাম,—বড্ড পরিশ্রম হয়েছে না? একটু জিরিয়ে নিন্। কেন যে মিছিমিছি ছোটাছুটিটা করলেন?

বিরাট থাবার মত হাত দিয়ে খপ্ করে আমার হাতটা ধরে ফেলে প্রাণপণে টানবার চেষ্টা করে সে হিংস্র উল্লাসে এবার বলে উঠল,—এইবার—?

তার হাতটাই তার মাথার ওপর টেনে রেখে বললাম,—এবার মাথা ঠাণ্ডা করে যা বলছি শুনুন। কাল নয় আজই আমি চলে যাচ্ছি। কারণ সুড়ঙ্গপথ কাল আর খোলা থাকবে না। গত দু-বছর ধরে বছরে মাত্র দুটি দিন ও সুড়ঙ্গপথ শুকনো থাকে। এখুনি ঘণ্টাখানেকের মধ্যে রওনা হতে না পারলে ওই সুড়ঙ্গে জলের তোড়ে ডুবে মরতে হবে।

মিথ্যা কথা!—আমার হাতটা হয়রান হয়ে ছেড়ে দিয়ে বোথা গর্জে উঠলেন,—তুই! তুই এসবের কি জানিস্?

আমি কিছু জানি না। তবে ডাঃ সাপেরো দু'বছরে মা জেনেছেন তাই বলছি।

ডাঃ সাপিরো!—বোথার ফ্যাকাশে মুখ এবার দেখবার মত।

হ্যাঁ, যাঁর সহকারী হয়ে এসে এখানে সোনার সন্ধান পেয়ে লোভে একেবারে পিশাচ হয়ে উঠেছিলেন।

পকেট থেকে একটা দড়ি বার করে আচমকা বোথার হাত দুটো ধরে ফেলে পিছমোড়া করে বাঁধতে বাঁধতে তারপর বললাম,—যাকে এমনি করে পিছমোড়া করে বেঁধে রেখে সোনার নমুনা নিয়ে একা সুড়ঙ্গপথে পালিয়ে গেছলেন।

কে? কে এসব কথা বলেছে?—বোথার গলায় আর যেন তেজ নেই। হাতের বাঁধন খোলবার চেষ্টা করতেও তিনি ভুলে গেছেন।

কে আর বলতে পারে ডাঃ সাপিরো ছাড়া!—হেসে বললাম,—আপনার সঙ্গে দেখা হবার আগের দিনই ওই 'মথ'-এর খবর পেয়ে তাঁকে আমি এখান থেকে উদ্ধার করে নিয়ে গেছি। তারপর আপনার জন্যেই তাঁর পেতে অপেক্ষা করছিলাম।

আমার জন্যে?

হ্যাঁ, আপনি যে সোনার নমুনা নিয়ে দেশে গিয়েছিলেন যাচাই করাতে, তারপর এই কুবেরের ভাণ্ডার ঠিকমত চিনতে না পেরে এক বছর যে এই অঞ্চলে পাগলের মত ঘোরাঘুরি করছেন, সবই আমার জানা। আমার ওপর সন্দিগ্ধ নজর রেখে আমায় একবার বাজিয়ে নিতে আপনি আসবেনই আমি জানতাম। তাই অপেক্ষা করে ছিলাম ডাঃ সাপিরোকে যা করেছেন তার উপযুক্ত শাস্তি আপনাকে দেবার জন্যে। তবে শাস্তি আর এমন কি! যে সোনার জন্যে আপনি সব করতে পারেন, সেই সোনার রাজ্যেই আপনাকে রেখে গেলাম। আশ মিটিয়ে এখন বালি কাঁকর ছেঁকে সোনা বার করুন। পিছমোড়া করে যে বাঁধন দিয়েছি ওই ওখানকার

পাথরের ধারে ঘণ্টা দুয়েক ঘষলেই সেটা ছিঁড়ে যাবে। ততক্ষণে আমি অবশ্য সুড়ঙ্গপথে অনেক দূরে চলে গেছি। আপনার কিন্তু বেরুবার আর তখন সময় থাকবে না।

কথাগুলো বলে চলে যাবার জন্যে পা বাড়াতেই বোথা হাঁকুপাঁকু করে কোনরকমে উঠে দাঁড়িয়ে প্রায় ককিয়ে উঠলেন,—কিন্তু আমার ডায়েরী নেই। হিসেবে ভুল হলে এক বছর বাদে আমি বার হব কি করে?

বার হবেন না। আর এক বছর না হয় এইখানেই থাকবেন। ডাঃ সাপিরো দু'বছর এইখানে কাটিয়েছেন আপনারই শয়তানিতে।

না, না,—বোথা যেন ডুকরে উঠলেন,—আমি সোনা চাই না, কিছু চাই না, আমায় শুধু এখান থেকে বেরুতে দাও।

বেশ, বেরুতেই পারবেন।—আমি হেসে বললাম,—কিন্তু এক বছরের আগে তা হয় না। এ শাস্তি আপনার পাওনা। এক বছর বাদেই যাতে বার হতে পারেন তার ব্যবস্থা করছি।

কি ব্যবস্থা?—বোথা হতাশভাবে জিজ্ঞাসা করলেন।

এই ছাতাটা দেখছেন।—ছাতাটা খুলে ধরে বললাম,—আর ওই পাহাড়ের দেওয়ালের পুব দিকের মাথাটা দেখুন।

আমি যেন তাঁর সঙ্গে নির্মম পরিহাস করছি এইভাবে বোথা একবার ছাতাটা আর একবার পাহাড়ের মাথার দিকে চাইলেন।

হেসে আবার বললাম,—ভয় নেই আপনার সঙ্গে ঠাট্টা করছি না। এ পাহাড়ের ভেতর দিকটা এমন খাড়া যে ওঠা অসাধ্য, কিন্তু বাইরের দিকটা ঢালু। সেখান দিয়ে উঠে ওই পুব দিকের মাথা থেকে এই খোলা ছাতাটা নিচে ফেলব। সেই ছাতায় বাঁধা থাকবে বছর হিসেব করবার নির্ভুল জ্যান্ত ঘড়ি।

বছর হিসেব করবার জ্যান্ত ঘড়ি!—বোথা হতভম্ব।

হ্যাঁ, 'লিম্যাক্স ফ্ল্যাভাস্'—খোলসহীন এক জাতের শামুক। পৃথিবীতে প্রলয় হতে পারে তবু ওই প্রাণীটি বছরে একবার ঠিক পয়লা কি দোসরা আগস্ট ডিম পাড়বেই। ছাতা থেকে খুলে নিয়ে ওই শামুকের ওপর নজর রাখবেন। তারিখ ভুল আর হবে না।

বোথা যত বড় শয়তানই হোক, তাকে যা কথা দিয়েছিলাম তা রেখেছিলাম। কুড়ি বছর আগে পাহাড়ের চূড়া থেকে লিম্যাক্স ফ্ল্যাভাস্ বেঁধে সেই যে নিজের ছাতাটা মরা আগ্নেয়-গিরির তলায় ফেলে দিয়েছিলাম তারপর আর ছাতা কিনিনি।

কথা শেষ করেই ঘনাদা শিশিরের সিগারেটের টিনটা অন্যমনস্কভাবে হাতে নিয়ে বারান্দার দিকে পা বাড়ালেন।

চাকী ফাঁক পেয়ে পেছন থেকে চীৎকার করে উঠল,—নিজের ত নেই, আজ কার ছাতা তাহলে দান করে এলেন শুনি?

জানি না।—ঘনাদা তেতালার সিঁড়িতে উঠতে উঠতে বলে গেলেন।

তারপর হুলস্থুল ব্যাপার। চাকী সঙ্গে সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে গিয়ে আর্তনাদ করে উঠল,—আমার ছাতা! আমার ছাতা এখানে শুখোতে দিয়েছিলাম!

সবাই মিলে তাকে সান্তনা দিতে এগিয়ে গেলাম।

ওঃ, আপনার ছাতাটাই গেছে বুঝি? কার যে কখন কি যাবে কিছু ঠিক নেই এখানে।

তার মানে?—চাকী চিড়বিড়িয়ে উঠল,—যে যারটা যখন খুশি নিয়ে যাবে। আবার দান করেও আসবে!

দুঃখের সঙ্গে জানালাম,—এ মেসে ওই নিয়ম!

চাকী দু-মাসের অগ্রিম টাকা রিফাণ্ড নিয়ে মেস ছেড়ে গেছে।

ঘনাদা কুলপি না

ঘনাদা বললেন,—না।

আমরাও সবাই হাঁ।

ঠাণ্ডা গরম কোনো রকম লড়াই চলছে না, বাইরে সাদা মেঘের হ্যাণ্ডবিল ছড়ানো শরতের আকাশ যেমন পুজোর বাজারের মত প্রসন্ন, কদিন ধরে আমাদের বাহাত্তর নম্বর বনমালী নস্কর লেনের আবহাওয়াও তাই।

এই গোলমেলে সময়েও শিবু ট্রেনে করে প্রথমে গড়িয়াহাট, তারপর সোনারপুর শেষ ক্যানিং পর্যন্ত ধাওয়া করে চিংড়ি, ভেটকি, এমনকি গাঙের ইলিশ পর্যন্ত নিয়ে এসেছে। সরষের তেলের অভাবটা বাদাম তেলে সরষের গুঁড়ো মিশিয়ে টের পেতে দেওয়া হয়নি। শিশির একটা করে নতুন সিগারেটের টিন একদিন অন্তর খুলে আর হিসেব রাখছে না, ঘনাদা দুবেলা আমাদের আড্ডা-ঘরে নিজে থেকে হাজিরে দিয়ে এ-পর্যন্ত গালগল্পের দু-চারটে মাত্র ফুলঝুরি ছাড়লেও, তুবড়ি পটকার আশায় আমরা সমানে জল উঁচু জল নিচু মেপে তাঁর সঙ্গে তাল দিয়ে যাচ্ছি। হঠাৎ তাহলে ঘনাদার এমন ঘাড় বাঁকাবার কারণ কী?

আর বেঁকে দাঁড়ালেন কিসে?

শহরের সেরা আইসক্রীমে।

অনেক ভেবেচিন্তে এ আইসক্রীমের ব্যবস্থা করেছিলাম। পাড়ার বিখ্যাত তেলেভাজার ওপর আর ভরসা নেই। সরষের তেল যখন মহাজনের গোডাউনে নারকেল তেলের টিনে অজ্ঞাতবাস করছে, তখন তেলেভাজা খেতে মোবিল না সায়ানাইড কি পেটে যাবে ঠিক কী? বড় রাস্তার রেস্তোরাঁর চপ-কাটলেটও চোখ বুজে আর মুখে ফেলবার নয়। সামনেই কাঠের আড়ত। আর কিছু না হোক সেখানকার করাতের গুঁড়ো এ-বাজারে কাজে লাগতেও তো পারে।

অনেক বিচার-বিবেচনা করে তাই শহরের সেরা কোম্পানির কুলপি মানে আইসক্রীম আনিয়েছিলাম আজ বিকেলে।

এ-কুলপিতে ছিটেফোঁটার বদলে গল্পের একটা বড় চাঁই যদি জমে এই আশা।

বনোয়ারী বড় ট্রেতে আইসক্রীমের প্লেটগুলো সাজিয়ে আনতেই ঘনাদার চোখে একটু বিলিক দেবে ভেবেছিলাম।

তা তো নয়ই। একসঙ্গে দু-দুটো টুটি ফুটি সমেত সবচেয়ে বড় প্লেটটা তাঁর দিকে এগিয়ে দিতেই ঘনাদা যেন রবিবর্মার ছবির বিশ্বামিত্রের মত মেনকার কোলে শকুন্তলাকে দেখে শিউরে উঠে নিষেধের হাত তুলে মুখ ফেরালেন।

সে কী ঘনাদা!—শিশির অবাক হয়ে বললে,—আইসক্রীম খাবেন না?

একেবারে বাজারের সেরা কুলপি-বরফ,—শিবু পঞ্চমুখ হয়ে উঠল,—ম্যাগলিটি থেকে স্পেশ্যাল অর্ডার দিয়ে আনানো। জিভে ঠেকতে না ঠেকতে প্রাণ মন জুড়িয়ে যায়। এ-কুলপি খাবেন না!

না।—ঘনাদার এই সংক্ষিপ্ত যন্ত্রাক্ষরবর্জিত প্রত্যাখ্যানেই আমরা একেবারে হাঁ।

গৌর তবু একবার ওকালতি করে দেখল,—এ আর সেই মাটির হাঁড়ির ময়দা-আঁটা টিনের খোলের নোংরা কুলপি নয়। দস্তুরমত বৈদ্যুতিক যন্ত্রে তৈরী। হস্ত দ্বারা অস্পৃষ্ট। একটু শুধু চেখেই দেখুন না।

ভবী তবু ভোলবার নয়। সামনে যেন নিমের পাঁচন ধরা হয়েছে এমনিভাবে মুখ বেঁকিয়ে ঘনাদা হাতের শুধু কনিষ্ঠা, অনামিকা ও মধ্যমা নেড়ে সরিয়ে নিয়ে যাবার ইঙ্গিত করলেন।

বরফ খেলে দাঁত কনকন করে বুঝি?—মুখ ফসকে কথাটা বেরিয়ে যেতেই তটস্থ হয়ে উঠলাম। ঘনাদার বাঁধানো দাঁত ধরা পড়ার সে-কেলেঙ্কারি তো ভোলবার নয়। তারপর থেকে সাবধানে সে-উল্লেখ আমরা এড়িয়েই যাই। আজ হঠাৎ আমার ভুলেই না ঘনাদা আরামকেদারা ছেড়ে উঠে পড়েন।

বেফাঁস কথাটা সামলাতে যাচ্ছি হঠাৎ শিশির যেন আমার বেআদবির খেই ধরেই উল্টো হাওয়া দিয়ে বসল।

না না, দাঁত কনকন নয়, ঘনাদা ওই পেল্লায় ম্যাগনাম সাইজ দেখেই ভয় পাচ্ছেন। বরফ তো নয় যেন একজোড়া কোলবালিশ!

ঘনাদা আর অত বড় বরফ দেখেন নি কখনো?—শিবু শিশিরকে বকুনি দেওয়ার ছলে একটু খোঁচা লাগাল।

দেখবেন না কেন?—গৌর আর একটু ফুটিয়ে দিলে,—বরফের দোকানে কাঠের গুঁড়ো-মাখানো চাঁই দেখেছেন। তার বেশি তো কিছু নয়।

কেন?—আমি সরল প্রতিবাদ জানালাম,—দুনিয়া এস্পারওস্পার করে ঘনাদা একটা আইস-বার্গও দেখেন নি কখনো! এই ত সেবার সেই ছাঁড়র কল্যাণে দক্ষিণ মেরু থেকে বেঁচে ফেরবার পথে আইসবার্গের ওপরই পড়েছিলেন।

আকাশে আজ দু-চারটে হাল্কা সাদা মেঘ ছাড়া কিছু নেই। কালো মেঘগুলো সব ঘনাদার মুখেই এসে জমছে টের পাচ্ছিলাম। আমি শঙ্কিত হলেও গৌর কিন্তু তাতেও যেন ভ্রূক্ষেপ না করে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললে,—হ্যাঁ, ওই আইসবার্গ পর্যন্তই বলতে পারো!

আইসবার্গটা বুঝি কিছু না!—ঘনাদার নাম বাঁচাতে আমাকেই কোমর বাঁধতে হল,—সেটা কত বড় হবে ঘনাদা?

উৎসুকভাবে ঘনাদার দিকে চোখ কপালে তোলবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে তাকালাম। আইস-বার্গটা এভারেস্ট না ছাড়াক আল্পস্ কি অ্যাণ্ডিজকে লজ্জা দেবে-ই নিশ্চয়।

কিন্তু একেবারে যেন থাবড়া দিয়ে বসিয়ে ঘনাদা নিজেই নিতান্ত অবজ্ঞার সুরে বললেন,—কত আর! শ দুই ফুট উঁচু হবে বড় জোর। সঙ্গে সঙ্গে ঘনাদা উঠে পড়েন আর কি!

আমি এবার হতাশ, কিন্তু প্রথম ছেঁকা যে দিয়েছিল সেই শিশিরই মলম লাগিয়ে নরম গরমে এমন বাজিমাত করবে কে ভেবেছিল।

হঠাৎ খক্ খক্ করে দু-বার কেশে নিয়ে শিশির বললে,—গলাটা কেমন খুসখুস করছে। যা ডেঙ্গুর মরশুম চলেছে। গলার জন্যে একটা কিছু খেলে হয়।

আমার ঘরে থ্রোট-প্যাস্টিল্ আছে। আনাব নাকি ঘনাদা?

ঘনাদা প্রায় উঠে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন। আবার আরামকেদারায় একটু সোজা হয়ে বসে বললেন—তা থাকে যদি আনাও।

আর ভাবছি,—শিশির এখন রাস্তা পেয়ে গেছে বোঝা গেল। দু-গ্রাসে নিজের প্লেটের আইসক্রীমটা সাবাড় করে মুখ চোখের কাঁহিল অবস্থাতেই করুণ সুরে বললে,—এ-সব বরফ-টরফ এখন না খাওয়াই ভালো। বাজারের কিছুতে তো বিশ্বাস নেই। রামভুজকে না হয় কটা অমলেট ভাজতেই বলি।

বলো।—ঘনাদা, এবার কেদারায় গা এলিয়ে দিলেন যেন নির্লিপ্তভাবে।

সেই সঙ্গে ক-কাপ গরম কফি?—গৌর ফরমাশ করলে।

ঘনাদার মুখ থেকে আষাঢ়ের মেঘগুলো সরছে বলেই মনে হল। হঠাৎ আবার শিশিরের বেয়াড়া খোঁচা।

ঠাণ্ডাটা আপনার সয় না, না ঘনাদা?

ঘাটে লাগতে লাগতে নৌকো বুঝি বানচাল হয়ে যায়।

কিন্তু বিপরীতেই হিত হয়ে গেল যেন ফুস-মন্তরে।

ঘনাদা তাঁর সেই পেটেণ্ট নাসিকাধ্বনি ছেড়ে বললেন,—হ্যাঁ, তেমন আর সয় কই। শুনেছি দক্ষিণ মেরুর অভিযানে রাশিয়ানরা ভোস্টকে মাইনাস একশ পঁচিশ ডিগ্রি পেয়েছে। সেটা আমার দেখবার সৌভাগ্য এখনো হয় নি। তবে পারার থার্মোমিটার পাথর হয়ে জমে অচল হয়ে গেছল।

থার্মোমিটারের পারা জমে গেছল!—স্বাভাবিক বিস্ময়ের সঙ্গে উস্কানি দেবার জন্যেও মুখব্যাদান করতে হল,—কত ঠাণ্ডা তাহলে?

কত ঠাণ্ডা বুঝবেন কী করে?—গৌর ধমক দিল,—শুনছিস থার্মোমিটার জমে গেছল!

না, পারার থার্মোমিটার জমলেও ঠাণ্ডা মাপা যায়!—ঘনাদার অনুকম্পা-অবজ্ঞার দৃষ্টি যত জোরালো আমাদের আশাও সেই অনুপাতে প্রবল,—পারা জমে শক্ত হয়ে যায়,—৩৮°তে, তারপর অ্যালকোহল থার্মোগ্রাফ দরকার হয়। সে অ্যালকোহল থার্মোগ্রাফে তখন মাইনাস সত্তর।

মাইনাস সত্তর! গৌর বিনা চেষ্টাতেই চোখ কপালে তুলল,—কোথায়?

ব্রাঘিমা ৪২·১২° পূর্ব-অক্ষাংশ উত্তর ৭২·৩৫°।

বলা বাহুল্য ঘনাদার এই সরল সংক্ষিপ্ত সমাচারে আমরা সবাই অথই পাথারে।

শিবুই প্রথম সামলে উঠে দু-বার ঢোক গিলে জিজ্ঞাসা করলে—উত্তর অক্ষাংশ বলছেন না? তার মানে আলাস্কা-টালাস্কা কি ল্যাপল্যাণ্ড-আইসল্যাণ্ড বুঝি?

না। গ্রীনল্যাণ্ডের উত্তর-পুবে সাড়ে-আট হাজার ফুট, যাকে আইস-ক্যাপ বলে সেই বরফের একটা চাঁই-এর উপর।

সাড়ে-আট হাজার ফুট বরফের চাঁই।—ঘনাদা গৌরের বেআদবির জবাব দিলেন বুঝে বিস্ফারিত নয়নে জিজ্ঞেস করলাম,—সেখানে মানুষ থাকে?

না, থাকে না। প্রায় পঞ্চাশ হাজার বর্গমাইলের মধ্যে মানুষের বসতি নেই বললেই হয়। জায়গাটা সুমেরুবৃত্তেরও চারশ মাইল উত্তরে। গ্রীনল্যাণ্ডের সবচেয়ে দক্ষিণের ঘাঁটি ফেয়ারওয়েল অন্তরীপ থেকে প্রায় হাজার মাইল। উত্তর মেরুও হাজার মাইলের কিছু বেশি। সেটা আই. জি. ওয়াই. মানে ইণ্টারন্যাশন্যাল জিওলজিক্যাল ইয়ার বলে কয়েক মাসের জন্যে এই বরফের শ্মশানে একটি বৈজ্ঞানিকের দল কাছাকাছি কোথায় একটা ঘাঁটি বসিয়ে একটা রাত কাটাতে এসেছে এইটুকু শুধু জানতাম।

ঘনাদা ভাষণ থামিয়ে আমাদের মুখের ওপর একবার চোখ বুলোলেন। তাঁর ঠোঁটের বাঁকা হাসিটুকুর মানে না বুঝে আমি বেশ একটু অবাক।

গৌরই আমাদের মুখরক্ষা করলে। ভুরু কুঁচকে বললে,—কয়েক মাস ধরে এক রাত কাটাচ্ছেন, মানে ওখানে সেই ছ-মাস দিন, ছ-মাস রাত তাহলে?

ঠিক ধরেছ।—ঘনাদা কিঞ্চিৎ প্রসন্ন হয়ে বললেন,—তখন সেই রাত দুপুর চলছে। সূর্যের মুখ দেখা যায় না, শুধু একবার চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আকাশটা একটু পরিষ্কার হয়। তবে মাঝে-মাঝে উত্তর আকাশে যেন বৈদ্যুতিক আতসবাজির উৎসব লেগে যায়।

অরোরা বোরিয়ালিস!—শিশির তার বিদ্যা জাহির করেই বোধ হয় বিবাদ বাধালে।

হ্যাঁ, ওই বোরিয়ালিসের ভুতুড়ে আলোয় এক বিশাল 'সাস্‌ত্রুজি'-র ওপর দিয়ে তখন দূরের এক 'নুনাটাক' লক্ষ্য করে চলেছি।

দাঁড়ান। দাঁড়ান।—শিশিরের বাহাদুরির খেসারত দিতে বাধ্য হয়েই অজ্ঞতা স্বীকার করে ঘনাদাকে থামাতে হল,—ও-সব শাস্ত্রীজি আর নুন টুন আবার কী?

শাস্ত্রীজি নয়, সাস্‌ত্রুজি, আর নুন টুন নয়, নুনাটাক।—ঘনাদা কৃপা করে ব্যাখ্যা করলেন,—সাস্‌ত্রুজি হল ঢেউ-খেলানো বরফের প্রান্তর আর নুনাটাক হল পাহাড় গোছের পাথুরে ঢিবি। প্রথম কথাটা রুশ ভাষার, দ্বিতীয়টা এস্কিমোদের থেকে পাওয়া। ওই কথা-গুলোই এখানে চালু।

একটু থেমে আমাদের কুপোকাত অবস্থাটা উপভোগ করে ঘনাদা বলতে শুরু করলেন,—গায়ে ভালুকের চেয়ে ধোক্কড় পোশাক—পশমের পা-গেঞ্জি, হাত-গেঞ্জি তার ওপর পশমের শার্ট পাজামা, পর-পর দু-জোড়া মোজা, ভেতরে রেশমের লাইনিং দেওয়া পশমের পার্কা, তার ওপর ক্যারিবো হরিণের লোমওয়ালা চামড়ার প্যান্ট আর বল্গাহরিণের লোমশ চামড়ার বড় পার্কা আর মাথাঢাকা টুপি, পায়ে সীলের চামড়ার জুতো, দু-হাতে পশমের দস্তানার ওপর বল্গা-হরিণের চামড়ার আর একটা দস্তানা, মুখে তুষার বাঁচাবার গগল্‌স-আঁটা মুখোশ—তা সত্ত্বেও মুখে গলায় যেখানে একটু ফাঁকা সেখানে যেন অসংখ্য অসাড়-করা ছুঁচ ফুটছে।

গ্রীনল্যাণ্ডের এই বরফের প্রান্তরে ঠিক তুষারপাত যাকে বলে তা খুব কমই হয়। সাদা ঢেউ-খেলানো শূন্যতার ওপর দিয়ে সারাক্ষণ অসহ্য একটা গোঙানি-তোলা ঝোড়ো হাওয়া এলোমেলো ভাবে বয়, আর তাতে একটু-ফুটলেই-কালিয়ে-দেওয়া বরফের অগুনতি ছুঁচ যেন সূক্ষ্ম ক্ষ্যাপা ভোমরার ঝাঁকের মত উড়ে বেড়ায়।

এইভাবে কয়েক পা আরো এগিয়েই সামনের সেই ফাটলটা দেখতে গেলাম। বরফের প্রান্তর দু-ফাঁক করে কত হাজার ফুট অতলে যে নেমে গেছে তার ঠিক নেই। ওপরেই ফাটলটা এদিক থেকে ওদিক প্রায় চোদ্দ ফুট চওড়া।

আমার পেছনে পেরীনও যে এসে দাঁড়িয়েছে অরোরা বোরিয়ালিসের ভুতুড়ে আলোর ফেলা ছায়া দেখেই বুঝলাম।

পেছন না ফিরেই জিজ্ঞাসা করলাম,—এবার কী করবেন সেনর পেরীন? এ ক্রেভ্যাস্‌ কতদূর লম্বা কিছু তো বোঝবার উপায় নেই। অথচ এটা পার না হলে তো আপনি যে নুনাটাক দেখাচ্ছেন সেখানে পৌঁছান যাবে না। এই দু-মণি পোশাক নিয়ে পারবেন লাফ দিয়ে পার হতে?

লাফ দেবার দরকার হবে না।—সেনা মাস্ক-এর ভেতর দিয়েই সেনর পেরীনের জলদ-গম্ভীর গলা শোনা গেল,—এখান থেকেই ফিরে যাব ভাবছি, আর একলাই ফিরব।

একলাই ফিরবেন!—যেন কথাটা ঠাট্টা মনে করেই হাস্য না করে হেসে উঠে নিচু হয়ে তার দিকে পিছন ফিরে বসে অতল ফাটলটা ভালো করে পরীক্ষা করতে করতে বললাম,—কী ভয়ঙ্কর ফাটল দেখেছেন। মনে হয় সোজা আট হাজার ফুট সেই পাতালে নেমে গেছে।

হ্যাঁ।—পেছন থেকে আমার প্রায় ঘাড়ের ওপরে পেরীনের বাজখাঁই গলা শোনা গেল

এবার,—একটা কেলে গরুরে পোকার পক্ষে গোরুটা একটু বেশি জমকালো হয়ে যাচ্ছে। সাড়ে আট-হাজার ফুট বরফের পিরামিড মিশরের ফারাওরাও ভাবতে পারেনি।

যেন রীতিমত ঘাবড়ে গিয়ে এবার উঠে দাঁড়িয়ে বললাম,— আপনার হঠাৎ এ-রকম ঠাট্টার মানে তো বুঝতে পারছি না, সেনর পেরীন। আপনার প্রাণ সংশয় বলে সাহায্য করবার জন্যে আমায় ডেকে নিয়ে এলেন। তখন গোপনে বললেন যে 'এস এ এস'-এর এই ট্রান্স-পোলার ফ্লাইটের জেট হঠাৎ বিকল হয়ে এভারেস্ট আইসক্যাপের ওপর নামার পেছনে ভয়ঙ্কর,

ষড়যন্ত্র রয়েছে। প্লেনটা প্রায় নিরাপদেই নামলেও প্রথম ধাক্কায় আপনার পাশের সীটের ভদ্রলোক মিঃ হিগিনসের হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে যাওয়াটা স্বাভাবিক নয়। আপনাকে ঘায়েল করতে গিয়েই শত্রুরা সামান্য ভুলে নাকি মিঃ হিগিনসকে জখম করে বসেছে। শত্রুরা প্লেনের ভেতরেই যাত্রী না কর্মচারী সেজে আছে আপনি বুঝতে পারেননি বলেই তাদের ভয়ে আপনি প্লেন ছেড়ে পালাবার এই ভয়ঙ্কর ঝুঁকি নিয়েছেন। এখানে আই. জি. ওয়াই-এর বৈজ্ঞানিকদের একটা ঘাঁটি বসেছে বলে আপনার জানা আছে। প্লেন সামান্য যেটুকু জখম হয়েছে তা সারাবার ফাঁকে আপনি আমার সাহায্য চেয়েছেন সেই ঘাঁটি খুঁজে

বার করবার জন্যে। সীমাহীন তুষারের এই ধুধু জনমানিষ্যিহীন তেপান্তরে সে অজানা ঘাঁটি খুঁজে না পাওয়ার মানে যে কী তা বুঝেও জেনেশুনে এত বড় বিপদ ঘাড়ে নিয়ে আপনার সঙ্গী হয়েছি, আর আপনি কিনা এ-রকম বিশ্রী ঠাট্টা করছেন।

আচ্ছা, ঠাট্টা আর করব না তাহলে।—অরোরা বোরিয়ালিস্-এর ভূতুড়ে আলোর রং-বেরং-এর মায়া-পর্দা দোলানো সেই গাদা তুষারের অসীম মহাশ্মশানে ছুঁচ-ফোটানো হাওয়ার অবিরাম গোঙানি ছাপিয়ে যেন সাক্ষাৎ যমদূতের মত পেরীনের বুক-কাঁপানো হাসি শোনা গেল। তারপর হাসি থামিয়ে সে চাপা গর্জন করে বললে,—শোন তাহলে হতভাগা। বরফের পিরামিডের তলায় কবর দেবার আগে তোকে সত্যি কথাগুলো শুনিয়ে দি। তুই আমায় চিনতিস্ না, কিন্তু তুই যে হিগিন্স্কে পাহারা দেবার জন্যে এ প্লেনে যাচ্ছিস তা আমি জানতাম। এ জেট প্লেন যে হঠাৎ বিকল হয়ে এই আইস্-ক্যাপের ওপর নেমেছে সে আমাদেরই কারসাজিতে। এ প্লেনের ফ্লাইট ইঞ্জিনিয়ার আমাদের হাতের মুঠোয়। তারই কৌশলে প্লেনের ইঞ্জিন হঠাৎ বিগড়ে গেছে।

কিন্তু প্লেনের ইঞ্জিন বিগড়ে দিয়ে এই জনমানবহীন বরফের রাজ্যে নামতে বাধ্য করায় লাভটা কী? আমি যেন হতভম্ব হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম।

লাভটা এখনো বুঝতে পারিসনি?—পেরীন হায়নার হাসি হেসে বললে,—লাভ এক ঢিলে দু-পাখি সাবাড় করা। প্লেনটা বেকায়দায় নামাবার সময় সামান্য যেটুকু ঝাঁকুনি লেগেছে তারই সুযোগ নিয়ে পাশে থেকে মাথায় ঘা দিয়ে বুড়ো হিগিন্স্কে বেহুঁশ করেছি। তারপর গোলমালের মধ্যে তার অ্যাটাচিটাই তুলে নিয়ে টয়লেটে গিয়ে ঢুকেছি। সেখানে যা দরকার বার করে নিয়ে তার জায়গায় অন্য কাগজপত্র রেখে অ্যাটাচিটা আবার যথাস্থানে রেখে দিয়েছি। ফ্লাইট অফিসার আর ইঞ্জিনিয়াররা তখন প্লেন থেকে নেমে বাইরে মেরামতের কাজে লেগেছে। এবার তোর একটা ব্যবস্থা না করলে নয়। বাইরের পোশাকগুলো এয়ার-ব্যাগে ভরা ছিল। আর-একবার টয়লেটে গিয়ে সেগুলো পাঁরে ফেলেছি। প্লেনের ভেতরে যেখানে সত্তর ডিগ্রি তাপ বাইরে সেখানে মাইনাস সত্তর। এই গোলমাল না হলে অফিসাররা কেউ বাধা দিত। একজন স্টুয়ার্ডেস চেষ্টাও করেছিল। কিন্তু পোশাক দেখিয়ে তাকে বুঝিয়ে নিচে নেমেছি। তুই যে আগেই নিচে নেমেছিস তা দেখেছি। নিচে তোকে একটু আড়ালে ডেকে নিয়ে এই আজগুবি বিপদের কাহিনী শুনিয়েছি। এত সহজে আহাম্মকের মত তুই এ-ফাঁদে পা দিবি তা সত্যি আশা করিনি। তখন রাজী না হলে অন্য উপায়ে তোকে সাবাড় করবার ব্যবস্থা করতে হ'ত।

তাহলে আপনার বিপদ, আই. জি. ওয়াই.-এর ঘাঁটি খোঁজার কথা, সব মিথ্যে!—আমি যেন দিশাহারা।

তোর মত একটা গবেটকে যারা হিগিন্স্কে আগলাবার জন্যে পাঠিয়েছে তাদের বুদ্ধিকেও বলিহারি!—পেরীন যেন গায়ে থুতু দেবার মত করে বললে,—এই পঞ্চাশ হাজার বর্গমাইল ধুধু বরফের রাজ্যে আই. জি. ওয়াই.-এর একটা কুঁড়ের মত আস্তানা খুঁজে বার করা, খড়ের গাদায় ছুঁচ খুঁজে বার করার চেয়ে যে শক্ত সে হুঁশটুকুও তোর হয়নি। কিন্তু আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। প্লেন বোধ হয় এতক্ষণে চালু হয়ে এসেছে। তোর কবরের ব্যবস্থা করে তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে এবার।

সত্যি একলাই ফিরে যাবেন!—আমি যেন সমস্ত ব্যাপারটা এখনো বিশ্বাস করতে না পেরে ভ্যাবাচাকা,—ওরা যখন আমার কথা জিজ্ঞাসা করবে?

আমায় জিজ্ঞেস করবে কে?—পেরীন খেঁকিয়ে উঠল,—আমার সঙ্গে তোকে আসতে কেউ দেখেছে? তুই যে নেই এ-গোলমালে তা কেউ খেয়ালই করবে না। খেয়াল পরে কোনো সময়ে অবশ্য হবে, কিন্তু তখন প্লেন উত্তর মেরু পেরিয়ে বোধ হয় প্রশান্ত মহাসাগরের নাগাল পেয়েছে। তুই তখন সব খোঁজাখুঁজির বাইরে।

এই ফাটলেই তাহলে ফেলে দেবেন বলছেন।—হতাশ করুণ সুরে বলে ফাটলটা আর একবার দেখবার জন্যেই যেন পেরীনের দিকে পিছু ফিরলাম।

সেই মুহূর্তে পেরীন বুনো মোষের মত পেছন থেকে সজোরে ঠেলা দিলে।

তৈরিই ছিলাম। তবু হাত বাড়িয়ে ধরে না ফেললে পেরীন সেই হাঁ-করা পাতালে বোধ হয় তলিয়েই যেত।

ধরে-তুলো তার হাতটা ফাটলের পাড়ে বরফের একটা খাঁজে লাগিয়ে দিয়ে বললাম,—শক্ত করে ধরুন সেনর পেরীন। আপনার যা দু-মণি বালির বস্তার মতো লাশ তাতে আগেই যদি বরফের পাড় ধসে না যায় তাহলে মিনিট পাঁচেক অন্তত টিকে থাকতে পারবেন।

প্রাণপণে দু-হাতে বরফের খাঁজটা ধরে অতল ফাটলের ওপর ঝুলতে ঝুলতে পেরীন ভয়ে-কাঁপা ধরা গলায় কোনো রকমে বললে,—আমি—আমি—

হ্যাঁ, আপনি আমার জন্যে ভালো সমাধিরই ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু আমার মত সামান্য একটা পোকামাকড়ের পক্ষে এমন সমাধি একটু বেমানান নয়? বরফের পিরামিডটা আপনার কবরেরই মান রাখবে।

আমি আর ধরে থাকতে পারছি না।—এবার একটু দম পেয়ে পেরীন আর্তনাদ করে উঠল,—আমায় বাঁচাও। এবার আমি তোমাকে অনেক অনেক টাকা দেব। এত টাকা তুমি ভাবতে পারো না।

সত্যি বলছেন?—আমি যেন একটু দোমনা,—কিন্তু টাকার আমার ভাবনা কী। আপনার পকেটেই যে-কটা কাগজ চুরি করে রেখেছেন সেগুলো পেলেই তো আমি টাকা রাখবার জায়গা পাব না।

পাড়ের ধার থেকে ঝুঁকে পেরীনের পার্কা থেকে শুরু করে সাতপুরু জামার তলায় হাত চালিয়ে তার শার্টের ভেতরের পকেট থেকে খামে-ভরা কাগজগুলো বার করে নিয়ে বললাম,—কিছু মনে করবেন না। কখন আপনি এ ফাটলে তলিয়ে যান কিছু ঠিক নেই তো, তাই এগুলো আগেই বার করে নিলাম।

আমার হাত অবশ হয়ে আসছে।—পেরীনের এবার প্রায় ডুকরে কান্না,—আপনাকে দিব্যি গেলে বলছি, নিজে থেকে আমি ধরা দেব, সব ষড়যন্ত্রের কথা কবুল করে যারা যারা এর ভেতর আছে ধরিয়ে দেব। আমায় বাঁচান।

দেখুন দিকি!—বড় ফাঁপরেই যেন পড়লাম,—আট হাজার ফুট ফাটলে নামিয়ে দিচ্ছিলেন, এখন আবার তুই থেকে আপনিতে তুলে লজ্জা দিচ্ছেন। কিন্তু ষড়যন্ত্রের কথা জানাবার জন্যে আপনাকে বাঁচাবার দরকারই নেই যে? আপনার মত নিরেট আহাম্মক বেইমানকে যারা এ শয়তানি কাজ হাসিল করতে নিয়েছিল তাদের বুদ্ধিকে বলিহারি। আপনি কি ভাবেন ষড়যন্ত্রের কথা জানতে আমাদের কিছু বাকি আছে! হিগিন্‌স্‌কে আগলাতে নয়, আপনার ওপর নজর রাখবার জন্যেই আপনার পেছনের সীটে জায়গা নিয়ে চলেছি। ফ্লাইট ইঞ্জিনিয়ার আপনাদের হাতের মুঠোয় বলে ইঞ্জিন বিগড়ে দিয়ে এই বরফের শ্মশানে প্লেন নামাবার ব্যবস্থা করেনি। সে যাকে বলে ডাব্‌ল এজেন্ট, মানে আমাদেরই চর। আপনাদের দলের লোক সেজে এতদিন আপনাদের ধোঁকা দিয়েছে। এ অমূল্য কাগজ চুরির ষড়যন্ত্রের কথা জানা থাকলেও হাতেনাতে ধরবার জন্যেই যেন আপনারই সুবিধে করতে প্লেন এখানে নামানো হয়েছে। ঘটে যদি আপনার একটু বুদ্ধি থাকত তাহলে আমায় প্লেনের বাইরে এই সব পোশাকে দেখেই আপনার সন্দেহ হ'ত। সাধারণ প্লেনের যাত্রী হয়ে গ্রীনল্যান্ডের ওপর ঘোরাফেরার পোশাক কেউ সঙ্গে রাখে না। এ আইস-ক্যাপে আই. জি. ওয়াই.-এর ঘাঁটি যে এখন ধারে কাছে নেই তা আমি জানি। আপনার মিথ্যে ধাপ্পা অত সহজে বিশ্বাস করে যে আপনার সঙ্গে এসেছি সে শুধু আপনার দৌড় দেখবার জন্যে। মিঃ হিগিন্‌স্‌ও আপনার চোরা মারে অজ্ঞান হননি। এই রকম কিছু হতে পারে আন্দাজ করেই তাঁর গায়ে

বুলেট-প্রুফ বর্ম আঁটা, আর মাথায় শক্ত ইস্পাতের আঁটো টুপির ওপর পরচুলা লাগানো। তিনি শুধু অজ্ঞান হবার ভান করে ছিলেন। কিন্তু আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। আপনার হাত দুটো অসাড় হয়ে এসেছে বুঝতে পারছি। ভাবছি এত কষ্ট যার জন্যে করলেন সেটা থেকে আপনাকে বঞ্চিত করা উচিত নয়। এ ক্লেভ্যাস কত গভীর জানি না। যতই হোক, তলায় গিয়ে খামটা খুঁজে নিতে পারবেন।

লেফাফাটা তারপর সেই ফাটলের মধ্যেই ফেলে দিলাম।

অ্যাঁ! ওই অমূল্য কাগজগুলো ফেলে দিলেন!—আমাদের সকলের চোখই ছানাবড়া!

হ্যাঁ,—ঘনাদা নির্বিকার,—ফেলে দিতে ওই অবস্থাতেও পেরীনও প্রায় আর্তনাদ করে উঠেছিল। তাকে অবশ্য শেষ পর্যন্ত ফাটল থেকে তুলে প্লেনে নিয়ে গিয়ে হাতকড়া পরাবার ব্যবস্থা করেছিলাম।

কিন্তু সেই দামী কাগজগুলো?—আমাদের বিমূঢ় জিজ্ঞাসা।

আসল কাগজ তো ছিল আমার পকেটে।—ঘনাদা ঈষৎ দন্ত বিকাশ করলেন,—মিঃ হিগিন্‌সের অ্যাটাচিতে যা ছিল তা ফাঁকি।

কিন্তু ও অমূল্য কাগজে ছিল কী?—আমি কৌতূহল চাপতে পারলাম না।

স্পেস-রকেটের নতুন নক্সা!—শিবু আঁচ করলে।

নিউট্রন বোমার অংক!—গৌরের কল্পনা।

উঁহু, আধুনিক কটা ছবি!—শিশিরের মন্তব্য।

না,—ঘনাদা আমাদের সংশয় মোচন করলেন,—ছিল 'লেজের'-এর নতুন কূট কৌশল।

লেজের!—আমরা হতভম্ব।

হ্যাঁ,—ঘনাদা সদয় হয়ে ব্যাখ্যা করলেন,—এল. এ. এস. ই. আর.। মানে, লাইট অ্যাম্প্লিফিকেশন বাই স্টিমুলেটেড এমিসন অফ রেডিয়েশন। সংক্ষেপে ইংরেজী আদ্যক্ষরগুলো নিয়ে লেজের, একারটা খাটো। আর বর্গীয় জ-টা জানতি পার না-র মত। আজগুবি বিজ্ঞান-কাহিনীর লেখকরাও যা কল্পনা করতে পারে নি, 'লেজের' এ-যুগের মাত্র সেদিনের ১৯৬০ সালের সেই যুগান্তকারী আবিষ্কার ও উদ্ভাবন। এ এমন তীব্র তীক্ষ্ণ আলোর রেখা যে দশ মাইল দূরে ফেললেও কয়েক ফুট মাত্র ছড়ায়। এ আলো দিয়ে মুহূর্তের মধ্যে সূর্যের লক্ষ লক্ষ গুণ উত্তাপ সৃষ্টি করা যায়। এ আলোর রেখা মারফত বেতারের চেয়ে ভালোভাবে মানুষের কণ্ঠ আর যে-কোন ছবি পাঠানো যায়। একটা এ আলোর রেখা এই ভারতবর্ষে এই মুহূর্তে যেখানে যত টেলিফোনের আলাপ হচ্ছে সব বইতে পারে। প্রথম যে 'লেজের' যন্ত্র তৈরী হয় তাতে চুনি-র ভেতর দিয়ে শুধু একটি রঙের লাল আলোই বার হ'ত। আর্গন্, ক্রীপ্টন গোছের গ্যাস ব্যবহারের কৌশলে এখন অন্তত ষাট-সত্তর রঙের 'লেজের' আলো বার করবার উপায় উদ্ভাবিত হয়েছে। সেই আশ্চর্য উদ্ভাবনের খসড়া নিয়েই মিঃ হিগিন্‌স্ বিলেত থেকে আমেরিকায় যাচ্ছিলেন। এ অমূল্য কাগজ চুরি যাবার ভয়েই সঙ্গে থাকতে হয়েছিল আমায়।

কিন্তু এ আশ্চর্য উদ্ভাবনের কৌশল শুধু ওই কটা কাগজেই লেখা থাকবে কেন? গৌরের বেয়াড়া প্রশ্ন,—সঙ্গে করে তা নিয়ে যাবারই বা দরকার কী? 'টপ্ সিক্রেট' ডাকেই তো তা পাঠাবার কথা!

ঘনাদার কাছে কোনো উত্তর আর পাওয়া গেল না। বনোয়ারী তখন রামভুজের সদ্য-ভাজা গরম অমলেটের প্লেট নিয়ে হাজির হয়েছে।

ঘনাদা তারই ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লেন।

গলা-ব্যথার লজেন্সও রয়েছে ঘনাদা!—শিশির জানাল।

ঘনাদার ভর্তি গাল থেকে যে অস্পষ্ট আওয়াজ বেরুল তা মনে করিয়ে দেওয়ায় খুশির, না ধরে ফেলায় বিরক্তির ঠিক বোঝা গেল না।

ভারত যুদ্ধে পিঁপড়ে

মহাভারতে নেই

ভারত-যুদ্ধে পিঁপড়ে! সে আবার কি?

শুনে হাসি পাচ্ছে ত? কথাটা বিশ্বাস হচ্ছে না কাঠবিড়ালীরাও যেমন কাজে লেগেছিল, ভারত-যুদ্ধে মানে কুরুক্ষেত্রের সেই মহাযুদ্ধে পিঁপড়েদের সেইরকম কোনো মদৎ ছিল বলে মনে হচ্ছে হয়ত।

না, সরাসরি ভারত-যুদ্ধে পিঁপড়েদের কোন পার্ট ছিল বলে জানা নেই।

তবে,—যাক বলেই ফেলা যাক—পিঁপড়েদের—না, বহুবচনটা ভুল, আসলে—একটি ক্ষণজন্মা পিঁপড়ে তার কেরামতিটুকু না দেখালে ভারত-যুদ্ধের প্রামাণিক ইতিহাসে ওই পাঁচ লহমায় ফাঁক মানে ফাঁকিটুকু থাকত না।

ক্ষণজন্মা পিঁপড়ে। তার কেরামতিতে ভারত-যুদ্ধের ইতিহাসে ফাঁক?

—কেরামতিটা কি?

তা বোঝাবার জন্যে গোড়া থেকে শুরু করা উচিত। একেবারে বাহাত্তর নম্বরের সেই দোতলার আড্ডাঘরে বত্রিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে সুরু এক রবিবারের গুমোট সকালবেলায়।

কাগজে আবহাওয়ার পূর্বাভাষ দিয়েছে:—সারাদিন ভ্যাপসা গরম,—বিকালে বজ্রবিদ্যুৎসহ প্রচুর বৃষ্টির সম্ভাবনা।

কাগজে ত' হপ্তাভোর রোজই ওই ভাঁওতা দিচ্ছে। কিন্তু সব ভরসাই ফরসা। না আকাশে না টঙের ঘর থেকে এক ছিটেফোঁটা বর্ষণের লক্ষণ পাচ্ছি।

আকাশে কি টঙের ঘরে বজ্র-বিদ্যুৎ অবশ্য নেই। কিন্তু তাতেই ত' আরো জ্বালা।

বজ্রবিদ্যুতের জায়গায় দু-বেলা কোকিলের বদলে দাঁড়কাক-গিলে-খাওয়া গলায় অমৃতসম মহাভারতের কথা শুনছি।

কখনো—

গোপালের চরিত্র দেবের অগোচর।
অন্য কে কহিতে পারে ত্রৈলোক্য ভিতর॥
ব্রহ্মাণ্ড বলি যে এক চতুর্দশ লোকে।
বিরাট পুরুষ ধরে এক লোমকূপে॥
তিল অর্ধ কোটি সে ব্রহ্মাণ্ড ধরে গায়।
এমত বিরাট যার নিঃশ্বাসে প্রলয়॥

কখনো বা—

অশ্বত্থামা নামে হস্তী তার তুল্য অন্য নাস্তি
এমনি উত্তম গজবর।
বর্ণে তিনি জলধর, ঈষা সম দন্ত সর
দেখিতে বড়ই ভয়ংকর॥
তাহে আরোহণ করি, আসে কুরু অধিকারী
যথা আছে বীর বৃকোদর।
হাতে গদা ঘোরতর, রোষযুক্ত নৃপবর
ভীমসনে করিতে সমর।

গলাটি কার তা আর বলে দিতে হবে না নিশ্চয়।

হ্যাঁ সেই একমেবাদ্বিতীয়ম তেতালার টঙের ঘরের তিনি কিছুদিন ধরে আর সব ছেড়ে মহাভারত ধরেছেন। আমরাও সেই সংগে পথে বসেছি।

সময়ে অসময়ে তাঁর নিজস্ব ট্রেডমার্ক-মারা গলায় ওপর থেকে কাশীরাম দাসের পয়ার ভেসে আসে। সে পয়ারের ঢেউ ঠেলে কোনরকমে যদি তাঁর কাছে গিয়ে পৌঁছোই তিনি যেন মহাভারতের অমৃতরসে ডুবে আমাদের দেখতেই পান না।

তাঁর মতিগতি একটু ফেরাবার আশায় স্বস্ত্যয়নের উপচার যোগাতে আমরা কিছু ত্রুটি করিনি এ পর্যন্ত। কখনো আমিষ কখনো নিরামিষ, সাত্ত্বিক বা তামসিক বেশ কিছু আমাদের সমভিব্যাহারে গিয়েছে।

নৈবেদ্য সামনে ধরে দিয়ে আমরা একান্ত বশংবদ হয়ে এধারে ওধারে বসেছি। তার শূন্য দৃষ্টি দু-একবার আমাদের দিকে ফিরলেও এ স্থূল বর্তমান ভেদ করে সেই সুদূর হস্তিনা-পুরেরই বোধ হয় চলে গেছে। আমরা যে তাঁর গোচরীভূত তার কোনো প্রমাণ পাইনি।

শুধু দক্ষিণ হস্তটা তাঁর নিজের অজান্তেই প্লেটের প্রত্যক্ষ বর্তমানের ওপর প্রসারিত হয়েছে। অচেতনভাবেই মুখে গিয়ে পৌঁছেছে তারপর।

সেখানে যান্ত্রিক দন্ত নিষ্পেষণ চলতে চলতে হঠাৎ ক্ষণিকের জন্যে থামায় আমরা শশব্যস্ত হয়ে বলার সুযোগ পেয়েছি—কবিরাজীটা কি জুৎ হয়নি ঘনাদা? একেবারে টাটকা ভাজিয়ে এনেছি কিন্তু।

ঘনাদার কর্ণকুহরেই বোধ হয় কথাগুলো প্রবেশ করেনি। সাড়ে তিন হাজার বছর ছাড়িয়ে গিয়ে কৃষ্ণার্জুনের কাছে অগ্নিদেবের ক্ষিদের বায়নাই তিনি তখন শুনছেন।

হাসিয়া কহেন পার্থ, কহ বিচক্ষণ।
কোন ভক্ষ্য দিলে তৃপ্ত হইবা এক্ষণ॥
আমি অগ্নি, বলি দিয়া নিজ পরিচয়।
আশ্বাস পাইয়া বলে অগ্নি মহাশয়॥
ব্যাধিযুক্ত বহুকাল আমার শরীর।
নির্ব্যাধি করহ মোরে পার্থ মহাবীর॥

খাণ্ডব বনেতে বহু জীবের আলয়।
সেই বন ভক্ষ্য মোরে কর ধনঞ্জয়॥
উদর পূরিয়া খাই এই অভিরুচি।
কোনো পশুপক্ষী মৎসে নাহিক অরুচি॥

অগ্নিদেবের ক্ষিদের আবদার শোনাতে শোনাতে খাণ্ডব বনের অভাবে সামনে ধরে দেওয়া প্লেটগুলো ঘনাদা চেটে পুটে সাবড় করেছেন। আমাদের উপস্থিতি টের পাবার কোনও লক্ষণই কিন্তু দেখা যায়নি।

মনে মনে গজরাতে গজরাতে নিচে নেমে এসেছি সবাই। আর তার পরই ঘনাদাকে কাৎ করবার এই নতুন মতলব ভাঁজা হয়েছে।

ফন্দিটা বিষে বিষক্ষয়, মানে যাকে বলে অটোম্যাক্সিন। যা দিয়ে আমাদের জব্দ করেছেন তাই দিয়ে ঘনাদাকে জব্দ করা। অর্থাৎ তাঁর ওপরই মহাভারত চাপানো।

সকাল থেকেই আমাদের তর্কটা সুরু হয়েছে। ঘণ্টার কাঁটা ছটা থেকে সাতটার দিকে যত এগিয়েছে আমাদের গলা ধাপে ধাপে তত চড়ে তেতালার টঙ পর্যন্ত পেঁাছেছে নিশ্চয়।

একদিকে শিবু আর আমি অন্য দিকে গৌর আর শিশির।

তর্ক ত' নয় যেন দ্বিতীয় কুরুক্ষেত্র।

ছটা একুত্রিশে শিবুর হাঁক ন্যাড়া সিঁড়িটা বোধ হয় পেরিয়ে গেছে,—আলবাৎ হারত পাণ্ডবেরা।

কখখনো না!—শিশিরের প্রতিবাদ খোলা ছাদ পর্যন্ত নিশ্চয়।

কচু কাটা হত তাহলে!—আমি গলাটা টঙের ঘরে পর্যন্ত পেঁাছে দিতে পেরেছি বোধহয়।

ওপরে ঘনাদার সুরেলা মহাভারত শোলোক আওড়ান হঠাৎ যেন থেমেছে। এই 'জিরো আওয়ার' বুঝে নিজেদের গলার পেছনে আমরাও এবার ন্যাড়া সিঁড়ি বেয়ে টঙের ঘরের দিকে পা বাড়িয়েছি। পেছন দিকে তাকিয়ে খাবারের ট্রে সমেত বনোয়ারী ঠিক হিসেব মত হাজির হবার জন্য তৈরী কিনা দেখে নিতে ভুলিনি।

তারপর টঙের ঘরে গিয়ে দোতালার তর্কটা একেবারে যেন তপ্ত খোলা থেকে নামিয়ে দিয়েছি ঘনাদার সামনে।

গৌর প্রায় বিধানসভার মেজাজ নিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে ঘনাদার কাছে স্পীকারের রুলিং চেয়েছে দাঁত মুখ খিঁচিয়ে—শুনেছেন শুনেছেন এদের কথা! বলে পাণ্ডবরা নাকি গোহারান হারত কুরুক্ষেত্রে!

হারতই ত'—শিবু তাল ঠুকেছে ঘনাদার তক্তপোষটাই চাপড়ে—দুর্যোধন অমন গদ্ধেট না হলে তুলোধোনা হত পাণ্ডবেরা।

তুলোধোনা হত পাণ্ডবেরা!—শিশির আর গৌর যেন অর্জুনের গাণ্ডীব আর ভীমের গদা-ই হাতে নিয়ে হুংকার দিয়েছে—কে তুলোধোনা করত, কে? দুর্যোধনের নিরানব্বই-এর বদলে আরো ন'শ নিরানব্বইটা ভাই থাকলেও, কুলোত না।

দুর্যোধনের ভাইদের আবার ডাকা কেন?—আমি গলায় একেবারে লঙ্কাবাটা মাখিয়ে বলেছি, —তাদের মাঠে নামবার দরকারই হত না। গাল্যারিতে বসেই তারা ফাইন্যাল দেখতে পেত। দেখত কর্ণ—হ্যাঁ একা সূতপুত্র কর্ণ কেমন করে কুরুক্ষেত্রের কাঁকুরে মাটিতে পাঁচ ভাই পাণ্ডবের নাকগুলো ঘসে দেয়। নেহাৎ দুর্যোধন নিজের আহাম্মকীতে রেফারীকেই খচিয়ে দিলে তাই।

কথাগুলো বলতে বলতে আড়চোখে ঘনাদার দিকে অবশ্য নজর রেখেছি। এত পাঁয়তাড়া যে জন্যে কষা সে মতলব একটু হাসিল হচ্ছে কি?

কোথায়?

ঘনাদা তাঁর কাশ্মীরাম দাসের বিরাট গন্ধমাদনটি সামনে খুলে ধরে শ্লোক আওড়ানো থামিয়েছেন বটে, কিন্তু নিজে যেন তাঁর এই টঙের ঘরেই আর নেই। দেহটা শুধু ফেলে রেখে কুরুক্ষেত্রেই বুঝি চরতে গেছেন।

তা গেছেন যান। ফিরতে যাতে হয়, তার জন্য নায়াচ, নালিক, পাশুপত থেকে ব্রহ্মাস্ত্র পর্যন্ত সবরকম অস্ত্রের ব্যবস্থা না করে আজ আমরা আসিনি।

দু' এক সেকেণ্ডের ফাঁক যা পড়েছিল রেফারী কথাটার খেই ধরে তা ঢেকে গৌর খিঁচিয়ে উঠল—রেফারী! রেফারী আবার কে?

রেফারী কে জানো না!—সঙ্গে সঙ্গে শিবুর টিটকিরি আর আমার নব মহাভারত পাঠ শুরু।

শিশির আর গৌরের দিকে চেয়ে কানমলা দেওয়া গলায় বললাম,—মহাভারতটাও পড়িস নি। শোন তাহলে—

মহাভারতের কথা কি কহিব আর।
কি হলে যে কি হইত অন্ত পাওয়া ভার॥
দুর্যোধন দুর্ভাগার মতিচ্ছন্ন হইল।
পদতল ছাড়িয়া বন্ধু শিয়রে বসিল॥
তাই না চটে চতুর কৃষ্ণ গাড়োয়ান হইয়া।
পাণ্ডু বয়েজ টীমকে দিলেন ম্যাচটা জিতাইয়া॥
চালের ভুলে রুণ্ট যদি না হতেন রেফারী।
কুরুক্ষেত্রে যায় কুরুরা পেনাল্টিতে হারি?॥

ঘনাদার দিকে চোখ রেখেই পদগুলো আওড়াচ্ছিলাম, কিন্তু শুভলক্ষণ কিছু দেখলাম না। ঠিক কুরুক্ষেত্রে না থাকলেও এখনও হস্তিনাপুর ছেড়ে তিনি আসতে প্রস্তুত নন মনে হল।

ঠিক ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় সাতটা বাজতে পাঁচ মিনিটে বনোয়ারী তখন ঘরে ঢুকে ঘনাদার সামনে খাস্তার কচুরি আর অমৃতির প্লেট দুটো ট্রে থেকে নামিয়ে রাখছে।

ঘনাদার মুখের ভাব দেখে মনে হল এবারে তার হস্তিনাপুরের প্রবাস থেকেই তিনি আনমনে সে প্লেটে হাত বাড়াতে দেরী করবেন না।

ব্রহ্মাস্ত্রটা চটপট তাই প্রয়োগ করতে হল এবার।

ঘনাদার লুব্ধ হাত প্লেটে এসে পৌঁছোবার আগেই দুদিক থেকে গৌর ও শিবু চক্ষের নিমেষে দুটি প্লেট তুলে নিয়ে বনোয়ারীকে ধমকে উঠল—কি হচ্ছে কি এসব! যখন তখন খাবার দিলেই হল! এখন এসব কে আনতে বলেছে!

বনোয়ারী অভিনেতা নয়। আগে থাকতে অনেক শেখানো পড়ানো সত্ত্বেও গৌর শিবুর ধমক খেয়ে সে সব ভুলে তোতলা হয়ে গিয়ে দুবার শুধু 'হামি হা..মি..ত' গোছের কিছু একটা উচ্চারণ করল। আমাদের মতলব হাসিলের পক্ষে তাই কিন্তু যথেষ্ট।

ঘনাদার মুখের চেহারাটা তখন সাড়ে তিন হাজার বছর আগেকার হস্তিনাপুর থেকে এক ঝটকায় উনিশশ' পঁচাত্তরের বাহাত্তর নম্বরে এসে পড়ার জন্যেই বোধহয় বেশ একটু ভ্যাবাচাকা।

আর যাই হোক এরকম একটা অবস্থার কথা তিনি কল্পনা করতেই পারবেন না জেনে মতলবটা ভাঁজা হয়েছিল।

কচুরি অমৃতির প্লেট দুটো বনোয়ারীর ট্রেতে তুলে তাকে চলে যাবার হুকুম দেওয়ার সঙ্গেই কাজ যা হবার হল।

ঘনাদা অবশ্য এইটুকুর মধ্যেই নিজেকে সামলে নিয়েছেন। সেই ভ্যাবাচাকা ভাবটা মুখ থেকে মুছে এতক্ষণে যেন আমাদের সম্বন্ধে সচেতন আর বনোয়ারীর প্রতি করুণাময় হয়ে উঠলেন,—আহা বেচারাকে মিছে কষ্ট দেওয়া কেন? আবার ত' সেই আনতেই হবে ওকে।

ওগুলো রেখে যেতেই বলছেন!—আমাদের গলায় একটু মৃদু প্রতিবাদের সুরই ফোটালাম —কিন্তু আমাদের জরুরী কথাগুলো...

কি তোমাদের জরুরী কথা বলো না!—ঘনাদা বনোয়ারীর হাত থেকে পুরো ট্রেটা এক-রকম কেড়ে নামিয়ে নিলেন—এগুলোর ত' আর গলা নেই যে গোলমাল করবে। বলে ফেলো কি তোমাদের জরুরী কথা!

ঘনাদার শেষ কথাগুলো মুখে ঠাসা কচুরি ভেদ করে একটু জড়ানো অবস্থাতেই বার হল। আবার পাছে মুখের গ্রাস ফসকে যায় এই ভয়ে তিনি তখন প্রায় দুহাতে কচুরি আর অমৃতি মুখে বোঝাই করছেন।

তা যা করেন করুন। আমরা এতদিনে তাঁকে বাগে পেয়েই খুশি। বেশ একটু জমিয়ে বসে জিজ্ঞাসা করলাম,—জরুরী কথাটা কি, তা এখনো বোঝেন নি? শুনুন না ওই আহাম্মকদের কথা। বলে কিনা পাণ্ডবরা কিছুতে হারত না!

আহাম্মকেরা মানে শিশির গৌর। তারাও ঠিক সিনেরিও মাফিক ঝাঁপিয়ে উঠল,—কখখনো হারত না, কিছুতেই হারত না।

শুনলেন? শুনলেন ত!—একটা জমজমাট বৈঠকের আশায় জ্বলজ্বলে চোখে ঘনাদার দিকে তাকালাম—এই ওদের মহাভারতের বিদ্যের দৌড়। কুরুক্ষেত্রে পাণ্ডবদের জিৎ নাকি হতই! আপনিই বলুন ত' ঘনাদা!

ওই উসকানিটুকু দিয়েই আমরা চুপ। ঘনাদার বাঁধানো দাঁতে মচমচে অমৃতি চিবানোর শব্দ ছাড়া ঘরে আর আওয়াজ নেই। যে খেইটা জুগিয়ে দেওয়া গেছে তা থেকে কি গল্প-গল্পর গালিচা ঘনাদা বুনে তোলেন তা দেখবার জন্যে আমরা একেবারে উদগ্রীব।

কিন্তু ঘনাদা অমন করে শোধ নেবেন তা কি জানি! শোধ তাঁর মুখের খাবার সরিয়ে নিয়ে তাঁকে দাগা দেবার।

গালচের আশা একেবারে খণ্ডেপোঁশে কুঁকড়ে দিয়ে ঘনাদা যেন মর্স কোডে জানালেন,—ভাই!

তাই। কি তাই?—আমরা যেমন হতাশ তেমনি অস্থির।—পাণ্ডবদের জিৎ হত-ই বলতে চান?

হ্যাঁ!—এবার ঘনাদার সংক্ষিপ্ত সরল জবাব।

দুর্যোধন যদি দলে টানতে গিয়ে ঘুমন্ত শ্রীকৃষ্ণের শিয়রে না বসে পায়ের দিকে বসত তবুও!—আমরা শেষ আশার যেটুকু সাধ্য চাগাড় দিলাম।

যদি কেন, পায়ের দিকেই ত বসেছিল দুর্যোধন!—ঘনাদা এতক্ষণে বোমাটি ছাড়লেন।

পায়ের দিকেই বসেছিল দুর্যোধন?—চোখগুলো যতটা পারি ছানাবড়া করে বললাম,—কিন্তু মহাভারতের কোথাও ত নেই! পায়ের বদলে মাথার দিকেই দুর্যোধন বসেছিল বলে ত' লেখা আছে।

লেখা যা আছে তাও ঠিক!

তাও ঠিক?—ঘনাদার ধাঁধায় এবার একটু কাবু হয়েই জিজ্ঞাসা করলাম—পায়ের দিক মাথার দিক হয় কি করে?

হবার কারণ অতি সোজা!—ঘনাদার মুখে যেন একটু অনুকম্পার হাসি,—শ্রীকৃষ্ণ ঘুমের মধ্যে উল্টে শুয়েছিলেন বলেই পায়ের দিকটা মাথার দিক হয়ে গিয়েছিল।

ঘুমের মধ্যে উল্টে শুয়েছিলেন শ্রীকৃষ্ণ?—এবার আর আমাদের অবাক হবার ভান করতে হল না।

হ্যাঁ উল্টে শুয়েছিলেন!—ব্যাখ্যা করলেন ঘনাদা, দুর্যোধন বোকা যেমন নয়, তেমনি গড়িমসি আলসেমিও তাঁর ধাতে নেই। অর্জুন রথে ঘোড়া জুতে রওনা হতে না হতেই দুর্যোধন শ্রীকৃষ্ণের শিবিরে এসে হাজির। বাসুদেব ঘুমোচ্ছেন শুনে সে শোবার ঘরেই গেল অপেক্ষা করতে। ঘরে ঢুকেই সে কিন্তু একটু ফাঁপরে পড়ল। ঘুমন্ত বাসুদেবের মাথার দিকে যেমন পায়ের দিকেও তেমনি একটি করে আসন পাতা। এখন কোথায় তার বসা উচিত। ভেবে চিন্তে শেষ পর্যন্ত সে পায়ের দিকেই বসল।

শ্রীকৃষ্ণ এবার পড়লেন মুস্কিলে। তাঁর ত কপট নিদ্রা। যা ভেবেছিলেন দুর্যোধন তার উল্টোটা করেছে জেনে, আর কোনো উপায় না পেয়ে নিজেও তিনি ঘুমের মধ্যেই যেন স্বপ্নে উঠেপড়ার ভান করে উল্টে শুলেন।

দুর্যোধন আহাম্মক নয় কিন্তু অহংকারী। শ্রীকৃষ্ণকে ঘুমের মধ্যে উল্টে শুতে দেখে তার দেমাকে একটু সুড়সুড়িই লাগল। ভাবল, বাসুদেবের ঘুমের মধ্যেও তার মত রাজা-গজাকে পায়ের দিকে রাখতে বাধছে। এই দম্ভেই তার মরণ। নইলে মাথা থেকে আবার পায়ে গিয়ে বসতে পারত না!

কিন্তু?—আমরা সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলাম, এসব কথা মহাভারত থেকে সরালে কে? সেই আপনার ভীমসেন দারুক আর বন-বরা মার্কা মুষিক কোম্পানী?

না।—ঘনাদা বনোয়ারীর সদ্য এনে হাজির করা চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে একটু হাসলেন,—এ বৃত্তান্ত সরাবার দরকার হয়নি, কারণ লেখাই হয়নি মহাভারতে।

লেখাই হয়নি!—আমরা সত্যিই তাজ্জব—কেন?

কেন জানতে চাও?—ঘনাদা শিশিরের ধরিয়ে দেওয়া সিগারেটে রামটান দিয়ে তার ধোঁয়ার সঙ্গেই চোখবুজে যেন ধ্যানস্থ হয়ে গেলেন।

এ ধ্যান কি ভাঙবে?

আমরা গরুড়পক্ষী হয়ে তাঁর দিকে চেয়ে আছি।

ধ্যান শেষ পর্যন্ত ভাঙল আর চক্ষু উন্মীলন করে সামনের দেয়ালটার দিকে তাকিয়ে তিনি ত্রিকালদৃষ্টির যে নমুনা দেখালেন তাতে আমরা হাঁ।

কেন লেখা হয়নি তা,—সামনের ফাঁকা দেয়ালটার দিকে সিগারেট-ধরা আঙুল দুটোই উঁচিয়ে তিনি বললেন, ওই ওর তস্য তস্য আদি সপ্তশত সংঘব্রাতা হয়ত বলতে পারত!

মাথাগুলো তখন ঘুরতে সুরু করেছে। ঘোরার আর অপরাধ কি? সংঘ ভ্রাতা, তস্য তস্য, আদি সপ্তশত—এ সব কি বলছেন ঘনাদা! আর বলছেন কিনা ওই সেদিনের চুনকাম-করা শাদা দেয়ালটার দিকে তাকিয়ে।

ওখানে ও সব বলে সম্বোধন করছেন কাকে?

যাকে করছেন অনেক কষ্টে তাকে আবিষ্কার করা গেল এরপর। আবিষ্কার যা করলাম চক্ষু তাতে চড়কগাছ। ঘনাদার দিকে ফিরে হতভম্ব হয়েই তাই বলতে হল,—ওখানে ত একটা শুধু সুড়সুড়ে পিঁপড়েই দেখছি।

হ্যাঁ, ওই।—ঘনাদা ধ্যান নিমীলিত হয়েই বললেন।

হ্যাঁ, ওই! সুড়সুড়ে পিঁপড়ে। ওরই কি বললেন, তস্য তস্য সার্দ্ধতিনসহস্র-আধি...

হ্যাঁ, হ্যাঁ!—ঘনাদা আমাদের থামিয়ে দিয়ে জ্ঞান দিলেন। ব্যাখ্যা করে বোঝালেন,—কুরুক্ষেত্রের ভারতযুদ্ধের আগে পরে যা যা হয়েছে দিব্যদৃষ্টিতে সবই ব্যাসদেবের জানা। তিনি রেখে ঢেকে কিছু বলবার মানুষ নন আর যত ঝড়ের বেগেই বলুন গণেশঠাকুরের সর্ট-হ্যাণ্ডে তা ধরা না পড়েই পারে না। তবু যে মহাভারত থেকে ওই মোক্ষম খবরটুকু বাদ পড়েছে তার মূল হল ওই সুড়সুড়ে পিঁপড়ে। ও মানে, ওরই সাড়ে তিন হাজার বছর আগেকার তস্য তস্য কোনো বাসাতুতু ভাই। পরমাণু ওদের চার থেকে সাত বছরের বেশী নয় বলে গড়পড়তা হিসেবে আদি সপ্তশত সঙ্ঘ-ভ্রাতা বলছি। কথায় কথায় বুকের মধ্যে যিনি বিশ্ব-রূপ দেখান, বিশ্বচরাচর যাঁর রেফারীগিরিতে চলে সেই চতুর চূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণ তাঁর মান বাঁচাতে ওই সামান্য পিঁপড়েটিকেই বেছে নিয়েছিলেন। পিঁপড়ে ত নয়, ও আদি কীটাবতার, একাই পৃথিবীর প্রথম পঞ্চমবাহিনী।

ঘনাদা থামলেন। আমাদের ধরা গলায় আর টুঁ শব্দটিও নেই দেখে ঘনাদা শেষ জ্ঞান-টুকুও দিলেন।

দুনিয়া যাঁর নখের টেলিভিশনে, কোথায় কি হচ্ছে তা আর তাঁর জানেত বাকি থাকে না। দ্বারকায় বসেই তিনি টের পেলেন ব্যাসদেব তাঁর কপট নিদ্রার বৃত্তান্ত এবার বলতে সুরু করছেন। গড় গড় করে বলে যাচ্ছেন ব্যাসদেব, সড় সড় করে কলম চলছে গণেশ ঠাকুরের, এমন সময় লেখার চৌকির ওপরই গড়িয়ে রাখা গণেশ ঠাকুরের শুঁড়টা সুড়সুড়িয়ে উঠল। অনেক-চেষ্টা করেও সামলাতে পারলেন না গণেশ ঠাকুর। দুর্দান্ত একটি হ্যাচ্চোতে পুঁথির পাতা উড়ল, কলমও থামল কটি পলকের জন্যে। আবার যখন চলল ব্যাসদেবের ডিক্টেশন, তখন কেষ্টঠাকুরের কারসাজি পার হয়ে গেছে।

বেড়াজালে ঘনাদা

চিলের ছাদে কিসের আওয়াজ?

কিসের আর, একজোড়া বিদ্যাসাগরী চটির।

বিদ্যাসাগরী চটির আওয়াজ তারপর চিলের ছাদের ওপর থেকে খোলা সিঁড়ি বেয়ে দোতালায়।

চটির আওয়াজ গোড়ার দিকে যা ছিল নিচে নামবার সঙ্গে সঙ্গে তার চেয়ে আস্তে হয়ে আসবে।

বারান্দায় এসে তা একেবারে থেমে যাবে কি?

না। একেবারে থামবে না তবে এখন আওয়াজটা হবে যেমন নিচু তেমনি আবার আস্তে। সে চটাপট চটাপট আর নেই, এখন ক্ষীণ একটু চট এর পর পটটা অনেক দেরি করে শোনা যাবে।

কেউ যেন থতমত খাওয়া পা দুটো কেমন হতভম্ব হয়ে কোন রকমে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

বিদ্যাসাগরী চটি পরা হতভম্ব হয়ে টেনে নিয়ে যাওয়া পা জোড়া কার?

তা কি আবার বলে দিতে হবে?

হ্যাঁ বুঝতে যা কারুর বাকি নেই ব্যাপারটা তাই, ও বিদ্যাসাগরী চটি পরা পা-জোড়া স্বয়ং ঘনাদার।

তা, তিনি তাঁর টঙের ঘর থেকে বেরিয়ে ছাদের খোলা সিঁড়ি দিয়ে নেমে বারান্দায় এসে অমন থতমত খাবেন কেন? আর তারপর কেমন হতভম্ব হয়ে যেন পা টেনে টেনে যাওয়ার কারণই বা কি?

কারণ গুরুতর। ঘনাদা ভোরবেলা উঠে তাঁর নিজের রুটিন মাফিক সব কিছু করার মধ্যে তেমন খেয়াল হয়ত না করতে পারেন, কিন্তু টিকে ধরিয়ে তামাকটি সেজে তাতে সুখটান দেবার জন্যে তৈরী হয়ে বেশ একটু অবাক হবেন।

তাঁর তামাক সাজা শেষ হবার আগেই ত বনোয়ারী বাহাদুরের ভালোমন্দ কিছু সমেত ধুমায়িত চায়ের পট পেয়ালার ট্রে নিয়ে হাজির হবার কথা। এখনো তার দেখা নেই কেন?

একটু খেয়াল করার পর নিচেটা কেমন যেন ঠাণ্ডা বলেও মনে হবে। সকাল বেলার নিয়ম মাফিক সাড়া শব্দ যেন পাওয়া যাচ্ছে না।

আরো মিনিট কয়েক ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করে ঘনাদাকে চিলের ছাদে বেরিয়ে আসতে হবে। সেখান থেকে গম্ভীর গলায় ডাকও দিতে হবে বনোয়ারী বলে।

তাতেও কোন সাড়া মিলবে না।

এবার বেশ একটু চিন্তিত হয়ে ঘনাদাকে সিঁড়ি দিয়ে নামতে হবে আশ্চর্য ব্যাপারটার খোঁজ নেবার জন্যে।

সিঁড়ি দিয়ে বারান্দা পর্যন্ত নামবার পরই কিন্তু চক্ষু স্থির।

বৈঠকী ঘরের দরজা বন্ধ শুধু নয়, তার কড়ায় মজবুত একটা তালা এঁটে ঝোলানো।

এই দৃশ্য দেখবার পর হতভম্ব হয়ে পা টেনে চলার আর অপরাধ কি? ঘনাদা ওই অবস্থাতেই সমস্ত বারান্দাটা পার হয়ে নিচের রান্না আর খাবার ঘর পর্যন্ত ঘুরে আসবেন নিশ্চয়।

সব দরজায় তালা ঝুলছে, মায় রান্নাভাঁড়ার খাবার ঘরে পর্যন্ত।

কি হল হঠাৎ বহাত্তর নম্বর বনমালী নস্কর লেনের? রাতারাতি কোনো যখ কি জিন ভোজবাজিতে সবাইকে উড়িয়ে নিয়ে গেছে নাকি? না, হঠাৎ মাঝরাতের কোনো হামলার ভয়ে সবাই একসঙ্গে বাড়ি ছাড়া?

তাহলে এতবড় একটা কাণ্ড হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও ঘনাদা কিছু টের পান নি কেন?

এ রকম দিশাহারা অবস্থায় কি করবেন এখন ঘনাদা এই খাঁখাঁ শূন্য পুরীতে?

সেইটেই দেখবার ব্যবস্থা করে রেখেছিলাম।

এবার আর শুধু মনে মনে কল্পনা করা নয়, পুরোপুরি ব্যাপারটা ঘটাবার জন্যে যা কিছু দরকার তার কোনটা বাদ দিইনি। রামভুজ আর বনোয়ারীকে সাচ্চা ঝুট নানা রকম যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে মাঝরাতেই চুপি চুপি বাহাত্তর নম্বর ছেড়ে রাতটা অন্য কোথাও কাটাতে রাজী করিয়েছি, নিচের রান্নাঘর ভাঁড়ার খাবার ঘর সমেত ওপরের বৈঠকীঘর নিয়ে আমাদের সকলের সব কটা ঘরের তালা যোগাড় করবার ব্যবস্থা করেছি আর ঘনাদার নাজেহাল অবস্থাটা স্বচক্ষে দেখবার জন্যে নিজেদের মধ্যে লটারী করে একজনকে শেষ তালাটা দিয়ে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যাবার জন্যে বাছাই করতেও ভুলিনি।

লটারীতে এ দুর্ভাগ্যটা শিশিরের ওপরই পড়েছে। লটারীতে ফাঁকি আছে বলে গোড়ায় বেশ একটু বেয়াড়াপনা করলেও এ ব্যবস্থা শেষপর্যন্ত শিশিরকে মেনে নিতে হয়েছে। বনোয়ারী আর রামভুজ চলে যাবার পর, আমাদের বাকি সকলকে এক এক ঘরে তালা বন্ধ করে রেখে শিশির বাইরে কোথাও গিয়ে রাতটা কাটিয়ে সকালে এসে আমাদের খালাস করবে এই হল ব্যবস্থা।

ব্যবস্থাটা একটু অন্যায় বলে মনে হচ্ছে কি?

ঘনাদাকে জব্দ করার দিক দিয়ে একটু হয়ত বাড়াবাড়িই আছে ব্যবস্থাটায়। তবু তার জন্যে নিজেদের খুব বেশী দোষ কি দিতে পারি?

যা জ্বালান তিনি জ্বালাচ্ছেন কিছুদিন ধরে, তাতে একটু দাওয়াই তাঁকে না দিলে নয়। আর যদি দিতেই হয় তাহলে কোনো কাজ যাতে হবে না এমন যাদুর গায়ে হাত বুলোন গোছের দাওয়াই দিয়ে লাভ কি। তাঁর ওল যতখানি বুনো, আমাদের তেঁতুলও তাই ততখানি বাঘা।

এমন বাঘা তেঁতুলের ব্যবস্থা করার আগে তাঁর তোয়াজ করতে কি কিছু বাকি রেখেছি? বুঝিয়েছি মিনতি করেছি, ঘুষও দিয়েছি যত খানি সম্ভব দুটি বেলা, শুধু বাঁকা ঘাড়টা অন্য দিকে একটু হেলাবার জন্যে।

কি বাহার ছাদটার হবে দেখবেন ঘনাদা!—শিবু তাঁকে লোভ দেখিয়েছে,—দরজা খুললেই

দেখবেন যেন ফুলের দেওয়াল। আর তার সঙ্গে কি সব পাখির মিষ্টি ডাক। বাহাত্তর নম্বর বনমালী নস্কর লেনে আছেন তাই ভুলে যাবেন।

আর আপনার খোলা ছাদ ঢাকা তো পড়ছে না।—শিশির বুঝিয়েছে,—শুধু মিহি তারের জাল দিয়ে সামনেটা ঘেরা থাকবে।

এসব শুনতে শুনতে কি করেছেন ঘনাদা? যেন কানেই যাচ্ছে না এমন ভাবে নিজের গড়গড়ার নলে টান দিতেই তন্ময় হয়ে থেকেছেন?

না। তা থাকেন নি বলেই তো মুস্কিল। তাঁর কালা বোবা সাজার প্যাঁচ আমাদের জানা। তা কটাবার উপায়ও আছে অনেক রকম।

কিন্তু এবার ঘনাদা যে নতুন চালাকি ধরেছেন। যেন উৎসাহভরে খোঁজ নিয়েছেন আমাদের ওই খবরের কাগজের ভাষায় যাকে বলে 'প্রকল্পের'।

ও! ছাদটাকে তোমরা ফুলের বাগান আর চিড়িয়াখানা বানাতে চাও?—যেন সরল ভাবেই জিজ্ঞাসা করেছেন,—তার জন্যে লোহার জালটাল দিয়ে সব ঢেকে দেবে?

না, না সব ঢাকব কেন?—আমাকেই মৃদু প্রতিবাদ জানাতে হয়েছে—ওই উত্তরের আলসের ওপর দুটো খুঁটি বসিয়ে তাতে লোহার খানিকটা জাল টাঙাবো, আর তার নিচে শুধু একটা লম্বা খাঁচা থাকবে জালের। টাঙানো জালে ফুলের লতা উঠবে আর খাঁচায় থাকবে দুর্গা-টুকটুকি, ফুলচুকি, মুনিয়া গোছের কটা পাখি।

খুব ভালো কথা!—ঘনাদা যেন আগ্রহই দেখিয়েছেন।

আর তখন আমাদের পায় কে? উৎসাহভরে আমাদের পেটে যা ছিল সব কিছু ঘনাদার কাছে উজাড় করে দিয়েছি।

আমাদের ভাগ্যে যে এখন মণিকাঞ্চন যোগ!—বলেছে শিশির।

শিবুর এক মামা এসেছেন আলিপুর হর্টিকালচারাল গার্ডেনে কাজ নিয়ে!—আমি ব্যাখ্যা করেছি,—আর গৌরের এক কাকা পেয়েছেন শহরে নতুন এক এভিয়ারি খোলার ভার।

এই দুজনের ভরসাতেই আমাদের এই মিনি বাগান বানাবার সখ।—বলেছে গৌর।

আর শেষ জোরালো যুক্তিটা জানিয়ে শিবু বলেছে,—এমন সুযোগ তো আর রোজ রোজ মেলে না!

ঠিক! ঠিক!—ঘনাদা শিবুর যুক্তিতেই যেন পুরোপুরি কাৎ হয়ে বলেছেন,—তা এতই যখন করছ তখন আমারও কিছু সাধ যদি মেটাতে...

মেটাতাম মানে!—আমরা সবাই তখনই একবাক্যে এক পায়ে খাড়া,—বলুন না কি চান? আপনার সাধ তো আমাদের কাছে হুকুম! সবার আগে সে সাধ না মেটালে বাগানই বাতিল।

আমাদের ভক্তির উচ্ছ্বাসেই যেন ভরসা পেয়ে ঘনাদা এবার তাঁর বাসনাটুকু জানিয়েছেন।

বেশী কিছু নয়,—একটু যেন দ্বিধা ভরেই বলেছেন ঘনাদা—তোমাদের ওই সব পাখির সঙ্গে আমার পছন্দের দুটো পাখি রাখতে বলছি। তার একটার জন্যে অবশ্য একটু স্পেশ্যাল জাল লাগবে!

তা লাগুক না যা লাগবার!—আমরা তাঁকে ঢালাও আশ্বাস দিয়েছি,—কোন ভাবনা নেই আপনার। বাজারের একেবারে সেরা জাল আমদানি করব দেখবেন, এখন পাখিদুটো কি বলুন।

ঘনাদা পাখিদুটোর নাম গোত্র সব জানিয়েছেন এবার।

একটাকে পাহাড়ী লোয়া বলতে পারো—ঘনাদা বিস্তারিত পরিচয়ই দিয়েছেন,—পোশাকী নাম হল ওক্রিসিয়া সুপারসিলিওসা, আর অন্যটাকে গুণগুনিয়া বলা যায়, পোশাকী নাম হল, মেল্লিসুগা হেলেনী।

ব্যস আর কিছু বলতে হবে না!—গৌর পকেট থেকে নোটবই বার করে পোশাকী আর ডাক নাম টুকে নিতে নিতে জের গলায় জানিয়েছে,—আগে আপনার পাখির ব্যবস্থা হয়ে তার পরে বাগানের কাজ সুরু।

ঘনাদাকে অত সহজে রাজী করতে পেরে হাতে একেবারে চাঁদ পেয়ে যেদিন নেমে এসেছিলাম সেই দিনই ঘণ্টা কয়েক বাদে সবাই চোখে অমন অন্ধকার দেখব তা কি জানতাম!

অন্ধকার দেখলাম গৌরের কথা শুনে।

ঘনাদার আবদার নোটবই-এ টুকে নিয়েই গৌর ছুটেছিল তার পক্ষীতত্ত্ববিদ কাকার কাছে।

সেখান থেকে ফিরে আসার পর তার মুখের চেহারা দেখেই আমরা সন্ত্রস্ত। ভগ্নদূতের পার্ট করতে হলে তার কাছে কিছু শেখা যায়।

গৌরের মুখে প্রথমে কোন কথাই নেই।

ব্যাপার কি?—জিজ্ঞাসা করতেই হ'ল উদ্বিগ্ন হয়ে,—ঘনাদার পাখি পাওয়া যাবে তো?

না।—উত্তর নয়, গৌর যেন একটি হাত-বোমা ছাড়ল।

পাওয়া যাবে না মানে?—তবু শেষ আশাটুকু আঁকড়ে ধরে জিজ্ঞাসা করলাম,—ঘনাদা বাজে গুল ছেড়েছেন? যা চেয়েছেন সেরকম কোন পাখি দুনিয়ায় নেই?

না, আছে ও ছিল!—গৌরই হেঁয়ালী ছাড়ল।

তার মানে?—খিঁচিয়ে উঠতে হল গৌরকেই,—এখন কি তামাসার সময়?

তামাসা করছি না।—গৌর প্রায় করুণ হয়ে বোঝাল,—সত্যিই যা বলেছি, তাই। উনি যা বায়না ধরেছেন তার একটা পাখি থেকেও নেই আর অন্যটা এককালে ছিল কিন্তু এখন নিপাত্তা। দুটোর কোনটাই তাই যোগাড় করা অসম্ভব।

আমাদের খোঁচাখুঁচিতে এরপর গৌর সবিস্তারে যা বোঝালে তাতে আমরা সত্যিই অকূল পাথারে।

ঘনাদা যে দুটি পাখি চেয়েছেন তার মধ্যে গুণগুনিয়া বা মেল্লিসুগা হেলেনী নিপাত্তা নয়। দুনিয়ায় এ পাখিটি যথেষ্ট সংখ্যাতেই আছে। তবে আমাদের ভারত ভূমিতে ত নয়ই, সমস্ত এশিয়া ইওরোপ আফ্রিকাতেও নেই। এ পাখিটিকে পাওয়া যায় শুধু মাত্র আমেরিকার উত্তর ও দক্ষিণের মাঝামাঝি অঞ্চলে। গুণগুনিয়া এর নামও নয়। দুনিয়ার সব চেয়ে ছোট প্রায় একটা ভোমরার মত ক্ষুদে এ পাখির চলতি নাম হ্যামিংবার্ড। ঘনাদা তাই থেকে গুণগুনিয়া বানিয়েছেন। ঘনাদার দ্বিতীয় পাখিটি কিন্তু দুনিয়াতেই আর আছে কি না সন্দেহ। পাখিটি আমাদের দেশের হলেও আঠারোশ ছিয়াত্তরে শেষ একবার নৈনিতালের পাহাড়ী জঙ্গলে পাবার পর আর কেউ এ পর্যন্ত এ পাখি কোথাও দেখেনি। পাহাড়ী লোয়া নামটাও হয়ত ঘনাদারই দেওয়া। পাখিটি কিন্তু নির্বংশ হয়ে গেছে বলেই মনে হয়।

গৌরের এ বিবরণ শুনে সবাইকে এবার মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়তে হয়েছে।

ঘনাদা যে ল্যাংটি মেরেছেন তারপর কি আমাদের করা উচিত?

সোজা তাঁকে গিয়ে অবশ্য চেপে ধরতে পারি, আজগুবী 'অন্যায় অবদার করেছেন' বলে।

কিন্তু তাতে নিজেরা গবেট বলে ধরা ত পড়বই, তার ওপর হিতে বিপরীত হতে কতক্ষণ?

তার চেয়ে সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলির প্যাঁচই ভালো। আমরা যে ডাহা উজবুক বনছি তা বুঝতে না দিয়ে ঘনাদার আবদারটা কোনরকমে পাল্টে দেবার ফিকিরে থাকা।

সেই ফিকিরেই তেয়াজ সাধাসাধি ঘষ কিছু আর বাকি রাখিনি। সেদিন বিকেলেই বনোয়ারীর সযত্নে বয়ে আনা জোড়া কবিরাজী কাটলেটের প্লেট তাঁর হাতে ধরিয়ে বলেছি,—মিস্ত্রীদের শনিবারই তাহলে কাজ সুরু করতে বলে দিই? কি বলেন?

শনিবারই কাজ সুরু করতে চাও বুঝি?—ঘনাদা কাটলেট জোড়ার সদ্ব্যবহার করতে করতে যেন ভাববার সময় নিয়েছেন।

তারপর চাঁছাপোঁছা প্লেটটি ট্রের ওপর রেখে চায়ের পেয়ালার দিকে হাত বাড়িয়ে জিজ্ঞাসা করেছেন,—তোমাদের সব যোগাড়-যন্ত্র হয়ে গেছে বুঝি?

তা একরকম হয়ে গেছে!—গৌর অম্লান বদনে বলেছে,—একটু শুধু অদলবদল হয়েছে আগের ফর্দের।

অদলবদল!—ঘনাদা চায়ের পেয়ালা মুখে তুলতে গিয়ে নামিয়েছেন।

হ্যাঁ—গৌর যেন তাঁর কোঁচকানো ভুরু জোড়া লক্ষ্য না করেই বলেছে,—ওই আপনার গুণগুনিয়া আর পাহাড়ী লোয়া-র বদলে আরো ভালো পাখির ব্যবস্থা করেছি।

আরো ভালো পাখি!—ঘনাদার মুখ এক মুহূর্তেই একেবারে আষাঢ়ের মেঘ। জোড়া কাটলেটের খুশির বাষ্পও সেখানে নেই।

কিন্তু এখন সে দিকে কালা কানা না সেজে উপায় কি? গৌর তাই যেন বাহাদুরী জানাতে বলেছে,—ভালো বলে ভালো! আপনার ওই গুণগুনিয়ার বদলে তুরপ আনাচ্ছি। মোল্লিসুগা হেলেনীর বদলে মুস্কিকাপা পার্ভা।

অনেক কষ্টে কাকার কাছ থেকে মুখস্থ করে আসা নাম দুটো বলে গৌরকে থামতে হয়েছে। ঘনাদার মুখে আর তখন কথাই নেই।

গৌর ততক্ষণে পরের মুখস্থ নাম দুটোও মনে মনে আউড়ে নিয়ে গড়গড় করে বলে গেছে,—আর আপনার ওই পাহাড়ী লোয়া-র বদলে আনছি চানক! ওফ্রিসিয়া সুপারসিলি ওসার জায়গায় কোটরনিক্স কোরোমাণ্ডালিকা।

হুঁ,—যেন পাতাল গুহা থেকে আওয়াজ বেরিয়েছে এবার,—তা অত কষ্টই বা করা কেন? তোমাদের চিড়িয়াঘরে তোমাদের পাখি-ই থাক। ভালো মন্দ কোন পাখিরই আমার দরকার নেই।

এই থেকে সুরু হয়ে একেবারে ছক-বাঁধা ধাপে ধাপে ঠাণ্ডা লড়াই তারপর এগিয়ে গেছে। প্রথম আমাদের আড্ডা ঘরে আসা বন্ধ তারপর নিজের ঘরে রামভুজকে দিয়ে দুবেলার খাবার আনানো, তারপর বনোয়ারী মারফৎ বার্তা প্রচার।

হামাকে ত এক গো লরি বন্দোবস্ত কোরতে বোলিয়েছেন বড়াবাবু।

পরের দিন বিকেলে আড্ডা ঘরে চা দিতে এসে বনোয়ারীর বিহ্বল করুণ অসহায়তা প্রকাশ।

লরি! লরি কি হবে বড়বাবুর?—আমার সন্দিগ্ধ প্রশ্ন।

আ লরি কি হবে বুঝলে না?—শিবুর জ্ঞান দান,—বড়বাবু দুর্জন সংসর্গ ত্যাগ করবেন ঠিক করেছেন।

তা করতে চান করুন।—গৌর এবার খাপ্পা,—কিন্তু তার জন্যে লরি কি হবে? ওঁর যা অস্থাবর তার জন্যে একটা টেম্পোও তো লাগে না। টঙের ঘরখানাই উনি লরিতে চাপিয়ে নিয়ে যাবেন নাকি? বেশ তাই যেন যান, আর যত তাড়াতাড়ি হয়।

রাগের অভিমানের হল্কাটা গৌরের মুখ দিয়ে বার হলেও আমাদের সকলের মনের কথাটা তখন এক।

হামেশা ভারী ভয় দেখান আমাদের ছেড়ে যাবেন বলে। কথায় কথায় এ হুমকি আর সহ্য হয় না। ছেড়ে যাওয়ার মজাটা ওঁকে বোঝানো দরকার।

বোঝাবার সেই পণ থেকেই এ কাহিনীর গোড়ার পরিকল্পনার জন্ম। সে পরিকল্পনা অমন বেয়াড়া ভাবে ভেস্তে যাবে তা কি জানি। জোর করে বলা যায় আমাদের কোথাও গলতি কিছু হয়নি। যেমন ছকা হয়েছিল পরিকল্পনাটা ঠিক সেই লাইন ধরেই এগিয়েছে। রাত ভোর না হতে রামভুজ আর বনোয়ারীকে আগে বিদেয় করে শিশির আমাদের কজনকে আড্ডাঘরেই তালা বন্ধ করে, অন্য সব কামরাতেও সেই সঙ্গে তালা লাগিয়ে বাহাত্তর নম্বর ছেড়ে বেরিয়ে গেছে।

বাড়ি ছেড়ে গেলেও বেশী দূরে কোথাও সে যাবে না। সকালে ওঠবার পর খাঁ খাঁ বাড়িতে ঘনাদার একটু উচিত শিক্ষা হবার পরই ফিরে এসে আমাদের তালা খুলে বার করবে।

শিশির যতদূর সম্ভব নিঃশব্দে তালা এঁটে চলে যাবার পর থেকেই আমরা একেবারে কান খাড়া করে সজাগ।

কিন্তু যার জন্যে এত আয়োজন, ছাদের সিঁড়িতে ঘনাদার সেই ভয়ে ভাবনায় নামা পায়ের আওয়াজ কই?

ঘনাদার খাওয়া শোয়া ওঠা বসা সব তো একেবারে ঘড়ি ধরা। আজ তাঁর সেই ঘড়িই বিকল হয়ে গেল নাকি? তাঁর এতটুকু সাড়া শব্দও নেই।

না। আছে। ওই তো চিলের ছাদে তাঁর বিদ্যাসাগরী চটির কেমন একটু অধৈর্যের চট-পট ফট-ফট্। তারপর খোলা সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে সে অধৈর্যের আওয়াওয়াজটা একটু দ্বিধা সংশয়ে ঢিমে হয়ে আসা।

তারপর ঠিক যেমনটি কষে রাখা হয়েছিল ঘনাদার পদধ্বনি একেবারে সেই ছন্দে মেলানো।

বারান্দায় নেমেই চটপটের জায়গায় চটি জোড়ায় যেন একটু ঘসটে চলা। ঘনাদা এখন হতভম্ব হয়ে তালাগুলো দেখছেন নিশ্চয়।

আড্ডাঘরের সামনে থেকে যেন নেহাৎ দিশাহারা হয়ে পরের কামরাটা পর্যন্ত পা দুটো টেনে নিয়ে যাওয়া।

তারপরই সভয়ে আবার ওপরের দিকে ছুটের উপক্রম।

কি ব্যাপার কি ঘনাদা!

ঠিক একেবারে কাঁটায় কাঁটায় মিলিয়ে সেই মুহূর্তে নিচের সিঁড়ি দিয়ে উঠে শিশিরের যেন বিস্মিত সম্ভাষণ।

সেই সঙ্গে ঝটপট তালা খুলে দেওয়ার সঙ্গে আমাদেরও ও ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ঘনাদাকে ঘিরে ধরা।

এ কি আপনি এমন সময় এখানে!—আমাদের কেমন একটু সন্দিগ্ধ জিজ্ঞাসা।

হাতে হাতে ধরা পড়ে এবার ঘনাদা একেবারে বেড়াজালে ঘেরা।

কোন দিকে কোন ফাঁক নেই পিছলে বার হবার। কি করবেন এখন, কি বলবেন?

ঘনাদা কিন্তু বললেন। যা বললেন তাতে সবাই আমরা হাঁ। আমরা তাঁকে লজ্জায় ফেলব কি, তিনিই আমাদের অভয় দিলেন।

না আর কোন ভয় নেই।—ঘনাদার দাঁড়াবার ভঙ্গি থেকে গলার স্বরে পর্যন্ত পরম বরাভয় আশ্বাস আর সেই সঙ্গে আমাদের প্রশস্তি,—খুব ভালো করেছ দরজায় তালা লাগিয়ে রেখে। ঐ তালা দেখেই চলে গেছে।

এসব শুনে মাথায় চক্কর দেওয়াটা খুব অন্যায় নিশ্চয় নয়। কিসের ভয় ছিল আর কেন তা আর নেই, দরজায় তালা দেখে কে-ই বা চলে যাওয়ায় আমাদের বিপদ কাটল এসব খোলসা করবার জন্যে ঘনাদাকে আর ওপরে যেতে না দিয়ে বৈঠকী ঘরেই টেনে নিয়ে যাওয়া ছাড়া কি করতে পারি তখন?

বনোয়ারী রামভুজের এখনো আসতে দেরী হবে হয়ত, কিন্তু আরাম কেদারাটা আছে, শিশিরের সিগারেটের টিনও। তাই প্রণামী দিয়ে জিজ্ঞাসা করতে হল,—দরজায় তালা দেখে চলে গেছে কে?

কে আর!—ঘনাদা শিশিরের ধরিয়ে দেওয়া সিগারেটে জুত করে টান দিয়ে বললেন—সেই সেরা দো মারের শিকারের আস্তানা থেকে হন্যে হয়ে যে আমায় সারা দুনিয়া খুঁজে বেড়াচ্ছে সেই কাল পাউলো।

কাল পাউলো!—নামটা দুবার জিভে সড়সড় করে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম,—সেই পাউলোকেই আপনার ভয়? তা সে আপনাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে কেন! মারবে টারবে নাকি?

হ্যাঁ, পারলে সে আমায় পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে কাটবে কিন্তু তার আগে সেরা যো মার-এর ধাঁধাটার উত্তর না বার করতে পারলে শান্তি পাবে না।

ওই পাউলোকে একটা ধাঁধা শুনিয়ে তার উত্তর না জানিয়ে পালিয়ে এসেছিলেন বুঝি!—আমাদের বলতেই হল,—খুব অন্যায় কিন্তু।

হ্যাঁ অন্যায় একদিক দিয়ে তো বটেই।—ঘনাদা স্বীকার করলেন,—তা ছাড়া কার্ল পাউলোর ধারণা তার সঙ্গে আমি বিশ্বাসঘাতকতা করেছি।

সত্যি তাই করেছেন নাকি?—আমাদের গলায় অবিশ্বাস।

হ্যাঁ, যা করেছি তা একরকম বিশ্বাসঘাতকতাই ভাবতে পারে পাউলো। কারণ সে-ই তো আমায় সঙ্গে করে তার নিজের প্লেনে....

ঘনাদা থামলেন। তাঁর দৃষ্টি অনুসরণ করে চোখ ফিরিয়ে দেখি দরজায় স্বয়ং শ্রীমান বনোয়ারী হাজির। আমাদের নির্দেশ মত ভোরটা পার করে দিয়ে রামভুজের সঙ্গে সে যথা-সময়ে ফিরে এসেছে।

অবস্থাটা আমাদের পক্ষে একটু অস্বস্তির হতে পারত, কিন্তু গৌর চায়ের সঙ্গে টা হিসেবে টোস্ট, ডবল অমলেট আর পাড়ার বিখ্যাত খাস্তা কচুরির লম্বা ফরমাস দিয়ে সেটা কাটিয়ে দিলে।

ঘনাদাকে এবার আর উস্কে দেবার দরকার হল না। বাহাত্তর নম্বর বনমালী নস্কর লেন থেকে সোজা কার্ল পাউলোর প্লেনে গিয়ে উঠলেন আমেরিকার টেক্সাসের ডালাস শহরের এয়ার পোর্টে।

বললেন,—ডালাসের এয়ার পোর্টে আমি পাউলোকে দেখে যতখানি বিব্রত, সে আমায় দেখে ততখানি অবাক আর খুশী।

আরে দাস! তুমি এখানে কি করছ?—দূর থেকে আমায় দেখেই কাছে এসে পেটে একটা বুলডোজার মার্কা আদরের গুঁতো দিয়ে পাউলো বললে,—তোমার সঙ্গে এখানে দেখা হবে ভাবতেই পারিনি।

আমিও পারিনি!—পেটের আচমকা গুঁতোটার ঠেলা একটু কষ্ট করে সামলে নিয়ে বললাম,—তা এখন চলেছ কোথায়?

কোথায় যাচ্ছি দেখতেই তো পাবে!—বলে পাঁচমণি বপুটি কাঁপিয়ে পাউলোর সে কি হাসি!

আমি দেখতে পাব।—তার লাউঞ্জ ফাটানো হাসির মাঝখানে বলতেই হল, অবাক হবার ভান করে,—কি বলছ?

ঠিকই বলছি।—হাসির মাত্রাটা একটু শুধু কমিয়ে বললে পাউলো,—তুমি তো আমার সঙ্গেই যাচ্ছ। দেখা যখন হয়েছে তখন আর তোমায় ছাড়ি!

ছাড়লে না সত্যিই। কার্ল পাউলোর হাত থেকে ছাড়া পাওয়ার চেয়ে ব্রেজিলের আনা-কোণ্ডার পাক কি অক্টোপাসের নুলোর আলিঙ্গন ছাড়ানো সোজা।

পাউলোর সঙ্গে দেখা হয়ে তারই প্লেনে সঙ্গী হয়ে যাওয়া নেহাত নিয়তির বিধান বলেই মেনে নিয়ে শেষ পর্যন্ত বেশী আপত্তি করলাম না। নিজের প্লেনের টিকিট আমার পকেটেই রইল, সেইসঙ্গে জুয়ান ভার্গাসের চিঠিটাও।

ডালাসের এয়ার পোর্টে প্লেনে চড়তেই আমি এসেছিলাম। তবে সেটা নেহাত সাধারণ প্যাসেঞ্জার প্লেনে, পাউলোর নিজস্ব জেট বিমান নয়। সে প্যাসেঞ্জার প্লেনে গেলে আমার যা গন্তব্য সেখানে একটু দেরিই হত ঘুরপথে পৌঁছোতে। কার্ল পাউলো আমার সে কষ্টটুকু যদি জোর করে বাঁচিয়ে দেয় তাহলে কত আর আপত্তি করা যায়?

নিজস্ব প্লেনটা পাউলো একেবারে বাদশাহী মেজাজে সাজিয়েছে। কোন সুখ স্বাচ্ছন্দ্যেরই সেখানে অভাব নেই। প্লেনে নয় পাউলোর নিজের বাড়িতেই যেন বসে আছি।

সেই বাদশাহী বিলাসের মধ্যে বসিয়ে প্লেনে যেতে যেতে পাউলো তার নতুন পরিকল্পনার কথা সোৎসাহে আমায় শোনালে।

ব্রেজিলের মাথায় উত্তর-পূব দিকে সেরা দো মার পর্বতমালা। সেই সেরা দো মার-এর দক্ষিণে বিরাট এলাকার সে মালিক। সেখানে সে এতদিন শুধু শিকারে গিয়ে থাকবার একটা আস্তানাই করে রেখেছিল। এখন সেখানে সে রবারের একটা বিরাট কারখানা বসাতে চায়। মোটর এরোপ্লেন ইত্যাদির টায়ার টিউব থেকে শুরু করে রবারের যা কিছু সম্ভব সব সেখানে তৈরী হবে। ও অঞ্চলে মজুরী সস্তা। দুনিয়ার সেরা বেলেম-এর রবারও কাছেপিঠেই জন্মায়। তা ছাড়া সমুদ্রের কাছে আর আবহাওয়া জুৎসই বলে মাল তৈরী আর চালানের অন্য সুবিধেও যথেষ্ট। এমন একটা লাভের পরিকল্পনা শুধু এক তেএঁটে হাড়বজ্জাতের বদমায়েসীর দরুন ভেস্তে যেতে বসেছে।

এতদূর পর্যন্ত শুনে একটু অবাক হবার ভান করে বলতেই হল,—তাই নাকি?

শোন না আগে!—তার রবারের কারখানায় যে বাদ সাধছে তার ওপরকার রাগটা একটা দুরমুশপেটানো কিলে আমার পিঠেই ঝেড়ে পাউলো বললে, কয়েক বছর আগে এ কারখানার কথা যখন মাথায় আসেনি তখন না বুঝে এক হতভাগা জুয়ান ভার্গাসকে ওখানকার অনেকখানি জায়গা ইজারা দিয়েছিলাম। সে হতভাগা জুয়ান সেখানে গরু ঘোড়ার 'র‍্যাঞ্চ' বসিয়েছে। এখন এত সাধাসাধি করছি, তার ইজারার টাকা ফেরৎ দিয়ে গরু ঘোড়া সমেত সমস্ত 'র‍্যাঞ্চ' কিনে নেব বলছি তবু সে বদমাসটা কিছুতেই তার দখল ছাড়বে না। ডেকে পাঠালে আসে না। জোক দিয়ে বলে পাঠায় যে রবারের কারখানার চেয়ে গরু ঘোড়ার কারবার অনেক পবিত্র জিনিস। প্রাণ থাকতে তার দখল সে ছাড়বে না। এরকম বদমায়েসকে শায়েস্তা করবার সোজা ওষুধ আছে। কিন্তু মুস্কিল হয়েছে এই যে কারখানা বসানো ব্যাপার নিয়ে ওই জুয়ানের সঙ্গে গোলমালের কথাটা রাজধানী ব্রাসিলিয়ার খাস দপ্তরে পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। খবরের কাগজেও লেখালেখি হয়েছে এই নিয়ে। এখন হঠাৎ ওই বদমাসটার ভালোমন্দ কিছু হয়ে গেলে বড় বেশী জবাবদিহির দায়ে পড়তে হতে পারে। কারখানা তাতে আরো পিছিয়ে যাবে।

একটু থেমে আমার আগাপাস্তলা একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে তার আসল মতলবটা জানালে পাউলো।

গলায় যেন একটু আদর ঢেলে বললে,—তোমাকে যে পেয়ে গেছি এইটেই আমার ভাগ্য দাস। তোমায় একটা কাজ আমার করে দিতেই হবে। সেই জন্যেই তোমায় ধরে নিয়ে যাচ্ছি।

মুখে কিছু না বলে তার দিকে অবাক হয়ে চাওয়া চোখেই প্রশ্নটা রাখলাম।

তুমি প্যাঁচের রাজা।—আমায় তাতিয়ে বললে পাউলো,—যে কোন ফিকিরে হোক ওই পাজি জুয়ান ভার্গাসকে তোমায় বাগ মানাতে হবেই।

আমাকে!—এবার বিস্ময়ে সরব হলাম।

হ্যাঁ তোমাকে!—সঙ্গে সঙ্গে কার্ল পাউলোরও মুখের চেহারার সঙ্গে গলার স্বরটা বদলাল। আগের সে মধু আর নেই।

না, না ওসব আমি পারব না!—ইচ্ছে করেই আপত্তিটা বেশ জোর দিয়ে জানালাম,—আমায় খাতির করে নিয়ে যাচ্ছ, যাচ্ছি। তোমার ওসব ঝামেলায় আমি ঘাড় পাতব কেন?

সঙ্গে সঙ্গে ঘাড়ের ওপর প্রচণ্ড একটি রদ্দা।

ঘাড় পাতবি জান বাঁচাবার জন্যে রে কেলে নেংটি!—পাউলোর গলা যেন এবার কার্বলিক অ্যাসিডে [illegible],—তোর মত একটা উচ্চিংড়েকে কি এমনি ধরে নিয়ে যাচ্ছি মনে করছিস! ভুজং [illegible] ঠুকে, যা করে হোক, জুয়ান ভার্গাসের ও ইজারা বাতিল করতে তোকে হবেই! [illegible] না পারিস চুরি করবি ওর সে ইজারার দলিল। কি? বুঝেছিস এবার?

মাথা নেড়ে জানালাম যে বুঝেছি। তারপর বেশ যেন ঢিট্ হওয়া করুণ বশংবদ গলায় জানালাম,—কিন্তু আমায় তাহলে একটু সুবিধে দিতে হবে যে।

কি সুবিধে?—কার্ল পাউলো খেঁকিয়ে উঠল।

একটু ঘুরে ফিরে বেড়াবার সুবিধে।—যেন ভয়ে ভয়ে নিবেদন করলামও তল্লাটে দু-চার-দিন টহলদারি করতে করতে ওই তোমার কি নাম, জুয়ান না তুয়ানের সঙ্গে ভাব জমাতে হবে ত। নইলে হট্ করে গিয়ে হাজির হলে সন্দেহ করবে যে।

থাম্ থাম্।—ধমকে থামিয়ে দিয়ে পাউলো বললে,—বেশী বকতে হবে না। ঘোরাফেরা করার জন্যে আমার শিকারের আস্তানার একটা জীপ-ই তুই পাবি। আর কিছু চাস?

না।—কৃতজ্ঞতায় প্রায় গলে গিয়ে জানালাম,—ওই জীপটা যে দিচ্ছ সেই দয়াই যথেষ্ট।

কিন্তু তুই....?—হঠাৎ একটু যেন সন্দিগ্ধ সুরে পাউলো জিজ্ঞাসা করলে,—তুই তো শুধু ওই একটা ফোলিওব্যাগই সঙ্গে এনেছিস। আর কিছু নেই?

না। আর কিছুতে কি দরকার?—সবিনয়ে জানালাম,—আকাশে উড়তে যত হাল্কা থাকা যায়।

কোঁচকানো ভুরুজোড়া সোজা হয়ে এলো এবার। পাউলো একটু ঠাট্টার সুরেই জিজ্ঞাসা করলে,—কি আছে ও ব্রীফ-কেসে! কি এমন দামী নথিপত্র?

না, সেসব কিছু নেই।—সরলভাবেই জানালাম দাঁতমাজা দাড়ি কামানোর সরঞ্জাম আর এক প্রস্থ হাল্কা পোশাক বাদে যা আছে তা শুনলে হাসবে।

বেশ হাসা তাহলে।—পাউলোর মেজাজ এখন খোশ।

আস্তে আস্তে বেশ স্পষ্ট করে বললাম,—আছে খানিকটা জাপানী কুয়াশা, এক কৌটো ভেসলিন, ছোট্ট এক শিশি ডাইফেনাডিয়োন আর এক জোড়া মোটা চামড়ার দস্তানা।

সেকেণ্ড খানেক সামান্য ভুরু কুঁচকে থেকে সত্যিই এবার হেসে ফেললে পাউলো। তারপর একটু কড়া গলাতেই বললে,—ওসব ভড়কি আর যাকে পারিস দিস। কাজ যা দিয়েছি তা হাসিল করতে না পারলে ওসব ভড়কি তোর সঙ্গে গোরেই যাবে মনে রাখিস। নামবার পর এক হপ্তা তোকে সময় দেব। তার মধ্যে জুয়ান ভার্গাসকে বাগ মানানো চাই-ই।

নীরবে মাথা নেড়ে সায় দিতে দিতে মনে মনে বললাম,—আমার পকেটের জুয়ান ভার্গাসের চিঠিটা যদি এখন দেখতে পেতে পাউলো!

সেরা দো আর পাহাড়ের ধারে কার্ল পাউলোর শিকারী আস্তানায় নামবার পর নিজের একটা কামরা পেয়ে একটু নিরিবিলি হবার পর জুয়ান ভার্গাসের চিঠিটা আবার বার করে পড়লাম।

চিঠির কথাগুলো আমার প্রায় অবশ্য মুখস্থ হয়ে গেছে। নিউ অর্লিন্স্ থেকে ওয়াশিংটন যাবার পথে আমার ট্রাভেল এজেন্সী মারফৎ এই চিঠিটা পেয়েই আমি প্ল্যান বদলে ডালাস থেকে ব্রেজিলের ব্রাসিলিয়া প্যাসেঞ্জার প্লেন ধরবার জন্যে এয়ার পোর্টে গিয়েছিলাম। সেখানে যেন নিয়তির নিজের কারসাজিতে কার্ল পাউলোর সঙ্গে দেখা। সে অমন জোর করে ধরে না নিয়ে এলে বেশ একটু ঘুরপথে আরো দেরিতে এই জুয়ানের কাছে আমায় পৌঁছোতে হত। জুয়ান যে দারুণ ব্যাপারের কথা লিখেছে তাতে যেমন করে হোক না এসে অবশ্য আমি পারতাম না।

জুয়ান তার চিঠিতে প্রায় দিশাহারা হয়ে আমার সাহায্য চেয়েছে। বেশ কয়েক বছর আগে এই অঞ্চলের বিস্তৃত জমি ইজারা নিয়ে সে যখন গরু ঘোড়ার পাল বাড়াবার 'র‍্যাঞ্চ' বসায় তখনকার কথা আমি জানি। নিজের যা কিছু সম্বল সব সে এই আকাট র‍্যাঞ্চে ঢেলে দিয়েছিল। সে দুঃসাহস তার বৃথা হয়নি। এই ক'বছরে তার 'র‍্যাঞ্চ'—সব দিক দিয়ে সার্থক হয়ে উঠছিল। হঠাৎ কোথা থেকে এক সর্বনাশা অভিশাপে সব ছারখার হবার জোগাড়। তার গরুর ঘোড়ার পালে ভয়ঙ্কর রকম মড়ক লেগেছে। সে মড়কের কারণও অবিশ্যি পালে পালে তার গরু ঘোড়া মরছে জলাতঙ্ক রোগে। ভয়ে দুর্ভাবনায় তার মাথা খারাপ হয়ে যাবে বলে মনে হচ্ছে। তার এ অঞ্চলের জমির মালিক কার্ল পাউলো কিছুদিন থেকে তার কাছে জমিগুলো ফেরৎ চাইছে। কারখানা বসিয়ে এই পবিত্র সুন্দর অঞ্চলটা নোংরা বিষাক্ত করতে

দিতে চায় না বলে এতদিন সে পাউলোর পেড়াপিড়ি বা হুমকি কিছুতেই আমল দেয়নি। কিন্তু এবার বোধহয় নিরুপায় হয়ে তাকে নিজে থেকে সেধেই ড্যাগু বেচে চলে যেতে হবে। এই বিপদের মধ্যে শেষ পরামর্শের জন্যে সে আমায় ডেকে পাঠিয়েছে।

কার্ল পাউলো আমায় সাতদিন মাত্র সময় দিয়েছিল।

সাতদিন কিন্তু আমার লাগল না। মেয়াদের দুদিন বাকি থাকতেই সেদিন বিকেলে পাউলোর নিজের কামরায় গিয়ে হাজির হলাম। হাতে আমার নিজের ব্রিফকেসটি।

পাউলো তখন তার আরাম কেদারায় গা এলিয়ে কি একটা ডায়রি গোছের খাতায় পাতা ওল্টাচ্ছে।

কোন সম্ভাষণ না করে তার কাছেই একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলাম।

একটু চমকে ওঠার সঙ্গে মুখটা একটু লাল হয়ে উঠলেও পাউলো নিজেকে সামলালে। তারপর গলার স্বরটা যথাসম্ভব হাল্কা করে জিজ্ঞাসা করলে,—কি? এ ক'দিন তো ছুলোর টিকিটি দেখতে পাইনি। কেন? আর দুদিন মাত্র বাকি তা মনে আছে?

দুদিন আর লাগবে না।

আমার গলায় তাচ্ছিল্যের সুরটাতেই কেমন একটু সন্দিগ্ধ হয়ে পাউলো একটু সোজা হয়ে উঠে বসে ভ্রূকুটির সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলে,—লাগবে না মানে? কাজ হাসিল হয়ে গেছে এর মধ্যে? জয়ান ভাগাস রাজী হয়েছে?

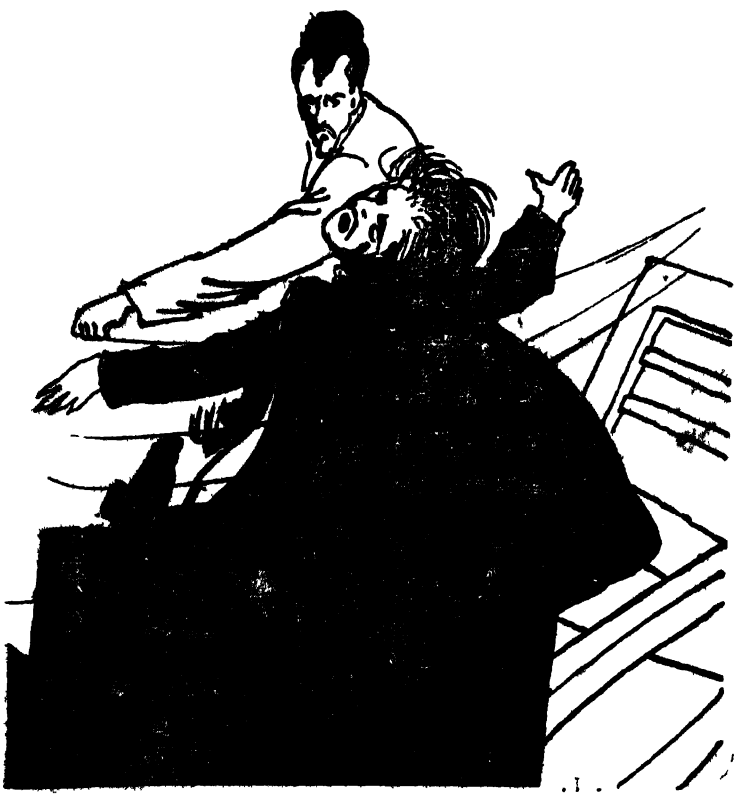

জয়ান ভার্গাসের রাজী না রাজী হওয়ার কি আছে!—আগের মতই তাচ্ছিল্যের সুরে বলেছি,—তার সঙ্গে দেখাই করিনি। হয়নি মানে করিনি।

তার সঙ্গে দেখাই করিসনি!—রাগে পাউলোর মুখ দিয়ে যেন ফেনা বেরুবে মনে হল,—আর পাঁচ দিনে কাজ হাসিল করে তুই আমার কাছে সাহস করে এসে বসেছিস!

পাউলো ক্ষ্যাপা ষাঁড়ের মত ইজি চেয়ারটার খোল থেকে উঠতে গেল।

পিঠে একটি ছোট্ট কিল দিয়ে তাকে আবার কেদারাতেই বসিয়ে দিয়ে বললাম,—অস্থির হচ্ছ কেন মিছিমিছি? আসল যা কাজ তা পাঁচ দিনে সত্যিই হাসিল হয়ে গেছে যে! আজ এক বছর ধরে মোক্ষম শয়তানী ফন্দি তুমি খাটাচ্ছ বটে। আমার সঙ্গে এবারের প্লেনেও একটি ব্লেটে শয়তানী চক্রান্তের সব যমের দূতদের বয়ে এনে নামাতে দেখলাম। তাদের সব শেষ কিন্তু এবার খতম। জয়ান ভার্গাসকে বাগ মানাতে না পেরে তাকে একেবারে খুন করে মরবার যে ফন্দি তুমি করেছিলে তা যেমন পৈশাচিক তেমনি ভয়ঙ্কর। কোথাও কিছু নেই, তার গন্ধ ঘোড়া পালে পালে আচমকা মারা যেতে শুরু করল এক বছর আগে থেকে। আর মারাও যাচ্ছে এ রোগ সে রোগ নয় হাইড্রোফোবিয়া মানে জলাতঙ্ক রোগে যার চিকিৎসা নেই। কোথা থেকে এ রোগ এল গূঢ় রহস্য না জানলে কেউ ভেবেও পাবে না। কজন জানে যে জলাতঙ্ক রোগের শুধু ক্ষ্যাপা কুকুরের কামড়েই হয় না, তার চেয়ে মারাত্মক উৎস এ রোগের আছে!

পাউলো আমায় একবার লাফিয়ে ওঠবার চেষ্টা করতে একটি আলতো রদ্দায় তাকে কেদারায় বসিয়ে দিয়ে বললাম,—সে উৎস হল প্রাণীজগতের সত্যিকার রক্তখাকী এক রাক্ষসী, ডেসমোডাস্ রোটান্ডাস, যার চলতি নাম হল ভ্যাম্পায়ার বাদুড়। ভ্যাম্পায়ার সম্বন্ধে সত্য মিথ্যে অনেক রকম কিংবদন্তীই আছে। প্রাণীটিকে চোখে দেখলে তার সর্বনাশা ভীষণতা বোঝা কঠিন। এক কাঁচ্চা থেকে খুব বেশী হলে তিন কাঁচ্চা এই জীবটির ওজন। কিন্তু রাত্রে ঘুমন্ত মানুষ গরু ঘোড়ার রক্তই শুধু সে চুষে খেয়ে যায় না, সাংঘাতিক জলাতঙ্ক রোগের বিষও শরীরে ঢুকিয়ে দিয়ে যায়। ভ্যাম্পায়ার বাদুড়ের এই ভয়ঙ্কর ক্ষমতার কথা জেনে তুমি অনেক টাকা খরচ করে বিশেষভাবে তৈরী কাঠের খাঁচায় তোমার প্লেনে বেশ কিছু ঝাঁক সে বাদুড় আনিয়ে জয়ানের র‍্যাঞ্চের কাছাকাছি সেরা দো মার পাহাড়ের গুহায় তা ছাড়বার ব্যবস্থা করেছ। এবারও এক ঝাঁক তুমি এনে ছাড়তে ভোলনি। কিন্তু সব শয়তানী ফন্দি তোমার ভুল। যত ভ্যাম্পায়ার তুমি ছেড়েছ তার একটাও আর বেঁচে নেই। কাল নিজে গিয়ে সবগুলো পরীক্ষা করে তুমি দেখে আসতে পারবে। আসল মরণকাঠি নেড়ে রক্তচোষা মরণ-বিষ-ছড়ানো সব রাক্ষসী আমি শেষ করে দিয়ে যাচ্ছি।

শেষ একটি থাবড়ায় পাউলোকে ইজিচেয়ারে একেবারে চিৎ করে শুইয়ে দিয়ে বললাম,—অকারণে ব্যস্ত হয়ো না। এখন ওঠার চেষ্টা করে কোন লাভ নেই। তুমি যতক্ষণে উঠে দাঁড়াবে ততক্ষণে আমি তোমারই দেওয়া জীপে প্লেনে পৌঁছে যাব। সেখানে একজন পাইলটকে আমি সব কথা বলে নিজের দলে টেনেছি। আর একজনকে আগে থাকতে সেখানে বেঁধে রাখবার ব্যবস্থা আছে। তোমার প্লেন আমি চুরি করব না। শুধু কিছুক্ষণের জন্যে ধার নিয়ে ওই প্লেনে হুভুরাস কি গুয়াতেমেলা কোথাও গিয়ে নামব। বেঁধে রাখা পাইলট ছাড়া পেয়ে সেখান থেকে তোমার প্লেন ফিরিয়ে নিয়ে আসবে। তোমায় শেষ একটা উপদেশ। এর পর আর কোন শয়তানী চালাকির চেষ্টা কোরো না। এখানে কারখানা বসানোর মতলব ছেড়ে অন্য কোনো কারবারে তোমার শয়তানী বুদ্ধি খাটাও গিয়ে। আচ্ছা বিদায়!

আমি উঠে আসতেই কেদারা থেকে ওঠবার চেষ্টা করে পাউলোর সে কি করুণ মিনতি!

শোনো, শোনো দাস! সত্যি তোমার কাছে হার স্বীকার করছি। রাক্ষসী ভ্যাম্পায়ারদের মরণকাঠি কি তা-ই শুধু বলে যাও!

কে তার জবাব দেয়!

তার আকুল মিনতি জীপের আওয়াজেই তখন চাপা পড়ে গেছে।

ঘনাদা থামলেন।

দরজায় ট্রে হাতে বনোয়ারী। ট্রে থেকে প্লেট নামানো থেকে সেটি একবারে চাঁছাপোঁছা না হওয়া পর্যন্ত ঘনাদার মুখে আর কথা নেই।

আমাদেরও ধৈর্য অসীম।

প্লেটটা তিনি নামাবার পরই মুখিয়ে থাকা কথাটা জানালাম।

জবাবটা কিন্তু আমাদের যে চাই। রাক্ষুসীদের মরন কাঠিটা কি ঘনাদা?

মরন কাঠিটা হল, শিশিরের এগিয়ে দেওয়া সিগারেটের টিনটা খুলতে খুলতে ঘনাদা বললেন,—ওই ডাইফেনাডিয়োন। মানুষের, বিশেষ করে হার্টের রুগীর পক্ষে এটা দামী ওষুধের সামিল, কিন্তু ইঁদুর বাদুড় গোছের প্রাণী মারবার একেবারে ব্রহ্মাস্ত্র। রক্ত চুষে যারা বাঁচে এ ওষুধ তাদের রক্ত জল করে দিয়েই মারে। ওষুধটার গুন জানবার পরও এটা ব্যবহারের উপায় প্রথমে পাওয়া যায় নি। রাক্ষুসে ভ্যাম্পায়ার বাদুড় এ ওষুধ খেলে সহবে। কিন্তু তাদের খাওয়ান যাবে কি করে? এক একটা করে বাদুড় ধরে ওষুধ গেলানো তো যায় না। ভ্যাম্পায়ার বাদুড়ের একটা অভ্যাসের কথা জেনে এ সমস্যার আশাতীত সমাধান বার করা গেছে। ভ্যাম্পায়ারের একটা অভ্যাস হলো বাঁদরদের মত পরস্পরের গা চেটে পরিস্কার করা। চামড়ার দস্তানা পরা হাতে একটা রাক্ষুসীকে ধরে তার গায়ে আধ চামচ ভেসলিনের সঙ্গে মাত্র পঞ্চাশ মিলিগ্রাম ডাইফেনাডিয়োন মিশিয়ে লাগিয়ে দিলেই হল। একটা ওষুধ মাখানো রাক্ষুসীর গা চেটে গোটা পঁচিশ ত্রিশ অন্য রাক্ষুসীর ভবলীলা শেষ হবে।

কদিন ধরে পাউলোর জীপে ঘুরে ঘুরে ভ্যাম্পায়ার বাদুড়ের গুহাগুলো খুঁজে বার করে এই কাজই করেছিলাম। পাউলো তার শয়তানী ফন্দিতে মোটমাট ষাট-সত্তরের বেশী ভ্যাম্পায়ার আমদানি করতে পারেনি। তার উদ্দেশ্য অবশ্য তাতেই সিদ্ধ হয়েছে। আমারও সুবিধে হয়েছে দিন তিনেকের মধ্যে তাদের সব কটাকে খতম করার।

ওষুধের গুণ যতই হোক ওই জাপানী কুয়াশা যাকে বলছি তা না থাকলে সব কিছুই মিথ্যে হয়ে যেত। জাপানী কুয়াশা আসলে হল কুয়াশার মত সুক্ষ্ম নাইলনের একরকম অদৃশ্য জাপানী জাল। তার সুতোগুলো এত সুক্ষ্ম যে রাত্রে তা অতি তীক্ষ্ম চোখের দৃষ্টিতেও একেবারে দেখাই যায় না, বাদুড়দের শব্দতরঙ্গও তাতে কাজ করে না। অত বেশী মিহি বলেই এ জালের নাম জাপানী কুয়াশা জাল।

ভ্যাম্পায়ারদের গুহার মুখে এই কুয়াশা জাল টাঙিয়েই তাদের সবকটাকে আমি ধরতে পেরেছিলাম।

ঘনাদা মুখের সিগারেট ধরিয়ে যথারীতি শিশিরের টিনটা ভুলে হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন।

তিনি দরজার কাছে যাবার পর শেষ প্রশ্নটা হঠাৎ মনে পড়ল।

গলা ছেড়ে জিজ্ঞাসা করলাম,—আচ্ছা এতদিন বাদে ওই কার্লস পাউলো আপনার খোঁজ পেল কি করে?

ওই জাপানী কুয়াশা থেকে!—ঘনাদা ফিরে দাঁড়িয়ে অনুগ্রহ করলেন,—চলে আসবার পর নির্দেশ লিখে ওটা ওষুধপত্র সমেত জরুরান ভার্গাস-এর কাছে পার্শেল করে পাঠিয়েছিলাম কিনা। সেদিন আবার তোমাদের চিড়িয়াঘরের কথায়, আশার গুণগুনিয়া রাখবার জন্যে জরুরানের কাছে সেটা আবার চেয়ে পাঠিয়েছি। সেই চিঠি কোন ভাবে পাউলোর হাতে পড়েছে বোধহয়। জাপানী কুয়াশা সুতরাং আর পাবার আশা নেই।

তার দরকারও নেই অবশ্য!—ঘনাদা একটু যেন দীর্ঘশ্বাস ফেললেন,—তোমরা গুণগুনিয়া তো আর আনছ না।

ঘনাদা চলে গেলেন।

এর পর চিড়িয়াঘর বানাবার উৎসাহ আর থাকে?

দাদা

দিন আর আমাদের কাটতে চায় না।

চার চারটে সুস্থ সবল জোয়ান ছোকরার পক্ষে এ খানিকটা অবিশ্বাস্য ব্যাপারই বটে।

কেন, কলকাতায় কি খেলাধুলো সব বন্ধ হয়ে গেছে? গড়ের মাঠ কি ভাগাভাগি করে নিয়ে লোকে সেখানে দালান-কোঠা তুলেছে? ফুটবল ক্রিকেট হকি কি দেশ থেকে আইন করে তুলে দেওয়া হল?

না।

তবে?

কলকাতার ছবিঘরগুলো কি সব বন্ধ? থিয়েটার বায়োস্কোপ সভাসমিতি মজলিশ কি আজ শহর থেকে উধাও?

না। তা নয়।

তবে?

কলকাতার সাঁতার, কুস্তি, বক্সিং, দৌড়-ঝাঁপ সব কি উঠে গেছে?

না। সবই আছে। শুধু ঘনাদা মেসে নেই।

সত্যিই ঘনাদা মেস থেকে চলে গেছে। একেবারে তল্পিতল্পা গুটিয়ে আমাদের হতভম্ব করে চলে গেছে এবং এ পর্যন্ত আর ফিরে আসেনি।

প্রথম দিন দুয়েক আমরা তেমন গ্রাহ্য করিনি।

এ মেসের এমন মৌরসী পাট্টা ছেড়ে ঘনাদা যাবে কোথায়? ফিরে তাঁকে আসতেই হ'বে।

কিন্তু দেখতে দেখতে দু-দশ দিনের জায়গায় দু-চার মাস কেটে গেছে, এখন প্রায় বছর ঘুরতে যায়, তবু ঘনাদার ফেরবার নাম নেই।

প্রথম বিস্মিত থেকে আমরা চিন্তিত হয়েছি, তারপর ব্যাকুল হয়ে খোঁজ-খবর করেছি এবং শেষে এখন তাঁর ফেরবার সম্ভাবনা সম্বন্ধে হতাশ হ'য়ে শিবুর উপর খাপ্পা হ'য়ে উঠেছি।

কারণ ঘনাদাকে মেস-ছাড়া করবার মূলে যদি কেউ থাকে ত' সে শিবু।

কি দরকার ছিল বাপু সেই টুঁপির কথাটা তোলবার?

টেনজিং নোরকে হিলেরীর সঙ্গে এভারেস্ট চূড়া জয় করেছেন—সকালের কাগজে খবরটা পড়ে, বসবার ঘরে আমরা গল্পতালি করছি, এমন সময় ঘনাদা তাঁর টঙের ঘর থেকে নেমে এলেন।

"কি ব্যাপার হে, এত হৈ-চৈ কিসের!" ঘনাদা তাঁর আরামকেদারায় গা এলিয়ে শিশিরের দিকে হাত বাড়ালেন।

শিশির কৌটো খুলে তাঁকে সিগারেট এগিয়ে দিচ্ছে যথারীতি, হঠাৎ বলে উঠল,—"ব্যাপার গুরুতর ঘনাদা। খবরের কাগজে এখুনি একটা প্রতিবাদ পাঠাতে হবে।"

"প্রতিবাদ! কেন হে?"—ঘনাদা সিগারেটটা তখন ধরাচ্ছেন।

"প্রতিবাদ নয়!" শিবু দস্তুরমত উত্তেজিত,—"এত জালিয়াতি! এত চুরি! এত মানহানি!"

রহস্যটা আমরাও তখন ধরতে পারিনি। ঘনাদা সিগারেটে প্রথম টানটা দিয়ে এতক্ষণে একটু কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "মানহানি আবার কার?"

"আপনার!" শিবু বোমাটি ছাড়লো।

"আমার!" ঘনাদার সিগারেটে দ্বিতীয় টানটা ভালো করে দেওয়া হ'ল না।

"হ্যাঁ, আপনার! আমরা প্রতিবাদ করব, নালিশ করব, খেসারত আদায় করব"—শিবু ঝড়ের মত বলে চলল,—"বলে কিনা এভারেস্টে উঠেছে!"

ব্যাপারটা এতক্ষণে আমরা বুঝেছি এবং ঘনাদাকে আড়চোখে দেখে নিয়ে তৈরিও হয়েছি।

গৌরই বোকা সেজে জিজ্ঞাসা করলে, "তুমি কি বলতে চাও এভারেস্টে এরা ওঠেনি?"

"আলবত তাই বলতে চাই।" শিবু নিজের বাঁ হাতের চেটোর উপরই ডান হাতে ঘুঁষি মারল।

"তোমার এ রকমের সন্দেহের কারণ?" শিশির গম্ভীরভাবে শুধোলে।

"কারণ?" শিবু নাটকীয়ভাবে সকলের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললে, "কারণ, টুঁপি।"

"টুঁপি!" আমরা যেন আকাশ থেকে পড়লাম।

"হ্যাঁ, ঘনাদার টুঁপি!" শিবু ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে বলে, "এভারেস্টে উঠলে সে টুঁপি পেত না? আর সে টুঁপি পেলে এভারেস্টে প্রথম ওঠবার বাহাদুরি আর ক'রত!"

"ঠিক! ঠিক!" আমরা সবাই সায় দিলাম, "কাগজে এখুনি ঘনাদার নাম দিয়ে একটা চিঠি পাঠাতে হবে। আমরাই লিখে দিচ্ছি, ঘনাদার শুধু একটা সই!"

ঘনাদার সিগারেটে তৃতীয় টান আর দেওয়া হল না। তিনি আরাম-কেদারা থেকে কি একটা কাজের নাম করে উঠে পড়লেন। সেই যে উঠে বেরিয়ে গেলেন আর যে ফিরবেন কখন কি জানি।

ঘনাদার অভাবে মেস আমাদের অন্ধকার।

আড্ডায় এসে আমরা বসি, বিরস মুখে এক এক করে, আবার উঠে যাই। কিছুই আর জমে না।

হঠাৎ সেদিন সন্ধ্যায় এই ঢিমে আসর একটু চঞ্চল হয়ে উঠল। ঘনাদার তেতালার ঘরখানা এ পর্যন্ত খালিই আছে। প্রথম নিজেদের গরজে আমরা কাউকে সেখানে ঢুকতে দিইনি।

কিন্তু গত দু-এক মাস ধরে মেসের অন্য বোর্ডারদের মুখ চেয়ে নিজেদের জেদ ছেড়ে দিতে হয়েছে। ঘনাদার আসবার কোন ভরসাই নাই। মেসের ক্ষতি করে কতদিন একটা ঘর আটকে রাখা যায়? এখনো কেউ ঘর দখল করেনি, তবে লোকে আসাযাওয়া করছে।

কিন্তু হঠাৎ ওপরের সেই ঘরে কিসের শব্দ? জিনিসপত্র নাড়ার না? পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ির পর শিবুই আগে বারান্দায় গিয়ে একবার উঁকি দিয়ে এল। হাঁ, ওপরের ঘরে আলো জ্বলছে।—

কাউকে আর কিছু বলতে হল না। হুড়মুড় করে সবাই একসঙ্গে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে গিয়ে উঠলাম।

টোকবার আগেই ঘরের ভেতর থেকে ডাক এল,—"আসুন আসুন।"

ঘরের চৌকাঠেই থমকে দাঁড়ালাম সবাই। ইনি ত ঘনাদা নন!

"আসুন আসুন, ভেতরে আসুন"—ভদ্রলোক অমায়িক। ঘনাদা রোগা লম্বা শুকনো, ইনি মোটা বেঁটে এবং দিব্য গোলগাল। কিন্তু তবু কোথায় যেন মিল আছে। সে মিল ভালো করেই কিছুক্ষণ পরে টের পেলুম, কিন্তু তখন দরজায় আমাদের অবস্থা না যযৌ ন তস্থৌ।

আমতা আমতা করে বললাম, "না, ভেতরে আর যাব না। আমরা আসি।"

"আসবেন কি! বিলক্ষণ! ছুটোছুটি করে এসে দরজা থেকেই ফিরে যাবেন!"

ব্যাপারটা একটু বিসদৃশই বটে। এসে যদি চলে যাই তাহলে এত হন্তদন্ত হয়ে আসবার মানেটা কি! তবু কাঁচুমাচু হয়ে বোঝাবার একটু চেষ্টা করলাম—"না, মানে আমরা ভেবেছিলাম—আমাদের ঘনাদা এঘরে থাকতেন কিনা!"

"ঘনাদা!"—ভদ্রলোক যেন চিন্তিত।

আমরা বুঝিয়ে বললাম,—"হাঁ, নাম ঘনশ্যাম দাস। এই মেসে অনেকদিন ধরে ছিলেন কিনা...."

হঠাৎ হো হো হাসিতে আমরা চমকে উঠলাম।

ভদ্রলোক বেশ কিছুক্ষণ হেসে নিয়ে তারপর বললেন।—"ঘণ্টা!"

"ঘণ্টা!" আমরা তাজ্জব।

"হাঁ হাঁ, আমাদের ঘণ্টা!" ভদ্রলোক এবার আরো একটু বিশদ হলেন,—"আপনারা যাকে ঘনাদা বলতেন, সে-ই হ'ল আমাদের ঘণ্টা। হাঁ মনে পড়েছে বটে, ঘণ্টা এই রকম একটা মেসে কোথায় থাকত বলেছিল। তার গল্প-টল্পও দুচারটে শুনেছি।"

"আপনি ঘনাদাকে চিনতেন?" আমরা উদগ্রীব।

"চিনতাম বৈ কি!" ভদ্রলোক হঠাৎ দীর্ঘশ্বাস ফেললেন,—"কিন্তু ঘণ্টা ত আর ফিরবে না।"

"ফিরবে না! কেন?" আমরা ঘরের ভিতর তখন ঢুকে পড়েছি।

"কানের প্লাগ খুলে গেল যে!"

"কানের প্লাগ!" খালি তক্তপোশটায় কখন সবাই বসে পড়েছি টেরও পাই নাই। ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞাসা করলাম,—"কানের প্লাগ খুলে গেল মানে!"

"মানে? মানে বোঝাতে অনেক দূর যেতে হবে।" ভদ্রলোক চিবুক ও বুকের মাঝে প্রায় অদৃশ্য গলাটায় হাত বুলিয়ে কড়িকাঠের দিকে মুখ তুলে অনেক দূরেই যেন দৃষ্টি মেলে শুরু করলেন,—"দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হয়েছে। এদিকে ইংরেজ মার্কিন ওদিকে রুশ, কে আগে বার্লিন দখল করবে, তার পাল্লায় রুশদের জিত হয়েছে। বার্লিন একটা ধ্বংস-পুরী। ইংরেজ মার্কিনের বোমা আর রুশদের গোলায় শহর গুঁড়ো হয়ে যে ধুলো উড়েছে আকাশে, তাই তখনও থিতোয়নি। দিনের বেলাতেই যেন ঝাপসা কুয়াশায় অন্ধকার। ভয়ে ভয়ে পথ চলতে হয়, কোথাও কোন নড়বড়ে ছাদ কি দেয়াল মাথায় ভেঙে পড়ে তার ঠিক নেই।

কাইজার উইলহেল্মস্ট্রাস—চমকে উঠবেন না, ওটা রাস্তার নাম—তা থেকে বেঁকে একটা সরু গলি রাস্তায় চলেছি সেদিন, এমন সময় চমকে উঠলাম।

"দাদা!"

কাজল ডাকটা আমার পেছন থেকেই, কিন্তু চমকালাম—আওয়াজ শুনে নয়, এই দাঁতভাঙা ভাষার দেশে "দাদা" ব'লে বাংলায় কে ডাকতে পারে তাই ভেবে।—

ফিরে তাকিয়ে দেখি আমাদের ঘণ্টা। অকাজে বোপোট জায়গায় বেঘোরে পড়তে তার জুড়ি নাই। বিরক্ত হয়েই বললাম,—"তুমি আবার এখানে কোথা থেকে হে!"

ঘণ্টা ছুটে এসে আমার হাত দুটো বাড়িয়ে ধরে বললে,—"সব কথা পরে বলব দাদা, এখন আমায় বাঁচাও!"

"দিব্যি বেঁচেই ত আছো দেখছি, বাঁচাবো আর কি?" ব'লে বিদ্রূপ করে আবার মায়াও হ'ল একটু। বললাম,—"কি ফ্যাসাদ আবার বাধিয়েছ শুনি।"

ঘণ্টা কিছু বলবার আগেই, হঠাৎ বড় রাস্তার দিকে মেশিন-গান পট্‌পটিয়ে উঠল। চোখের পলক পড়তে না পড়তে ঘণ্টা আর সেখানে নাই। এক দৌড়ে রাস্তার ধারে এক বোমা-ভাঙা বাড়ির শুকনো এক চৌবাচ্চায় গিয়ে তখন সেঁধিয়েছে। সেখানে গিয়ে ধরতেই কাঁপতে কাঁপতে বললে,—"ফ্যাসাদ দাদা ওই!"—

অবাক হ'য়ে বললাম।—"আরে, ও ত' বেওয়ারিশ বাড়ি-ঘর পেয়ে যুদ্ধের গোলমালে যারা লুটপাটের ফিকিরে আছে, তাদের রুশ শান্ত্রীরা গুলি করছে।—তোমার ওতে ভয়টা কিসের?"

"ভয়টা কিসের ত' ব'লে দিলে। আমার চেহারাটা কি লুটেরার বদলে দেবদূতের মত যে, সান্ত্রীরা আমায় ছেড়ে কথা কইবে?"—

ঘণ্টার কাঁদুনি শুনে হাসিই পেল একটু, বললাম—"চেহারা তোমার যাই হোক না, মিলিটারী পাস ত' আছে।"

"হাঁ, মিলিটারী পাস! আমি কি রুশভেল্ট চার্চিলের ইয়ার, না স্টালিনের দোস্ত যে মিলিটারী পাস পাব। প্রাণটা নিয়ে ইঁদুরের মত এই কদিন বার্লিন শহরে লুকোবার গর্ত খুঁজে ছুটোছুটি করছি। কখন ধরা পড়ি কে জানে?"

এবার পিঠ চাপড়ে তাকে সাহস দিয়ে বললাম—"আচ্ছা ভয় নাই, মিলিটারী পাসের ব্যবস্থা তোমায় করে দেব।—কিন্তু মরতে এই শহরে এমন সময় কেন এসেছিলে বলত?"

ভরসা পেয়ে ঘণ্টা তখন একটু চাঙ্গা হয়েছে। বললে,—"বেশী কিছু নয় ,দাদা, একটা হিসাবের কল। তার একটা শুলুক-সন্ধান নিয়ে যেতে পারলেই মোটা বকশিশ পেতাম। কিন্তু কারিগর সমেত সে কল এখন রুশদের গোলায় কোন্ পাতালে চাপা পড়েছে কে জানে।"

না হেসে আর পারলাম না। বললাম, "সাগর ডিঙোতে তোমার মত ব্যাংকে যারা পাঠিয়েছে, তাদেরও বলিহারি! আরে, ওটা সামান্য হিসাবের কল, নয়, পৃথিবীর 'অষ্টম আশ্চর্য' ইলেক-ট্রোনিক ব্রেন, আর ও যন্ত্র যিনি তৈরি করে বিজ্ঞানের জগতে যুগান্তর এনেছেন, তাঁর নাম হ'ল ডাঃ বেনার। ওদিকে মিত্রশক্তি আর এদিকে রাশিয়া তাঁকে পাবার জন্যে অর্ধেক রাজত্ব এখুনি দিতে প্রস্তুত।—কিন্তু পাবে কোথায়? সে গুড়ে বালি। ডাঃ বেনার মারাও যাননি, তাঁর যন্ত্রও কোথাও চাপা পড়েনি। মিত্রশক্তি যেদিন নরম্যাণ্ডির কূলে নেমেছে, তিনটে "স্পরকেল সাবমেরিনে তাঁর যন্ত্রপাতি সাজসরঞ্জাম চড়িয়ে সেইদিনই তিনি উধাও।—"

হতভম্ব হয়ে ঘণ্টা এবার শুধোলে—"এত কথা তুমি জানলে কি করে, দাদা?"

কি আর উত্তর দেব। হেসে বললাম,—"এই বার্লিন শহরে ঘাস কাটতে কি অলিগলি ঘুরে বেড়াচ্ছি মনে করো?"

ঘনাদার দাদা সত্যিই একটু হেসে এবার থামলেন। বদ অভ্যাস যাবে কোথায়? শিশির সিগারেটের টিনটা আপনা থেকেই তখন বাড়িয়ে দিয়েছে। দাদা কিন্তু সেটিকে মোলায়েমভাবে প্রত্যাখ্যান করে প্রকাণ্ড এক ডিবে থেকে সশব্দে এক টিপ নস্যি নিয়ে নাক মুছলেন।

"ডাঃ বেনারকে তারপর আর পাওয়া গেছে?"—গৌরের আর তর সইছে না। আমাদেরও অবশ্য তাই।

"বলছি, সবই বলছি। কিন্তু তার আগে ডাঃ বেনারের যন্ত্রটার একটু পরিচয় দেওয়া

দরকার। বড় বড় অফিসের ক্যালকুলেটিং মেশিন দেখেছেন, দুঘণ্টার অঙ্ক দু সেকেণ্ডে সব কষে দেয়? গাঁয়ের কামারশালের সঙ্গে টাটার কারখানার যা তফাত, এই ক্যালকুলেটিং মেশিনের সঙ্গে ডাঃ বেনারের ইলেকট্রোনিক ব্রেনের তাই। সাত সাতটা অঙ্কের শুভঙ্কর সাত বছরে যে অঙ্কের শেষ পায় না, ভূতুড়ে যন্ত্র তা সাত সেকেণ্ডে কষে দিতে ত' পারেই, তা ছাড়া কি যে পারে না—তাই বলাই শক্ত। মিত্রশক্তি আর রাশিয়া হন্যে হয়ে ডাঃ বেনারকে এই জন্যেই খুঁজেছে। বিজ্ঞানের যত আশ্চর্য আবিষ্কার, তত সূক্ষ্ম জটিল তার অঙ্ক। ডাঃ বেনারের ভূতুড়ে যন্ত্র যারা বুঝতে পারবে, অন্য পক্ষকে তারা পাঁচশ বছর পিছিয়ে ফেলে যেতে পারবে।

কিন্তু কোথায় ডাঃ বেনার, আর কোথায় তাঁর ভূতুড়ে কলের মাথা?

ঘনান্ধ শেষ হল। গলায় গলায় যাদের ভাব, তারা আদায়-কাঁচকলায় গিয়ে পেঁছাল। দু'দলের চর-গুপ্তচরেরা দুনিয়া তোলপাড় ক'রে ফেললে, কিন্তু ডাঃ বেনার নিপাত্তা। আতলান্তিকের তলাতেই কোথাও "স্করকেল ডুবোজাহাজগুলি সমেত তিনি ডুবেছেন, এই ধারণাই শেষ পর্যন্ত সকলের হ'ত যদি না...."

ঘনাদার দাদা একটু থেমে—আমাদের অবস্থাটা একটু লক্ষ্য করে নিয়ে আবার শুরু করলেন,—"যদি না নরওয়েব ক'টা তিমি-ধরা জাহাজ পর পর অমন নিখোঁজ হ'ত।"

আজকালকার তিমি-ধরা জাহাজ ত' তখনকার পালতোলা মোচার খোলা নয়, সে জাহাজকে জাহাজ, আবার কারখানাকে কারখানা। আস্ত তিমি ধ'রে গালে পুরে তেল-চর্বি থেকে ছাল চামড়া হাড় মাংস সব সেখানে আলাদা ক'রে বার করবার বন্দোবস্ত আছে। তার হার্পুন কামান যেমন আছে, বেতারযন্ত্র আছে তেমনি বিপদে পড়লে খবর পাঠাবার। সেরকম জাহাজ নেহাত চুপিসাড়ে টুপ করে ডুবতে পারে না, একটু কান্নাকাটি শোনা যাবেই।

ব্যাপারটা কি জানবার জন্যে কেঁচো খুঁড়তে একেবারে গোখরোর গর্তে গিয়ে পেঁছিলাম। ব্যাফিন্ আইল্যাণ্ডের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে ফ্রবিশার বে, সেইখানে ছোট এক বেনামী দ্বীপ। ভাড়া-করা একটা মোটর-লঞ্চে সেখানে যখন গিয়ে উঠলাম, তখন গভীর রাত।

রাত অবশ্য সেখানে মাসখানেক ধরেই গভীর। উত্তর মেরুর কাছাকাছি জায়গা ত'! একটা দিনরাতেই প্রায় বছর কেটে যায়।

একটা সরু খাড়ির মধ্যে মোটর-লঞ্চ ঢুকিয়ে নামলাম ত' বটে, কিন্তু সেই আবছা অন্ধকারের রাজ্যে বরফ-ঢাকা পাথুরে জায়গায় দু-পা গিয়েই ঘণ্টা আর যেতে চায় না। ঘণ্টা সেই থেকে সঙ্গে আছে বলা বাহুল্য।

ঘণ্টাকে বোঝাব কি? নিজেরই তখন কেমন অস্বস্তি হচ্ছে, দুনিয়ার হেন বিপদ নেই যা'তে পড়িনি। কিন্তু এ যেন সবকিছু থেকে আলাদা ব্যাপার। ভয়ঙ্কর একটা আতঙ্কই যেন আবছা অন্ধকার হ'য়ে চারিদিকে ছমছম করছে, আকাশ থেকে, মাটির তলা থেকে একটা বুক-গুরুগুরু করা ভয়ের কাঁপুনি উঠে সমস্ত শরীর হিম ক'রে দিচ্ছে। কিন্তু তা বলে থামলে ত' চলবে না।

ঘণ্টাকে ধমক দিতে যাচ্ছি এমন সময় চীৎকার করে উঠল,—"পালাল! পালাল!"

ফিরে দেখি, সত্যি একটা আবছা মূর্তি পাথুরে একটা ঢিবির পাশ থেকে ছুটে আমাদের লঞ্চটায় গিয়ে লাফিয়ে ওঠে আর কি!

তখনি ছুটি, খানিকটা ধস্তাধস্তি! মূর্তিটাকে কাবু করে মাটিতে ফেলতেই সে কাতরে উঠল, "ছাড়ো আমায় ছাড়ো. যদি বাঁচতে চাও ত' এখনি না পালালে নয়!"

চোস্ত জার্মান কাতরানি শুনে টর্চটা জেবলে তার মুখে ফেলে দেখি—একি! এ যে ডাঃ বেনার। কিম্বা তার ভূতও বলা যায়। ফ্যাকাশে মুখে যেন রক্ত নেই! শরীরে হাড়ের ওপর শুধু চামড়াটা আঁটা।

অবাক হয়ে গেলাম,—"ব্যাপার কি ডাঃ বেনার? আপনার খোঁজে যমের এই উত্তর দোরে এলুম, আর আপনি পালাচ্ছেন কেন?"

"সব বলব, আগে লঞ্চ উঠে বেরিয়ে পড়ো, তারপর।"

আমি কিন্তু নাছোড়বান্দা। সব কথা না শুনে নট্ নড়ন-চড়ন, নট্ কিচ্ছু।

নিরুপায় হয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ডাঃ বেনার তারপর যা বললেন তা শুনে আমরা থ'! দুনিয়ায় এরকম তাজ্জব ব্যাপার কখনো কেউ শোনেনি, কল্পনা পর্যন্ত করেছে কিনা সন্দেহ।

ডাঃ বেনার আতলান্তিককে ডোবেননি, তিনটে সাবমেরিন নিয়ে অনেক ভেবেচিন্তে এই যমের অরুচি দ্বীপে এসে উঠেছিলেন। যে-সব লোকজন সঙ্গে এনেছিলেন তাদের দিয়ে কয়েক বছর ধরে ধীরে ধীরে তিনি তাঁর আশ্চর্য কলের মাথা তারপর বসিয়েছেন। এমন সব উন্নতি তারপর সে কলের করেছেন, যে জার্মানীর যে যন্ত্র তখনই পৃথিবীর বিস্ময় ছিল, তা' এর কাছে ছেলেখেলা হ'য়ে গেছে। এই এক দানবীয় কলের মাথা দিয়ে সমস্ত পৃথিবী তিনি জয় করবেন, শাসন করবেন—এই তাঁর জেদ। এ কলের মাথা শুধু অঙ্ক কষে না, ভাবে, আর যে-কোন বিষয়ে ভেবে যে সিদ্ধান্তে পেঁছায় তা নির্ভুল। পৃথিবীর সব দিকের সমস্ত বৈজ্ঞানিকের মাথা একত্র করলেও এর তুলনায় তা সমুদ্রের কাছে ডোবা। সৃষ্টিরহস্যের বড় বড় কূটকচাল ত বটেই, ছোটখাট তুচ্ছ বিষয়েও তার বুদ্ধির প্যাঁচ একেবারে থ' করে দেয়। এই দানবীয় কলের মাথার পরামর্শ পেলে মানুষের সভ্যতা গরুর গাড়ীর তুলনায় একেবারে রকেটে উড়ে এগিয়ে যাবে। শুধু কটা কল টিপলেই হল। আলাদীনের পিদ্দিম এর কাছে কিছু নয়।

ডাঃ বেনার হাতে স্বর্গ পেয়ে যখন ধরাকে সরা দেখছেন, এমন সময় একদিন বিনা মেঘে বজ্র পড়েছে। ডাঃ বেনার আঁতকে উঠে একদিন টের পেয়েছেন যে, তিনি কল-কে নয়, কলই তাঁকে চালাচ্ছে। কল টিপে ভাবালে যে ভাবত, সে যন্ত্র কেমন করে স্বাধীন হ'য়ে উঠেছে। আর সে স্বাধীনতার মানে কি? নিজের ভাবনা নিজেই শুধু ভবে না, এমন অদৃশ্য আশ্চর্য শক্তি তার ভেতর জেগেছে যে তাই দিয়ে ধারে কাছে তুচ্ছ মানুষ যারা থাকে, তাদের একেবারে খেলার পুতুল বানিয়ে দেয়। তার সে শক্তির কাছে কারও রেহাই নাই। মানুষ তাকে দিয়ে এতদিন প্রশ্নের উত্তর জেনেছে, এখন সে মানুষকে প্রশ্ন করে তার সব-কিছু জানবে, যেমন খুশি চালাবে—এই তার দানবীয় ক্ষ্যাপামি। হাতে ছুরি পেলে দুরন্ত ছোট ছেলের যেমন সব-কিছু কেটে সুখ, এ যন্ত্রের তেমনি পৈশাচিক বিলাস—প্রশ্ন করায় আর প্রশ্ন শোনায়। সময় যেন তার কাটে না। আর কিছু যখন নেই, তখন খালি প্রশ্ন করতে হবে তাকে। প্রশ্নের পর প্রশ্ন। আর পট পট তার উত্তর দিয়ে তখুনি সে চাইবে আবার প্রশ্ন। জিজ্ঞাসা করবার মত প্রশ্ন খুঁজতে খুঁজতে হয়রান হয়ে উন্মাদ হয়ে ডা বেনারের সঙ্গীরা একে একে সব শেষ হয়ে গেল। কটা তিমি-ধরা জাহাজ কি কুক্ষণে এখানে এসে পড়েছিল? তাদের লোক-লস্কর সব সুদিনেই কাবার। পালাবার উপায় নাই তার হাত থেকে। অদৃশ্য শক্তিতে এ দ্বীপের দশ মাইলের মধ্যে যে কেউ আছে, তার কাছে বাঁধা। ডাঃ বেনার তাঁর জীবনের সমস্ত বিষয়ের পাণ্ডিত্য হাঁটকে কোন রকমে প্রশ্নের পর প্রশ্ন জুগিয়ে এখনো টিকে ছিলেন। কিন্তু তাঁর সমস্ত পুঁজিও শেষ। এখুনি আর রক্ষা নাই না পালালে।

সব শুনে জিজ্ঞাসা করলাম, "কিন্তু অদৃশ্য শক্তিতে যদি বাঁধা হন তা হ'লে আপনি পালাচ্ছেন কি করে? আমরাই বা কিছু বুঝতে পারছি না কেন"

ডাঃ বেনার বললেন, "নেহাত দৈবাৎ একটা সুযোগ পেয়ে একটা তার আমি আলগা করে দিতে পেরেছি আজ। কলের মাথা তাই খানিকক্ষণের জন্যে বিকল হ'য়ে আছে। কিন্তু সে বেশীক্ষণ নয়, এখুনি হয়ত শুধরে নিয়ে চাঙ্গা হ'য়ে উঠবে।"

"তাহলে উপায়?"

"উপায় এখুনি লঞ্চ চালিয়ে বেরিয়ে পড়া।"

"কিন্তু দশ মাইল পার হবার আগেই যদি ওই দানব জেগে উঠে!"

"তারও একটা উপায় করেছি!" ডাঃ বেনার পকেট থেকে ক'টা ছোট ইলেক্ট্রিক প্লাগের মত জিনিস বার করে আমাদের হাতে দিয়ে বললেন—"শীগ্‌গির এইগুলো দু'কানে গুঁজে

দিন। পরীক্ষা এখনো হয়নি, তবে আমার ধারণা—কলের মাথার অদৃশ্য শক্তি কানের ভেতর দিয়েই আমাদের মগজে হুকুম চালায়। আমার গোপনে তৈরী এ প্লাগ সে শক্তিকে খানিকটা ক্ষীণ করে দিতে পারবে।"

মোক্ষম সময়েই প্লাগের ঠুলি দুটো হাতে পেয়েছিলাম। শরীরে হেঁচকা টানে যেমন হয়, হঠাৎ মাথায় ঠিক তেমনি একটা প্রচণ্ড ঝাঁকুনি খেয়েই বুঝলাম, দৈত্য-মাথা জেগেছেন। তৎক্ষণাৎ ঠুলি দুটো দু'কানে গুঁজলাম। কিন্তু ঠুলিতে কি আটকায়! মনে হ'ল কে যেন আমার মগজে ভর করে প্রাণপণে আমায় কোথায় টানছে। ঠুলির দরুন টানটা একটু কম—এই যা।

পড়ি কি মরি তিনজনে লঞ্চে গিয়ে উঠে ইঞ্জিন চালিয়ে দিলাম। কানের ঠুলি যেন অদৃশ্য টানে ফেটে বেরিয়ে যাবে।

লঞ্চ তখন চলেছে এই ভাগ্যি। কিন্তু আহাম্মকের মরণ যাবে কোথায়? কানের যন্ত্রণাতেই বোধ হয় ঘণ্টা একটা কানের ঠুলি একবার একটু খুলতেই—আর দেখতে হ'ল না! 'ধর', 'ধর' করতে করতে ঘণ্টা লঞ্চ থেকে জলে লাফিয়ে পড়ল। আমাদের লঞ্চ তখন তীরবেগে বারদরিয়ায় চলেছে। ঘণ্টার সঙ্গে সেই শেষ দেখা।"

হঠাৎ কাশির শব্দে আমরা ফিরে তাকিয়ে একেবারে থ'।

আমরা যদি থ' হয়ে থাকি ত' আমাদের নতুন দাদা একেবারে হাড়গোড় ভাঙা দ'।

কোন রকমে শুকনো গলায় ঢোঁক গিলে বললেন—"একি! ঘনু—মানে ঘনশ্যাম তুমি কি, কখন এলে?"

ঘনাদার মুখে কোন ভাবান্তর নেই। গম্ভীরভাবে বললেন—"তা এসেছি অনেকক্ষণ।"

"কিন্তু তুমি ত'..." নতুন দাদার কথাটা আর শেষ হ'ল না।

ঘনাদা বললেন—"হ্যাঁ, অক্ষত শরীরেই ফিরে এসেছি কাজ শেষ করে।"

"কি করে ঘনাদা? কেমন করে?" আমরা এক সঙ্গেই বোধ হয় চেঁচিয়ে উঠলাম।

ঘরে তক্তপোশ ছাড়া আর বসবার জায়গা নেই। তারই একধারে বসে শিশিরের এগিয়ে দেওয়া টিনটা থেকে একটা সিগারেট নিয়ে হাতের ওপর ঠুকতে ঠুকতে ঘনাদা তাচ্ছিল্যের স্বরে বললেন—"অত অবাক হবার কি আছে! এমন শক্ত ব্যাপার ত' কিছু নয়। তাকে স্রেফ একটি প্রশ্ন গিয়ে করলাম; ব্যস্, তাতেই খতম।"

"কি প্রশ্ন ঘনাদা?"

ঘনাদা বললেন—"প্রশ্ন আর কি! জিজ্ঞাসা করলাম—গাছ আগে না বীজ আগে? সে তাই ভাবছে, ভাবতে ভাবতে এতদিনে শেষও হ'য়ে গেছে বোধ হয়।"

হঠাৎ জোর করে ঘনাদার পায়ের ধুলো নিয়ে আমাদের নতুন দাদা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

ঘড়ি

মোহনবাগান বনাম ঈস্টবেঙ্গলের চ্যারিটি ম্যাচের চার-চারটে 'হোয়াইট গ্যালারির' টিকিট আগে থাকতে কেনা থাকা সত্ত্বেও, ঢাকা, বরিশাল, হুগলী ও বর্ধমান জেলার চারিটি সুস্থ সবল উগ্র ক্লাবে মিক যুবক, আষাঢ় মাসের একটা আশ্চর্য-রকম খটখটে বিকেলে ঘরে ব'সে কাটিয়েছে, এমন কথা কেউ কখনো সুস্থ মস্তিষ্কে বিশ্বাস করতে পারে?

জানি তা পারা সম্ভব নয়, তবু এই অবিশ্বাস্য ঘটনা আমাদের জীবনে ঘটেছে ব'লে তার কাহিনী অত্যন্ত লজ্জিতভাবে নিবেদন করছি। ঘনাদার সঙ্গে যাদের পরিচয় হয়নি এবং ঘনাদার মত অঘটন-ঘটন-বুশলী অসামান্য ব্যক্তি যাদের মেসে নাই, তাদের কাছে এ-কাহিনী বলা যে বৃথা বাক্যব্যয় তা অবশ্য জানি।

ঘনাদা যে দিনকে রাত করতে পারেন এবং অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারেন, একথা তারা জানবে কি করে? সওয়া পাঁচটায় খেলা আরম্ভ, কিন্তু সেদিন আমারা পরস্পরকে তাগাদা দিতে শুরু করছি বেলা বারোটা থেকেই। টিকিট আগে থাকতে কেনা থাকলে কি হয়, টিকিট যারা কিনে রেখেছে, গেটে তাদের ভিড়ও ত কম নয়! সেই ভিড় ঠেলে ভেতরে ঢুকতেই যদি খেলা শুরু হয়ে যায়, তা'হলে তখন খেলা দেখব, না, সীটের নম্বর খুঁজে বেড়াব? না, যেতে যদি হয়, আগে যাওয়াই ভাল। সর্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গ্রহণ ক'রে আমরা ক্ষণে-ক্ষণে পরস্পরকে উৎসাহিত যেমন করেছি, নজরও রেখেছি তেমনি এ-ওর ওপরে।

আমাদের গৌর বড় বেশী ঘুম-কাতুরে। দুপুরে খাওয়ার পর একটু গড়িয়ে নেওয়া তার চাই-ই, আর একবার গড়ালে কত বেলা পর্যন্ত তা যে গিয়ে ঠেকবে, তার কোন ঠিক নেই। তাই শিবু তাকে পাহারা দিয়েছে। আধ ঘণ্টা. পনরো মিনিট অন্তর জিজ্ঞাসা করছে, "কিরে গৌর জেগে আছিস ত?" তারপর গৌরের ক্রমশঃ সংক্ষিপ্ত ও উত্তরোত্তর উষ্ণতর প্রতিবাদ শুনে বলেছে, "দেখিস, ঘুমোসনি যেন!"

শিবুর ওপর আবার পাহারায় রাখতে হয়েছে শিশিরকে। শিবুর বড় ভুলো-মন। ঠিক বেরুবার সময় রাস্তায় বেরিয়ে সে হয়ত বলবে, "ওই যাঃ, মনি-ব্যাগটা ফেলে এসেছি," কিংবা

নিদেন পক্ষে বলবেই, "দাঁড়া ভাই—ঘরের জানালাটা বন্ধ ক'রে আসি, নইলে বৃষ্টিতে সব ভিজে যাবে।"

শিশির তাই মিনিটে-মিনিটে শিবুকে সাবধান করেছে, কোনো কিছু ভুল যেন তার না হয়! শিশিরের ওপর আবার নজর রাখতে হয়েছে আমাকে। কোনো-কিছু দরকারী কাজে বেরুবার ঠিক আগের মুহূর্তে তার একটা কিছু হারাবেই। হয় একটি পাটি জুতো সে খুঁজে পাবে না, কিংবা পাঞ্জাবির বোতাম তার কোথায় যে আছে মনে করতে না পেরে নিজের ও আমাদের সকলের টেবিল দেরাজ ঘেঁটে সে তছনছ করবে।

ওদের সকলকে পাহারা দেওয়া সত্যি দরকার। কিন্তু আমাকে অমন ক্ষণে ক্ষণে বিরক্ত করার সত্যি কোনো মানে হয়? ওদের ধারণা—কোথা থেকে এ-ধারণা হ'ল তা জানি না—আমার নাকি সময়ের কোনো জ্ঞান নেই। এক-আধ ঘণ্টা এদিক-ওদিক কখনো কখনো আমার হয় না এমন কথা বলছি না, কিন্তু তাই ব'লে 'পনেরো মিনিট অন্তর ঘড়িটা একবার দেখুন দিকি!'—অথবা, 'ক'টা বাজলো খেয়াল আছে?'—শুনতে কার ভাল লাগে।

বিরক্ত হয়ে শেষে ঘড়িটাই আমি গৌরের বিছানার ওপর ফেলে দিয়ে বলেছি, "ঘড়িটা নিজের কাছেই রাখ না, ক'টা বাজলো তাহ'লে আর মিনিটে মিনিটে জিজ্ঞেস করতে হবে না!"

ঠিক সেই মুহূর্তে ঘনাদা ঘরে ঢুকে গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে বলেছেন, "উঁহুঃ, ঠিক হচ্ছে না, ঠিক হচ্ছে না ওটা।"

"কি ঠিক হচ্ছে না, ঘনাদা"—অবাক্ হয়ে জিজ্ঞাসা করেছি আমরা।

ঘনাদা তখ্খুনি কোনো জবাব না দিয়ে ধীরে-সুস্থে শিশিরের টেবিল থেকে কেসটা তুলে তা থেকে একটা সিগারেট নিয়ে ধরিয়ে আরাম ক'রে—আরাম-কেদারার অভাবে তার বিছানার ওপরই দুটো বালিশ ঠেসান দিয়ে ব'সে একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে বলেছেন, "ওই না দেখেশুনে ঘড়ি নেওয়া।"

ঘনাদার রকম-সকম ভাল মনে হয়নি। ইশারায় শিশির, গৌর শিবুকে সাবধান ক'রে দিয়ে একটু হেসে বলেছি, "ও-ঘড়ি আর দেখবার শোনবার কিছু নেই ঘনাদা, সুইটজারল্যাণ্ডের একেবারে সবচেয়ে বনেদী-কারখানার ছাপ ওতে মারা।"

ঘনাদা একটু হেসেছেন, "ছাপ ওরকম মারা থাকে। ছাপ দেখে কি আর ঘড়ি চেনা যায়?"

"আপনি, ঘড়িও চেনেন নাকি ঘনাদা? শিবু বুঝি না জিজ্ঞেস ক'রে পারেনি।

"হুঁ, তা একটু চিনি বইকি! না চিনলে এই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আর কি হ'তো? তার দরকারই হ'তো না।"

ঘনাদার সঙ্গে আমাদের বেশ ভালোরকমই পরিচয় আছে, তবু এ-কথার পর খানিকক্ষণ আমরা একেবারে থ' হয়ে গেছি। কারুর মুখ দিয়ে কোনো কথাই বেরোয়নি। গৌরই প্রথম বলেছে, "কিন্তু, ঘড়ি ত' আপনাকে ব্যবহার করতে কখনো দেখলাম না!"

"না, ঘড়ি-টড়ি আমি ব্যবহার করি না!" সিগারেটে একটা সুখটান দিয়ে ঘনাদা বলেছেন, "তবে, ঘড়ি একবার পেয়েছিলাম কয়েকটা।"

"পেয়েছিলেন? ক'টা ঘনাদা?"—শিশিরের বিদ্রূপটা খুব অস্পষ্ট নয়। কিন্তু ঘনাদা নির্বিকারভাবে খানিক চোখ বুজে থেকে বলেছেন, "যতদূর মনে পড়ছে, মোট, দু'লক্ষ তিপ্পান্ন

হাজার তিনশো একটা।" ঘনাদার কাছে থাকা আর নিরাপদ নয় বুঝে শিবুকে তাড়া দিয়ে বলেছি, "ওহে, ওঠো না এইবার। সময় ত' হয়ে এল।"

শিবু তা সত্ত্বেও জিজ্ঞাসা করেছে, "সে-সব ঘড়ি গেল কোথায় ঘনাদা? কোথায় রেখেছেন মনে নেই বুঝি?"

"নাঃ, মনে থাকবে না কেন, খুব মনে আছে। সেগুলো রেখেছিলাম, ১২৫ ডিগ্রি দ্রাঘিমা যেখানে ৩১ ডিগ্রি অক্ষাংশকে কেটে বেরিয়ে গেছে ঠিক সেইখানে। তবে সেগুলো এখন অচল।"

ঘনাদা গলাখাঁকারি দিয়ে নড়ে-চড়ে বসতেই সভয়ে উঠে প'ড়ে শিশিরকে ঠেলা দিয়ে বলেছি, "উঠে পড়ো শিশির, তুমি ত' আবার শিরে সংক্রান্তির সময় জুতো খুঁজতে জামা হারিয়ে ফেলবে।"

কিন্তু ঘনাদা তখন শুরু ক'রে দিয়েছেন,—"১৯৩৭ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর, প্রশান্ত মহাসাগরের দক্ষিণে যে বিরাট সাইক্লোন আর টাইড্যাল-ওয়েভ অর্থাৎ প্রলয় বন্যা দেখা দেয়, তার কথা তোমাদের মনে আছে কিনা জানি না। তবে, খবরের কাগজে বিশদভাবেই সব বিবরণ বেরিয়েছিল। টাইড্যাল-ওয়েভের পাহাড়-প্রমাণ ঢেউ পশ্চিমে নিউজিল্যাণ্ড ও পুবে দক্ষিণ-আমেরিকার চিলির পার্বত্য উপকূল পর্যন্ত তো পৌঁছয়ই; উত্তরে, অথবা ঠিক ক'রে বলতে গেলে, উত্তর পশ্চিমে ডুসি, পিট্‌কেয়ার্ন দ্বীপ থেকে শুরু ক'রে তাহিতি, টোঙ্গা, ফিজি, সামোয়া পর্যন্ত অসংখ্য দ্বীপ প্রায় ভাসিয়ে নিয়ে যায় বললেই হয়। অস্ট্রাল দ্বীপপুঞ্জের কয়েকটা ত' একেবারে নিশ্চিহ্নই হয়ে গিয়েছিল কিছুকালের মত। প্রচণ্ড ঝড়ে আর এই সমুদ্র-বন্যায় কত লোক যে মারা যায় তার লেখা-জোখা নেই।

টাইড্যাল-ওয়েভ-এর প্রায় দু'মাস আগের কথা। হাওয়াই থেকে সামোয়া হয়ে, ফিজি দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত তখন আমদানি-রপ্তানির ব্যবসা চালাই, তিনটে জাপানী-মালের জাহাজ ভাড়া নিয়ে। আমদানি-রপ্তানির কারবারটা অবশ্য লোক-দেখানো ব্যাপার। বাইরে এই সব দ্বীপ থেকে ইউরোপ আমেরিকায় নারকোল-শাঁস চালান দিয়ে তার বদলে ছুরি কাঁচি থেকে শুরু ক'রে, ঘড়ি সাইকেল সেলাই-এর কল পর্যন্ত টুকি-টাকি নানা জিনিস আমদানি করি। কিন্তু ভেতরে যে ধান্দায় ঘুরি, তারই সম্পর্কে হঠাৎ একদিনেই আমেরিকা আর ইংলণ্ড থেকে গোপন 'কোডে' লেখা দুটি রেডিওগ্রাম একসঙ্গে এসে হাজির। নেভিল আর ফ্রাঙ্ক দু'জনেই তখন বেঁচে।"

শিশির অবাক্ হয়ে জিজ্ঞেস করেছে, "নেভিল আর ফ্রাঙ্ক? তারা আবার কে?"

মৌর গম্ভীরমুখে বলেছে, "বুঝতে পারলিনে? নেভিল—চেম্বারলেন আর ফ্রাঙ্কলিন—রুসভেল্ট!"

"ওঁরাই আপনাকে তার করেছিলেন?" চোখ কপালে তুলে জিজ্ঞাসা করেছে শিবু,—"আপনার সঙ্গে বন্ধুত্ব ছিল বুঝি?"

যেন অত্যন্ত সামান্য ব্যাপার, এইভাবে কথাটা হাত নেড়ে উড়িয়ে দিয়ে ঘনাদা বলেছেন, "যাকগে সে-সব কথা। হ্যাঁ, যা বলছিলাম—দুই রেডিওগ্রামেই এক কথা, সমূহ বিপদ, প্রশান্ত মহাসাগরের কাজ ফেলে এক্ষুনি যেন চ'লে আসি।"

কিন্তু একটা মানুষ একসঙ্গে আমেরিকা আর ইংলণ্ড ত' যেতে পারে না। সেই মর্মেই দু'টো তার দু'জায়গায় পাঠিয়ে আরো বিশদ বিবরণ জানতে চাইলাম।

বিশদ বিবরণ শুধু পরের রেডিওগ্রামে নয়, বেতারের খবরেও কিছুটা তার পরদিন পাওয়া গেল। ইউরোপ, আমেরিকা, ইংলণ্ডের নানা জায়গায় হঠাৎ রহস্যজনকভাবে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ

হয়ে বড়-বড় বাড়ি-ঘর, কারখানা, রেলের লাইন প্রভৃতি উড়ে যাচ্ছে। গোয়েন্দা-পুলিশ সব জায়গায় এই অভাবনীয় ব্যাপারে শুধু ছুটোছুটি ক'রে হিমসিম খাচ্ছে না, কিছু বুঝতে না পেরে একেবারে ভ্যাবাচাকা হয়ে গেছে। ভ্যাবাচাকা হওয়া কিছু বিচিত্র নয়। কারণ যে-সব জায়গায় বিস্ফোরণ ঘটছে, পুলিশ সেখানে কোনরকম বোমা বারুদ ডিনামাইটের নাম-গন্ধও পাচ্ছে না এবং এরকম এলোপাথাড়ি ধ্বংসের কাজ চালাতে পারে এমন কোনো দেশদ্রোহী প্রবল গুপ্ত-দলের কথাও তাদের জানা নেই।

অবস্থা এই রকম সঙ্গীন ব'লেই, আমাদের বিভাগের বড় বড় মাথা যে যেখানে আছে, সকলের ডাক পড়েছে পরামর্শ-সভায়। কিন্তু ইংলণ্ড ও আমেরিকা, দু' জায়গার কোথায় যাব, দোমনা হয়ে ঠিক করতে না পেরেই শেষ পর্যন্ত স্থির করলাম, সামোয়া-দ্বীপের 'পালোলো'-উৎসবটা আগে না দেখে অন্য কোথাও যাব না। ভাবলাম, কাছে থেকে যা দুর্বোধ, দূর থেকে ঠাণ্ডা-মাথায় সে রহস্যের খেই হয়ত পেয়েও যেতে পারি।

'পালোলো'-উৎসব পৃথিবীর একটি অষ্টম আশ্চর্য ব্যাপার বললেই হয়। বৎসরে মাত্র দু'টি দিন এই উৎসব হয়। সামোয়া আর ফিজি-দ্বীপপুঞ্জের চারিদিকে ঠিক নির্দিষ্ট তারিখে যেন অলৌকিক মন্ত্রবলে 'পালোলো' নামে সংখ্যাতীত এক রকম সামুদ্রিক পোকা জলের ওপর ভেসে ওঠে, দু' ভাগ হয়ে বংশ-বিস্তার করবার জন্যে। 'পালোলো'র এই বংশ বিস্তারের লগ্ন সামুদ্রিক মাছেদেরও জানা। ঝাঁকে-ঝাঁকে তারাও সেদিন ভেসে ওঠে। 'পালোলো'-রা বংশ-বিস্তার যত না করে, সমুদ্রের এই মাছেদের পেটে যায় তার বেশী। কিন্তু 'পালোলো' আর মাছের ঝাঁকের ওপরেও আছে আর এক প্রাণী। তারা, পলিনেশিয়ান জেলে। মাছ ও 'পালোলো' দুই-ই তাদের কাছে পরম সুখাদ্য। রাশি রাশি মাছ ও পালোলো ধরবার সুযোগ হয় ব'লে বৎসরের এই দুটি দিন তাদের কাছে একটা মস্ত পরব।

কিন্তু ঠাণ্ডা-মাথায় খোশ-মেজাজে এ পরব দেখা সেবার আমার ভাগ্যে নেই। হাওয়াই-দ্বীপের হনলুলু থেকে এপিয়া বন্দরে আসবার পথে জাহাজেই ওই দু'টি রেডিওগ্রাম পেয়েছিলাম। সমোয়া দ্বীপপুঞ্জের উপোলু দ্বীপের এই এপিয়া বন্দরটিই তখন আমার কারবারের প্রধান ঘাঁটি। সেখানে পৌঁছেই খবর পেলাম, দিন তিনেক আগে আমার 'ওয়ার হাউজ' থেকে বড় গোছের একটা চুরি হয়ে গেছে। চুরি না ব'লে তাকে ডাকাতিই বলা উচিত। রাত্রে দরজার তালা ভেঙে প্রায় হাজার পঞ্চাশ টাকার মাল ডাকাতেরা সরিয়ে নিয়ে গেছে, আমার দু'জন পাহারাদারকে পিছমোড়া ক'রে বেঁধে। পুলিশকে খবর আগেই দেওয়া হয়েছিল। নিজে গিয়ে থানায় একবার দেখাও করতে হ'ল। এপিয়া—বৃটিশ এলাকা। প্রধান পুলিশ কর্মচারী আমার বিশেষ পরিচিত 'জন লেমান' নামে একজন মার্কিন। 'কি-কি ধরনের কত মাল চুরি গেছে, তার একটা তালিকা তাকে দিলাম। দামী মালের মধ্যে ইউরোপ থেকে আনানো শ' পাঁচেক রেডিও সেট আর শ' তিনেক সাইকেল। কয়েক বাক্স ঘড়িও তার মধ্যে ছিল। লেমান আমায় আশ্বাস দিলে যে, মাল যদি চোরেরা ইতিমধ্যে পাচার করেও দিয়ে থাকে, তবু সাইকেল আর রেডিও বেশীর ভাগই সে উদ্ধার ক'রে দিতে পারবে। তবে ঘড়িগুলোর কথা বলতে পারে না। সেগুলো হাতে হাতে লুকিয়ে চালান দেওয়া সহজ। খুশি হয়ে বললাম, তুমি অন্যগুলো যদি উদ্ধার ক'রে দাও, ঘড়িগুলোর জন্যে আমি ভাবি না। সেগুলো নেহাত সস্তা খেলো জিনিস। চেহারা—দামী ঘড়ির মত জমকালো হলেও, আসলে ছেলে-ভুলানো জাপানী মাল।

কিন্তু এই সস্তা খেলো ঘড়িগুলোই এক জ্বালা হয়ে উঠলো। লেমানের কাছ থেকে বাড়ি ফিরে দেখি, আবার দু'টি 'তার' এসে হাজির। তার একটি লণ্ডন থেকে, আগেরগুলির মতই

তাড়াতাড়ি রওনা হবার তাগিদ, আর একটি জাপানের যে কোম্পানী থেকে ঘড়িগুলো আনিয়েছিলাম তাদের জরুরী আদেশ, যে ঘড়িগুলো আমায় পাঠানো হয়েছে, সেগুলো আমি যেন অবিলম্বে ফেরত পাঠাই। কারণ, আমি যে-ঘড়ির অর্ডার দিয়েছিলাম তার বদলে এগুলি চালান দেওয়া হয়েছে।

যে-ঘড়ি চোখেই দেখিনি তা অর্ডার-মাফিক না অন্য-কিছু, কি ক'রে জানবো, ঘড়িগুলো যে আমার গুদাম থেকে চুরি গেছে, এই কথা জানিয়ে এক টেলিগ্রাম ক'রে 'পালোলো'-উৎসবের জন্যে একটি মোটর লঞ্চে ক'রে বেরিয়ে পড়লাম। লণ্ডনের টেলিগ্রামের জবাবই আর দিইনি। মনটা সেজন্যে একটু খচ্‌খচ্‌ করছিল। কাজে ফাঁকি দিয়ে এই পরব দেখতে গিয়েই প্রধান রহস্যের সূত্র যে পেয়ে যাবো, তখন ত' আর জানতাম না!

মাঠের ওপর যেমন মেলা হয়, 'পালোলো'-উৎসব তেমনি সমুদ্রের ওপরকার মেলা। বন্দর ছাড়িয়ে কয়েক মাইল যাবার পর সমুদ্রের একটি বিশেষ অঞ্চলে যে দৃশ্য চোখে পড়ে তা বর্ণনা করা কঠিন। মাইলের পর মাইল জলে অগুনতি 'পালোলো' আর মাছের ঝাঁক কিলবিল করছে। মাছেদের রূপোলী-ডানার ঝিলিকে সমুদ্রে যেন ক্ষণে-ক্ষণে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে মনে হয়। পোকা ও মাছের লোভে অসংখ্য সামুদ্রিক পাখি সেই সঙ্গে সাদা পাখার ঝাপটায় বাতাস তোলপাড় ক'রে ফিরছে। এরই ভেতর যেদিকে চাও, পলিনেশিয়ান জেলেদের নানা রঙের ডিঙ্গি আর জাল। সে-সব ডিঙ্গিতে উৎসবের সাজে মেয়েরাও এসেছে মজা দেখতে। নৌকোগুলোতে নানা রঙের নিশান আর ফুলের সাজ, মেয়েদের মাথায় ও গলায় ফুলের মালা, কেউ-কেউ আবার বাজনাও এনেছে গান গাইতে ও বাজাতে। আমার মত দু'চারজন শৌখীন লোক একলা, বা দল বেঁধে শুধু এই দৃশ্য উপভোগ করবার জন্যেই নিজেদের মোটরলঞ্চে বা ছোট স্টীমারে এসে জড়ো হয়েছে।

'পালোলো' উৎসব খুব ভালভাবেই জমেছিল। উজ্জ্বল, নির্মেঘ আকাশ, ঝড়-বাতাসহীন শান্ত সমুদ্র, হঠাৎ তারি মাঝে বিনামেঘে বজ্রাঘাতের মত একটা বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেল। সেই সঙ্গে কাছাকাছি তিনটি নৌকো আরোহীদের নিয়ে আকাশে টুকরো-টুকরো হয়ে ছিট্‌কে উঠে একেবারে নিশ্চিহ্ন। একি আশ্চর্য ব্যাপার! সমুদ্রের জলে 'মাইন' না থাকলে তো এরকম হ'তে পারে না! কিন্তু 'মাইন' এ-অঞ্চলে কেমন ক'রে থাকবে? আসবে কোথা থেকে?

দেখতে-দেখতে আরো দু' জায়গায় ওইরকম দু'টি বিস্ফোরণ পর-পর হয়ে গেল। পলকের

মধ্যে উৎসবের আনন্দ আতঙ্কে পরিণত হ'ল। সমুদ্র তখনও তেমনি মাছে আর পোকায় বিল্‌বিল করছে, সাগর-চিলগুলো তেমনি ঝাঁকে-ঝাঁকে জলের ওপর ছোঁ মারছে, কিন্তু 'মাইন'-এর ভয়ে জেলেডিঙিগুলো প্রাণপণে সে-অঞ্চল ছেড়ে পালাচ্ছে।

মোটর-লঞ্চে আমিই অবশ্য প্রথম এই দুর্ঘটনার খবর 'এপিয়া'তে নিয়ে এলাম। দেখা করলাম গভর্নরের সঙ্গে। তিনি ত' এ-খবর শুনে একেবারে থ'। যুদ্ধবিগ্রহ নেই—কোন গোলমাল কোথাও নেই, হঠাৎ সামোয়া দ্বীপপুঞ্জের বিশেষ একটি সামুদ্রিক-অঞ্চলে মাইন ভাসিয়ে দিয়ে যাবে কে? তাও, বন্দরের মধ্যে হ'লে না হয় উদ্দেশ্য খানিকটা বোঝা যেত, যেখানে কস্মিনকালে জেলেডিঙ্গি ছাড়া কোন বড় জাহাজ যায় না, সেখানে এ 'মাইন' ভাসানোতে কার কি স্বার্থ? ভাল করে ব্যাপারটার সন্ধান নেবার জন্যে আমার সঙ্গেই একটি পুলিস লঞ্চ পাঠাবেন ব'লে গভর্নর ঠিক করলেন। লেমানকে খবর পাঠিয়ে দিলেন, আমার আমার বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যাবার জন্যে।

দু'মুঠো খেয়ে নেবার জন্যে আমার আস্তানায় গিয়ে দেখি, আর-এক হাঙ্গামা সেখানে আমার জন্যে অপেক্ষা করে আছে। যে-কোম্পানির কাছ থেকে ওইসব ঘড়ি আনিয়েছিলাম, তাদের একজন বড় কর্মচারী নিজে এসেছেন ঘড়িগুলো ফেরত নিয়ে যাবার জন্যে। কর্মচারীর নাম মিঃ ওকামোতো, শুনলাম তিনি ইয়োকো-হামা থেকে প্লেনে ক'রে আজ সকালেই এসে এখানে পৌঁছেছেন ও আমার জন্যে এতক্ষণ ধ'রে অপেক্ষা ক'রে আছেন। একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম "ওই-কটা সস্তা খেলো ঘড়ির জন্যে আপনাদের এত মাথাব্যথা?"

একটু সলজ্জভাবে হেসে মিঃ ওকামোতো বললেন, "ঘড়িগুলি সস্তা হ'তে পারে, কিন্তু ভুলটা কোম্পানির পক্ষে বড় বেশী লজ্জার। সেইটে শোধরাবার জন্যেই তাঁদের এত বেশী ব্যাকুলতা।"

"কিন্তু, ঘড়ি যে চুরি গেছে তা ত' আপনাদের জানিয়েছি।"

মিঃ ওকামোতো কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে যা বললেন, তাতে আরো অবাক হলাম! এ-ঘড়ি ফেরত না নিয়ে যেতে পারলে তাঁর মুখে চুন-কালি পড়বে, তাই এ ভুলের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ কিছু গুনাগার দিতেও তিনি প্রস্তুত।

বুঝলাম, ঘড়ি চুরির কথা মিঃ ওকামোতো বিশ্বাস করতেই পারছেন না। একটু বিরক্ত হয়েই তাই বললাম, "আপনাদের ওই ছেলে-ভুলানো ঘড়ি লুকিয়ে রেখে আমার কোন লাভ আছে মনে করেন? সত্যি চুরি গেছে কিনা, চলুন আপনাকে দেখিয়ে দিচ্ছি।"

চুরি প্রমাণ করবার জন্যে গুদামে যাওয়ার আর দরকার হ'ল না, মিঃ লেমান আমার খোঁজে সেই মুহূর্তেই এসে ঘরে ঢুকলেন। ওকামোতোর সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললাম, "ইনিই এখানকার পুলিস-চীফ্। আমার গুদাম ভেঙ্গে ডাকাতরা ঘড়ি এবং অনেক-কিছু নিয়ে গেছে কি-না ওঁর কাছেই শুনতে পাবেন।"

মিঃ লেমান আমার কথা সমর্থন করার পর শান্তশিষ্ট ওকামোতো হঠাৎ একেবারে জ্বলে উঠলেন। সবেগে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে-যেতে যা ব'লে গেলেন তার মর্ম এই যে, তাঁদের কোম্পানির সঙ্গে এই চালাকি করার ফল কি, আমরা শীগ্‌গিরই হাড়ে-হাড়ে বুঝবো।

মিঃ লেমান একটু অবাক্ হয়ে বললেন, "কি এমন দামী ঘড়ি মশাই, যার জন্যে এত আস্ফালন!"

"দেখবেন?" ব'লে আমার ম্যানেজারকে একটি ঘড়ি নিয়ে আসতে বললাম। চোরেরা কেস ভেঙে নিয়ে যাবার সময় কয়েকটি ঘড়ি গুদামের মধ্যে অসাবধানে প'ড়ে গেছলো। সেগুলো আমি বাড়িতেই আনিয়ে রেখেছিলাম। ম্যানেজার তা থেকে একটি ঘড়ি এনে আমার হাতে

দিলে। লেমান সেটি নিয়ে একটু পরীক্ষা ক'রে বললেন, "এ-জগতের বুদ্ধি সত্যি অসাধারণ! এমনিতে দেখলে মনে হবে, যেন নামজাদা কোন সুইস কোম্পানির হাতঘড়ি!"

হেসে বললাম, "অথচ দাম তার দশ ভাগের একভাগও নয়।"

টেবিলের উপর সেখানকার খবরের কাগজটা খোলা ছিল, তার ওপর ঘড়িটা রেখে উঠতে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ ঘড়ির তলায় যে খবরের শিরোনামাটা দেখা যাচ্ছিল সেইটে পড়বামাত্র মাথার ভেতর দিয়ে যেন একটা বিদ্যুৎ খেলে গেল। মিঃ লেমানকে উত্তেজিতভাবে বললাম, "মাপ করবেন মিঃ লেমান, আপনার সঙ্গে আজ যেতে পারছি না। ডাঃ ডেভিসের কাছে এখুনি আমার যাওয়া দরকার!"

"সে কি! ডাঃ ডেভিসের কাছে হঠাৎ কেন?"—অবাক্ হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন মিঃ লেমান।

"কেন? ডাঃ ডেভিস পৃথিবীর একজন নামজাদা রাসায়নিক ব'লে। তিনি যে কয়েক-মাসের জন্য শরীর সারাতে এপিয়াতে এসে বাস করছেন, এও আমাদের সৌভাগ্য ব'লে।"

"কিন্তু 'পালোলো' উৎসবের দুর্ঘটনাগুলোর রহস্য আগে সন্ধান করতে গেলে ভাল হ'ত না কি?"

"না, মিঃ লেমান, মনে হ'চ্ছে, আপনারও সেখানে যাবার আর দরকার নেই।" ব'লে টেবিল থেকে ঘড়িটা তুলে নিয়ে মিঃ লেমান কোন কিছু বলার আগেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম।"

সেদিন সারারাত মিঃ ডেভিসের সঙ্গেই তাঁর বাইরের ঘরে গভীর গবেষণায় কাটালাম। পরের দিন দুপুরেই ইউরোপ আমেরিকার সমস্ত বড়-বড় রাজ্যে গোপন-কোডে টেলিগ্রাম ক'রে দিলাম স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রীদের কাছে।

পনরো দিন পর্যন্ত ইউরোপ ও আমেরিকার নানা জায়গা থেকে অল্প-বিস্তর দুর্ঘটনার সংবাদ পাওয়া গেল। আমাদের এপিয়া ও কাছাকাছি নানা জায়গা থেকেও কয়েকটা বিস্ফোরণের খবর এল। তারপর সব গেল শান্ত হয়ে। ইউরোপ ও আমেরিকার যে-কোন রেডিও খুললে এই ক'দিন প্রতি ঘণ্টায় একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তিই বারবার শোনা যেত। প্রতি খবরের কাগজে ওই একই কথা। ইউরোপ ও আমেরিকা থেকে দু'টি জাহাজ তখন এপিয়ার দিকে রওনা হয়েছে।

জাহাজ দু'টি এসে পৌঁছলো, ১৯৩৭ সালের ১৩ই ও ১৪ই সেপ্টেম্বর। সেইসঙ্গে আমেরিকা থেকে চারটি বিরাট আর্মি-প্লেনও আনিয়ে নিয়েছিলাম। ১৫ই সেপ্টেম্বর জাহাজ দু'টি থেকে সেই চারটি প্লেনে কয়েকটি বড়-বড় কাঠের বাক্স তুলে আমি ও মিঃ ডেভিস সকাল আটটায় রওনা হলাম। সন্ধ্যা-নাগাদ চারটি প্লেন যেখানে একসঙ্গে পৌঁছলো, আমাদের চার্ট দেখে বুঝলাম, তার দ্রাঘিমা ১২৫ ডিগ্রি আর অক্ষাংশ ৩৫ ডিগ্রি। বেতার ইঙ্গিতে সকলকে আদেশ জানাবার পর চারটি প্লেন থেকে কয়েকটা বড় বড় বাক্স সমুদ্রের ওপর ফেলে দেওয়া হ'লো।

মিঃ ডেভিস আর আমি দু'জনেই এতক্ষণ যেন কিসের ঘোরে আচ্ছন্ন হয়েছিলাম। এতক্ষণে তিনি ধরা-গলায় বললেন, "সভ্যজগতের সবচেয়ে বড় বিপদ বোধ হয় কেটে গেল!"

আমি একটু ম্লান হেসে বললাম—"আপাততঃ!" ঘনাদা চুপ করলেন। গৌর উৎসুক-ভাবে জিজ্ঞাসা করলে, "ওই বাক্সগুলোর মধ্যে কি ছিল ঘনাদা? ঘড়ি?"

"হ্যাঁ, দু'লক্ষ তিপ্পান্ন হাজার তিনশো একটা ঘড়ি। ঘড়ি নয়, তার প্রত্যেকটা হ'ল এক-একটি ক্ষুদে অ্যাটম-বোমার সামিল। এমনভাবে সেগুলি তৈরী যে, কোনটি তিন দিন, কোনটি-বা তিন মাস ধরে দম দেওয়ার পরই তার গোপন দু'টি ক্ষুদে বুটারি খুলে দিয়ে—

টি. এন. টি. এর চেয়েও সাংঘাতিক দু'টি রাসায়নিক পদার্থ একসঙ্গে মিশে যায়। এই মিশ্রনের ফলে যে বিস্ফোরণ হয়, তা অ্যাটম-বোমার মত না হ'লেও ডিনামাইটের চেয়ে অনেক বেশী প্রচণ্ড। যে-কোম্পানি এই ঘড়ি তৈরী করেছিল, সস্তা-দরে সমস্ত ইউরোপ আমেরিকায় এগুলি ছড়িয়ে দিতে তাদের কোন অসুবিধা হয়নি। কারখানার মজুর থেকে কেরানী উকিল ডাক্তার অনেকেই এ-ঘড়ি সস্তার লোভে অজান্তে কিনে হাতে পরেছে। তার ফলে দুই দেশের সর্বত্র অতর্কিত বিস্ফোরণ হ'তে শুরু ক'রে। আর কিছু বেশী দিন এই ঘড়ি চালাতে পারলে ওসব দেশের অধিকাংশ কল-কারখানা, রেল, জাহাজ কিভাবে যে ধ্বংস হয়ে যেত কেউ তার হদিসই পেত না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের তাহ'লে আর দরকারই হ'ত না।

ইউরোপের বদলে ভুলক্রমে কয়েক বাক্স ঘড়ি যদি আমার কাছে না এসে প'ড়ত, সে ঘড়ি আবার যদি চুরি না যেত, 'পালালো' উৎসবে ওইরকম রহস্যময় বিস্ফোরণ তার কয়েকদিন পরেই যদি না ঘটত, ঘড়ির কোম্পানির প্রতিনিধি ওই সামান্য সস্তা খেলো ঘড়ি ফেরত নেবার জন্যে প্লেনে ক'রে ছুটে আসবার মত গরজ যদি না দেখাত এবং সবচেয়ে যে ব্যাপারে আমার টনক নড় ওঠে,- আমার ম্যানেজার সেইদিনকার কাগজের একটি বিশেষ সংবাদের ওপর ঘড়িটি যদি না রেখে যেত, তাহ'লে এ দারুণ সর্বনাশা রহস্যের সমাধান করবার মত খেই আমি খুঁজে পেতাম না।

খবরের কাগজে ইউরোপের কয়েকটি কারখানার বিস্ফোরণের সংবাদের ওপর ঘড়িটা দেখবার পরই হঠাৎ এই সমস্ত ব্যাপারের মধ্যে একটা যোগসূত্র আছে ব'লে আমার মনে হয়। ডঃ ডেভিসকে দিয়ে ঘড়িটা খুলে পরীক্ষা করবার পর আমি এ-বিষয়ে নিঃসন্দেহ হই। নিরপরাধ পলিনেশিয়ান জেলেদের কেউ কেউ না জেনে আমার কারখানায় চোরাই ঘড়ির কয়েকটা কিনেই উৎসবের দিনের ওই সমস্ত বিস্ফোরণের কারণ হয়, এ তখন আমার আর বুঝতে বাকি নেই।"

ঘনাদা এতক্ষণ চুপ ক'রে আর-একটা সিগারেট ধরাতেই শিশির বললে, "রেডিও আর খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েই তাহ'লে এই ঘড়িগুলো সংগ্রহ করা হয়। কিন্তু এত জায়গা থাকতে ওই কত দ্রাঘিমা আর অক্ষাংশ বললেন, সেখানে এগুলো ফেলবার মানে কি?"

"মানে ম্যাপ খুললেই বুঝতে পারবে। স্থলভাগ থেকে যতদূর সম্ভব এ সর্বনাশা জিনিস ফেলতে হবে ত'! ম্যাপে দেখতে পাবে, ওই জায়গার ধারে-কাছে একটা দ্বীপের ফুট্‌কি পর্যন্ত নেই।"

"ওখানে ফেলার দরুন কোনো ক্ষতি তাহ'লে আর হয়নি?—"জিজ্ঞাসা করলে শিবু।

"না, তা আর বলি কি ক'রে!" হতাশভাবে বললেন ঘনাদা, "১৭ই সেপ্টেম্বরের টাইড্যাল-ওয়েভ আর সাইক্লোনের কথা ত' আগেই বলেছি। তার মূলে ত' ওই ঘড়ি।"

"কিন্তু এদিকে ঘড়িতে ক'টা বাজে জানো?" গৌর প্রায় আর্তনাদ ক'রে উঠলো, ফেরারী এতক্ষণে বোধ হয় ফাইনাল হুইসল দিচ্ছে।

"অ্যাঁ!"—প্রায় সমস্বরে সবাই চিৎকার ক'রে উঠে ফ্যালফ্যাল ক'রে পরস্পরের মুখের দিকে রইলাম।

———

হাঁস

গৌর, শিশির, শিবু নয়, এ একেবারে বুনো বাপি দত্ত। যেমন গোঁয়ার তেমনি ষণ্ডা।

এ-হেন লোককে মেসে নতুন জায়গা দিয়ে কি ভুলই হয়েছে, সেদিন রাত্রে হাড়ে-হাড়ে বুঝে আমরা সবাই ইষ্টদেবতা স্মরণ করতে লাগলাম।

কুরুক্ষেত্রের বুঝি আর বাকি নাই। বিরাট-পর্ব শুরু হয়ে গেছে। প্রথম বোমা ফেটেছে।

বোমাটা ফাটল রাত্রের খাওয়া-দাওয়ার পর।

খাওয়া-দাওয়াটা বেশ ভালই হয়েছিল। মফঃস্বলে যাদের বাড়ি, তাদের কল্যাণে শুক্রবার রাত্রের খাওয়াটা আজকাল এই রকমই হয়। শুক্রবারের পরই শনিবার হাফ হলিডে-তে তাঁরা সকাল সকাল বাড়ি যান, আর ফেরেন সেই সোমবার সকালে। রবিবারের খাটটার অভাব শুক্রবারের রাত্রের ভোজ দিয়েই তাঁরা তাই উশুল ক'রে নেন।

মফঃস্বলীদের মধ্যে বাপি দত্ত একজন। সাঁটিয়েদের ভেতরও।

তিনবারের জায়গায় চারবার চেয়ে খেয়ে যেভাবে সে পাত চাটছিল, ঘনাদা দেখলে বোধ হয় ঈর্ষান্বিত হতেন। তাঁদের খাওয়ার রেষারেষির পাল্লায় ঠাকুর-চাকরের জন্য কিছু থাকত কিনা সন্দেহ। কি ভাগ্যি ঘনাদা আজ শরীর খারাপ বলে নয়,—না খেয়ে নয়,—আগেই খেয়ে-দেয়ে তাঁর ঘরে চলে গেছেন।

পেতলের থালাটা মাজবার দায় থেকে লছমনিয়াকে প্রায় নিষ্কৃতি দিয়ে নিজের হাত চুষতে চুষতে বাপি দত্ত বললে,—"বাঃ চমৎকার!"

তা মাংসটা সত্যি অপূর্বই রান্না হয়েছিল।

আঙুল চোষা শেষ ক'রে ঝকঝকে থালাটার দিকে একবার যেন করুণভাবে চেয়ে বাপি দত্ত বললে,—"কেমন, আমি বলি কিনা যে মাংস খেতে হয়ত' হাঁসের। ও মুরগী বল, পায়রা বল, হাঁসের কাছে কিছু না! যদি জাত বিগড়ি হাঁস হয়।"

"কেন উটপাখী হ'লে মন্দ কি!"—শিবু একটু ফোড়ন কাটল।

"উটপাখী! উটপাখী আবার খায় নাকি?"—বাপি দত্তর বুদ্ধিটা চেহারারই মাপসই।

"খেলে দোষ কি ? একটাতে তোমারও কুলিয়ে যায়। অন্যদের জন্যেও মাংসের হাঁড়িতে টান পড়ে না।"—শিবু উৎসাহ দিলে।

একটু যেন দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে বাপি দত্ত বললে,—না না, উটপাখী খাওয়াই যায় না, আর তা ছাড়া হাঁসের তুলনা নেই—আসল বিগড়ি হাঁস ! হাঁস আবার চেনা চাই।"

কথাটা বলেই বাপি দত্তর কি যেন মনে পড়ে গেল। ঠাকুরকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলে,—"আজ হাঁস কিনে আনল কে, ঠাকুর ?"

ঠাকুর আমাদের ভাল-মন্দ বাজার করে। সে কিন্তু সামনে এলেও নীরবেই দাঁড়িয়ে রইল।

"কই, কে কিনে এনেছে বললে না ! তুমি ?"

"আজ্ঞে না বাবু !"

"সে আমি জানতাম !"—বাপি দত্ত গর্বের হাসি হাসল। "এ হাঁস চিনে আনা তোমার কর্ম নয়। কিন্তু কিনে আনল কে ?"

"তোমরা কেউ আননি ! তাহ'লে বিগড়ি হাঁস কি নিজে থেকে উড়ে এসে তোমাদের হাঁড়িতে ঢুকল নাকি ! ন্যাকামি কোরো না। বলো !"

"আজ্ঞে, আপনিই কিনে এনেছেন !"—ঠাকুরকে সভয়ে বলতেই হ'ল।

"আমি কিনে এনেছি !"—খানিকক্ষণ বাপি দত্তের মুখ দিয়ে আর কথা সরলো না। তারপর আমরা টের পেলাম, পল্‌তেয় আগুন লেগেছে। "আমি মানে,—কাল বাড়িতে নিয়ে যাব বলে আমি যে ক'টা হাঁস কিনে রেখেছি, তাই কেটে রান্না হয়েছে ! তাই তোমরা সবাই মিলে স্ফূর্তি ক'রে খেয়েছ আর আমায় খাইয়েছ !"

ঘরে কি বলে—আধুনিক কবিতার মত—শিশির পড়লে শোনা যায়।

এইবার বোমা ফাটল।

"কে ? কে আমার হাঁস কেটেছে ? কার এই শয়তানি আমি শুনতে চাই।"

আমাদের চোখ যার যার থালার ওপর। কিন্তু উত্তর না দিলে ঠাকুরের নিস্তার নেই।

"আজ্ঞে, বড়বাবু কেটেছেন।"

"বড়বাবু ? বড়বাবু ! বড়বাবু মানে তোমাদের সেই শুঁটকো মর্কট গেঁজেল চালিয়াৎ ঘনাদা !"

হে ধরণী দ্বিধা হও—আমরা তখন ভাবছি।

কিন্তু ভাববার সময়ও পাওয়া গেল না।

সকড়ি হাতে এঁটো-মুখ না ধুয়েই বাপি দত্ত তখন সিঁড়ি দিয়ে রওয়ানা হয়েছে ওপরে ! আমাদের ছুটতে হ'ল পেছনে।

"আরে শোন ! শোন দত্ত।"

কে কার কথা শোনে !

ছাদ পর্যন্ত পৌঁছবার আগেই শুনতে পেলাম ঘনাদার ঘরের দরজা সারা পাড়াকে সজাগ করে সশব্দে আর্তনাদ করছে। বর্মা নয়, সি পি'র সামান্য সেগুন কাঠ। তার আর কতটুকু জান

বাপি দত্তকে এখন সামলানো বুনো মোষের মওড়া নেওয়ার চেয়েও শক্ত। তবু মরিয়া হয়ে তাকে ধরতে যাব, এমন সময় দরজা ভেতর থেকেই খুলে গেল।

"কি ব্যাপার !" ঘুম-চোখে যেন সদ্য বিছানা থেকে উঠে এসে হাই তুলে ঘনাদা বললেন,—"এতরাত্রে দরজায় টোকা কেন ?"

টোকা শুনেই বোধ হয় বাপি দত্ত কাত। পাড়ার লোক যে-আওয়াজে ডাকাত পড়ার ভয়ে এতক্ষণে হয়ত' লালবাজারে ফোন ধরেছে, তার নাম টোকা।

কিন্তু ভেতরের বারুদ তখন জ্বলছে। বাপি দত্ত গর্জন ক'রে উঠল, "কেন, আপনি জানেন না! কে আমার হাঁস কেটেছে?"

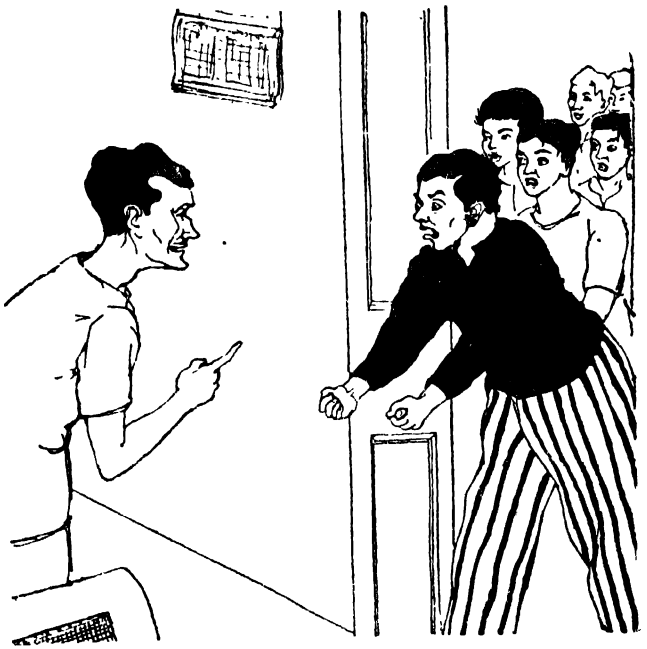

"আমিই কেটেছি।" ঘনাদা নির্বিকার।

"আপনিই কেটেছেন তা আমি জানি। নইলে এত বড় আস্পর্ধা কার হবে। কিন্তু কার হুকুমে, কোন্ সাহসে, আপনি আমার হাঁস কেটেছেন,—বাড়ি নিয়ে যাব ব'লে বাছাই ক'রে কেনা আমার চার-চারটে হাঁস!—"

"চারটে ত' মোটে!—"—ঘনাদা যেন দুঃখিত।

"ওঃ চারটে হাঁস কিছু নয় আপনার কাছে!—বাপি দত্ত আগুন।

"কিছুই নয়। এ-পর্যন্ত কেটেছি বারো শ' বত্রিশটা। আরো কত যে কাটতে হবে কে জানে!"—ঘনাদা তাঁর খাটের দিকে বিষণ্ণভাবে পা বাড়ালেন। আমরাও সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু তখুনি থামতে হ'ল।

"যাচ্ছেন কোথায়?" বাপি দত্ত হুংকার দিয়ে উঠল,—"আপনার ওসব গুল আমার কাছে ঝাড়বেন না। ওসব চালাকি আমি সব জানি।"

"জানো!" ঘনাদা যেন অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে ফিরে দাঁড়ালেন। "জানো গুগারুসেরচঙ্ কাকে বলে!"

"কি বললেন!"—বাপি দত্ত ক্ষিপ্ত।

"ওগারুসেরচঙ্! তুমি নয়, হাঁসের নাম।" ঘনাদা আশ্বস্ত করলেন, "জানো, তিনশ' সেরা শিকারী দুনিয়ার সমস্ত জলা জঙ্গলে এই হাঁস খুঁজে ফিরছে? জানো, একটা হাঁসের জন্যে গলায় গলায় যাদের ভাব এমন দু' দুটো রাজা এ ওর গলা কাটতে পারে? জানো একটা হাঁসের পেট কেটে এই কলকাতা শহরটা কিনে নিয়েও যা থাকে তাতে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ইজারা নেওয়া যায়!"

এই শেষের কথাতেই বাপি দত্ত কাবু। তবু গলাটা চড়া রেখেই শুধালো,—"কি আছে সে হাঁসের পেটে? হীরে, মাণিক?"

"হীরে মাণিক!" ঘনাদা অবজ্ঞার হাসি হাসলেন, "এই বুদ্ধি না হ'লে হাঁস শুধু এতকাল খেতেই কেনো!"

"কি আছে তাহ'লে?"—বাপি দত্ত এবার উদ্‌গ্রীব।

"কি আছে?" ঘনাদা জুত করে নিজের খাটের ওপর বসলেন। আমরাও যেখানে যেমন পারলাম বসলাম। শিশির সদ্য খাওয়া থেকে উঠে এসে সিগারেটের কৌটোটা আর সঙ্গে আনতে পারেনি। তার দিকে একটু ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে তাকিয়ে ঘনাদা গভীরভাবে বললেন,—"আছে একটা নস্যির কৌটো।"

"নস্যির কৌটো! আমি ভাবছিলাল কলকে বুঝি কিছুর!" বাপি দত্তর বিদ্রূপে কিন্তু আর তেজ নেই। খাটের ধারেই সেও জায়গা নিয়েছে।

ঘনাদার মুখে তীব্র ভ্রূকুটি দেখা গেল। "রাত ত' অনেক হয়ে গেল, এখন শুতে গেলে হয় না।" তিনি হাই তুললেন।

আমরা সন্ত্রস্ত, বাপি দত্ত নাছোড়বান্দা। "নস্যির কৌটো কেন?" চার চারটে হাঁসের শোক সে প্রায় ভুলেছে মনে হ'ল।

"কেন? উনিশ শ' পঁয়ত্রিশ সালের জুলাই মাসের সতরোই তারিখে পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু মালভূমিতে তুষার-ঝড়ে পথ হারিয়ে মরতে বসেছিলাম ব'লে, দুনিয়ার সেরা শয়তান ফন ব্রুল সদলবলে নেকড়ের পালের মত আমার পিছু নিয়েছিল ব'লে, প্রাণ যায় যাক, মান বাঁচাবার আর কোন উপায় ছিল না ব'লে, ষোল হাজার দশ ফুট উঁচু গুরলা গিরিদ্বারের তিন মাইল সোজা খাড়াই-এর পথে ভূত দেখেছিলাম ব'লে, আর বন্দুকের শেষ গুলিতে 'চঙ্গু'টাকে মারতে পেরেছিলাম ব'লে!"

বাপি দত্তের মুখের হাঁ-টা আমাদের সকলের চেয়ে বড়।

কোনরকমে হাঁ বুজিয়ে সে জিজ্ঞাসা করলে, "ভূত! ভূতের নাম চাঙ্গু? সেই ভূত গুলিতে মারলেন!"

"ভূত নয়, মারলাম চাঙ্গুটাকে। চাঙ্গু হ'ল ও অঞ্চলে নেকড়ে বাঘের নাম।" ঘনাদা যেন ক্লান্তভাবে একটু থেমে আবার বললেন,—"তোমরা ত' হ ত মুখও ধোওনি দেখছি।"

"হাত মুখ!" বাপি দত্তই সবার আগে রুমাল বার ক'রে হাত-মুখটা চটপট মুছে ফেলে বললে, "নেমন্তন্ন খেতে এসেছি মনে করলেই হয়! হ্যাঁ, তারপর শুনি।"

"তারপর নয়, তার আগে।" ঘনাদা শুরু করলেন—"কৈলাসটা চক্কর দিয়ে মানস সরোবর আর রাক্ষসতাল হয়ে টাকলাকোটে এসে তখন আটকে গেছি। টাকলাকোট ভারত আসতে তিব্বতের শেষ গ্রাম। তারপরই বিপুলেখ গিরিদ্বার হয়ে ভারতে নামতে হয়। টাকলাকোটে এসেই শুনলাম বিপুলেখ গিরিদ্বার বরফ পড়ে বন্ধ হয়ে গেছে। পারাপার হওয়া মানুষের অসাধ্য। অসময়ে আসার দরুন এ-ধরনের বিপদ যে হ'তে পারে তা অবশ্য

আগেই জানতাম! মানস সরোবরের যাত্রীদের মরশুম অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে। খাস তিব্বতীরাও এ অসময়ে শীত কাটাবার জন্যে তৈরী হয়ে গাঁ থেকে নড়ে না। টাকলা-কোটের মোড়ল জানালে, শীতটা আমায় তাদের গাঁয়েই কাটাতে হবে। আপত্তি করলাম না। কাছাকাছি দেখবার শোনবার অনেক কিছুই আছে। দশ-বারো মাইলের মধ্যে সিস্থিলিঙ গুম্ফা, খেচরনাথ গুম্ফা ত' বটেই, তা'ছাড়া কিছুদূরে গেলে এ অঞ্চলে এখনও নাকি 'ডং' পাওয়া যেতে পারে। আর 'ডং' যদি না মেলে ত' 'গোয়া' কি 'তো' কি 'না আঁধিয়ান' পেলেই বা মন্দ কি?"

শিবুর কাশির শব্দে ঘনাদা থামলেন। গৌর বললে,—"এই সবে একপেট খেয়ে আসছি কিনা। মাথাটা কি রকম ঝিমঝিম করছে।"

একটু ভ্রূকুটি ক'রে ঘনাদা বললেন,—"ও, মাথায় ঢুকছে না বুঝি! আমারই দোষ। তিব্বতের কথা বলতে সেখানকার ভাষাই এসে যায়। 'গোয়া' আর 'তো' হ'ল ছোট আর বড় দু'জাতের তিব্বতী হরিণ আর না 'আঁধিয়ান' হ'ল সেখানকার বুনো ভেড়া।"

"আর 'ডং' বুঝি গাধা! ডংকি থেকে?"—বাপি দত্ত সোৎসাহে শুধালে।

"আরে না! ডং গাধা হবে কেন?" ঘনাদা যেন বিশেষ তাৎপর্যের সঙ্গে বাপি দত্তের দিকে তাকালেন। "ডং হ'ল বুনো চমরী গাই। খুব কমই পাওয়া যায় আজকাল।

হ্যাঁ, টাকলাকোটে থাকি আর এদিক সেদিক বন্দুক নিয়ে শিকারে বেরোই। শীতটা সেবার একটু আগেই পড়েছিল। যেদিকে যাই শুধু তুষার আর তুষার। জন্তু জানোয়ারও সব শীতের ভয়ে আগেই নীচে নেমে গেছে বোধ হয়। বেশীর ভাগ শুধুহাতেই ফিরতে হয়।

এর মধ্যে একদিন খেয়াল হ'ল, এই শীতের দিনে গিরিদ্বার থেকে আর-একবার কৈলাস আর মানস সরোবর দেখব। ভারতবর্ষ থেকে যেতে এই গুরলা গিরিদ্বার পার হবার সময়ই প্রথম কৈলাস আর মানস সরোবরের দর্শন পাওয়া যায়।

মোড়ল মানা করলে। গুরলা গিরিদ্বার এখন বরফে মানুষের অগম্য। তা'ছাড়া আকাশের লক্ষণও নাকি ভাল নয়। তবু কে কার কথা শোনে। বারফু পর্যন্ত বারো মাইল একরকম নির্বিঘ্নেই গেলাম, তারপর কিছুদূর যেতে না যেতেই কোথায় আকাশ, কোথায় মাটি আর খেয়াল রইল না। তিব্বতের তুষার-ঝড় যে কি বস্তু যে নিজের চোখে দেখেছে তারও বর্ণনা করতে ভাষায় কুলবে না। একেবারে প্রলয় কাণ্ড! ছেঁড়া ঘুঁড়ির মত সে ঝড়ে কখনও শূন্যে কখনও মাটিতে পাক খেয়ে—কোথায় গিয়ে যে পৌঁছলাম জানি না। হাত-পাগুলো যে আস্ত আছে তাইতেই তখন অবাক্!"

শিবুর কাশিটা নিশ্চয়ই ছোঁয়াচে। এবার গৌর শিশির দু'জনে কাশি চাপতে গিয়ে বিষম খেয়ে কেলেঙ্কারি। ঘনাদার আগে বাপি দত্তই বিরক্ত হয়ে উঠল—"কি সব কেশো রুগী এখানে জুটেছে। হাসপাতালে গেলেই ত' পারো।"

কাশির রেশ মেলাবার আগেই ঘনাদা আবার ধরলেন, "কিন্তু অবাক্ হওয়ার তখনও বাকি আছে। তুষার-ঝড় যেমন হঠাৎ ক্ষেপে ওঠে তেমনি হঠাৎ ঠাণ্ডা হয়। গা ঝেড়ে-ঝুড়ে উঠে দাঁড়িয়ে দেখি, চেনা কোন কিছুই চোখে পড়ছে না। এক-একটা বড়-বড় পাহাড় ছাড়া সবই যেন নতুন। তিব্বতের তুষার-তেপান্তরে হারিয়ে যাওয়া মানে যে কি, আমার চেয়ে ভাল ক'রে আর কে জানবে। দশ-দিন দশ-রাত হেঁটে, মানুষের আস্তানা খুঁজে পাওয়া অসাধ্য। আর দশ দিন দশ-রাত টিকলে ত'! সঙ্গে ত' মাত্র দিন-দুয়েকের রসদ ছিল, তাও ঝড়ে কোথায় গেছে ছড়িয়ে। আছে শুধু হাতের বন্দুকটি। তবু যতক্ষণ শ্বাস

ততক্ষণ আশ। যে কোন দিকে যাবার চেষ্টা করতেই হবে। পা বাড়াতে গিয়ে হঠাৎ চম্‌কে উঠলাম।

ঝড়ের ঝাঁকানিতে শেষে মাথাই খারাপ হ'য়ে গেল নাকি! নইলে এ অদ্ভুত ব্যাপার কি ক'রে সম্ভব?

সেই জনমানবহীন ধুধু-তুষার-প্রান্তরে বিশুদ্ধ "ফিনিস" ভাষায় কে ডাকছে—কে আছে কোথায়? কাছে এস, আমার কথা শুনে যাও।

গায়ে কাঁটা দিয়ে শির-দাঁড়াটার ভেতর শির্‌শির ক'রে উঠল। যে দিকে চাই কোথাও মানুষ দূরে থাক একটা কাক-পক্ষীও ত' নেই।

খানিক চুপ করার পর আবার সেই ডাক এল। এবার ফরাসীতে।

নিজের গায়ে চিমটি কাটটি কাটলাম। সাতানব্বই হাজার সাতশ' সাতান্নকে একাশী হাজার ন-শ' বাইশ দিয়ে গুণ করলাম মনে মনে। না মাথা ত' খারাপ হয়নি একেবারে। এ অশরীরী আওয়াজ তাহ'লে কেমন ক'রে শুনছি?

আবার সেই ডাক। এবার ভাঙা-ভাঙা ইংরেজিতে। আশ্চর্য এ-গলা যেন খানিকটা চেনাই মনে হচ্ছে। কিন্তু তাই বা কি ক'রে হ'তে পারে। সাত বছর বাদে এ-গলা ত' শোনবারই কথা নয়!

মিনিট কয়েক থেমেই ঘুরে ঘুরে সেই ডাক আসছে। যেদিক থেকে ডাকটা আসছিল সেই দিকেই এবার গুটি গুটি এগুলাম। কোথাও কোন একটা ছায়া পর্যন্ত নেই। শুধু থেকে থেকে ওই আওয়াজ।

খানিক দূর গিয়েই একেবারে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। ধুরো তুষারে প্রায় অর্ধেক ঢাকা একটা মানুষের দেহ।

এ কি! এ যে সত্যই ডাঃ ক্যালিও—ফিনল্যাণ্ডের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক। সাত বছর আগে সিনকিয়াং থেকে তিব্বতে যাবার পথে দস্যুদের হাতে যিনি মারা পড়েছেন ব'লে সবাই আমরা জানি! তাঁর তিব্বতে যাওয়ার খেয়াল নিয়ে তখন লেখালেখিও হয়েছিল অনেক কাগজে।

এবার ব্যাকুলভাবে সেখানে বসে পড়ে। ডাঃ ক্যালিওর দেহটা পরীক্ষা করলাম: না, সাত বছর আগে মারা না পড়লেও অন্ততঃ সাত দিন আগে যে তিনি মারা গেছেন এবিষয়ে সন্দেহ নেই। বরফের দেশ বলে দেহটা তেমন বিকৃত হয়নি। পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ বাসায়নিকের এর চেয়ে বুঝি সাত বছর আগে দস্যুর হাতে মারা যাওয়াই ভাল ছিল। এই তুষার-প্রান্তরে তিল তিল ক'রে মরতে কি কষ্টই না পেয়েছেন, কে জানে!

পর মুহূর্তেই শরীরের লোমগুলো খাড়া হয়ে উঠল। ডাঃ ক্যালিওর গলার সরে সেই ডাক আবার। তুষার-ঢাকা নিস্তব্ধ প্রান্তরে সে ডাক কোথা থেকে আসছে? সভয়ে চেয়ে দেখলাম তাঁর মৃতদেহ থেকে অন্ততঃ নয়।

উন্মাদ ক'রে দেবার মতই অলৌকিক ভয়াবহ ব্যাপার। কিন্তু মাথা ঠাণ্ডা রাখতেই হবে। তা রাখতে না পারলে আর সহজ সুস্থ মানুষ হিসাবে সেখান থেকে ফিরতে হ'ত না, আর তারপর ফন ব্রুলের সন্ধানও পাওয়া যেত না।

গুরুলা গিরিদ্বারের প্রায় পঞ্চাশ মাইল দূরে এই দুর্দান্ত শীতে ফন ব্রুল একান্ত নির্জনে সদলবলে তার ছাউনি যেখানে গেড়েছে সেখানে কয়েকদিন বাদে সকালে এক পথ-হারানো 'ডোকপা'—মানে রাখাল গিয়ে হাজির। তুষার ঝড়ে তার সব খোয়া গেছে। উপোসে

ঠাণ্ডায় সে আধমরা। এক পাল চমরী আর ঝাব্বুস অর্থাৎ ভারতবর্ষের গরু আর তিব্বতের চমরী মেশানো পশু নিচের টাকলাকোটে পৌঁছে দিয়ে, সে দু'জন বন্ধুর সঙ্গে কিছু রসদ নিয়ে যুগোলো গুম্ফায় ফিরছিল! মাঝে তুষার ঝড়ে কে কোথায় গেছে সে জানে না।

ফন ব্রুন যেমন শয়তান তেমনি চৌকস। তিব্বতী ভাষা সে ভাল করেই জানে। সামান্য একটু তিব্বতী রাখাল হ'লেও তবু নানারকম প্রশ্ন ক'রে 'ডোক্‌পা'কে পরীক্ষা ক'রে তবে তাকে ছ উনিতে ঠাঁই দিলে। ছাউনি মানে গোটা পাঁচ ছয় তাঁবু। কিন্তু তিব্বতের শীতের সঙ্গে যোঝবার মত ক'রে তৈরি। একটিতে থাকে ব্রুল নিজে, আর একটিতে তার অনুচরবৃন্দ আর রসদ যন্ত্রপাতি ইত্যাদি। অনুচরের ভেতর তিব্বত লাদক সিনকিয়াং সব জায়গার লোকই আছে।

'ডোক্‌পা' লোকটা কাজের। একদিন খেয়ে দেয়ে একটু চাঙ্গা হয়েই শুধু কাজের গুণে সে ব্রুলের নজরে পড়ে গেল! তাঁবু পরিষ্কার বন্দুক সাফ থেকে সাহেব-সুবোর হেন কাজ নেই সে জানে না।

দু'দিন বাদে তাকে দিয়ে হ্যাসাক বাতি সাফ করাতে করাতে ব্রুল হঠাৎ একটা খুটের ঠোক্কর দিয়ে জিজ্ঞাসা করলে,—"এই বেটা ভূত! এ সব সাহেব-সুবোর কাজ শিখলি কোথায়?"

"আজ্ঞে, হেডিন সাহেবের সঙ্গে ছিলাম যে ক'বার।"

"হেডিন সাহেব!"—ব্রুল অবাক্। "কে হেডিন?"

"আজ্ঞে গরীবের মা-বাপ সোয়েন হেডিন।"

ব্রুল সাহেব এবার যেন একটু হতভম্ব। "সোয়েন হেডিনের সঙ্গে তুই কাজ করেছিস্। তিব্বতের এ অঞ্চল ত' তুই তা'হলে জানিস্ কিছু?"

"আজ্ঞে তা আর জানি না। এমন সব পাহাড়, নদী, হ্রদের খবর রাখি এদেশের লোকেরাও যার নাম জানে না।"

"বেশ বেশ। তোকে আমার কাজে লাগবে।" ব'লে ব্রুল বেরিয়ে গেল, তার পরদিন তাঁবু উঠিয়ে নতুন পথে রওনা হবার ব্যবস্থা করতেই বোধ হয়।

পরের দিন পর্যন্ত ব্রুলকে অপেক্ষা করতে হ'ল না।

সেদিনই বিকেলের দিকে কাছাকাছি বুঝি শিকারে গেছল একটু। সন্ধ্যের পর ফিরে এসে ঘরে 'ডোকপা'কে দেখে একটু বিরক্তই হয়ে উঠল।

"কি করছিস্ কি এখানে এখন, ভূত কোথাকার!"

হ্যাসাক বাতিটা তুলে এদিকে ওদিকে ঘোরাতে ঘোরাতে 'ডোকপা' বললে,—"আজ্ঞে, একটা জিনিস খুঁজছি।"

"জিনিস খুঁজছ! হতভাগা জানোয়ার! এটা তোমার জিনিস খোঁজবার সময়! কি খুঁজছ কি?"

"আজ্ঞে, একটু জল।"

"জল!"—প্রথমটা ব্রুল হাসবে না রাগবে ঠিক করতে পারল না। তার পর-মুহূর্তেই তার প্রকাণ্ড বাঘের মত মুখখানা লাল হয়ে উঠল রাগে। হুংকার দিয়ে বলল—"কি এখানে খুঁজছিস?"

"আজ্ঞে, একটু ভারী জল, ডিউটেরিয়াম-অক্সাইড।"

পায়ের তলায় হঠাৎ পৃথিবীটা সরে গেলেও ব্রুল বোধ হয় এমন চমকে উঠে ফ্যাকাশে মেরে যেত না। সামলাতে তার কিন্তু বেশীক্ষণ লাগল না। "তবে রে শয়তান! বাঘের ঘরে

বোবের বাসা!" বলে পাক্কা সাড়ে ছ ফুট দু-মণী লাশটা নিয়ে 'ডোক্‌পা'র ওপর এবার সে ঝাঁপিয়ে পড়ল। অতবড় লশটা ত' আর চারটিখানি কথা নয়! একদিকের দড়ি ছিঁড়ে তাঁবুর একটা কোণ ঝুলে পড়ল।

হাসাক বাতিটা একটু সরিয়ে রেখে বললাম,—"তাঁবুটা বড়ই ছোট, এর মধ্যে অত লাফালাফি দাপাদাপি কি ভাল!"

বাপি দত্ত হঠাৎ লাফ মেরে উঠল উত্তেজনায়—"ও! আপনিই তা'হলে 'ডোক্‌পা'! আমিও তাই ভাবছিলাম 'ডোক্‌পাটা' এল কোথা থেকে।"

করুণামিশ্রিত অবজ্ঞার সঙ্গে বাপি দত্তের দিকে একবার চেয়ে ঘনাদা আবার শুরু করলেন,—"গা-টা ঝেড়ে-ঝুড়ে উঠে বুল বেশ একটু হতভম্ব হয়েই আমার দিকে এবার তাকাল। যা শিক্ষা এইটুকুতেই হয়েছে তাতে, গায়ের জোর পরীক্ষা করবার উৎসাহ আর তার তখন নেই। কিন্তু ভেতরের জ্বালা যাবে কোথায়। গলা দিয়েই সেটা বেরুল আগুনের হল্কার মত।"

"কে তুই! কি মতলবে এখানে ঢুকেছিস্?"

"বললাম ত, শুধু একটু ভারী জলের খোঁজে। একশিশি যে জল এই হাইড্রোজেন বোমার বুকে বেঁধে সারা-জীবন পায়ের ওপর পা দিয়ে কাটিয়ে দেওয়া যায়। ডাঃ ক্যালিও প্রাণের মায়া ত্যাগ ক'রে এই সুদূর তিব্বতে এসে, যে ভারী জলের এমন স্বাভাবিক এক গুপ্ত হ্রদ খুঁজে পেয়েছেন, পিপে চালান দিলেও যা একশ' বছরে ফুরোবে না। ডাঃ ক্যালিও কাজ সেরে দেশে ফেরবার মুখে নিরীহ সাধারণ পর্যটক ভেবে যে জলের হ্রদ আবিষ্কারের কথা তোমার মত শয়তানকে বলেছিলেন, আর ডাঃ ক্যালিওর কাছে যে জলের হ্রদের গুপ্ত মানচিত্র কেড়ে নিয়ে তাঁকে তুষার-ঝড়ের মধ্যে একদা মরতে ছেড়ে দিয়ে তুমি এখন হ্রদের সন্ধানে চলেছ।"

"এসব কথা তুই জানলি কি করে!"—রাগে বিস্ময়ে বুলের গলাটা তখন কাঁপছে।

"জানলাম ডাঃ ক্যালিওর কাছে।"

"হতে পারে না!"—বুল চেঁচিয়ে উঠল, ডাঃ ক্যালিওকে কথা বলবার অবস্থায় আমি রেখে আসিনি।"

"তাই নাকি!"—শয়তানের নিজের মুখের এই স্বীকারটুকুই চাইছিলাম।

"কোথা থেকে তুই জানলি আগে বল—।" বুল পারলে আমায় ছিঁড়ে খায়।

"তাহ'লে শোন। জানলাম ডাঃ ক্যালিওর ভূতের কাছে।"

"ভূতের কাছে!"—বুল বুঝি ক্ষেপেই যায়।

হেসে বললাম,—"হাঁ, ভূতের কাছে। আর জেনেছি যে ঠিক, তাতে কোন সন্দেহ আছে কি?"

"কিন্তু জেনে তোর লাভ কি!"—হঠাৎ বুল তাঁবুর ধারে রাখা তার বন্দুকটা তুলে নিয়ে আমার দিকে উঁচিয়ে, তার চাল আর গলা দুই-ই পালটে ফেললে—"এ জলের হ্রদ কি তুই কখনো খুঁজে পাবি ভেবেছিস্? আর পেলেও তোর মত কালা মর্কটের কাছে ও জল কিনত কে?"

বিদ্রূপের হাসি হাসতে গিয়ে হঠাৎ বুল থমকে আমার দিকে হাঁ করে চেয়ে রইল। টুপিসমেত মাথার চুলটা আর তিব্বতীদের চেহারার ধরনের সামান্য যে-কটা দাড়ি গোঁফ মুখে ছিল তা আমি তখন খুলে ফেলেছি।

"দাস!"

"হ্যাঁ মূলার, সেই দাস, তোমার সঙ্গে অনেকদিনের বোঝাপড়া যার বাকি। ডাঃ ক্যালিও, তোমায় নিরীহ বুল বলেই জেনেছিলেন। কিন্তু আমি তোমার আসল পরিচয়টা ভুলিনি,—বিজ্ঞানের কলঙ্ক, জালিয়াৎ, খুনে, ফাঁসির আসামী জেল পালানো—মূলার! জীবনের প্রথমে ল্যাবরেটরির রেডিয়াম চুরি করে ধরা পড়ার পর অনেকবার যে নাম পালটেছে সে-ই!"

মূলার এবার সত্যিই হো হো করে হেসে উঠল—"যাক, ভালই হয়েছে দাস, নিজে থেকে এ-সুযোগটা আমায় দিয়েছ বলে। মূলার নামটা যারা ভোলেনি তাদের সংখ্যা আমি কিছু কমাতে চাই।"

মূলার বন্দুকটা আমার দিকে বাগিয়ে ধরল।

হেসে বললাম,—"শিকার করে ত' এই ফিরলে, বন্দুকে আর টোটা আছে কি?"

হিংস্রভাবে হেসে মূলার জবাব দিলে,—"আছে একটাই আর সেই একটাই তোমার মত মর্কটকে মারবার পক্ষে যথেষ্ট।"

"কিন্তু মর্কট মারা গেলে ভারী জলের হ্রদ আর খুঁজে পাবে কি?"

"পাব না মানে?" রাগে খিঁচিয়ে উঠলেও মূলারের চোখ দেখে বুঝলাম সে অত্যন্ত বিচলিত হয়েছে।

"সে ম্যাপ—ম্যাপ তুই চুরি করেছিস?"—রাগে মূলার প্রায় তোতলা।

"নইলে কি শুধু তোমার খিদ্‌মতগারি করতে এ-তাঁবুতে ঢুকেছি! আরে সামলে সামলে! আমায় মারলে ম্যাপ পাবে কোথায়! সে কি আমার বুক পকেটে তোমার সুবিধের জন্যে রেখে দিয়েছি!"

"কোথায় রেখেছিস্?" তবু মূলার বন্দুকটা বুঝি ছুড়েই দেয়।

"বলব, কিন্তু হ্রদের জলে আমার আধা বখরা চাই।"

"আধা বখরা!"—মূলার চট করে কি ভেবে নিয়ে বললে, "তাই সই। কোথায় ম্যাপ্?"

"বলছি বলছি, অত ব্যস্ত কেন? আগে বখরাটা কি রকম শোনো!"

"কি রকম?"

"যে শিশিতে এ জল চালান যাবে সেইটে তোমার, জলটা আমার!"

"কি!" এই অবস্থায় এই ঠাট্টায় একেবারে চিড়-বিড়িয়ে উঠে মূলার এক পলকের জন্যে বুঝি একটু অসাবধান হ'ল।

একহাতে বন্দুকটা কেড়ে নিয়ে আর একহাতে হ্যাসাক বাতিটা আছড়ে ফেলে আমিও তৎক্ষণাৎ তাঁবু থেকে ছুট।

হ্যাসাক বাতিটা বৃথাই পড়েনি। ছুটতে ছুটতে দূর থেকে ফিরে দেখলাম তাঁবুগুলো দাউ দাউ করে জ্বলছে।

কিন্তু মূলারের মত শয়তানকে যে ওইটুকুতে ঠেকান যায় না পরের দিনের সকালেই তা টের পেলাম।

তিব্বতের মত উঁচু মালভূমির পাতলা হাওয়ায় প্রাণপণ ছুটে, ক্লান্তিতে ক্ষিদেয় সত্যিই তখন আমার অবস্থা কাহিল। সেই অবস্থায় মাঝারিগোছের একটা তুষার-চূড়োর ওপর উঠে চারিদিক দেখতে গিয়ে বুকটা হঠাৎ ধ্বসে গেল।

পিঁপড়ের মত হ'লেও বহুদূরে একটা চলন্ত প্রাণী দেখা যাচ্ছে। "সেটি আর কিছু নয়—মূলার স্বয়ং—আর তার পায়ে স্কি। শয়তানটা যে সঙ্গে স্কিও এনেছিল এইটিই ভাবতে

পারিনি। শুধু পায়ের দৌড়ে তার সঙ্গে আর কতক্ষণ পারব! হাতের বন্দুকটা ভার হ'লেও ফেলে দিতে ত' পারি না।

প্রাণও যদি যায় এ ম্যাপ মূলারকে পেতে দেব না। এই পণ করে খোলা প্রান্তর ছেড়ে এবার পাহাড়ের গায়ে গায়ে যেতে লাগলাম। কিন্তু ক্ষিদেয় যে বত্রিশ নাড়িতে পাক দিচ্ছে! পেটে কিছু না পড়লে আর ত' দাঁড়াতেই পারব না।

হঠাৎ পাহাড়ের একটা বাঁক ঘুরেই হাতে যেন স্বর্গ পেলাম। সামনে একটা চূড়োর ওপর ক'টা 'ওগারুাসরচণ্ড' মানে ব্রাহ্মিনী বালিহাঁস। শীতের সময় ভারতের গরমে সব জলায় উড়ে যাবার পথে বোধ হয় বিশ্রাম করতে নেমেছে। বন্দুকে একটামাত্র গুলি, কিন্তু তাতেই আহারের সমস্যা মিটে যাবে মনে করার সঙ্গে-সঙ্গেই আরেকটা মতলব বিদ্যুতের মত মাথায় খেলে গেল।

কিন্তু গুলি না করে হাঁস ধরি কি করে!

সে সমস্যা ভাগ্যই মিটিয়ে দিলে। চমকে দেখি পাহাড়ের অন্যধার দিয়ে নিঃশব্দে একটা 'চাঙ্গু', মানে নেকড়ে বাঘ ওই হাসের লোভেই গুঁড়ি-মেরে এগিয়ে আসছে। দুরু-দুরু বুকে বন্দুক বাগিয়ে বসে রইলাম। পাঁচ, দশ, পনরো সেকেণ্ড, নেকড়েটা ঝাঁপিয়ে হাঁস ধরবার সঙ্গে সঙ্গেই গুলি। নেকড়েটা লুটিয়ে পড়ল মরে, আর তার মুখ থেকে গড়িয়ে পড়ল, ভয়েই-আধমরা অজ্ঞান হাঁসটা।

ছুটে গিয়ে হাঁসটা তুলে নিলাম। না, জখম কিছু হয়নি, শুধু ভয়েই অসাড়। দেখতে দেখতেই সাড় ফিরল তার, আর ম্যাপটা পাকিয়ে দলা করে যার মধ্যে রেখেছিলাম সেই ছোট কৌটাটা তার মুখে পুরে দিয়ে বেশ করে ঝাঁকুনি দিলাম। কোঁৎ করে হাঁসটা সে কৌটোটা গিলে ফেলতেই—তাকে শূন্যে দিলাম ছুঁড়ে। পড়-পড় হয়ে দু'বার পাখা ঝাপটা দিয়েই সে দূর আকাশে উধাও হয়ে গেল। বুঝলাম হিমালয় পার না হয়ে আর সে থামবে না। সে হাঁস এই ভারতবর্ষের না হোক, দুনিয়ার কোন-না-কোন জলায় শীতকালে আসেই। আজো তাকে তাই খুঁজছি। ক'জন বড় বড় বৈজ্ঞানিককে গোপনে একথা জানিয়েছি। তাঁদের ভাড়া করা অন্ততঃ তিন শ' শিকারীও এই খোঁজে ফিরছে।

"তাহ'লে এখনও হাঁসটা পাওয়া যেতে পারে?"—বাপি দত্ত উৎসাহিত।

"আলবত পারে।"—ঘনাদা নিঃসংশয়।

"কিন্তু মূলার কি করলে? বন্দুকের শব্দ পেয়েও আপনাকে ধরতে পারলে না?"—শিশির যেন সন্দিগ্ধ।

"তা পারল বই কি? আর তাই তার কাল হ'ল। হাঁস উড়িয়ে দিয়ে লুকিয়ে পালাবার চেষ্টাতেই ছিলাম। কিন্তু তার আর তখন উপায় নেই। চেয়ে দেখি স্কি-তে চড়ে সে একেবারে পাহাড়ের তলায় পৌঁছে গেছে। স্কি-ছেড়ে সে ওপরে উঠতে শুরু করল এবার। আমার হাতে খালি বন্দুক, তার হাতে গুলি-ভরা। চূড়োর এমন জায়গায় আছি যে লুকোবারও উপায় নেই। ক্রমশঃই সে এগুচ্ছে। আর একটু উঠলেই অনায়াসে গুলি করতে পারবে। খালি বন্দুকটাই তার দিকে ছুঁড়ে মারলাম। সেটা বেয়াড়া একটা পাথরে ঠোক্কর খেয়ে একরাশ তুষার-গুঁড়ো উড়িয়ে সশব্দে নিচে গিয়ে পড়ল। তাকে ছুঁতেও পারল না।

কি পৈশাচিক তার আনন্দের হাসি তখন।

আর উপায় নেই। নড়াবার মত একটা পাথরও নেই কাছে। বরফও ঝুরো।

নিচে মূলার তখন ভাল করে বন্দুক বাগিয়ে ধরে তাগ করছে।

বন্দুকের গুলি তার ছুটল, কিন্তু একটু দেরিতে। মূলার তখন খাড়া পাহাড় দিয়ে তুষার-গুঁড়োর সঙ্গে গড়াতে গড়াতে নিচের বরফের নদীর মধ্যেই কবর হতে চলেছে। তার সঙ্গে সেই 'চাঙ্গু' মানে নেকড়েটাও। সেইটেরই লাশটা শেষপর্যন্ত কিছু না পেয়ে ছুঁড়ে দিয়েছিলাম।"

ঘনাদা থামতেই গৌরের বেয়াড়া প্রশ্ন—"আচ্ছা নস্যির কৌটো পেলেন কোথায়? নস্যি নিতেন নাকি তিব্বতে?"

"নস্যির কৌটো বলেছি বলেই তাই না। ফিল্ম যাতে থাকে সেই ছোট আলুমিনিয়ামের কৌটো। মূলারের তাঁবুতেই পেয়েছিলাম।"

এবার বাপি দত্ত আসল কথাটা তুলল, "ভাগ্যিস ডাঃ ক্যালিওর ভূত আপনাকে ডেকেছিল। তার কাছেই ত' সব জানতে পারেন?"

"তা ভূতই বলতে পারো, তবে আসলে জিনিসটা একটা টেপ রেকর্ডার।"—ঘনাদা মুখ টিপে হাসলেন।

"টেপ রেকর্ডার!" আমরাও অবাক্।

"হ্যাঁ, ডাঃ ক্যালিও জন্তু-জানোয়ার থেকে পাখি-টাখির আওয়াজ ও তিব্বতীদের কথাবার্তা তুলে নেবার জন্যে ওটি সঙ্গে রাখতেন। শেষপর্যন্ত মূলারের মতলব বুঝতে পেরে ওই যন্ত্রটি কাজে লাগাবার অদ্ভুত ফন্দি বার করেন। নিজের সব কথা ওই যন্ত্রে তুলে নিয়ে ওইটিই লুকিয়ে এক জায়গায় রেখে আসতে পেরেছিলেন মারা যাবার আগে, যন্ত্রটির এমন প্যাঁচ করেছিলেন যে ফিতেটা নিজে থেকেই একবার গুটিয়ে যায়, একবার খুলে যায়—কথাগুলোও ঘুরে ঘুরে শোনা যায়। আওয়াজ ধরে আমি যন্ত্রটা খুঁজে বার করি একটা পাথরের তলায়। অন্য ক'টা ফিতে থেকে বাকি কথাগুলোও কিছুটা জানতে পারি। কিন্তু যন্ত্রটা বরফের গুঁড়ো ঢুকে, ঝড়ের ধাক্কায়, পাথরে ঠোকাঠুকি খেয়ে, প্রায় তখন বিকল হয়ে এসেছে। আমি কিছুটা চালাতেই একেবারে বন্ধ হয়ে যায়।"

"ফিতেটা খুলে সঙ্গে আনলে পারতেন! বুনো হাঁসের পেছনে ধাওয়া করার দরকার হ'ত না।"—শিবুর কেমন বাঁকা মন্তব্য।

ঘনাদা কিছু বলবার আগে বাপি দত্তই শিবুর ওপর মারমুখো হয়ে উঠল।—"আনবার হ'লে আর ঘনাদা আনতেন না, আহাম্মক!"

বলা বাহুল্য বাপি দত্তই সেই থেকে ঘনাদার সবচেয়ে বড় ভক্ত।

হাঁস খেতে খেতে আমাদের অরুচি ধরে গেল।

———

সুতো

না, এবারে অবস্থা একেবারে সঙিন। খবরের কাগজের ভাষায় যাকে বলে সঙ্কটজনক পরিস্থিতি।

অন্ততঃ আমাদের বুদ্ধিতে আর কূল পাওয়া যাচ্ছে না।

একে একে সব কলা-কৌশলই আমরা প্রয়োগ করেছি, কিন্তু সবই বৃথা।

কণ্ঠির তীরের মত আমাদের সব ফন্দি-ফিকির এক দুর্ভেদ্য বর্মে ঠেকে নিষ্ফল হয়ে গেছে।

প্রথমে গৌর, তারপর আমি এবং আমাদের পরে শিবু ও শিশির হতাশ হয়ে ফিরে এসেছে। ঘনাদাকে তাঁর ঘর থেকে নিচে নামাতে পারিনি।

আজ সাতদিন ধরে তিনি স্বেচ্ছানির্বাসন নিয়েছেন নিজের তেতলার ঘরে।

রামতুজ দু'বেলা খাবারের থালা পৌঁছে দিয়ে আসে। উদ্ধব জলের কুঁজো ভরে দিয়ে এসে সে-থালা যথারীতি রোজ দু'বার নামিয়ে আনে।

ব্যস্। মেসের সঙ্গে আর কোন সম্পর্ক ঘনাদার নেই।

আমরা চেষ্টার ত্রুটি করিনি। কিন্তু ঘরের দরজাই না খুললে বাইরে থেকে কত আর কৌশল প্রয়োগ করা যায়। দরজায় টোকা দিয়ে তবু ডেকেছি,—"শুনছেন ঘনাদা!"

কোন সাড়া নেই প্রথমে। বারকয়েক ডাকের পর ভেতর থেকে একটা আওয়াজ শোনা গেছে যার মধ্যে অভ্যর্থনাব বাষ্পও নেই!

"কে?"

প্রশ্নটা অর্থহীন, কারণ আমাদের সকলের গলাই ঘনাদার ভালরকম চেনা। তবু সবিস্তারে পরিচয় দিয়ে শিবুই হয়ত' জানায়—"আজ্ঞে, আমি শিবু। আপনার সঙ্গে বিশেষ একটু দরকার ছিল।"

"পরে এসো।"

মুশকিল ওইখানেই। ঘনাদা অন্য কিছু ব'লে বিদায় করতে চাইলে তবু উপরোধ-অনুরোধ করা যায়। তিনি যদি রাগ দেখান তাতেও ক্ষমা চেয়ে তাঁকে সন্তুষ্ট করবার চেষ্টা করা যায়, 'কিন্তু পরে এসো' বলবার পর বেশীক্ষণ তা নিয়ে আর সাধাসাধি চলে না।

পরে এসেও অবশ্য তাঁর দরজা খোলা পাওয়া যায় না। হয় তিনি ঘুমোচ্ছেন, নয় বাথরুমে গেছেন।

নিরুপায় হয়ে, শেষে রামভুজের সঙ্গেই সেদিন রাত্রে তাঁর ঘরে ঢুকে পড়লাম। একটু চালাকি অবশ্য করতে হয়েছিল। দু' বেলা রামভুজ এসে "বড়বাবু খাবার আনিয়েছি" বলে ডাকলে তিনি দরজা খুলে দেন। আমরা একেবারে নিঃশব্দে রামভুজের পেছনে পেছনে এসে সেদিন দেওয়ালের আড়ালে দাঁড়িয়ে গেছি।

দরজা খোলার পর রামভুজ মেঝের ওপর থালা বাটি সাজাচ্ছে এমন সময় আমাদের প্রবেশ।

ঘনাদা আসনে বসে সবে গেলাসের জলে হাতটা ধুয়ে মহাযজ্ঞের জন্য তৈরী হচ্ছেন, এমন সময় আমাদের ক'জনকে দেখে মুখে তাঁর আষাঢ়ের মেঘ নেমে এসেছে।

শিশির তখন তাঁকে দেখিয়েই নতুন সিগারেটের টিনটা ঢাকনা ঘুরিয়ে খুলে হাওয়া ঢোকবার আওয়াজটুকু পর্যন্ত শুনিয়ে দিয়েছে। শিবু যেন রেগে গিয়ে রামভুজকেই বকতে শুরু করেছে, —"তোমার কি রকমীআক্কেল ঠাকুর! ওইটুকু বাটিতে ঘনাদার জন্যে মাংস এনেছ! কেন আর বড় বাটি নেই মেসে?"

.তা, যে বাটিতে ঘনাদাকে মাংস দেওয়া হয়েছে তার চেয়ে বড় বাটি অবশ্য ফরমাশ দিয়ে না গড়ালে বোধ হয় পাওয়া মুশকিল।

কিন্তু হায়, সবই বৃথা!

ঘনাদা আমাদের দিকে ভ্রূক্ষেপ পর্যন্ত না করে রামভুজকেই উদ্দেশ করে বলেছেন,—"এ সব নিয়ে যাও রামভুজ! আমি আজ আর খাব না।"

আমরা হতভম্ব। রামভুজও তথৈবচ। তবু তার মুখেই প্রথম কথা বেরিয়েছে,— "খাইবেন না, কি বলছেন বড়বাবু! আজ ভালো মটন আছে। হামি কোপ্তা কারি বানিয়েছি।

ঘনাদা আড়-চোখে একবার মাংসের ঘাটিটির দিকে চাইলেও নিজের সংকল্পে অটল থেকেছেন।

"না আমার খাবার উপায় নেই।"

"উপায় নেই! হঠাৎ হ'ল কি?"—আমার মুখ থেকে বেরিয়ে গেছে সবিস্ময়ে।

ঘনাদা রামভুজকেই শুনিয়ে বলেছেন,—"কারুর সামনে আমার খাওয়া বারণ, তুমি ত' জানো।"

রামভুজ কি জানে তা আর আমরা যাচাই করবার জন্যে অপেক্ষা করিনি। সবাই তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে এসেছি অপ্রস্তুত হয়ে। ঘনাদার এ কথা শোনার পর আর সেখানে থাকা যায়!

সেই থেকে আজ সাতদিন হ'ল ঘনাদার সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই।

ঘনাদার রাগটা এবার একটু বেশী এবং তা নেহাত অকারণেও নয়। আমাদের রসিকতাটা এবার বোধ হয় মাত্রা একটু ছাড়িয়েও গেছল।

কিন্তু সব দোষ ত' আসলে সেই বাপি দত্তের।

হাঁস খাইয়ে খাইয়ে আমাদের পাগল করে না তুললে তাকেই অমন একদিন ক্ষেপে গিয়ে মেস ছাড়তে হয়, না ঘনাদা আমাদের সঙ্গে সব সম্বন্ধ ঘুচিয়ে দেন!

বাপি দত্ত দু' মাসে বিগড়ি হাঁসের পেছনে বেশ কিছু গচ্চা দিয়ে নিজেও জব্দ হয়ে গেল, আমাদেরও মেরে গেল। আপনি মরিলি তুই মজালি লঙ্কায়। এই আর কি?

গায়ের জোরে না মারুক, যাবার সময় বাপি দত্ত যে-সব বাক্যবাণ ছেড়ে গেছে, নেহাত গণ্ডারের চামড়া না হ'লে আমরা তা'তেই কাবু হতাম। বাপি দত্ত রোজকার মত মিউনিসি-প্যাল মার্কেট থেকে হাঁস কিনে এনে নিজেই সেদিন যথারীতি কাটতে বসেছে। ধৈর্য তার অসীম সন্দেহ নেই। দু'মাস ধরে হাঁস কেটে নাড়িভুঁড়ি ছাড়া কিছু না পেয়েও সে দমেনি। ঘনাদার সেই সাত-রাজারাধন মানিকের কৌটো কোন্ হাঁসের পেট থেকে বেরিয়ে হঠাৎ একদিন তাকে রাজা করে দেবে, এ বিশ্বাস নিয়েই সে রোজ হাঁস কাটতে বসে।

অন্যদিন আমরা কাছাকাছি ঘোরাফেরা করে ঠাট্টা বিদ্রূপ মাঝে মাঝে করি।

"কি হে দত্ত! পেলে কৌটো?" "বিগড়ি হাঁস ছেড়ে এবার পাতিহাঁস ধরো হে!"—ইত্যাদি।

এদিন কিন্তু আমরা, বাপি দত্ত হাঁস কাটতে বসার পরই যে যেখানে পারি গাঢাকা দিয়েছিলাম।

হঠাৎ বাপি দত্তের বাজখাই গলার চীৎকারে মেস কম্পমান।

"ইউরেকা! পেয়েছি! পেয়েছি!"

আমরা যে-যার জায়গা ছেড়ে বেরিয়ে দোতলার বারান্দা থেকে সবিস্ময়ে নিচে উঁকি দিয়েছি এবার! ঘনাদা পর্যন্ত তাঁর তেতলার ঘর থেকে নেমে এসে বারান্দা দিয়ে গলা বাড়িয়েছেন।

বাপি দত্ত নিচেয় উঠোন থেকে কি একটা জিনিস রক্ত-মাখা হাতে তুলে ধরে শুধু বুঝি সেই নৃত্য করতে বাকি রেখেছে,—"শীগ্‌গির শীগ্‌গির আসুন। মার দিয়া কেল্লা!"

আমরা শশব্যস্ত হয়ে নিচে নেমে গেছি—ঘনাদাকেও একরকম টানতে টানতে সঙ্গে নিয়ে।

নিচে নামবার পর বাপি দত্তের গলায় যত উত্তেজনা, আমাদের মুখে তত বিমূঢ় বিস্ময়!

বলেছি, "এ্যাঁ। সেই কৌটো! সেই বাঙলা, বিহার, উড়িষ্যা যাতে কেনা যায় সেই ভারী জলের হুদের ম্যাপ?"

আড় চোখে ঘনাদার মুখটাও দেখে নিয়েছি তার মধ্যে; কিন্তু 'কেমন, কি বলেছিলাম!' ভাবখানার বদলে তাঁকে যেন কেমন ভ্যাবাচ্যাকাই দেখিয়েছে।

বাপি দত্তের সেদিকে লক্ষ্য নেই। কৌটোটা ঘনাদাকে সগর্বে দেখিয়ে সে হাঁপাতে হাঁপাতে হাঁসের পেট কেটে সেটা বার করার কাহিনী সবিস্তারে শুরু করেছে।

শিবু একটু কেশে বাধা দিয়ে বলেছে,—"কিন্তু কৌটোটা এবার খুললে হ'ত না!"

শিশির গম্ভীর মুখে সায় দিয়ে বলেছে,—"তবে খোলবার সম্মানটা ঘনাদারই পাওয়া উচিত!

বাপি দত্ত সোৎসাহে বলেছে, "নিশ্চয়! নিশ্চয়! ঘনাদা ছাড়া খুলবে কে?" কৌটোটা সে ঘনাদার দিকে এগিয়ে দিয়েছে।

কিন্তু ঘনাদার হঠাৎ হ'ল কি? এতবড় জয়-গৌরবের মুহূর্তে যেন সরে পড়তে পারলে বাঁচেন!

"না, না, আমার কি দরকার! ও তোমরাই খোলো!" ব'লে তিনি সটান সিঁড়ির দিকে পা বাড়িয়েছেন। কিন্তু বাপি দত্তই তাঁকে আটকেছে। আনন্দে গদগদ হয়ে বলেছে, "তা কি হয় নাকি! এ আপনারই কৌটো, আপনাকেই খুলতে হবে।"

অগত্যা ঘনাদাকে বাধ্য হয়ে কৌটোটা খুলতে হয়েছে। আমরা সকলে তখন উদ্‌গ্রীব হয়ে তাঁকে চারধারে ঘিরে দাঁড়িয়েছি। বাপি দত্তর চোখ দুটো প্রায় কোটর ঠেলে বুঝি বেরিয়েই আসে!

কৌটোর ভেতর থেকে এক টুকরো কাগজ বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে উল্লাসের যে চীৎকার উঠেছে, তা প্রায় মোহনবাগান কি ইস্টবেঙ্গলের শেষ মিনিটে গোল দিয়ে জিতে যাবার সামিল।

বাপি দত্ত আর ধৈর্য ধরতে পারেনি। ঘনাদার হাত থেকে কাগজের পাকানো টুকরোটা নিজের অজান্তেই ছিনিয়ে নিয়ে খুলে ফেলেছে।

তারপর তার মুখে পর পর যে ভাবান্তর কয়েক মুহূর্তের মধ্যে দেখা গেছে, ছায়াছবিতে হ'লে হাততালি পেত নিশ্চয়।

প্রথমে আহ্লাদে আটখানা, তারপরে চমকে হতভম্ব, তারপর একেবারে কালবোশেখীর কালো মেঘ।

সেই কালবোশেখীর মেঘই গর্জে উঠেছে এবার,—"কার, কার এই শয়তানি?"

গৌর বোকা সেজে বাপি দত্তের হাত থেকে কাগজের টুকরোটা নিয়ে পড়ে শুনিয়েছে ভালোমানুষের মত।

কাগজের টুকরোতে গোটা গোটা করে ছাপার হরপের মত লেখা,—"ঘনাদার গুল!"

তারপর যে লঙ্কাকাণ্ড হয়েছে তার পরিণামেই বাপি দত্ত মেস ছেড়েছে, আর ঘনাদা ছেড়েছেন আমাদের।

বিকেল বেলা। ঘনাদার রুটিন আমাদের জানা। এতক্ষণ তিনি দুপুরের দিবানিদ্রা সেরে, গড়গড়ার পরিপাটি করে তামাকটি সেজে, পরমানন্দে খাটের ওপর বালিশ হেলান দিয়ে বসে তা' উপভোগ করছেন। এই গড়গড়ায় তামাক খাওয়াটা ইদানীং শুরু হয়েছে, আমাদের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদের পর।

হঠাৎ নিচে সোরগোল উঠল। গৌর গলা চড়িয়ে শিশিরকে বকছে,—"আচ্ছা, তুই পিয়নকে ফেরত দিলি কি বলে!"

সঙ্গে সঙ্গে আমাদের গলা। শিশিরকে সবাই মিলে আমরা কোণঠাসা করছি চেঁচিয়ে।

"আহা! একবার জিজ্ঞেস করে দেখা ত' উচিত ছিল।"

"একেবারে 'হিঁয়া নেহি' বলে বিদেয় করবার কি দরকার ছিল?"

"ঘনাদার নাম যখন বললে, তখন তাঁকে একবার ডাকতে ক্ষতি কি ছিল?"

শিশির যেন সকলের আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত হয়ে রেগে জবাব দিলে—"ডেকে লাভ কি! ঘনাদা কি ঘর থেকে বেরুতেন! আর রেজেস্ট্রী চিঠি ঘনাদার নামে কোত্থেকে আসবে?"

কয়েক সেকেণ্ড বিরতির মধ্যে টের পেয়েছি ওপরে গড়গড়ার 'ভুড়ুক ভুড়ুক' আওয়াজ থেমে গিয়েছে।

দরজার খিলটা সাবধানে খোলার আওয়াজ যেন পাওয়া গেল। আমরাও গলা চড়িয়ে দিলাম।

"রেজেস্ট্রী-করা চিঠি কেউ ফেরত দেয়? তার ওপর আবার ইনসিওর-করা!" ওই 'ইনসিওর' শব্দটিতে বাজিমাত হয়ে গেল।

একটা গলাখাঁকরির আওয়াজে আমরা যেন চমকে চোখ তুলে তাকালাম। ঘনাদা ছাদের আলসের কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন ঘর থেকে বেরিয়ে।

"এই যে ঘনাদা! শুনেছেন শিশিরের আহাম্মুকি!"

"সেইটেই শুনতে চাইছি।"

আর দু'বার বলতে হ'ল না। তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে সবাই ওপরের ছাদে গিয়ে হাজির। তারপর এর মুখের কথা ও কেড়ে নিয়ে সবিস্তারে ফলাও করে ব্যাপারটা জানান হ'ল। সেই সঙ্গে শিশিরকে গালমন্দ আর আমাদের থেকে থেকে আফসোস!

"ইস্, ইনসিওর-করা চিঠি—! কি ছিল তা'তে কে জানে!"

"কিন্তু পোস্টাফিসে গেলে এখনো ত' সে চিঠি পাওয়া যায়!" - ঘনাদা নিজেই পথ খুঁজে বার করলে আগ্রহের সঙ্গে।

আমরা তার জন্যে প্রস্তুত ছিলাম।

"আর কি করে পাওয়া যাবে! কালই নাকি শেষ তারিখ ছিল চিঠি দেবার! আজ একবার শুধু শেষ-চেষ্টা করবার জন্যে এনেছিল। পিওন বলে গেল আজ দুপুরেই চিঠি যেখান থেকে এসেছে সেখানে ফেরত যাবে।"

শিশিরকেই আমরা ধমকালাম,—"ফেরত যাবে মানে! এতদিন কি করছিল! রেজেস্ট্রী-চিঠি এতদিন দেয়নি কেন?"

"নামের একটু গোলমাল ছিল যে! নাম ছিল Gana Sam Dos, তা'তেই পোস্টাফিস ঠিক বুঝতে পারেনি এতদিন!"—শিশির ব্যাপারটাকে আরও ঘোরালো করে তুললে।

আমরা শিশিরের ওপরেই চটে উঠলাম,—"বুঝতে পারেনি বললেই হ'ল! নামে গোলমাল থাক, ঠিকানা ত' ছিল, আর বিদেশের চিঠিতে নামের বানান ত' কতরকম হ'তে পারে। ঘনাদার কি শুধু ইংরেজদের সঙ্গেই কারবার! জার্মান, ফ্রেঞ্চ, ইটালিয়ান—কার সঙ্গে নয়?"

"সব দোষ কিন্তু শিশিরের!"—শেষপর্যন্ত আমরা শিশিরের ওপরেই গিয়ে পড়লাম,—"চিঠিটা ও কি ব'লে ফেরত দিলে?"

"খুব অন্যায় হয়েছে আমার।"—অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্যে শিশির যেন সিগারেটের টিনটা খুলে ধরল।

ঘনাদা অন্যমনস্কভাবে তা থেকে একটা তুলে নিতেই আর আমাদের পায় কে?

"চিঠিটা কোন জার্মানের লেখা বোধ হয়।" শিবুই জল্পনা শুরু করে দিলে সোৎসাহে,—"ঘনাদাকে সেখানে 'হের ডস্' নামেই ত' সবাই চেনে।"

গৌর প্রতিবাদ জানালে,—"না, না. নিশ্চয়ই ফরাসী কেউ লিখেছে। কি শিশির,—নামের আগে মঁসিয়ে ছিল না?"

"মঁসিয়ে নয়, সেনর বলে মনে হচ্ছে। ইটালী থেকে কেউ লিখেছে বোধ হয়। তাই না?" প্রশ্নটা শিশিরকেই করলাম।

শিশির অপরাধীর মতই স্বীকার করলে চিঠির নামের আগে কি লেখা ছিল সে লক্ষ্যই করেনি।

"তা লক্ষ্য করবে কেন? তা' হ'লে যে কাজ হ'ত!" ব'লে শিশিরকে ধমকে গোরু সোজা ঘনাদাকেই প্রশ্ন করলে,—"চিঠিটা কোথা থেকে কে পাঠিয়েছিল কিছু বুঝতে পারছেন?"

কয়েকটা উৎকণ্ঠিত মুহূর্ত। পাল্লা কোন্‌দিকে হেলবে? সন্ধি না বিগ্রহ?

শিবু হঠাৎ পাল্লায় পাষাণ চড়িয়ে দিলে আলগে থেকে ঝুঁকে ঠাকুরকে চীৎকার ক'রে ডেকে,—"আমাদের কাঁবরাজী কাটলেটগুলো আর চা, ওপরেই নিয়ে এসো ঠাকুর।" - ঘনাদার দিকে ফিরে সলজ্জভাবে বিশদ বিবরণও দিয়ে দিলে,- "স্পেশাল অর্ডার দিয়ে আনিয়েছি আজ।"

ওই পাষাণটুকুতেই পাল্লা হেললো। কাটলেটের কথা যেন শুনতেই পাননি এইভাবে

ঘনাদা আগেকার প্রশ্নটাকেই তুলে ধরলেন,—"চিঠিটা কোথা থেকে কে পাঠিয়েছে জানতে চাও, কেমন ?"

আমরা ঘনাদার আগেই তাঁর ঘরের দিকে পা বাড়িয়ে বললাম,—"হ্যাঁ, হঠাৎ বিদেশ থেকে ইনসিওর-করা চিঠি !"

ততক্ষণে ঘনাদার ঘরে আমরা ঢুকে পড়েছি। নিচে থেকে বড় ট্রেতে করে চা আর কাটলেটের ডিসও এসে গেছে।

ঘনাদা তাঁর তক্তাপোশটিতে সমাসীন হয়ে অন্যমনস্কভাবে একটা কাটলেট তুলে নিয়ে বললেন,—"চিঠিটা হঠাৎ নয় হে, এই চিঠি…"

কথাটা আর শেষ করা তাঁর হ'ল না। পরপর চারটি স্পেশাল অর্ডার-দেওয়া কবিরাজী কাটলেট যথাস্থানে প্রেরিত না হওয়া পর্যন্ত কথাটার সঙ্গে আমরাও মাঝপথেই ঝুলে রইলাম।

কাটলেটের পর ডান হাতের তর্জনী ও অনামিকার মধ্যে শিশিরের মুখ গুঁজে দিয়ে জ্বালিয়ে-দেওয়া সিগারেটটিতে দু'বার সুখটান দিয়ে চায়ে চুমুক দিতে দিতে তিনি বাক্যাংশটি শেষ করলেন।

" অনেকদিন আগেই আসার কথা।"

"তাহ'লে কে পাঠিয়েছে বুঝতে পেরেছেন !"—আমরা যেন অবাক।

"তা আর বুঝিনি ! ওই নামের বানান দেখেই বুঝেছি। আমার নামের ও বানান শুধু একজনেরই করা সম্ভব। আজ ছ'বছর ধ'রে তার এই চিঠির জন্যেই দিন গুনছি !"

"ছ' বছর ধ'রে ! খুব দামী চিঠি নিশ্চয় ?"—শিশির চোখ বড়-বড় করে জিজ্ঞাসা করলে ?

ধমকে বললাম,—"দামী না হ'লে ইনসিওর করে !"

ঘনাদা কিন্তু বিদ্রূপের হাসি হাসলেন,—"ইনসিওর ত' নামে, নইলে ও-চিঠি ইনসিওর করার খরচা দিতে পেরুর ট্রেজারি ফতুর হ'য়ে যেত !"

এবার নির্ভাবনা হয়ে কপালে চোখ তুলে জিজ্ঞাসা করলাম,—"চিঠিটার এত দাম ?"

"কি ছিল ওতে ? হীরে মুক্তো ?" সরলতার প্রতিমূর্তি হয়ে জিজ্ঞাসা করলে শিবু।

"দূর ! হীরে-টিরে হ'লে ত' ভারী হ'ত ! আর হীরের দাম যতই হোক, ইনসিওর করবার খরচ দিতে ট্রেজারী ফতুর হয় নাকি ?"—শিশির শিবুর মূঢ়তায় বিরক্ত হয়ে উঠল।

"কিন্তু পেরুর ট্রেজারি কেন ?" গৌর এ কবারে সার কথাটা ধরে বসল,—"চিঠিটা পেরু থেকে এসেছিল নাকি।"

ঘনাদা একটু হেসে আমাদের উদ্‌গ্রীব মুখগুলোর ওপর একবার চোখ বুলিয়ে বললেন,—"হাঁ, পেরুর কুজ্‌কো শহর থেকে ডন বেনিটো ছাড়া আর কেউ ও-চিঠি পাঠাতে পারে না।"

"কিন্তু কি ছিল ওতে ?"—আমরা উদ্‌গ্রীব।

আমাদের যথারীতি কয়েক সেকেণ্ড বুদ্ধ-নিশ্বাসে অপেক্ষা করিয়ে রেখে ঘনাদা ধীরে ধীরে বললেন,—"ছিল ক'টা রঙীন সুতো।"

"সুতো !" আমরা এবার সাতাই হতভম্ব।

"সুতো মানে এই কাপাসের তুলো থেকে যে সুতো পাকানো হয় ?—শিবুর মুখের হাঁ আর বুজতে চায় না।

"হ্যাঁ, গাঁটপড়া রঙীন খানিকটা সাধারণ সুতলি !"—ঘনাদা আমাদের দিকে সকৌতুক অনুকম্পার সঙ্গে তাকিয়ে বললেন,—"ওই সুতোর জট ক'টা পেলে, আমেরিকা এ-পর্যন্ত সারা পৃথিবীতে যেখানে যত ধার দিয়েছে, সব শোধ করে দেওয়া যায়। শুধু ওই গাঁটপড়া সুতলি ক'টার জন্যে গত সওয়া চারশ' বছরে, সওয়া চার হাজার মানুষ অন্ততঃ প্রাণ দিয়েছে !"

আমাদের এবার আর অবাক হবার ভান করতে হ'ল না। গৌর শুধু ধরা-গলায় কোনরকমে জিজ্ঞাসা করলে,—"তা ওই সর্বনাশা সুতো আপনার কছে পাঠাবার মানে ?"

'মানে ? মানে কিংকাজুর ডাক। কিংকাজু এক রকম ভাম। মরণ নিশ্চিত জেনেও তার তার ডাক সেদিন চিনতে না পারলে এ-গল্প শুনতে পেতে না। তবে—" ঘনাদা একটু হাসলেন।—"মানে ভাল ক'রে বুঝতে হ'লে বারো বছর আগের ব্রেজিলের 'মাত্তো গ্রসসো'-র এমন একটি জঙ্গলে যেতে হয় কোন সভ্য-মানুষ যেখান থেকে জীবন্ত কখনো ফিরে আসেনি।"

"সেই ভরসায় আপনি বুঝি সেখানে গেছলেন।" দুম্ করে কথাটা ব'লে ফেলে শিশির একেবারে কূলের কাছে ভরাডুবি প্রায় করেছিল আর কি !

কিন্তু কবিরাজী কাট্‌লেটের গুণ অনেক। শিশিরের কথা ঘনাদার যেন কানেই গেল না।

সিগারেটে একটা মোক্ষম টান দিয়ে তিনি নিজের কথাতেই মশগুল হ'য়ে শুরু করলেন,—"পাঁচটি প্রাণী আমরা প্রাণ হাতে নিয়ে সেই জঙ্গল দিয়ে চলেছি পৃথিবীর সবচেয়ে রহস্যময় একটি জাতির সন্ধানে। তাদের নাম শাভান্তে। ব্রেজিলের দুর্গমতম যে জঙ্গলে তারা থাকে, সেখানে পৌঁছতে হ'লে, জলে দুনিয়ার সবচেয়ে বড় সাপ আনাকোণ্ডা আর কুমীর, আর রক্তখেকো পিরহানা মাছের ঝাঁকের হাত থেকে বাঁচতে হয়, আর দুর্ভেদ্য জঙ্গলের পথে যুঝতে হয় বাঘের বড়মাসি জাগুয়ার থেকে শুরু করে বিষাক্ত সাপ, বিছে পর্যন্ত অনেক কিছুর সঙ্গে।

এসব বিপদের হাত এড়ালেই নিস্তার নেই। শাভান্তেরা দুনিয়ার সেরা ঠ্যাঙাড়ে। তীরধনুক তাদের আছে কিন্তু গাঁটওয়ালা মোটা মোটা লাঠি দিয়ে মানুষ মারতেই তাদের আনন্দ। জঙ্গলে কোথায় যে তারা ওত পেতে আছে, কিছুই বোঝবার উপায় নেই। প্রতিপদে কুড়ুল দিয়ে গাছ, লতা-পাতা কেটে যেখানে এগুতে হয়, সেখানে বনের জানোয়ারের চেয়েও নিঃশব্দ-গতি শাভান্তেদের হদিশ পাওয়া অসম্ভব।

শাভান্তেদের চাক্ষুষ দেখে ফিরে এসে বিবরণ দেবার সৌভাগ্য এ-পর্যন্ত কোন সভ্য পর্যটক কি শিকারীর হয়নি। এ অঞ্চলের অন্য অধিবাসীরাও তাদের যমের মত ভয় করে এড়িয়ে চলে। তবু তাদের কিংবদন্তী থেকেই শাভান্তেদের সম্বন্ধে সামান্য যা-কিছু বিবরণ এ পর্যন্ত পাওয়া গেছে।

সেবার কিন্তু ঠিক বিজ্ঞানের খাতিরে শাভান্তেদের রাজ্যে ঢুকিনি। ওই অঞ্চলে দু'বছর আগে সেনর বেরিয়েন নামে একজন পর্যটক নিরুদ্দেশ হয়ে যান। তাঁকে খুঁজতে পরের বছর আর একদল নিয়ে ডন বেনিটো নামে একজন বিখ্যাত শিকারীও ওই অঞ্চলে গিয়ে আর ফেরেননি। ব্রেজিল সরকারের পক্ষ থেকে এই দু'জনের খোঁজ পাবার জন্যে বিরাট এক পুরস্কার তখন ঘোষণা করা হয়েছে। কতকটা সেই পুরস্কারের লোভে, কতকটা অন্য এক মতলবে ছোট একটা দল নিয়ে সেই অজানা অঞ্চলে পাড়ি দিয়েছিলাম।

দলে পাঁচটি প্রাণী। তিনজন মোট বইবার কুলি বাদে আমি আর রেমণ্ডো। রেমণ্ডো আধা-পর্তুগীজ, একজন ও-দেশী শিকারী। ঠিক শাভান্তেদের রাজ্যে কখনো না গেলেও আশেপাশের অঞ্চলটা তার কিছু জানা ছিল ব'লে তাকেই পথ দেখাতে এনেছিলাম।

জানা-এলাকা ছেড়ে অজানা মুল্লুকে ঢোকবার পরই কিন্তু বুঝেছিলাম আমি যদি কানা হই, ত' সে চোখে দেখে না, এই অবস্থা !

রোনুরো নদীর তীরে দাঁড়িয়ে গভীর জঙ্গলের ভেতর ঢুকে তখন আমাদের দিশাহারা অবস্থা। তবু জঙ্গলের মধ্যে সামান্য একটু ফাঁকা জায়গা পেয়ে কুলিদের দিয়ে পরিষ্কার করিয়ে সেদিন রাতে তাঁবু ফেলেছি। পালা ক'রে আমি ও রেমণ্ডো পাহারায় থাকব এই ঠিক হয়েছে।

প্রথম রাতটা পাহারা দিয়ে সবে তাঁবুর মধ্যে দু'চোখের পাতা একটু এক করেছি, এমন সময় রেমণ্ডোর ঠেলায় ধড়মড় ক'রে উঠে বসতে হ'ল।

'শুনতে পাচ্ছেন আমো!' রেমণ্ডো কাঁপতে কাঁপতে বললে।

'কি, শুনবো কি!' বিরক্ত হয়ে বললাম,—'ও ত' জংলী মাকাও কাকাতুয়ার ডাক!'

'না আমো, ভাল করে শুনুন!' রেমণ্ডোর গলা দিয়ে ভয়ে কথাই বার হ'তে চাচ্ছে না।

মন দিয়ে এবার শুনলাম এবং সত্যই প্রথমে সমস্ত গায়ে আপনা থেকে কাঁটা দিয়ে উঠল।

মাকাওর কর্কশ ডাকের পরই ব্রেজিলের লাল বাঁদর গুয়ারি-বাস-এর বুক কাঁপানো চীৎকার। তারপর সেটা থামতে না থামতেই ময়ূর জাতের পাভাস পাখির গলার ঝনঝনে ঝংকার।

রেমণ্ডোর দিকে চেয়ে দেখি সে ইতিমধ্যে ঘামতে শুরু করেছে।

এ-অবস্থায় ঘেমে ওঠা কিছু আশ্চর্যও নয়। পাভাস পাখির ডাক বন্ধ হবার পরই জাগুয়ারের গলার ফাঁস-ফ্যাঁস শোনা গেল আর তারপরই আবার গুয়াবিদাস বাঁদরের ডাক।

আওয়াজগুলো ক্রমশঃ কাছেই এগিয়ে আসছে।

'কি হবে আমো!' রেমণ্ডো মাটির ওপরই বসে প'ড়ল। তাকে সাহস দেব কি নিজের অবস্থাই তখন কাহিল। তবু ধমকে বললাম,—'আমো আমো ক'রো না। কতবার বলেছি আমি তোমার মনিব নয় বন্ধু, আমো নয় আমিগো।'

'যে আজ্ঞে আমো।' ব'লে রেমণ্ডো তেমনি কাঁপতে লাগলো।

বিপদের মধ্যেও না হেসে পারলাম না। তারপর আবার ধমক দিয়ে বললাম,—'লজ্জা করে না তোমার? তুমি না ব্রেজিলের সেরা শিকারী!'

'শিকারী হয়ে লাভ কি আমো!'

লাভ যে নেই তা আমিও জানতাম। এটা শাভান্তেদের শত্রু মারবার একটা কায়দা। সারা রাত দল বেঁধে শত্রুকে বেড়াজাল দিয়ে ঘিরে এমনি জঙ্গলের নানা জানোয়ারের আওয়াজ করতে করতে তারা এগিয়ে আসে, আবার পিছিয়ে যায়। সারারাত শত্রুর চোখে ঘুম ত' নেই, প্রতি মুহূর্তেই আক্রমণের ভয়ে তটস্থ অবস্থা। এমনি ক'রে সারারাত শত্রুর ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে দিয়ে ভয়ে ভাবনায় আধমরা ক'রে ভোরের দিকে শাভান্তেরা সমস্ত আওয়াজ থামিয়ে একেবারে যেন বিদায় নিয়ে চলে যায়। শত্রু তখন বিপদ কেটেছে মনে করে ক্লান্তিতে হয়তো একটু ঘুমিয়ে পড়ে। শাভান্তেরা ঠিক সেই সময়েই হানা দিয়ে তাদের গেঁটে লগুড় দিয়ে সব সাবাড় ক'রে দেয়। শাভান্তেদের একটি লোকও তাতে মারা পড়ে না। শুধু ফন্দিতেই কাজ হাসিল হয়ে যায়।

বুনো জানোয়ারের ডাক ইতিমধ্যেই পিছিয়ে যেতে শুরু করেছে, টের পেলাম।

রেমণ্ডোকে ও সেই সঙ্গে নিজেকেও সাহস দেবার জন্য বললাম, 'এখনি এত ভেঙে পড়বার কি হয়েছে! ওদের এ চালাকি ত' সারারাত চলবে। ভোরে ওরা চড়াও হবার আগে পালাতে পারলেই হ'ল।'

'কিন্তু পালাবেন কোথায় আমো! আমরা মাত্র পাঁচজন, আর ওরা অন্তত পাঁচশ'। পাঁচজন হ'লেও ওরা এদিকে ঘুরে আক্রমণ করতে চায় না। কিন্তু পালাবার চেষ্টা করলেই ঠেঙিয়ে শেষ ক'রে দেবে। আমাদের দু'জনের দু'টো বন্দুক কটাকে ঠেকাবে এই অন্ধকার জঙ্গলে?'

রেমণ্ডোর কথাগুলো মিথ্যে নয়। কি ব'লে আপাততঃ তাকে শান্ত করব ভাবছি, এমন সময় জংলী আওয়াজ আবার কাছে এগুতে শুরু করল। প্রথমে টুকান পাখির চড়া গলা, তারপর জাগুয়ারের জাতভাই কুজার-এর গর্জন আর সে ডাক থামতেই সেই কিংকাজুর ঝগড়াটি বেড়ালের মত ডাক।

এই ডাক শুনেই চম্‌কে উঠে দাঁড়ালাম।

রেমণ্ডো সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে সভয়ে জিজ্ঞাসা করলে, 'কি হ'ল আমো ?'

'এখুনি জানতে পারব।' ব'লে বেরুবার চেষ্টা করতেই রেমণ্ডো দু'হাতে আমায় জড়িয়ে প্রায় ককিয়ে উঠল,—'আপনি কি পাগল হলেন আমো! যাচ্ছেন কোথায় ?'

বেশ জোর ক'রেই তার হাত ছাড়িয়ে কোন উত্তর না দিয়ে জঙ্গলের ভেতর ঢুকে পড়লাম।

ঘুটঘুটে অন্ধকার যাকে বলে। দিনের বেলাতেই যেখানে চলাফেরা শক্ত, রাতের অন্ধকারে সে জঙ্গলে এক পা এগুনোই দায়। টর্চ জ্বালবার উপায় নেই বলেই সঙ্গে নিইনি। কোনরকমে হোঁচট খেতে খেতে, হাতড়াতে হাতড়াতে, সেই জঙ্গল ভেদ করে চ'ললাম।

কিংকাজুর ডাকের পর আবার গুয়ারিবাসের চীৎকার শুতেই একটা শিস্ দিলাম 'উইরা পুরু' পাখির তীক্ষ্ণ বাঁশের মত আওয়াজ ক'রে।

অন্যদিকের শব্দটা খানিক থেমে গেল তাইতেই।

তার পর ওদিক থেকে আবার মাকাও পাখির ডাক শুরু হতেই 'আস্তা' মানে টাপিরের আওয়াজ শুরু করলাম।

জঙ্গল এবার একেবারে চুপ।

নিজেই আবার প্রসিঁওর আওয়াজ নকল ক'রে তার ওপর পাভাস পাখির গলার ঝংকার জুড়ে দিলাম।

জঙ্গলে আর কোন শব্দ নেই। আমি কিন্তু যথাসম্ভব সাবধানে তখনও এগিয়ে চলেছি।

বেশ কিছুক্ষণ এইভাবে যাবার পর জঙ্গল একটু ফাঁকা হ'তে, দেখি যা ভেবেছিলাম তাই—।"

"একটা চিড়িয়াখানা!" —শিবু বোধ হয় আর থাকতে না পেরেই বলে উঠল।

ঘনাদা ভুরু কুঁচকে সেদিকে তাকাতেই আমরা শিবুকে ধমকে উঠলাম, "চিড়িয়াখানা! শিবুর যেমন বুদ্ধি! জঙ্গলে কখনো চিড়িয়াখানা থাকে!"

ঘনাদা খুশী হলেন কিনা বলা যায় না, কিন্তু তাঁর বর্ণনা আবার চলল।

"বনের ওই ফাঁকা জায়গায় একটা তাঁবু। চারদিক ঢাকা হ'লেও তার ভেতর থেকে জোরালো হ্যাসাক বাতির সামান্য আলোর আভাস পাওয়া যাচ্ছে। নিঃশব্দে সেই তাঁবুর পেছনে গিয়ে পৃথিবীর সবচেয়ে ধেড়ে ইঁদুর কাপিবারার মত আওয়াজ দিলাম।

তাঁবুর ভেতর থেকে বাঘের মত গর্জন শোনা গেল, —'কিয়েন্ এন্তা আহি?'—অর্থাৎ কে ওখানে?

বললাম,—'সয় ইয়ো!' অর্থাৎ আমি।

এবার তাঁবুটাই যেন দুলে উঠলো এবং তার পর্দা সরিয়ে ছোটখাট পাহাড়ের মত যে লোকটি ক্ষেপে বেরিয়ে এল, অন্ধকারের মধ্যেও শুধু তার আকার দেখেই তাকে আমি তখন চিনি ফেলেছি।

সে বেরিয়ে আসতেই আমি নিঃশব্দে অন্যদিকে সরে গেলাম। টর্চ জ্বেলে সে তাঁবুর চারিদিকে ঘুরে যখন আবার ভেতরে ঢুকল তখন আমি তার জিনিসপত্র যা ঘাঁটবার ঘেঁটে দেখে তারই বিছানায় শুয়ে একটা সিগারেট ধরিয়েছি।

তাঁবুর ভেতর ঢুকে আমায় ওই অবস্থায় দেখে পাহাড় একেবারে আগ্নেয়গিরি হয়ে উঠল।

'তবে রে মুকুরা চিচিকা!' মানে পুঁচকে গন্ধগোকুল ব'লে সে তেড়ে আসতেই উঠে বসে বললাম, 'ধারে ধুমসো আই, ধীরে?'—আই হ'ল দুনিয়ার সবচেয়ে কুড়ের ধাড়ি জানোয়ার স্লেজিলের 'শ্লথ'।

মাঝপথে থেমে সে একেবারে হতভম্ব হয়ে আমার দিকে খানিক তাকিয়ে থেকে বলল,— "তুমি ডস্? এখানে! কি দেসিয়া উস্তেদ?"—মানে, কি তুমি চাও?"

"বিশেষ কিছু না! সেনর বেরিয়েন-এর সন্ধান করতে যে দলবল নিয়ে বেরিয়েছিল সেই বেনিটোর সঙ্গে একটু আলাপ করতে চাই। সেনর বেরিয়েনের কি হয়েছে, ডন বেনিটোই বা তাঁর খোঁজে বেরিয়ে কেন নিরুদ্দেশ, এই সব খবর জানবার জন্যে পৃথিবীর সবাই একটু উদ্‌গ্রীব কিনা!"

আমার পাশেই সেই চার মণী লাশ নিয়ে বসে ডন বেনিটো এবার হতাশভাবে বললে,— "সেনর বেরিয়েন শাভান্তেদের হাতে মারা গেছেন!"

"তা ত' বুঝলাম, কিন্তু সে কথা জানবার পর সভ্য সমাজে না ফিরে ডন বেনিটো জঙ্গলের মধ্যে এখনো লুকিয়ে থাকতে এত ব্যাকুল কেন?"

আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বেনিটো পাল্টা প্রশ্ন ক'রে ব'সল এবার,—"তুমি আমার খোঁজ পেলে কি ক'রে ?"

হেসে বললাম,—তোমার একটু ঠিকে ভুলের দরুন বন্ধু ! তুমি মস্ত শিকারী। প্রত্নতত্ত্ব নিয়েও কিছু নাড়াচাড়া করেছ, শুনেছি, কিন্তু প্রাণিবিদ্যাটায় তেমন পাকা ত' নও, তাই শাভান্তেদের সঙ্গে ভাব করবার জন্যে তাদের মত হরবোলার গলা দুরস্ত করলেও একটা মস্ত ভুল ক'রে ফেলেছ !"

"কি ভুল ?"—বেনিটো বেশ খাপ্পা।

"ভুল কিংকাজুর ডাক। ওই প্রাণীটি যে ব্রেজিলের, এ অঞ্চলে থাকে না, সেইটি তোমার জানা নেই। শাভান্তেরা ও ডাক জানে না। ওই ডাক শুনেই বুঝলাম শাভান্তেরা নয়—অন্য কেউ ভয় দেখিয়ে আমাদের তাড়াতে চাইছে !"

বেনিটোর জ্বালার মত মুখখানা তখন দেখবার মত। হতভম্ব ভাবের সঙ্গে আফসোস, বিরক্তি, রাগের সেখানে একটা লড়াই চলেছে।

সে লড়াই শেষ হবার আগেই আবার জিজ্ঞাসা করলাম, "কিন্তু ব্যাপার কি বল ত' ? এই জঙ্গলে কোথায় সভ্য মানুষজন দেখলে খুশি হয়ে দেখা করবে, না, ভয় দেখিয়ে তাদের তাড়াতে চাও ?"

"আমি মানে আমি"—বেনিটো আমতা আমতা ক'রে বললে—"সেনর বেরিয়েনকে যখন ফিরিয়ে আনতে পারিনি তখন সভ্যসমাজে আর মুখ দেখাতে চাই না।"

"বটে !"—গম্ভীরভাবে বললাম,—"তুমি বিফল হবার লজ্জায় এখন অজ্ঞাতবাসই চাছই তা'হলে ? ভালো কথা ! কিন্তু আমাকে কি তা'হলে শুধু-হাতে ফিরতে হবে ! ওদিকে ব্রেজিল সরকারের পুরস্কারটাও ত' ফসকাচ্ছে।" "কি, কি তুমি চাও !"—বেনিটো আমায় যে-কোন ভাবে তাড়াতে পারলে বাঁচে, বোঝা গেল।

"কি চাই ?"—যেন বেশ ভাবনায় পড়ে বললাম,—"এই জঙ্গলে কি-ই বা তোমার আছে যে দেবে ?"

"তুমি বলো না, কি চাও। ব্রেজিলের সরকার তোমায় যা পুরস্কার দিত তাই তোমায় যদি দিই, হবে ?"—বেনিটো বেশ ব্যাকুল।

"কিন্তু দেবে কি ক'রে ! এখানে অত টাকা তুমি পাচ্ছ কোথায় ?" "এখানে নয়, পেরুতে। এখুনি একটা চিঠি তোমায় লিখে দিচ্ছি। তুমি লিমায় গিয়ে যে ঠিকানায় চিঠি দিচ্ছ সেখানে দেখালেই পাবে।"—বেনিটো আমায় রাজী করাবার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে বললে, "আমার কথা ত' বিশ্বাস করো !"

"খুব করি। কিন্তু অত টাকায় আমার দরকার নেই। তুমি বরং—" ঘরের চারিদিকে একবার চোখ ঘোরালাম।

বেনিটো অধীর হয়ে বললেন,—"হ্যাঁ বলো, বলো কি চাও ?"

"চাই খানিকটা সুতো !" ব'লে ফেলে বোকার মত চেহারা ক'রে তার দিকে তাকালাম।

"সুতো" !—সেই বিরাট জ্বালার মত মুখে মনের ভাব কি সহজে লুকনো যায়। তবু প্রাণ-পণে ঠাণ্ডা থাকার চেষ্টা ক'রে বেনিটো বললে,—"তুমি কি পাগল হয়ে গেছ নাকি ! সুতো,—সুতো আবার কি ?"

"কি আর, খানিকটা বঙিন সুতো। তাই হ'লেই আমার চলবে।"

"নাঃ তোমার দেখছি সত্যি মাথা খারাপ হয়ে গেছে জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে !"—ব'লে বেনিটো খুব জোরে হাসবার চেষ্টা করলে।

"আমার পাগলামিতে তোমার হাসি পাচ্ছে ? তা'হলে আর একটা মজার গল্প বলি শোন। পিজারোর নাম শুনেছ ত' ?"

"পিজারো ? কে পিজারো ?"—বেনিটো তামাশার সুরে বলবার চেষ্টা করলেও, তার চোখ দুটোয় আর তখন হাসির লেশ নাই। ঠাট্টার সুর বজায় রেখে সে তবু বললে,—"আমি ত পিজারো ব'লে একজনকে চিনি,—আমাদের রাস্তা সাফ করত।"

"এ পিজারোও একরকমের ঝাড়ুদার, তবে প্রায় সওয়া চারশ'বছর আগে দক্ষিণ আমেরিকার পেরু সাফ ক'রে দিয়ে গেছে।"

"ও, তুমি 'কংকিসতাদোর' বীর পিজারোর কথা ব'লছ ?"—বেনিটো যেন এতক্ষণে আমার কথা বুঝল,—"স্পেনের হয়ে যিনি পেরু জয় করেছিলেন।"

"হ্যাঁ, বিশ্বাসঘাতকতাকে যদি জয় করা বলো, খুন আর শয়তানকে যদি বলো বীর !"

খাঁটি ইস্পাহানী না হলেও এ কথাগুলো বেনিটোর খুব মধুর লাগল না, তবু নিজেকে সামলে সে বললে,—"তা—পিজারোর উপর যত খুশি গায়ের ঝাল ঝাড়ো। কিন্তু তার গল্প আমায় কি শোনাবে !"

"শোনই না। হয়ত প্রাণখুলে হাসবার কিছু পাবে। পেরুর রাজাদের নাম যে 'ইংকা' তা তোমায় বলবার দরকার নেই। পেরুর শেষ স্বাধীন ইংকা আতাহুয়ালপা কাজামার্কা শহরে সরল বিশ্বাসে পিজারো আর তার একশ' তিরাশীজন অনুচরকে অভ্যর্থনা করেন। সেই সাদর অভ্যর্থনার প্রতিদানে পিজারো চরম বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে কৌশলে ইংকা আতাহুয়ালপাকে বন্দী করে। মুক্তির দাম হিসেবে ইংকা সোনা-রুপোয় প্রায় কুবেরের ভাণ্ডার পিজারোকে দেন। সে সমস্ত নিয়েও পিজারো ইংকা আতাহুয়ালপাকে নির্মমভাবে হত্যা করে। মানুষের ইতিহাসে সেই কলঙ্কিত তারিখ হ'ল ১৫৩৩-এর ২৯শে নভেম্বর।"

এই পর্যন্ত শুনেই বেনিটো ধৈর্য হারিয়ে বললে,"তোমার সব কথা সত্যি নয়, তবু এ ইতিহাস পৃথিবীর কে না জানে !"

"সবাই যা জানে না তাই একটু তাহলে বলি। পেরুর শেষ ইংকার কাছ থেকে বিশ্বাস-ঘাতকতা করে পিজারো সোনাদানা যা নিয়েছিল, তা বিরাট দীঘির একটা গণ্ডুষ মাত্র। পেরু তখন সোনায় মোড়া বললেও বেশী বলা হয় না। ইংকারা নিজেদের সূর্যের সন্তান বলত, আর সোনাকে বলত সূর্যের চোখের জল। সোনায় তারা থালাবাটি ঘটি গয়না থেকে বড় বড় শুধু তৈরি করতো না, তাদের মন্দিরের মেঝেও হতো সোনা দিয়ে বাঁধানো। কুজকে শহরের সূর্য মন্দিরের চারিধারে বর্ষার জলের নর্দমাগুলোও ছিল সোনার পাত নয়, তাল দিয়ে তৈরি। আর রুপো তো তখন এমন সস্তা যে কংকিস্তাদোর মানে পিজারোর বিজয়ী সৈনিকেরা তাই দিয়ে ঘোড়ার নাল বাঁধাত। পিজারো সোনার লোভে ইংকাকে আগেই মেরে না ফেললে আরো কত সম্পদ যে পেত কেউ ধারণাই করতে পারে না। কারণ কুজকো শহর থেকে ইংকা পুরোহিতেরা আতাহুয়ালপার মুক্তির জন্যে আরো রাশি রাশি সোনার জিনিস তখন কাজামার্কাতে পাঠাবার আয়োজন করছে। ইংকার হত্যার খবর পাবার পরই তারা পিজারোর আসল স্বরূপ বুঝে সে সোনাদানা সব লুকিয়ে ফেলে। কুজকো শহরই সোনার খনি জেনে পিজারো সে শহর লুণ্ঠন করেও তারপর আসল গুপ্ত ভাণ্ডারের সন্ধানই পায়নি। প্রধান ইংকা পুরোহিত ভিল্লাক উমু সেই সমস্ত গুপ্ত ভাণ্ডারের এমন ভাবে হদিস রেখে দেন; ইস্পাহানীদের পেরু থেকে তাড়াবার পর যাতে সেগুলো উদ্ধার করা যায়। ইংকাদের কোন লিখিত ভাষা ছিল না। তাঁরা যে ভাষায় কথা কইতেন তার নাম 'কেচুয়া'। প্রধান পুরোহিত

তাঁর সংকেত-চিহ্ন তাই ভাষার অক্ষরে লিখে যান নি। তিনি সংকেতগুলি যাতে রেখে গিয়েছিলেন তাকে বলে 'কিপু'।

বেনিটো কি কষ্টে যে স্থির হয়ে আছে বুঝতে পারছিলাম। সে এখন হাল্কা সুরে বলবার চেষ্টা করলে,—"তোমার ও কিপুমিপু শুনে হাসি ত' আমার পাচ্ছে না!

"পাচ্ছে না? তা'হলে আর একটু শোনো। প্রধান পুরোহিতের পর এই সব 'কিপু' দ্বিতীয় পুরোহিতের হাতেই পড়ে। তারপর পুরোহিতবংশই শেষ হয়ে যাবার সঙ্গে, সে-সব 'কিপু' কোথায় যে হারিয়ে যায় কেউ জানে না। শেষ ইংকা আতাহুয়ালপার এক ভাইপো গার্সিলাসো দ্য লা ভেগা সারাজীবন সে-সব 'কিপু' খুঁজেছেন কিন্তু পান নি। শুধু সম্প্রতি এখান ওখান থেকে কয়েকটা টুকরো 'কিপু' উদ্ধার হয়েছে। কিন্তু মুশকিলের কথা এই যে, 'কিপু'র সংকেত-চিহ্ন পড়বার লোক পৃথিবীতে প্রায় নেই বললেই হয়।"

বেনিটোর ধৈর্যের বাঁধ আর রইল না। রাগে উত্তেজনায় সে গর্জন করে উঠল এবার—"কি, তুমি বলতে চাও কি? এ গল্প আমায় শোনাবার মানে?"

"মানে এই, পৃথিবীর যে দু'তিনটি মাত্র লোক এখনো 'কিপু'র সংকেত-চিহ্ন বুঝতে পারেন সেনর বেরিয়েন তাঁদের একজন। তাঁর শরীরে ইংকাদের রক্তও কিছু আছে। সারাজীবন শুধু পেরুতে নয়, কলাম্বিয়ায়, ইকোয়েডরে, চিলিতে, বলিভিয়ায় ও ব্রেজিলে তিনি হারানো 'কিপু' সন্ধান করে বেড়িয়েছেন। সংগ্রহও করেছেন কিছু। তাঁর শেষ সন্ধান এই মাত্তো গ্রসসোর জঙ্গলে। পেরু স্পেনের কবলে যাবার পর ইংকাদের একটি শাখা টিটিকাকা হ্রদ পেরিয়ে প্রথমে বলিভিয়ায় ও পরে সেখান থেকে ব্রেজিলের এই অংশে এসে রাজ্য গড়বার চেষ্টা করে বলে কিংবদন্তী আছে। কুজ্‌কোর গুপ্ত ভাণ্ডারের সংকেত দেওয়া সবচেয়ে দামী 'কিপু' নাকি এই ইংকারাই সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল। সেনর বেরিয়েন এই 'কিপু'র খোঁজেই এই দুর্গম জঙ্গলে এসেছিলেন। এবং আমি নিশ্চিত জানি যে তা তিনি পেয়েও ছিলেন।"

"তুমি নিশ্চিত জানো"—বেনিটো একেবারে মারমূর্তি,—"হাত গুনে নাকি?" একটু হেসে হাতের মুঠোটা তার সামনে খুলে ধরে বললাম—"হাত গুনে নয়, হাতের মুঠোয় ধরে।"

আমার হাতের দিকে চেয়ে বেনিটোর জালার মত মুখের ভাঁটার মত চোখ দুটো প্রায় ঠেলে বেরিয়ে আসে আর কি?

তার এই অবস্থা যেন দেখেও না দেখে নিতান্ত ভালো মানুষের মত বললাম,—"এই জন্যেই তোমার কাছে একটু রঙিন সুতো মানে এই 'কিপু' চাইছিলাম। এইটে পেলেই খুশি মনে আমি চলে যাই, তুমিও পরমানন্দে জঙ্গলে অজ্ঞাত বাস করো।"

এতক্ষণে সেই মাংসের পাহাড় সত্যিই আগ্নেয়গিরি হয়ে উঠল।

"তবে রে কালা নেংটি 'কুটিয়া'। বেড়ার রাজা আনাকোণ্ডার গর্তে এসেছ চুরি করতে!"—বলে সেই চার-মণী লাশ আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। একটু গা-ঝাড়া দিয়ে দেখি—

"তাঁবুর কাপড় ছিঁড়ে সেই মাংসের পাহাড় বাইরে ছিটকে পড়ে খাবি খাচ্ছে"—গৌরই ঘনাদার কথাগুলো জুগিয়ে দেবার চেষ্টা করলে।

ঘনাদা একটু ভুরু কুঁচকে বলে চললেন,—"না, দেখি আমিই তাঁবুর কোণে দড়ি-দড়ার মধ্যে থুবড়ে পড়েছি। গা-ঝাড়া দিয়ে ওঠবার পর বেনিটোর সে কি গর্বের হাসি, তারি সঙ্গে আবার কাটা ঘায়ে নুনের ছিটের মত জ্বালা-ধরানো কথার চিমটি।—"কি ডস্! প্যাঁচটা লাগল" কেমন?" বড় জব্দ করেছিলে আর বারে, তাই হরবোলা গলা সাধার সঙ্গে যুযুৎসুটাও শিখেছি।"

তার হাসি থামাতে নিজেই এবার ঝাঁপিয়ে পড়লাম তার ওপর। কিন্তু আবার মাটি নিয়ে তার বিদ্রূপ শুনতে হল,—"জাপানী কুস্তি 'সুমোও' শিখতে ভুলি নি বন্ধু।"

তার হাসি কিন্তু মাঝপথেই গেল বন্ধ হয়ে। মাটিতে পড়ে তখন সে গোঙাচ্ছে। গলাটায় আর একটু চাপ দিয়ে বললাম—"সবই শিখেছ, শুধু এই বাঙলা কাঁচিটাই শেখোনি। এখন বলো এ 'কিপু' কোথায় তুমি পেয়েছ? সেনর বেরিয়েনকে খোঁজার নাম করে এসে তাঁকে কোন ছলে মেরে এ 'কিপু' বাগিয়েছ—কেমন?"

জবাবে তার মুখ থেকে একটু কাতরানির মত আওয়াজ বেরুল মাত্র,—"না, না।"

পায়ের ফাঁক আলগা করতেই বেনিটো ককিয়ে উঠলো,—"হলফ করে বলছি, সেনর বেরিয়েন মারা যাবার আগে এ 'কিপু' আমায় দিয়ে গেছেন। তাঁর নিজের হাতে লেখা প্রমাণ আমি দেখাচ্ছি।"

তাকে ছেড়ে দিয়ে বললাম, "বেশ, দেখাও সে প্রমাণ। বাংলা কাঁচি দেখেছ, কোন চালাকি করবার চেষ্টা করেছ কি একেবারে বাংলা তুড়ম ঠুকে দেব।"

মানে বুঝুক আর না বুঝুক, চালাকি করবার উৎসাহ আর তখন বেনিটোর নেই। নিজের ঝোলা থেকে সত্যিই সে একটা আধময়লা চিঠি বার করে দেখালে। সেনর বেরিয়েনের হাতের লেখা আমার চেনা। দেখলাম তিনি সত্যিই তাঁর মৃত্যু-শয্যায় বেনিটোর সেবার প্রশংসা করে তার হাতে 'কিপু'টা দেওয়ার কথা লিখেছেন।

চিঠিটা তাকে ফিরে দিয়ে বললাম, "কিপু'টা যখন সেনর বেরিয়েন নিজেই তোমায় দিয়েছেন, তোমার সেটা নিয়ে এমন লুকিয়ে থাকার মানে কি!"

বেনিটোর মুখ দেখে মনে হ'ল পারলে মানেটা সে আমার গলা টিপেই বুঝিয়ে দেয়। কিন্তু পরিণাম ভেবেই বোধ হয় নিজেকে সামলে সে চুপ করেই রইল।

হেসে আবার বললাম,—"মানেটা তাহ'লে আমিই বলি। এ 'কিপু' সেনর বেরিয়েন তোমাকে দান করেন নি। নিজের মৃত্যুর পর এটা পেরুর সরকারী মিউজিয়মে পৌঁছে দেবার জন্যে তোমার হাতে দিয়েছিলেন। তুমি এখন এই 'কিপু'র অর্থ নিজে বার করে কুজ্‌কোর গুপ্তধন একলা বাগাতে চাও। এখনি সভ্য-জগতে ফিরে গেলে তোমার গতিবিধি পাছে কেউ সন্দেহ করে, তাই তুমি 'কিপু'র সংকেত-চিহ্ন না বুঝতে পারা পর্যন্ত এই জঙ্গলেই লুকিয়ে থাকার ব্যবস্থা করেছ। আমাদের ভয় দেখিয়ে তাড়াবার চেষ্টাও করেছিলে সেই জন্যে।"

"তাই যদি করে থাকি তাতে দোষ কি! প্রাণের মায়া ছেড়ে এ 'কিপু' আমি সন্ধান করেছি। এ 'কিপু' আজ যখন আমার হাতে এসেছে, তখন সে গুপ্ত ভাণ্ডারের দখল আমি অন্য কাউকে দেব কেন?"

হেসে বললাম,—কিন্তু গুপ্তধন পাওয়ার আগে এ 'কিপু'র মানে ত বোঝা চাই। এ ত কয়েকটা গেরো দেওয়া রঙিন সুতোর জট মাত্র! ইংকাদের সাম্রাজ্য যাওয়ার সঙ্গে এই সুতোর গিঁটের সংকেত-চিহ্ন পড়বার বিদ্যাও প্রায় হারিয়ে গেছে। গুপ্তধনের লোভে তুমি সামান্য যা কিছু শিখেছ তা দিয়ে সারা জীবন চেষ্টা করলেও এর মানে খুঁজে পাবে না। সুতরাং এ 'কিপু' আমিই নিয়ে যাচ্ছি।"

"না, না!" বেনিটো প্রায় কেঁদে উঠল, "আমায় শুধু দু' বছর সময় দাও। দু' বছরে এ 'কিপু'র মানে যদি না বুঝতে পারি তাহলে তোমাকেই এ 'কিপু' আমি পাঠিয়ে দেব।"

ঘনাদা থামলেন।

"তাহ'লে মানে বুঝতে না পেরেই এতদিনে সে সুতোটা আপনার কাছে পাঠিয়েছিল! কিন্তু দু' বছর বাদেই পাঠাবে কথা ছিল না?"—শিশির সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলে।

"হ্যাঁ, কথা তাই ছিল। কিন্তু আমার ঠিকানা ত' পাওয়া চাই।" ঘনাদা শিশিরের নির্বুদ্ধিতায় যেন একটু বিরক্ত,—"কত মুল্লুক ঘুরে তবে ঠিকানা পেয়েছে কে জানে! দেরি হয়েছে তাইতেই।"

"কিন্তু সুতো সমেত চিঠিটাই যে এখন লোপাট। তাহ'লে উপায়?" শিবু প্রায় আর্তনাদ করে উঠল, "ও 'কিপু'র মানেও তা'হলে আর জানা যাবে না, গুপ্তধনও উদ্ধার হবে না!"

"গুপ্তধন অনেক আগেই উদ্ধার হয়েছে!"—ঘনাদা আমাদের প্রতি একটু অনুকম্পার হাসি হেসে বললেন,—"আমি কি দু' বছরের পরও ঘুমিয়ে ছিলাম! পেরুর লিমা শহরে 'প্লাজা দস দে মেয়ো'র কাছে সরকারী মিউজিয়ামে গেলেই দেখতে পাবে 'কিপু'-তে যার সংকেত দেওয়া ছিল, সে সমস্ত দুর্লভ সোনার জিনিস একটি আলাদা ঘরে সাজানো।"

"তার মানে?"—গৌর হতভম্ব হয়ে বললে,—"আপনি 'কিপু' পড়তে পারেন! সেই রাতেই তার মানে বুঝে নিয়ে আপনি মুখস্থ করে ফেলেছিলেন!"

ঘনাদা এ প্রশ্নের উত্তর দিতেই যেন ঘৃণা বোধ করে শিশিরের পুরা সিগারেটের টিনটা তুলে নিয়ে পকেটে ফেললেন।

নিচে নেমে শিশিরকে না জিজ্ঞেস করে পারলাম না,—"আচ্ছা ইনসিওর করা চিঠিটা কি আমাদের বানানো, না সত্যি এসেছিল?"

শিশির চিন্তিত মুখে বলল,—"তাই ত' ভাবছি।"

ফুটো

গৌর ছুটতে ছুটতে এসে যে খবরটি দিলে তাতে আমাদের চক্ষু একেবারে চড়কগাছ

ঘনাদা আবার বুঝি মেস্ ছেড়ে যায়।

আবার ? ! ? !

কি হল কি ? !

ছুটির দিন দুপুর বেলায় বসবার ঘরের মেঝেয় সবে তখন শতরঞ্জিটা পেতে তাস-টাস নিয়ে বসেছি। হঠাৎ এ-সংবাদে যেন যুদ্ধের সময়কার সাইরেনের আওয়াজে ধড়মড় করে পড়লাম।

প্রথম চোটটা গৌরের ওপরই গিয়ে পড়ল। শিশির ত' মারমূর্তি হ'য়ে বললে—"নিশ্চয়—তুই-ই সব নষ্টের মূল।"

"আহা আমি মূল হ'তে যাব কেন ?"—গৌর নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে ব্যস্ত উঠল—"সব নষ্টের মূলে ওই ফুটো !"

"ফুটো !!"

"হ্যাঁ, দেখবেই চল না।"

আর দু'বার বসবার দরকার হ'ল না। গৌরের পিছু-পিছু সবাই ঘনাদার তেতালায় গিয়ে উঠলাম।

উঠে বুঝলাম ব্যাপারটা গুরুতর।

আমাদের এতজনকে এমন হুড়মুড় ক'রে তাঁর ঘরে ঢুকতে দেখেও ঘনাদার কোন ভ্রূক্ষেপ নেই।

তিনি গম্ভীর মুখে তাঁর জিনিসপত্র গোছাতে তন্ময়।

জিনিসপত্র বলতে সাধের গড়গড়াটি বাদে একটি ছোট কম্বল জড়ানো বিছানা আর পুরনো রঙচটা ট্রাউস তোরঙ্গ।

এই তোরঙ্গটি আমাদের সকলেরই অত্যন্ত কৌতূহলের বস্তু। তার ভেতর কি যে আর কি যে নেই, এ নিয়ে বহুদিন আমাদের অনেক গবেষণা তর্কাতর্কি হয়ে গেছে।

কারুর সামনে কোনদিন এ তোরঙ্গ খুলতে ঘনাদাকে দেখা যায়নি। নিন্দুকেরা তাই এমন কথাও বলে থাকে যে, তোরঙ্গটি ঘনাদার গল্পেরই চাক্ষুষ রূপ। ওর ভেতর থেকে ঘনাদা না বার করতে পারেন এমন জিনিস নেই, কিন্তু আসলে ওটি একেবারে ফাঁকা।

আমাদের দেখে আজকেও ঘনাদা সশব্দে তোরঙ্গের ডালাটি বন্ধ করে দিতে ভোলেন না, তারপর তাঁর সেই কম্বল জড়ানো বিছানা নিয়ে এমন ব্যস্ত হয়ে পড়েন যেন সাত রাজ্যের ধন তার মধ্যে তিনি জড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছেন।

"ব্যাপার কি ঘনাদা! এত বাঁধা-বাঁধি কিসের?"—আমাদের জিজ্ঞাসা করতেই হয়।

ঘনাদা এতক্ষণে যেন আমাদের দেখতে পান। বিছানা বাঁধা থামিয়ে একটু দুঃখের হাসি হেসে বলেন,—"আর কেন? এখানে থাকা ত চলল না!"

কেন ঘনাদা!

কি হ'ল কি?

আমাদের প্রশ্ন ব্যাকুল থেকে ব্যাকুলতর হয়ে ওঠে। শিবু উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞাসা করে,—"কলকের মাংসের চপ্‌টা কি সুবিধের হয়নি?"

গৌর তাতে রসান দিয়ে বলে,—"আজ ত' আবার গঙ্গার ইলিশ এসেছে।"

শিশির সাগ্রহে সিগারেটের টিনটা এগিয়ে ধরে জিজ্ঞাসা করে,—"ভাতে, না কাঁচা ঝোল কোন্‌টা আপনার পছন্দ?"

কিন্তু ভবী আজ কিছুতেই ভোলবার নয়। গঙ্গার ইলিশের নামেও ঘনাদাকে টলান যায় না। শিশিরের সিগারেটের টিনের দিকে দৃক্‌পাত পর্যন্ত না করে তিনি ক্লান্তভাবে বলেন, "আমার পছন্দে কি যায়-আসে আর। আমি ত আর থাকছি না।"

"থাকছেন না! কেন বলুন ত! ওয়াশিংটন কি লণ্ডন থেকে জরুরী ডাক এল নাকি?"—এই সংকটকালেও শিবুর মুখ ফসকে রসিকতাটা বোধ হয় বেরিয়ে যায়। আমরা কিন্তু শিবুর ওপর ক্ষেপে যাই।

"কি, পেয়েছিস কি ঘনাদাকে! হেট্‌ করে ডাকলেই অমনি উনি চলে যাবেন। সে ইডেন কি ডালেস হ'লে যেত! বলে কতদিন সাধ্য-সাধনা করেও ওঁকে নিয়ে যাওয়া যায় না! না, না, সত্যি কি ব্যাপার বলুন ত ঘনাদা?"

ঘনাদা, কেন বলা যায় না, একটু যেন প্রসন্ন হয়েছেন মনে হয়। বিছানা বাঁধার যে দড়ি-গাছটা এতক্ষণ ধরে—নানাভাবে নাড়াচাড়া করছিলেন সেটা ছেড়ে দিয়ে অত্যন্ত গম্ভীরভাবে বলেন,—"কেন, সত্যি জানতে চাও?"

"চাই বই কি!"—আমরা সমস্বরে আগ্রহ জানাই।

উঠে দাঁড়িয়ে যেন কোন দারুণ রহস্য উদ্ঘাটন করতে যাচ্ছেন এই ভাবে ঘনাদা আমাদের ইশারায় ঘরের একটা দেওয়ালের কাছে নিয়ে যান। তারপর হঠাৎ নাটকীয়ভাবে একদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলেন,—"দেখো।"

গৌরের কাছে ব্যাপারটা আগে একটু জেনে তৈরি থাকলেও আমরা প্রথমটা একটু হতভম্বই হয়ে যাই।

ঘনাদার আজকাল দৃষ্টিভ্রম হচ্ছে নাকি! সাদা দেওয়ালে স্বপ্ন দেখছেন! তারপর অবশ্য ব্যাপারটা চোখে পড়ে।

মেঝে থেকে দেওয়াল যেখানে উঠেছে, সেখানে একটি কোণে একটা পেন্‌সিল গলাবার মত ছোট্ট একটা ফুটো।

আমরা অতি কষ্টে হাসি সংবরণ করি, কিন্তু ঘনাদা যেন সহ্যের সীমা পার হয়ে গেছেন এমনিভাবে বলেন—"এই ফাটা-ফুটো ঘরে মানুষ বাস করতে পারে?"

আঙুল গলাবার মত একটা ফুটোয় ঘরটা কেন মানুষের বাসের অযোগ্য হয়ে উঠেছে বুঝতে তখন আর আমাদের বাকি নেই।

অপরাধটা আমাদের সবাইকার। নিচের কলতলাটা অনেকদিন থেকেই ভেঙেচুরে গেছল। বাড়িওয়ালাকে অনেক ধরে-টরে দিনকয়েক আগে আমরা সে জায়গাটা নতুন সিমেণ্ট দিয়ে মেরামতের ব্যবস্থা করেছি।

কলতলা মেরামত দেখেই ঘনাদা আব্দার ধরেছিলেন, কলতলার সঙ্গে তাঁর ঘরটাও একবার মেরামত চুনকাম করে দিতে হবে।

আব্দারটা অন্যায়। আমরা ঘনাদাকে অনেক করে বোঝাবার চেষ্টা করেছি। কলতলা সারাচ্ছে বলেই হঠাৎ সমস্ত বাড়ি ছেড়ে দিয়ে তেতলার একটা কুঠরি মেরামত করতে বাড়িওয়ালা রাজী হবে কেন? তাছাড়া সেটা কি ভালো দেখাবে! কিছুদিন বাদেই সমস্ত বাড়িটা চুনকামের সময় তাঁর ঘরটার যা করবার করা হবে।

কিন্তু কে কার কথা শোনে! ঘনাদা সেদিন থেকে গুম হয়ে যা চেপে রেখেছিলেন, আজ এই ফটো দিয়েই তা ফাটবার উপক্রম।

অবস্থা সঙীন বুঝে আমাদের বাধ্য হয়েই চাল পাল্টাতে হয়।

রীতিমত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠে বলি,—"আপনার ঘরের এ অবস্থা হয়েছে তা ত' জানতাম না।"

গৌর সায় দিয়ে বলে,—"না, এ ঘর এখুনি মেরামত-ব্যবস্থা করা দরকার।"

"বাড়িওয়ালা যদি রাজী না হয়, আমরা চাঁদা তুলেই আপনার ঘর মেরামত করে দেব!"—শিশির দরাজ হয়ে ওঠে।

আগুনে জল পড়ে ঘনাদা যখন প্রায় ঠাণ্ডা হয়ে এসেছেন, তখন শিবুর একটি বেফাঁস কথায় আবার সব বুঝি মাটি হয়ে যায়।

"সত্যি। ফটো বলে ফটো!"—শিবু হঠাৎ ফোড়ন কেটে বসে—"ও ফটো দিয়ে ঘনাদা কোন দিন গ'লে যাননি, এই আমাদের ভাগ্যি!"

ঘনাদা শিবুর দিকে ঘাড় ফেরান। সেই ঘাড় ফেরাবার ধরন আর তাঁর মুখে আষাঢ়ের মেঘের মত ছায়া দেখেই আমরা সামলাবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠি।

কিন্তু সামলাব কি? হাসি চাপতে প্রায় দম ফাটার যোগাড়।

সব হাসির বেগ কিন্তু একটি কথায় ঠাণ্ডা।

"কি ফটো জীবনে দেখেছ হে!"—ঘনাদার গলা নয় ত যেন মেঘের ডাক শোনা যায়।

আর মেঘের ডাকে চাতকের মত সব হাসি-ঠাট্টা ভুলে আমরা উৎসুক হয়ে উঠি।

"আপনি কি ফটো দেখেছেন ঘনাদা?"

"পড়েছেন নাকি কখনো গ'লে?"

"হ্যাঁ পড়েছি!" ঘনাদা গম্ভীরমুখে আবার তাঁর বিছানায় এসে বসে বলেন, "পড়েছি চার কোটি মাইল!"

"চার কোটি মাইল একটা ফটো!"—শিশির প্রায় উল্টে পড়ে যায় আর কি।

"পৃথিবীটা এফোঁড় ওফোঁড় করলেও ত আট হাজার মাইলের বেশী হয় না।"—গৌর হতভম্ব হয়ে নিবেদন করে।

"না, তা হয় না"—নির্বিকারভাবে ঘনাদা জানান।

"তবে...?" বলার আগেই যে যেখানে পারি আমরা বসে পড়ি। ঘনাদা শুরু করেন...

"প্যারাসুটটা আর যেন খুলতেই চায় না। বিশ হাজার থেকে দশ হাজার ফুট, দশ হাজার থেকে পাঁচ হাজার। পাঁচ থেকে আড়াই, আড়াই থেকে এক হাজার ফুট। তখনো ঠিক যেন ইটের রাস্তার মত পড়ছি ত পড়ছি-ই।

নিচের তুষার ঢাকা পৃথিবী বিদ্যুৎবেগে আমার দিকে ছুটে আসছে দেখতে পাচ্ছি। আর কটা সেকেণ্ড। তারপর বুঝি শরীরের গুঁড়োগুলোও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

কিন্তু ঠিক পাঁচ শ' ফুটের কাছে আসলটা না হলেও এ রকম বিপদের জন্যে ফাউ-হিসাবে যে ছোট প্যারাসুটটা সঙ্গে থাকে, সেটা খুলে গেল ভাগ্যক্রমে। কিন্তু তা'তে কি আর পুরো-পুরি সামলান যায়। ইটের বস্তার মত না হোক, বেশ সজোরেই নিচে গিয়ে পড়লাম।

কি ভাগ্যি শীতের শেষে তুষার একটু নরম হতে আরম্ভ করেছে, চোট্‌টা তাই তেমন বেশী হ'ল না।

প্যারাসুট গুটিয়ে নিয়ে তারপর গা থেকে খুলে অবাক হয়ে চারিদিকে চাইলাম। ধু-ধু করা তুষার-ঢাকা তুন্দ্রা দিগন্ত পর্যন্ত বিছানো। কিন্তু মিখায়েলের দেখা নেই কেন?

প্যারাসুট নিয়ে সে ত আমার আগেই ঝাঁপ দিয়েছে প্লেন থেকে। এমন কিছু দূরে ত সে নামতে পারে না যে চোখেই দেখা যাবে না।

পরমুহূর্তেই রহস্যটা পরিষ্কার হয়ে গেল। মিখায়েলকে এখনো মাটির ওপর দেখব কি করে? এখনো সে ত' শূন্যলোকে।

প্যারাসুট না খোলার দরুন আমি যেখানে বিদ্যুৎবেগে কয়েক মুহূর্তে নেমেছি, সেখানে তার খোলা প্যারাসুট ধীরে-সুস্থে ভাসতে ভাসতে এখনো নামছে।

আকাশে তাকিয়ে তার প্যারাসুটটা এবার দেখতে পেলাম। মিনিট-খানেকের মধ্যে শ'-খানেক গজ দূরে সে নামল।

প্যারাসুট ও সঙ্গের যৎসামান্য লটবহর গুছিয়ে নিয়ে দূরবীণ দিয়ে চারিধার আর একবার ভালো করে দেখে অবাক হয়ে বললাম,—"কই হে, মেরুর একটা শেয়ালও ত দেখতে পাচ্ছি না। তোমার ডাঃ মিনোস্কি এই মহাশ্মশানে কোথায় লুকিয়ে থাকবেন!"

"আছেন নিশ্চয়ই কোথাও এখানে! এবং আমাদের তাঁকে খুঁজে বার করতেই হবে।"

"আহা, সে কথা ত অনেকবারই শুনিয়েছ। কিন্তু জায়গাটা ভুল করনি ত? এই চেল্যুস্কিন অন্তরীপ হ'ল উত্তর মেরুর দিকে রাশিয়ার শেষ স্থলবিন্দু। তারপর শুধু অনন্ত মেরুসমুদ্র। ঠিক এই জায়গাটিই ডাঃ মিনোস্কি তাঁর যুগান্তকারী পরীক্ষার জন্য বেছে নিয়েছেন এ খবরটার কোন ভুল নেই ত'।"

"না, তা'তে ভুল নেই।" মেখায়েল খুব জোরগলায় ঘোষণা করলেও মনে হ'ল তার মনেও একটু সন্দেহ দেখা দিয়েছে।

সন্দেহ কিন্তু সত্যই অমূলক। তুষার-ঢাকা সেই তুন্দ্রার মধ্যে ডাঃ মিনোস্কিকে আমরা শেষ পর্যন্ত খুঁজে পেলাম। কিন্তু তার আগে তাঁকে খোঁজার মূলে কি ছিল, একটু বলে দেওয়া বোধ হয় দরকার।

অনেকেই বোধ হয় জানে না যে, গত মহাযুদ্ধের পর থেকে পৃথিবীর দু'টি প্রধান শক্তি নিজেদের অজেয় করে তোলবার জন্যে মহাশূন্যে পর্যন্ত ঘাঁটি বানাবার কথা ভাবতে শুরু করেছে। একজন বৈজ্ঞানিক ত' তাঁর পরিকল্পনা কাগজে কতকট প্রকাশও করে দিয়েছেন। পৃথিবী থেকে মাইল পঞ্চাশ উঁচুতে ক্ষুদে চাঁদের মতই একটা শূন্যে ভাসমান বন্দর বসান হবে। সে বন্দর চাঁদের মতই পৃথিবীর সঙ্গে তার চারিধারে ঘুরপাক খাবে। আর সেই বন্দর যে প্রথম মহাশূন্যে ভাসাতে পারবে, বলতে গেলে পৃথিবী তার হাতের মুঠোয়। মহাশূন্যে এই বন্দর ভাসানো শুধু 'রকেট' অর্থাৎ হাউই-বিমানের দ্বারাই সম্ভব। দুটি মহাশক্তি তাই হাউই-বিজ্ঞান সম্বন্ধে পরস্পরের কাজের ওপর কড়া নজর রেখেছে। এ-বিজ্ঞানে কে কোন্ দিকে কতখানি এগিয়ে গেল, সোজাসুজি জানবার উপায় যে নেই তা বলাই বাহুল্য, তাই দুই রাজ্যের কল্পনাতীত পুরস্কারের লোভে প্রাণ হাতে নিয়ে বহু গুপ্তচর এই বিষয়ে যথা-সম্ভব খবর সংগ্রহ করবার আশায় ঘুরছে।

অবশ্য ডাঃ মিনোস্কির ওপর এই গুপ্তচরদের নজর না পড়াই উচিত। হাউই-বিজ্ঞান তাঁর গবেষণার বিষয় নয়। আগের যুগে যেমন আইনস্টাইন, এযুগে তেমনি তিনি অসাধারণ

একজন গণিতবিশারদ। অনন্ত সৃষ্টির মধ্যে যে অসীম অঙ্কের রহস্য রয়েছে—তার জট্ খোলায় তিনি আর সকলের চেয়ে অনেকদূরে এগিয়ে গেছেন।

এই মিনোস্কিও গুপ্তচরদের লক্ষ্য হতে পারেন একথা ভাবতে পারলে বিশ হাজার ফুট থেকে এই চেল্যুস্কিন অন্তরীপের ওপর আমি ঝাঁপ দিতে রাজী অবশ্য হতাম না। কিন্তু সেকথা যথাসময়ে বলা যাবে।

দূরবীণ চোখে দিয়ে—মিথায়েলের সঙ্গে সেই তুষার-ঢাকা তুন্দ্রা যখন আমি তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখছি, তখনও আমি জানি যে মিনোস্কিরই গোপন নিমন্ত্রণে তাঁর আশ্চর্য রেডিও-টেলিস্কোপ দেখতে আমি এসেছি। তাঁর নিজের ফরমাশ মত এই আশ্চর্য টেলিস্কোপ যে রাশিয়ার এক জায়গায় বসান হয়েছে, এ খবর দুনিয়াসুদ্ধ লোক তখন পেয়েছে। শুধু জায়গাটা যে কোথায়, দু'চারজন ওপরওয়ালা বাদে তা রাশিয়ার কেউই জানে না। এ টেলিস্কোপ এযুগে অসাধারণ এক কীর্তি। আলো দিয়ে নয়, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বেতার তরঙ্গ দিয়ে সুদূর মহাশূন্যের খবর এ টেলিস্কোপে পাওয়া যায়। অ্যারিজোনার লাওয়েল অবজারভেটারির, কি দক্ষিণ আফ্রিকার ব্লুমফন্টেনের টেলিস্কোপের চেয়ে এই বেতার দূরবীক্ষণযন্ত্র অনেকগুণ শক্তিশালী। তাছাড়া এ টেলিস্কোপের সুবিধে হল এই যে, মেঘ, কুয়াশা বা ধোঁয়া কিছুতেই অচল হয় না। আলোর ওপর যার নির্ভর সে টেলিস্কোপ আরিজোনা বা দক্ষিণ আফ্রিকার মরুর মত নির্মেঘ নির্মল আকাশের দেশে বসাতে হয়, কিন্তু এ টেলিস্কোপের সেরকম কোন হাঙ্গামা নেই। এরকম একটি টেলিস্কোপ ইংলণ্ডেও কিছুদিন হল বসান হয়েছে; কিন্তু ডাঃ মিনোস্কির টেলিস্কোপ নাকি তার চেয়ে অনেক জোরালো। শুধু তাই নয়, এ টেলিস্কোপের সাহায্যে মিনোস্কি এমন এক আশ্চর্য পরীক্ষা নাকি করছেন, বিজ্ঞানের যুগ যাতে পাল্টে যাবে।

এহেন লোক আমায় নিমন্ত্রণ করেছেন শুনে তেমন অবাক আমি হয়নি। কারণ মিনোস্কির সঙ্গে অনেক আগেই আমার আলাপ হয়েছিল। তখন অবশ্য বিশ্ববিখ্যাত তিনি হননি।

নিমন্ত্রণটা বিশ্বাস করলেও এরকম লুকিয়ে সেটা করার কারণ আমি প্রথমটা বুঝতে পারিনি। মিথায়েলই সেটা বুঝিয়ে দিয়েছিল।

কোন শত্রুপক্ষের লোক না হলেও আমি বিদেশী বটে। আর যত প্রভাব প্রতিপত্তিই থাক, বিদেশী একজন বন্ধুকে এসব গোপন জিনিস দেখানো মিনোস্কির পক্ষেও শোভন নয়। নেহাত আমাকে ভালো করে জানেন বলেই নিজের একান্ত বিশ্বাসী শিষ্য মিথায়েলের কাছে নিজের গোপন আস্তানার ঠিকানা জানিয়ে তারই মারফত এ নিমন্ত্রণ তিনি করে পাঠিয়েছেন। তার গোপন ঠিকানা মিথায়েলেরও আগে জানা ছিল না।

এ নিমন্ত্রণের কথা যখন আমি শুনি, তার কিছুদিন আগে মিথায়েলের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে। আলাপ সে কতকটা গায়ে পড়েই করেছিল, কিন্তু হাতীর মত বিরাট চেহারার খরগোসের মত শান্তশিষ্ট লোকটাকে আমার খারাপ লাগেনি তার জন্যে। মিনোস্কির দূত হয়েই সে যে আসল কথার সুযোগের অপেক্ষায় আমার সঙ্গে এভাবে আলাপ জমিয়েছে, এটুকু জানবার পর তার ওপর যেটুকু বিরাগ ছিল তাও কেটে গেছে। নিমন্ত্রণের কথা জানবার পর মিথায়েলের পরামর্শ মত ওপরওয়ালাদের কাছে যেটুকু খাতির আছে, তাই কাজে লাগিয়ে মিথ্যে অজুহাতে প্লেন যোগাড় করে তা থেকে প্যারাসুটে যথাস্থানে নামবার ব্যবস্থা করি। পাছে কেউ সন্দেহ করে বলে মিথায়েল নিজে এসব যোগাড়-যন্ত্রের ব্যাপারে মাথা গলায়নি। মাথা গলান উচিত নয় বলেই আমায় বুঝিয়েছিল।

আসলে মিথ্যে সে যে কিছু বলেনি, সেই তুষার তুন্দ্রার রাজ্যে মিনোস্কির গোপন মানমন্দির খুঁজে পাবার পর ভালো করেই বুঝলাম।

মানমন্দিরটি এমনভাবে তৈরি যে নেহাত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে না দেখলে তা' তুষার ঢাকা তুন্দ্রার অংশ বলেই মনে হবে। খুঁজে বার করতে সেই জন্যেই আমাদের অত কষ্ট হয়েছিল।

মানমন্দিরের ভেতর ঢুকে সমস্ত কষ্ট কিন্তু সার্থক মনে হল। এই চিরতুষারের দেশে মাটির নিচে এমন স্বর্গপুরী যারা বানিয়েছে, মনে মনে তাদের তারিফ না করেও পারলাম না।

কিন্তু আরামে স্বর্গপুরী হলেও এ কিরকম মানমন্দির! কোথায় আশ্চর্য যন্ত্রপাতি, কোথায় বা আর সব লোকজন?

বাইরে যেখানে পরা-জমানো শীত, মানমন্দিরের ভেতরে সেখানে ঠাণ্ডার কোন বালাই নেই। বড়ো একটা জাহাজের মত পরম সুখে দিন কাটাবার সব রকম আয়োজন উপকরণই সেখানে প্রচুর। শুধু আসল জিনিসের কোন চিহ্ন নেই।

শেষ পর্যন্ত মিনোস্কির কাছে নিজের কৌতূহলটা প্রকাশ না করে পারলাম না।

বিরাট একটা চাকার মত প্যাঁচলাগান দরজা খুলে মিনোস্কি নিজেই আমাদের সিঁড়ি দিয়ে ভেতরে নিয়ে এসেছিলেন। প্রথমটা একটু অবাক হলেও আমায় চিনতে পেরে তাঁর আনন্দ যেন আর ধরে না।

"একি দাস তুমি! তুমি এখানে আসবে আমি ভাবতেই পারিনি।"—বলে আমার হাত ধরে সজোরে তিনি ঝাঁকানি দিয়েছিলেন।

আমিও একটু ঠাট্টা করে বলেছিলাম,—"আমিই কি পেরেছিলাম। হঠাৎ প্লেনটা বিগড়ে যাওয়ায় প্যারাসুটে নেমে পড়লাম!"

"ওঃ প্যারাসুটে নেমেছ!"

তাঁর বিস্ময়টুকু দেখে হেসে বলেছিলাম, "সাধে কি আর নেমছি। আপনার শিষ্য মিখায়েলের কাছে শুনলাম, অন্য কোন রকম নামা নাকি আপনার পছন্দ নয়। তবে প্যারাসুটের দড়ি যে ভাবে জড়িয়ে গেছল, খুলতে আর একটু দেরি হলে আপনার নিমন্ত্রণ রাখা এ জন্মে আর হত না।"

"তাই নাকি! এত কাণ্ড করে তোমাকে নিমন্ত্রণ রাখতে হয়েছে!" বলে তিনি বেশ একটু গম্ভীর হয়ে গেছেন।

মেখায়েল অবশ্য একান্ত অনুগত শিষ্যের মত এর মধ্যে একটি কথাও বলেনি।

মিনোস্কি এখন ঘুরে ঘুরে সমস্ত জায়গাটা আমাদের দেখাচ্ছিলেন। তারই মধ্যে এক সময় আমার মনের কথাটা বলে ফেললাম।—"সব দেখে কি হবে ডাঃ মিনোস্কি! এর বদলে কুইন মেরী বা কোন বড় জাহাজ দেখলেই ত পারতাম।"

"জাহাজই ত দেখছেন!"—মিনোস্কির মুখে অদ্ভুত একটু হাসি।

"জাহাজ দেখছি। ঠাট্টাটা বুঝতে পারলাম না।" মিখায়েলের গলা এতক্ষণে প্রথম শোনা গেল। সে গলার স্বর যেন অন্যরকম।

"ঠাট্টা নয়! সত্যিই এটা জাহাজ। এমন জাহাজ যা এপর্যন্ত কল্পনাও করেনি।"

জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে মিনোস্কি আবার বললেন, "কিন্তু ঠাট্টার বদলে একটু ঠাট্টা করলেই বা দোষ কি! গুপ্তচর মিচেল যে আমার শিষ্য মিখায়েল হ'য়ে উঠেছে, এটা একটু বেয়াড়া ঠাট্টা বলেই ত আমার মনে হয়।"

অবাক্ হ'য়ে আমি যা বলতে যাচ্ছিলাম তাতে বাধা দিয়ে মিনোস্কি বললেন,—"তুমিও শেষে এই নীচ কাজে নামবে, আমি ভাবিনি দাস।"

ব্যাকুলভাবে এবার জানালাম,—"বিশ্বাস করুন ডাঃ মিনোস্কি, আমি এসবের কিছুই জানি না। মিখায়েলকে সত্যিই আপনার শিষ্য ভেবে ওর কথায় বিশ্বাস করেছিলাম।"

ছদ্মবেশী মিচেল এবার নির্লজ্জভাবে হেসে উঠে বললে—"তোমার মত আহাম্মককে তা না বিশ্বাস করাতে পারলে এখানে আসবার প্লেন, নামবার প্যারাসুট যোগাড় হ'ত কি করে! আমার কার্যোদ্ধারই যে নইলে হ'ত না।"

"কার্যোদ্ধার সত্যি হয়েছে ভাবছো!" মিনোস্কি বজ্রস্বরে ব'লে উঠলেন,—"আমাদের পুলিশ এতই কাঁচা মনে করো! তোমরা এখানে রওনা হবার সঙ্গে সঙ্গে তারা সব কথা

আমায় বেতারে জানিয়ে দিয়েছে। আমায় সাহায্য করবার প্রহরীও তারা পাঠাচ্ছিল। আমিই বারণ ক'রে দিয়েছি।"

"বারণ ক'রে ভালো করেন নি ডাঃ মিনোস্কি।"—মিচেলের আসল চরিত্র তার গলার স্বরেই এবার বোঝা গেল,—"কি পরীক্ষা আপনি এখানে করছেন এখনো জানতে পারিনি, কিন্তু এখানকার যা কিছু দরকারী জিনিস সব সমেত আপনাকেও এখান থেকে পাচার করবার ব্যবস্থা করতেই আমি এসেছি। আমার নির্দেশ পেয়ে আমাদের দুটি প্লেন শীগ্‌গিরই এখানে নামবে।"

অবিচলিতভাবে মিনোস্কি একটু হেসে বললেন, "কিন্তু নেমে কিছু পাবে কি?"

"হ্যাঁ পাবে!" মিচেল দাঁত খিঁচিয়ে উঠল, "কোনো চালাকি যাতে তার আগে আপনি না করতে পারেন সেজন্যে আপনাকে একটু বাঁধব। এই সুটকো কালা আদমীটা অবশ্য ধর্তব্যই নয়।"

যেমন চেহারা তেমনি মত্ত হাতীর মতই পদভরে ঘর কাঁপিয়ে মিচেল এবার এগিয়ে এল। পর মুহূর্তেই দেখা গেল ঘরের এক কোণের একটা সোফার ওপর জিগবাজি খেয়ে পড়ে সে কাতরাচ্ছে।

জামাটা যেটুকু নষ্ট হয়েছিল ঠিক ক'রে নিয়ে বললাম, "আর কিছু দরকার হবে ডাঃ মিনোস্কি?"

"ধন্যবাদ দাস। আর কিছুর দরকার নেই। তুমি না সাহায্য করলেও অবশ্য কিছু ক্ষতি হ'ত না। আমি তৈরি ছিলাম।"

কাতরাতে কাতরাতেও মিচেল গর্জে উঠল—"তৈরি থাকা বার করে দিচ্ছি! আমাদের লোকেরা এখানে নামলো ব'লে।"

"তার আগে তোমাকে যে অনেক নামতে হবে।" ব'লে মিনোস্কি আমার দিকে ফিরলেন—"শোন দাস, বিজ্ঞানের এক আশ্চর্য পরীক্ষা এবার আমি করতে যাচ্ছি। পরীক্ষায় বাঁচব কি

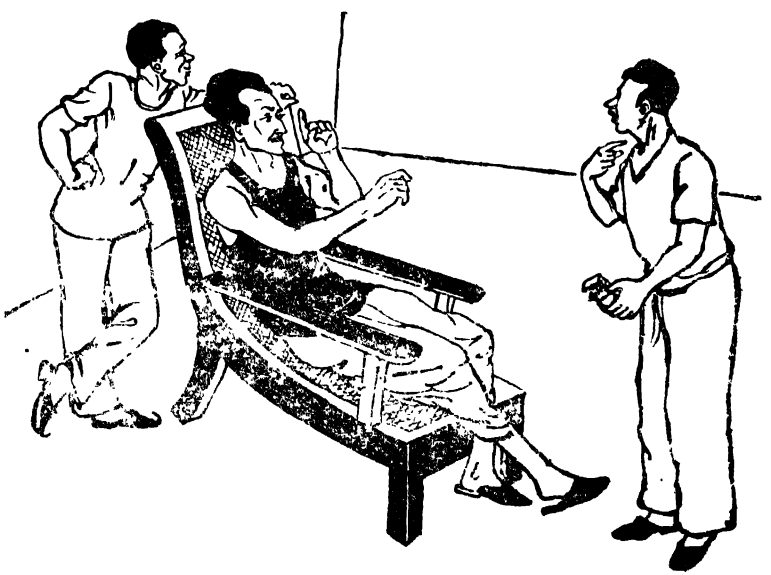

মরব জানি না। তাই এই শয়তানকেই শুধু আমার সঙ্গী করতে চাই। তুমি ইচ্ছে করলে এখন চলে যেতে পারো।"

"এত বড় সৌভাগ্য শুধু ওই শয়তানই পাবে। আমি কি অপরাধ করলাম!"

হেসে আমার পিঠ চাপড়ে মিনোস্কি বললেন,—"এই জবাবই তুমি দেবে জানতাম। যাও, ঐ সোফাটায় আরাম করে বস গিয়ে, যাও।"

সোফায় বসতে না বসতেই মিনোস্কি দেয়ালের একটা কি বোতাম টিপলেন। সঙ্গে সঙ্গে মেঝের একটা জায়গা ফাঁক হয়ে যেন ভোজবাজিতে অদ্ভুত একটা যন্ত্র বেরিয়ে এল। সে যন্ত্রের একটা কি হাতল টেনে ধরতেই কি যে হ'ল, কিছুই আর জানতে পারলাম না।

জ্ঞান যখন হ'ল তখন দেখি ঠিক সেই ঘরেই সেই সোফাতেই বসে আছি। মিসেল তখনও অসাড় হয়ে তার জায়গায় পড়ে আছে। আর মিনোস্কি ঘরের একদিকের কাঁচের জানলার ধারে দাঁড়িয়ে বাইরে কি দেখছেন।

তাঁর কাছে ছুটে গিয়ে বললাম,—"কি হল কি বলুন ত? কি দেখছেন আপনি?"

"নিজেই দেখো না।" ব'লেই তিনি হাসলেন।

দেখে সত্যিই স্তম্ভিত হ'য়ে গেলাম। মেরুর তুষার-ঢাকা তুন্দ্রার বদলে এ যে টকটকে লাল বালির মরুভূমি! "একি সাহারা নাকি!" সবিস্ময়ে ব'লে ফেললাম।

মিনোস্কি এবার সশব্দে হেসে উঠে বললেন,—"না, তার চেয়ে আর একটু দূর,—এ হ'ল মঙ্গল গ্রহের লাল বালির মরুভূমি। মঙ্গল গ্রহকে যার জন্য লাল দেখায়।"

মঙ্গল গ্রহ!—আমার না মিনোস্কির কার মাথা খারাপ হয়েছে তখন ভাবছি। কিন্তু তুষার-ঢাকা তুন্দ্রার বদলে লাল মরুভূমি ত সত্যিই দেখতে পাচ্ছি। পৃথিবীর কোন মরুভূমির সঙ্গে তার মিলও নেই।

আমায় আবার সোফায় নিয়ে এসে বসিয়ে মিনোস্কি বললেন,—"সত্যিই, মঙ্গল গ্রহে আমরা নেমেছি। আমার পরীক্ষা সফল।"

আমার বিমূঢ়তায় একটু হেসে তিনি আবার বললেন,—"মঙ্গল গ্রহ এবার পৃথিবীর কত কাছে এসেছে, খবরের কাগজেও তা বোধ হয় পড়েছ। পৃথিবী থেকে তার দূরত্ব এখন চার কোটি তিন লক্ষ মাইলের কাছাকাছি। কিন্তু এত কাছে এলেও, কোন হাউই-যন্ত্র দিয়ে ঘণ্টায় চার হাজার মাইল ছুটেও মাস দেড়েকের আগে আমরা পৌঁছাতে পারতাম না। সে জায়গায় প্রায় চক্ষের নিমেষে আমরা এসেছি বলা যায়।"

"কিন্তু এলাম কি ক'রে!"—আমি আগের মতই বিমূঢ়।

"এসেছি ফুটো দিয়ে গলে।" আমার বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখের দিকে চেয়ে তিনি বললেন "হ্যাঁ সত্যিই ফুটো! মহাশূন্যের ফোর্থ ডাইমেনসন্ মানে চতুর্থ মাপের ফুটো। লম্বা, চওড়া, উঁচু—এই তিন মাপ দিয়েই সৃষ্টির সবকিছু আমরা দেখতে জানি। গণিত-বিজ্ঞান এছাড়া আরও মাপের সন্ধান পেয়েছে, কিন্তু তা কাজে লাগাতে কেউ পারেনি এ পর্যন্ত। আমার এই পরীক্ষায় প্রথম সেই চতুর্থ মাপের জগৎ মানুষের আয়ত্তে এল।

ব্যাপারটা তোমায় আর একটু ভাল ক'রে বোঝাই। খুব লম্বা একটা চিমটে মনে করো। এক দিকের ডগা থেকে আর এক দিকের ডগায় পৌঁছতে হ'লে একটা পিঁপড়েকে সমস্ত চিমটেটা নাড়িয়ে যেতে হবে। তাতে তাকে হাঁটতে হবে ধরো তিন গজ। কিন্তু চিমটের একটা ফলা থেকে আর একটা ফলা মাত্র এক ইঞ্চি দূরে যদি থাকে, আর ওপরের ফলা থেকে নিচের ফলায় যাবার একটা ফুটো যদি পিঁপড়েটা পায়, তা হ'লে এক ইঞ্চি নেমেই তিন গজ হাঁটার কাজ তার সারা হয়ে যাবে। লম্বা, চওড়া ও উঁচু—এই তিন মাপের জগতে যা অনেক দূর চতুর্থ মাপ দিয়ে সেখানে অতি সহজে পৌঁছবার এমন অনেক ফুটো মহাশূন্যে আছে। তেমনি একটা ফুটোই আমি খুঁজে পেয়েছি।"

এবার উৎসাহে উঠে দাঁড়িয়ে বললাম,—"মঙ্গল গ্রহটা তাহলে ত ঘুরে দেখতে হয়।"

হেসে আমায় নিরস্ত করে মিনোস্কি বললেন, "না না, এবার সেজন্যে তৈরি হ'য়ে আসিনি। তাছাড়া এ ফুটো থাকতে থাকতেই পৃথিবীতে ফিরে যেতে হবে। অন্ততঃ ওই শয়তান মিচেলটার জ্ঞান হবার আগে।"

মিচেলের জ্ঞান পৃথিবীতে ফিরেই হয়েছিল। তখন তার হাতে হাতকড়া। প্লেনে ক'রে মিনোস্কিকে চুরি করতে যারা নেমেছিল তাদের অবস্থাও তথৈবচ।"

ঘনাদার কথা শেষ হতে না হতেই শিবু ব'লে উঠল, "এই বছরেই ত জুন জুলাই-এর মাঝামাঝি মঙ্গল গ্রহ পৃথিবীর অত্যন্ত কাছে এসেছিল শুনেছি। কিন্তু সশরীরে তখন আপনি এই মেসেই ছিলেন মনে হচ্ছে।"

কোন উত্তর না দিয়ে শিশিরের হাত থেকে সিগারেটের টিনটা অন্যমনস্কভাবে তুলে নিয়ে ঘনাদা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

দাঁত

মাছ ধরতে যাওয়া আর হ'ল না।

এতদিনের এত জল্পনা কল্পনা আয়োজন উদ্যোগ সব ভেস্তে গেল। অথচ কি উৎসাহ নিয়েই না সব ব্যবস্থাপত্তর করা গেছল। কি নিখুঁত তোড়জোড়! কি নির্ভুল অভিযানের খসড়া!

মাছ ধরা ত নয়, সত্যিই রীতিমত একটা যুদ্ধযাত্রা।

শিবুর ওপর কমিসেরিয়েটের ভার, শিশির আছে আর্সেনাল-এর তদারকে, আর গৌর নিয়েছে ট্রান্সপোর্টের ঝক্কি।

অর্থাৎ শিবু ব্যবস্থা করবে ভূরি-ভোজনের, শিশির যোগাবে ছিপ, বঁড়শি, টোপ, চার, আর গৌর দেবে পৌঁছে সেই আশ্চর্য অজানা জলাশয়ে, যেখানে সভ্যতার সংস্পর্শহীন সরল মাছেরা এখনো কুটিল মানুষের কারসাজির পরিচয় পায়নি।

তার পর শুধু ছিপ ফেলা আর মাছ তোলা।

গত ক'দিন ধরেই তাই দারুণ উৎসাহ উত্তেজনার মধ্যে দিয়ে মেসের দিন কাটছে। ধরার পর অত মাছ আনা যাবে কি করে তাই নিয়েও তুমুল তর্ক হ'য়ে গেছে এবং আনাও যদি যায়, তাহলে বাজারে কিছু বিক্রি করতে ক্ষতি কি, এ প্রস্তাব করতে গিয়ে খেলোয়াড়ী মেজাজের অভাবের অভিযোগে শিবুকে দস্তুরমত অপ্রস্তুত হ'তে হয়েছে।

শখের মাছ ধরে এনে বিক্রি!

মাছ চালানোর ব্যবসা করলেই হয় তাহলে!

এই বেফাঁস কথার সাফাই গাইতে শিবুকে সরকারী স্বাস্থ্যবিভাগের পর্যন্ত দোহাই পাড়তে হয়েছে। এত মাছ একসঙ্গে এনে এই ভাদ্রের গরমে পচলে শহরের স্বাস্থ্য বিপন্ন হ'তে পারে এই তার বক্তব্য।

কিন্তু তাতেও সে পার পায়নি।

পাবে কেন। খিঁচিয়ে উঠেছে শিশির।

বিলিয়ে দেব আমরা।—উদার হ'য়ে উঠেছে গৌর।

প্রতিবেশীদের মধ্যে কাদের কাদের মাছ বিলিয়ে অনুগ্রহ করা যায়, তার একটা তালিকাও তৈরি হ'তে বিলম্ব হয় নি।

এই তালিকা তৈরির মাঝখানে উদয় হয়েছেন ঘনাদা।

শিশিরের কাছে তিন হাজার তেষট্টিতম সিগারেট-টা ধার নিয়ে ধরাতে ধরাতে বলেছেন, কিহে তোমাদের Operation Pisces -এর কতদূর!

'জানতি পার না'-র জ দেওয়া 'পিসেজ' শুনে প্রথমটা একটু ভড়কে গেলেও তাড়াতাড়ি সামলে নিয়েছি। শিবু থাকতে আমরাও বিদ্যেয় কম যাই নাকি। 'পিসেজ' ত জ্যোতিষের মীন অর্থাৎ মৎস্য রাশির ল্যাটিন নাম। আমরা হেসে বলেছি,—দূর আর কোথায়! আপনার জ্যোতিষের মৎস্য রাশি উঠোনে এনে ফেলেছি বললেই হয়।

উৎসাহের চোটে সেই আশ্চর্য পুকুরের সরল সুবোধ মাছদের কথা উচ্ছাস ভরেই শুনিয়েছি এবার।

ঘনাদা কিন্তু শুধু একটু মুখ বেঁকিয়েছেন।

মাছ ধরতে তাহলে যাচ্ছ না।—ঘনাদার কথায় যেন কোথায় খোঁচা।

যাচ্ছি না মানে? কি করতে যাচ্ছি তাহলে?

বলো মাছ মারতে! মাছ ধরা আর মারার মধ্যে তফাত আছে কিনা। একটা হল খেলা আর একটা খুন। যে মাছ খেলাতেই জানে না, তাকে ধরা নয়, শুধু মারা-ই যায়।

কথাগুলো মোটেই মনঃপূত হয়নি আমাদের। তাই খুঁত ধরে বলেছি,—মাছ আবার খেলাতে জানবে কি! মানুষই ত মাছকে খেলিয়ে তোলে।

খেলায়, খেলায়, মাছও খেলায়। তেমন মাছ হলে মানুষকেই খেলায়; আর মাছ যদি খেলোয়াড় না হয়, তাহলে ছিপ ধরাই মিছে। তবে তেমন খেলোয়াড় আর আজকাল আছে কোথায়? শেষ দেখেছিলাম নীলিমা-কে।

নীলিমা! আমরা অবাক্।

হ্যাঁ, নীলিমা। নামটা অবশ্য আমারই দেওয়া। মেয়ে নয়, মাছ। ওপরে গাঢ় নীল আর নীচে ধোঁয়াটে রুপোলী। পাকা সাত হাত বিশমনী 'টুনী'। ক্যালিফোর্নিয়ার অ্যাভালন শহরের নাম শুনেছ কি না জানি না। মোটর বোটে ছিপ দিয়ে সমুদ্রের 'টুনী' ধরার খেলা সেই শহরের মাথা থেকেই প্রথম বেরোয়। কিন্তু নীলিমার কাছে সেই শহরের মাথা একেবারে হেঁট হয়ে গেছল সেবার। বাঘা বাঘা 'টুনী' শিকারী যেখানে জমা হয়, অ্যাভালনের সেই 'টুনা' ক্লাব একেবারে নিঃঝুম। নীলিমার কাছে হার মনে সমস্ত শহর মর্মাহত। নীলিমা টোপ গেলে অম্লানবদনে, কিন্তু সে যেন শিকারীকে আহাম্মক বানাবার জন্যেই। নাচিয়ে খেলিয়ে বেচারা শিকারীকে নাকালের চূড়ান্ত করে শেষ পর্যন্ত ছিপের সুতোটি কি ভাবে সে কেটে পালায় কেউ বুঝতে পারে না। তাই নীলিমা মাছের ছদ্মবেশে জলকন্যা এমন একটা গুজবও তখন রটে গেছে।

সেই অ্যাভালন শহরে সেবার...

বেড়াতে গেছলেন, আর বাঘা বাঘা শিকারীরা যার কাছে মাথা মুড়িয়েছে সেই নীলিমাকে মোটর-বোটের বদলে ডাঙা থেকেই হুইলের জায়গায় হাত-ছিপে-ই ধরে সবাইকে একেবারে তাকে লাগিয়েই দিয়ে ছিলেন এইত? ঘনাদার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে এইভাবে শেষ করেও গৌর থামেনি, তার ওপর জুড়ে দিয়েছে—এ আর শোনাবেন কি! খবরের কাগজেই ত তখন বেরিয়েছিল। আমরা পড়েছি।

গৌর আমাদের দিকে সমর্থনের জন্যে তাকিয়েছে। কলের পুতুলের মত আমরাও মাথা নেড়ে সায় দিয়েছি বটে কিন্তু বুঝতে তখন আর আমাদের বাকি নেই যে, অবস্থা চিকিৎসার বাইরে গেছে।

একসঙ্গে ঘনাদার গল্প তাড়াতাড়ি থামান ও তাঁকে খুশি রাখাই হয়ত গৌরের উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু ফল হয়েছে হিতে বিপরীত।

না পড়ানি—ঘনাদার গলায় বিষাদের মেঘের ডাক—পড়তে পারো না। কারণ ব্যাপারটা যা বানালে তা' নয়। আর খবরের কাগজে কিছু বার করতেই দেওয়া হয়নি।

শুনুন ঘনাদা, শুনুন।

আর শুনুন। ঘনাদা ততক্ষণে সিঁড়ি দিয়ে তাঁর টঙের ঘরে উঠছেন।

গৌরের ওপর আমরা সবাই খড়্গহস্ত হয়েছি।

দিলি ত সর্বনাশ ক'রে।

বাঃ আমি ত ভালোই করতে চেয়েছিলাম।—গৌরের করুণ কৈফিয়ত—খবরের কাগজে পড়েছি শুনলে খুশি না হয়ে খাপ্পা হবেন কে জানত। তাছাড়া স্টেশন ওয়াগন যে দেবে, তার সঙ্গে এই সকালেই দেখা না করলে নয়। গল্প একবার গড়ালে দুপুরের আগে কি থামত!

দোষ গৌরকে খুব দেওয়া যায় না। মাছ ধরার আয়োজনের এই ঝামেলার মধ্যে ঘনাদার গল্পটা মুলতুবি রাখার পক্ষে আমাদের সবারই সায় ছিল মনে মনে।

কিন্তু ঘনাদার মন ত আর তা শুনে গলবে না।

সেই যে তিনি বেঁকলেন, আর সোজা করে কার সাধ্য। উৎসাহ না থাকলেও আমাদের খেয়ালে আপত্তি তাঁর ছিল না আগে। আমাদের সঙ্গ ও শিক্ষা দেবার কথাও দিয়েছিলেন। সেকথা তিনি স্পষ্ট করে ফিরিয়ে নেননি এখনো। কিন্তু ভাবগতিক দেখে আমরা চিন্তিত।

রবিবারে আমাদের অভিযান! শুক্রবারে ঘনাদা তাঁর ঘর থেকে সন্ধ্যের পর নামলেন না। ঠাকুর ওপরেই খাবার দিয়ে এল। শুনলাম তাঁর সর্দি। শনিবার সকালে শোনা গেল সর্দির সঙ্গে জ্বরভাব, আর রাত্রের বুলেটিন-এ জানলাম দাঁতের ব্যথা।

দাঁতের ব্যথা!—খাবার ঘরে আমরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলাম।

খাওয়ার পরই একতলায় শিশিরের ঘরে দরজা ভেজিয়ে মন্ত্রণাসভা বসল। ঘনাদা যে আমাদের সব মজা মাটি করবার প্যাঁচ কষেছেন তা আর বুঝতে তখন বাকি নেই। কিন্তু আমাদেরও জেদ ঘনাদাকে পাই বা না পাই, মাছ ধরতে যাব-ই। আর তার আগে ঘনাদাকে একটু জব্দ না করলে নয়।

পরদিন সকাল সাতটা বাজতে না বাজতেই ঘনাদার ঘরে গিয়ে সবাই আমরা হাজির। আমরা আর সদ্য ভাজা এক প্লেট গরম 'ক্রোকেট'।

কি ব্যাপার ঘনাদা! তিন দিন ধরে নিচে নামছেন না, আমাদের সঙ্গে যাবেন না নাকি?

কি করে আর যাই!—ঘনাদার দীর্ঘশ্বাস আমাদের, না 'ক্রোকেটের' উদ্দেশে বোঝা কঠিন।

হ্যাঁ, হাঁতের ব্যথা নিয়ে যাওয়া উচিতও নয়,—আমরা সহানুভূতিতে গদগদ—কিন্তু ক্রোকেটগুলো কেমন হ'ল আপনাকে একটু চাখানোও ত তাহ'লে যাবে না। সবই আমাদের ভাগ্য। চল হে।

আমাদের সঙ্গে ক্রোকেটের প্লেটও অন্তর্ধান হওয়ার উপক্রম দেখে ঘনাদা আর বুঝি সামলাতে পারলেন না।

অত যখন পেড়াপীড়ি করছ দাও দেখি একটা চেখে।—ঘনাদার নেহাত যেন অনিচ্ছা।

আমাদের যেন সঙ্কোচ—কিন্তু এই দাঁতের ব্যথায়...

গৌর প্লেটটা ঘনাদার প্রায় নাকের কাছ দিয়েই ঘুরিয়ে নিয়ে যায় আর কি।

তার হাত থেকে প্লেটটা একরকম কেড়ে নিয়েই ঘনাদা আত্মবিসর্জনের সুরে বললেন,—হোক ব্যথা। একটা দায়িত্বও ত আছে। সঙ্গেও যাব না, আবার কি ছাইপাঁশ সঙ্গে নিচ্ছ দেখেও দেব না, তা কি পারি।

প্রথম ক্রামড়টা নির্বিঘ্নেই পড়ল, তারপর দ্বিতীয় কামড়— কটাস্।

আমরা একসঙ্গে হাঁ হাঁ করে উঠলাম।

একদিকে ক্রোকেটের ভেতর থেকে বড় মার্বেল গুলিটা মেঝেতে, আর একদিকে ঘনাদার মুখ থেকে দুপাটি দাঁত প্লেটের ওপর তখন ছিটকে পড়েছে।

চোখ বড় বড় করে সেদিকে তাকিয়ে গৌর গলায় মধু ঢেলে জিজ্ঞেস করলে,—বাঁধানো বলে মনে হচ্ছে না? বাঁধানো দাঁতেও ব্যথা হয় তাহলে?

ঘনাদা কি অপ্রস্তুত?

আমাদেরই মনের ভুল!

ফোক্‌লা মুখেই করুণামিশ্রিত সহিষ্ণুতার হাসি হেসে দাঁতের পাটি কুড়িয়ে নিয়ে মুখে লাগিয়ে ঘনাদা বললেন,—না, তা হয় না।

তারপর তাঁর গলার স্বর গাঢ় হয়ে উঠল রহস্যে—তবে ছেলেমানুষী চালাকি করে আজ তোমরা যা জানলে, একদিন তা ধরা পড়লে এই দুনিয়ার চেহারাখানাই পাল্টে যেত। কাঁচা দাঁত তুলিয়ে সেদিন যদি না বাঁধিয়ে রাখতাম, আর সেই নীলিমার কাছে হদিস যদি না পেতাম, তাহলে পৃথিবীর ইতিহাস আজ অন্যভাবে লেখা শুরু হত।

আবার নীলিমা! আমরা চঞ্চল হয়ে উঠি ঘর থেকে বেরুবার জন্যে।

কিন্তু ঘনাদা তখন বলে চলেছেন,—এই দুপাটি বাঁধানো দাঁতই এক ভুঁইফোড় রাজ্যের লোভের থাবা থেকে সেদিন মানুষকে বাঁচিয়েছে।

অ্যাভালন শহরের নাম সেদিন করেছি। শহরটা কোথায় বলিনি। এ শহর হল ক্যালিফোর্নিয়ার পশ্চিমে সেণ্ট ক্যাটালিনা নামে ছোট এক দ্বীপে। পুরো দ্বীপটা যেন একটা নাদাপেট বেলেমাছ, দক্ষিণমুখো চলেছে। অ্যাভালন শহরটা যেন তার চোখ। এ শহরে বেড়াতে আমি যাইনি শখ করে। গেছলাম ডে-কস্টা নামে এক পুরনো বন্ধুর ডাকে ডে-কস্টা নামে অবশ্য তাঁকে খুঁজে পাবার আশা করিনি। শ্রীকৃষ্ণের শতনামের মত তারও নামের সংখ্যা অগুনতি, আর সেই সঙ্গে ছদ্মবেশও। কিন্তু নাম আর চেহারা তার যত রকমেরই হোক, স্বভাব তার চিরকাল এক। যেখানে কোন গোলযোগের গন্ধ, সেখানেই ডে-কস্টা। জীবনে কত বিপদের মুখেই যে দু'জনে একসঙ্গে দাঁড়িয়েছি তার হিসেব নেই। এই কিছুদিন আগেও অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক অ্যাণ্টনি ফিশার অন্তর্ধান হওয়ার পর তাঁর খোঁজে প্রাণ হাতে নিয়ে কি না করেছি। খোঁজ যে পাইনি সে অবশ্য আমাদের একটা কলঙ্ক। এই ডে-কস্টার জরুরী সংকেত-টেলিগ্রাম পেয়েই অ্যাভালনে ছুটেছিলাম। টেলিগ্রামে এখনকার নাম সে দেয়নি। যে নামেই থাকুক, তাকে খুঁজে আমি বার করবই, সে জানত।

ঘনাদার দম নেওয়ার ফাঁকে নিচে স্টেশন ওয়াগনের হর্ন শুনতে পেলাম। মন তখনও উসখুস করছে।

আচ্ছা তাহলে—বলে গৌর ত উঠেই দাঁড়াল, কিন্তু ওই উঠে দাঁড়ান পর্যন্তই।

ঘনাদা আবার ধরলেন।

অ্যাভালনে নেমেই ডে-কস্টাকে খুঁজে ঠিক বার করলাম। কিন্তু জীবিত অবস্থায় নয়। ডে-কস্টা আমার পৌঁছবার আগের দিনই সেণ্ট ক্যাটালিনার পশ্চিম দিকের সমুদ্রে কেমন করে ডুবে মারা গেছে। ওখানকার কজন জেলে তার হাওরে ঠোকরান মৃতদেহটা উদ্ধার করেছে কোন মতে। অ্যাভালনের কেউ তাকে ডে-কস্টা বলে সনাক্ত করতে অবশ্য পারেনি। মিলার বলে যে ছদ্মনামে সে এখানে ছিল, দু'একজন সেই নামেই তাকে চিনেছে।

ডে-কস্টার ডুবে মরাটা আমার কাছে কেমন রহস্যময় ঠেকলো। ফুর্তির সাঁতার কাটতে ডুবে মরার ছেলে ত সে নয়! কি করতে সে এখানে এসেছিল? আমাকেও ডেকে পাঠাবার কারণ কি?

ডে-কস্টাই নেই—এ রহস্যের হদিস কে দেবে! তবু তার সংকেত টেলিগ্রামটা আর একবার পড়ে দেখলাম। ডে-কস্টা অতি সাবধানী। সংকেত-লিপিতে পাঠানো টেলিগ্রামের পাঠোদ্ধার

উঠলো, ভেবেছিস এখন কোথাও লুকিয়ে রেখে পরে পাচার করবি সুযোগ বুঝে। কিন্তু তার আগে তোকেই যে পাচার হ'তে হবে।

ডে-ক্রস্টার মত, কেমন।

এক মুহূর্তের জন্যে চমকে উঠে বেনিটো আরো হিংস্র হয়ে উঠলো,—হাঁ, ডে ক্রস্টার মত। সেও তোর মত এ-জাহাজের রহস্য ফাঁক করতে এসেছিল।

এ-জাহাজের রহস্য তাহ'লে আছে কিছু। দামী জিনিসের মধ্যে আমি ত লুকনো সিন্দুকে এক বাণ্ডিল কাগজই দেখলাম।

ও কাগজ তুই ঘেঁটেছিস তাহলে? বেনিটোর রাগের পারা চড়ছে।

তা ঘেঁটেছি বই কি, তবে নিইনি যে কিছু সে ত তুমি নিজেই গুনে দেখেছ।

আমার শির্বিকার ভাবটাই বুঝি বেনিটোর বেশী অসহ্য।

না নিলেও টুকে যে র‍্যাখিসনি তাতে বিশ্বাস কি।

ও বাবা, ওই বিদঘুটে মাথা-গুলোনো এক বাণ্ডিল অঙ্ক আমি টুকব, এইটুকু সম্বল।

যাই করে থাকিস্ নিস্তার তোর নেই। এ-জাহাজের রহস্য জেনে কেউ জ্যান্ত ফেরে না। ডে-কস্টার মতই তোকে হাঙরদের ভোজে লাগাবার ব্যবস্থা করছি এখনি। তবে তোর ওই কেলে মাংস হাঙরেও বোধ হয় ছোঁবে না।

তা'হলে তোমার মত যে মাংস হাঙরের পছন্দ, তাই তাদের পাতে দিলে ভাল হয় না?

কি বলব, ক্ষ্যাপা গরিলা না ষাঁড়, না দুই-এর একত্র-সম্মিলনের মত বেনিটো এবার আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

জামটা ঝেড়ে নিয়ে আর একটা সিগারেট ধরিয়ে বললাম, অনেক দিনের অনেক কিছুর শোধ নেবার আছে বেনিটো, এত তাড়াতাড়ি কিসের?

ঘাড়মড় গুঁজে কেবিনের যে ধারে বেনিটো পড়েছিল, সেখান থেকে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়িয়ে এবার সে সাবধানে আমার দিকে এগুতে লাগলো। তাড়াহুড়োয় কিছু হবে না সে বুঝেছে।

কাছাকাছি এসেই সাঁড়াশীর মত দু'হাত দিয়ে সে আমায় জাপ্টে ধরতে গিয়ে সেই যে পড়লো আর ওঠবার নাম নেই। রদ্দাটা অত জোর হবে ভাবিনি।

কোমর ধরে তুলে তাকে কামরার শোফাটার ওপর বসিয়ে দিলাম।

পরমুহূর্তেই দেখি তার পিস্তল আমার দিকে তাক করা। আমি তাকে ধরে তোলবার সময়, সুযোগ পেয়ে সে পকেট থেকে সেটা বার করেছে।

এইবার শয়তান! শয়তানের মতই বেনিটোর মুখের হাসি—বল কি করেছিস আমার সিন্দুকের কাগজপত্র ঘেঁটে?

সিগারেটে একটা টান দিয়ে বললাম,—আর বলে লাভ কি! বললেও যা, না বললেও তাই। মরতে ত হবেই।

না, সত্য কথা যদি বলিস ত একটা সুযোগ তোকে দেব।

শুনতে পাই সুযোগটা?

এই জাহাজ থেকে সাঁতরে দ্বীপে যাবার সুযোগ।

হেসে বললাম,—ডে-কস্টারকেও এই সুযোগই ত দিয়েছিলেন, কিন্তু এখানকার হাঙরগুলো যে বড় হ্যাংলা।

এখনও রসিকতা!—বেনিটো চীৎকার করে উঠলো, এ পিস্তলটা কি রসিকতা মনে হচ্ছে?

পাগল, বিশেষ তোমার মত আনাড়ির হাতে। কিন্তু সা বলব শুনলে যদি তোমার মেজাজ আরো খারাপ হয়?

তবু শুনতে আমি চাই।—বেনিটো হুঙ্কার দিলে।

তবে শোন, নেহাত যখন ছাড়বে না। ও কাগজপত্রের আমি ফটো নিয়েছি।

ফটো নিয়েছিস্?

হ্যাঁ। নির্ভুল মাইক্রোফটো যাকে বলে, এক এক করে সব পাতার।

অতিকষ্টে নিজেকে সামলে নিল বেনিটো, কোথায় সে-সব ফটো!

সে-সব তো আর এ জাহাজে নেই।

জাহাজে নেই! উত্তেজনায় বেনিটো উঠে দাঁড়ালো—কোথায় ফেলেছিস্!

ফেলব কেন। পাঠিয়ে দিয়েছি। আশ্চর্য যে guided missile অর্থাৎ দূর থেকে চালানো অস্ত্রের এখানে পরীক্ষা চালাচ্ছে; অস্ত্র পরীক্ষার সঙ্গে রসিকতার লোভ সামলাতে না পেরে টরপেডোর মত যে জলে-ডোবা অস্ত্র দিয়ে টুনী শিকারীদের ছিপের সুতো কেটে নীলিমাকে অজেয় করে তুলে সবাইকে ধ করে দিয়েছ, সেই টরপেডো দিয়েই নিউপোর্ট-এর সমুদ্রকূলে সে-সব ফটো পাঠিয়ে দিয়েছি। খবর যাদের দেওয়া আছে, কাল সকালেই সমুদ্রতীর থেকে টরপেডো তুলে তা' খুলে তারা সে-সব ফটো উদ্ধার করবে।

[illegible] কথা।—বেনিটোর আর্তনাদ না চীৎকার বোঝা যায় না—সে টরপেডো একজন ছাড়া [illegible] জানে না।

জানে সেই চালিয়েছে।—আমার নয়, বেনিটোর পেছনে আর একজনের কণ্ঠস্বর। কিন্তু গুজ সৌম্য চেহারার এক বৃদ্ধ বেনিটোর পিঠে পিস্তল ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে। কখন তিনি তার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন, বেনিটো উত্তেজনার মধ্যে বুঝতেও ন।...

[illegible]হায় অবস্থায় তার মুখ দিয়ে ক'টা অস্ফুট আওয়াজ শুধু বেরোয়—আপনি—[illegible]নি...

আমি অ্যান্টনি ফিশার। চুরি করে বন্দী করে নিয়ে গিয়ে পাঁচ বছর ধরে যাকে দিয়ে [illegible] মত যা খুশি তোমরা করিয়েছ, সেই হতভাগ্য নীচ বৈজ্ঞানিক। আমি দুর্বল, মরতে [illegible] পাই। তাই তোমাদের হুকুম কাপুরুষের মত আমি তামিল করেছি। আমায় দিয়ে [illegible] দূরে থেকে চালানো অস্ত্র তোমরা তৈরি করিয়ে নাওনি, যে কোবাল্ট বোমা আজও [illegible] করতে পারেনি, তার সমস্ত অঙ্ক লিখিয়ে নিয়েছ। সে অঙ্কের খাতা আর [illegible] শুধু একলার নয়, তার হুমকি দেখিয়ে দুনিয়াকে আর তোমরা ভয় দেখাতে পারবে [illegible] আমার সান্ত্বনা। নরপিশাচদের হাতের পুতুল হ'য়ে যে আমায় থাকতে হবে না, তার [illegible] মানুষটিকে ধন্যবাদ।

[illegible]টোর হাত থেকে তার পিস্তলটা কেড়ে নিয়ে বললাম—আমায় নয়, ধন্যবাদ দিন সেই [illegible], প্রাণ দিয়ে এ-রহস্যের কিনারা করার ইঙ্গিত যে দিয়ে গিয়েছে।

সংকেত টেলিগ্রাম যে আপনাকেই নিয়ে তা এতদিনে কাল সবে বুঝেছি। টুনা-[illegible] কথাটার ভেতর যে অ্যান্টনি ফিশার নামটা লুকানো আছে তা আগে মাথাতেই [illegible]

—কিন্তু—ফটো তোলা হ'ল কিসে? বেনিটো এই হতাশার মধ্যেও জিজ্ঞেস না করে [illegible] আমি গোপনে কে কি নিয়ে জাহাজে উঠেছে সব সন্ধান রেখেছি। ছোট-বড় কোন [illegible] তোমার কাছে দেখা যায়নি। ক্যামেরা তোমার ছিল কোথায়?

[illegible]র কথা শুনেও ক্যামেরা কোথায় ছিল বুঝতে পারছ না?

শুনে মানে? হঠাৎ মানেটা বুঝতে পেরে বেনিটো মেঝের ওপরই হতভম্ব হয়ে বসে [illegible]

সোজাসুজি ক্যামেরা আনলে ধরা পড়তে হবে জানতাম বলেই এমন ব্যবস্থা করে-[illegible] সন্দেহের বাইরে। আমার বাঁধানো দাঁতই গুপ্ত ক্যামেরা। ছবি সমেত সেই বাঁধানো [illegible]ই টরপেডোতে পাঠিয়েছি। ফোক্‌লা মুখে সব কথা যদি না বোঝাতে পেরে থাকি [illegible]

[illegible]র রুদ্ধায় যা হয়নি এই শেষ ক'টা কথায় তাই হ'ল। বেনিটো মাথা ঘুরে পড়ে একে-[illegible]ন।

[illegible]া গুপ্ত ক্যামেরায় ফটো নিয়ে যথাস্থানেই পৌঁছেছিল। বেনিটো আর তার জাহাজ-[illegible] পরদিন থেকে সেণ্ট ক্যাটালিনার ধারে-কাছে কিন্তু কেউ দেখেনি। সেই সঙ্গে টুনা-[illegible]র একটি লোককে যার সম্বন্ধে ক্লাবের সভ্যদের ধারণা আজও অত্যন্ত নীচু।

[illegible] থামলেন।

[illegible]রতে যাওয়ার আর তখন সময় নেই।